আরতি

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

সম্পাদক

শ্রীসারদাচরণ ঘোষ এম্, এ, বি, এল্।

তৃতীয় বর্ষ,

১৩০৯ আষাঢ় হইতে ১৩১০ জ্যৈষ্ঠ।

ময়মনসিংহ

সাহিত্য সভা হইতে প্রকাশিত।

মূল্য দেড় টাকা।

প্রবন্ধের বর্ণানুক্রামক সূচী।

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা।
অগ্নিমন্থন।	শ্রীযোগেশ চন্দ্র রায় এম্, এ,।	১৫৯
অর্দ্ধকালী।	শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ বি, এ।	২
অষ্ট্রেলিয়ার অহল্যা।	শ্রীশ্রীনিবাস বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ,।	৯৩
ইতরপ্রাণীর বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়শক্তি।	ঐ	২৮৯
ইন্সপেক্টিং পণ্ডিতের আত্ম-নিবেদন (চিত্র)।	শ্রীহরিহর বন্দ্যোপাধ্যায়।	৮১
উৎকণ্ঠিতা (কবিতা)।	শ্রীমতী গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী।	৩২২
ঊষা (কবিতা)	শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার বি, এল,।	২৬১
একটী নূতন জন্তু।	শ্রীশ্রীনিবাস বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ,।	১৩০
ঐতিহাসিক যৎকিঞ্চিৎ।	শ্রীব্রজসুন্দর সান্যাল।	২৬৬
কবে (কবিতা)।	শ্রীরাজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি, এ,।	১৮
কুহেলিকা।	শ্রীজ্ঞানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্,এ, বি,এল।	১৫৩
কৈলাশপতি কপিশাঞ্জন।	শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।	৩৩
কোথায় (কবিতা)।	শ্রীচিন্তাহরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।	১৬৭
গর্ব্বিত প্রেমিক (কবিতা)।	শ্রীমতী গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী।	১৫৯
গ্রন্থসমালোচনা।	শ্রীমহেশচন্দ্রসেন, শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র রায়।	১৪২, ৩২০
গ্রীষ্মাধিক্যে শোচনীয় ফল।	শ্রীশ্রীনিবাস বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ,।	২৭২
চাকিয়া পিষোরে (কবিতা)।	শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ,।	২২৬
চোখের বালি (সমালোচনা)।	শ্রীমহেশচন্দ্র সেন।	২৭৬, ৩০৩
জাতিভেদ ও অর্থনীতি।	শ্রীপরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ,।	৭৩
জাপানের বামন বৃষ।	শ্রীশ্রীনিবাস বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ,।	১৩১
তুলনা (কবিতা)।	কুমার সুরেশচন্দ্র সিংহ।	১৯৩
দক্ষিণ বঙ্গ।	শ্রীরজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী।	৯৫
দার্শনিক মতের সমন্বয়।	শ্রীকোকিলেশ্বরভট্টাচার্য্যএম্,এ,	১০১, ১৬৪, ২৮১
দিদি (গল্প)।	শ্রীসরোজনাথ ঘোষ।	১১৯
দিল্লীর আফগান শাসনের প্রকৃতি।	শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত।	৫৪, ৬৯
দৃষ্টিশক্তির হ্রাস বৃদ্ধি।	শ্রীশ্রীনিবাস বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ,।	১৯
নদীর গতি পরিবর্ত্তন।	শ্রীকরুণানাথ ভট্টাচার্য্য বি, এ,।	১৭২
নরেশের জীবন উৎসর্গ (গল্প)	শ্রীঅনুকূলচন্দ্র কাব্যতীর্থ।	৩০৭
পিতৃবৎসলা (গল্প)।	শ্রীরমণীমোহন দাস এম্, এ,।	২৬
পূর্ণানন্দ পরমহংস।	শ্রীকরুণানাথ ভট্টাচার্য্য বি, এ,।	১০৪
প্রণত (কবিতা)।	শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী	৩২৩

প্রাকৃতিক দিগ্দর্শন যন্ত্র।	শ্রীশ্রীনিবাস বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ,।	৩১
প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে নারী মর্য্যাদা	শ্রীজ্ঞানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্, এ, বি, এল্,	৭
প্রেম (কবিতা)।	শ্রীযতীন্দ্রনাথ মজুমদার বি, এ,।	৩২৪
বঙ্গভাষার আদিম গন্থ।	শ্রীরসিক চন্দ্র বসু।	২৩৩
বসন্তসেনা (আলোচনা)।	শ্রীঅনুকূলচন্দ্র কাব্যতীর্থ।	১৩২
বিশ্বনাথ কবিরাজ।	শ্রীরজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী।	২১৮
বাণী (সমালোচনা)	শ্রীকেদারনাথ মজুমদার।	২৪৬
ভারতের ব্রাহ্মণ।	মহারাজ কুমুদচন্দ্র সিংহ বি, এ,।	৪২
মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার	,, ,,	১৩
মাঙ্গলিক (কবিতা)।	,, ,,	১
মাসিক সাহিত্য।	শ্রীকেদারনাথ মজুমদার ও সম্পাদক।	৬২,১১১
মোহাম্মদ।	শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত।	১৯৩, ২৪০, ২৯৩
রাজা রাজসিংহ।	মহারাজ কুমুদচন্দ্র সিংহ বি, এ,।	১৬৮
রূপকথা।	শ্রীরমণীমোহন ঘোষ বি, এল্,	১৪১
লাজময়ী (কবিতা)।	শ্রীপ্রিয়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।	৩২৩
লেপ্চা জাতির ইতিবৃত্ত।	শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য বি, এ,।	৪৬
শক্তির অবিকল্পত্ব ও ভূগর্ভস্থ উত্তাপ।	শ্রীশ্রীনিবাস বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ,।	৯১
শারদীয় পূজা।	শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।	১১৩
শিবস্থান ও বাসস্থান।	শ্রীশ্রীনিবাস বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ,।	৫৮
শ্রীক্ষেত্রে জগন্নাথ।	শ্রীমতী অম্বুজাসুন্দরী দাস।	৫১
শ্রীক্ষেত্রে গুণ্ডিচাবাটী ও বড়দাণ্ড	ঐ	২৯৩
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত।	শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত বি, এ,।	২২৭, ২৩৬
সই (কবিতা)।	শ্রীমতী সুভাষিণী দেবী।	৬৩
সখী সমীপে (কবিতা)।	শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার বি, এ,।	১১৮
সতীর জয় (কবিতা)।	শ্রীমতী বিনয় কুমারী ধর।	৬৫
সরযূ (গল্প)।	শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য বি, এ,।	১৭৮
সহজ সাধন।।	শ্রীরসিকচন্দ্র বসু।	১৪৪
সাহিত্যে সহায়তা।	শ্রীমনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা।	২৮৭
স্বামী বিবেকানন্দ ও ঠাকুর রামকৃষ্ণ।	শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত বি-এ।	১৪৩
সিদ্ধ বকুল।	শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার।	২৬০
সে দেশে (কবিতা)।	শ্রীমতী বিন্দুবাসিনী সরকার।	৪৫
হিন্দুর দেবতা।	শ্রীঅনুকূলচন্দ্র কাব্যতীর্থ।	২১৩

তৃতীয় বর্ষের লেখকগণের নাম

(বর্ণানুসারে)

শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র কাব্যতীর্থ।

শ্রীমতী অম্বুজাসুন্দরী দাস।

শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র রায়।

,, করুণানাথ ভট্টাচার্য্য বি, এ।

,, কুমুদচন্দ্র সিংহ বাহাদুর বি, এ।

,, কেদার নাথ মজুমদার।

,, কোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য এম, এ।

শ্রীমতী গিরীন্দ্র মোহিনী দাসী।

শ্রীযুক্ত জ্ঞানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্, এ, বি, এল।

,, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ।

,, চিন্তাহরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

,, দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার।

,, ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

,, পরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি,এ।

,, প্রিয়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

,, বিজয়চন্দ্র মজুমদার বি, এল।

শ্রীমতী বিনয়কুমারী ধর।

,, বিন্দুবাসিনী সরকার।

শ্রীযুক্ত ব্রজসুন্দর সান্যাল।

শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা।

,, মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত বি, এ।

,, মহেশচন্দ্র সেন।

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ মজুমদার বি, এ।

,, যতীন্দ্রমোহন সিংহ বি, এ।

,, যোগেশচন্দ্র রায় এম্, এ।

,, রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী।

,, রমণীমোহন ঘোষ, বি, এল।

,, রমণীমোহন দাস এম্, এ।

,, রসিকচন্দ্র বসু।

,, রাজেন্দ্রলাল আচার্য্য বি, এ।

,, রাজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, বি,এ।

,, রামপ্রাণ গুপ্ত।

,, শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

,, সারদাচরণ ঘোষ এম্,এ,বি,এল।

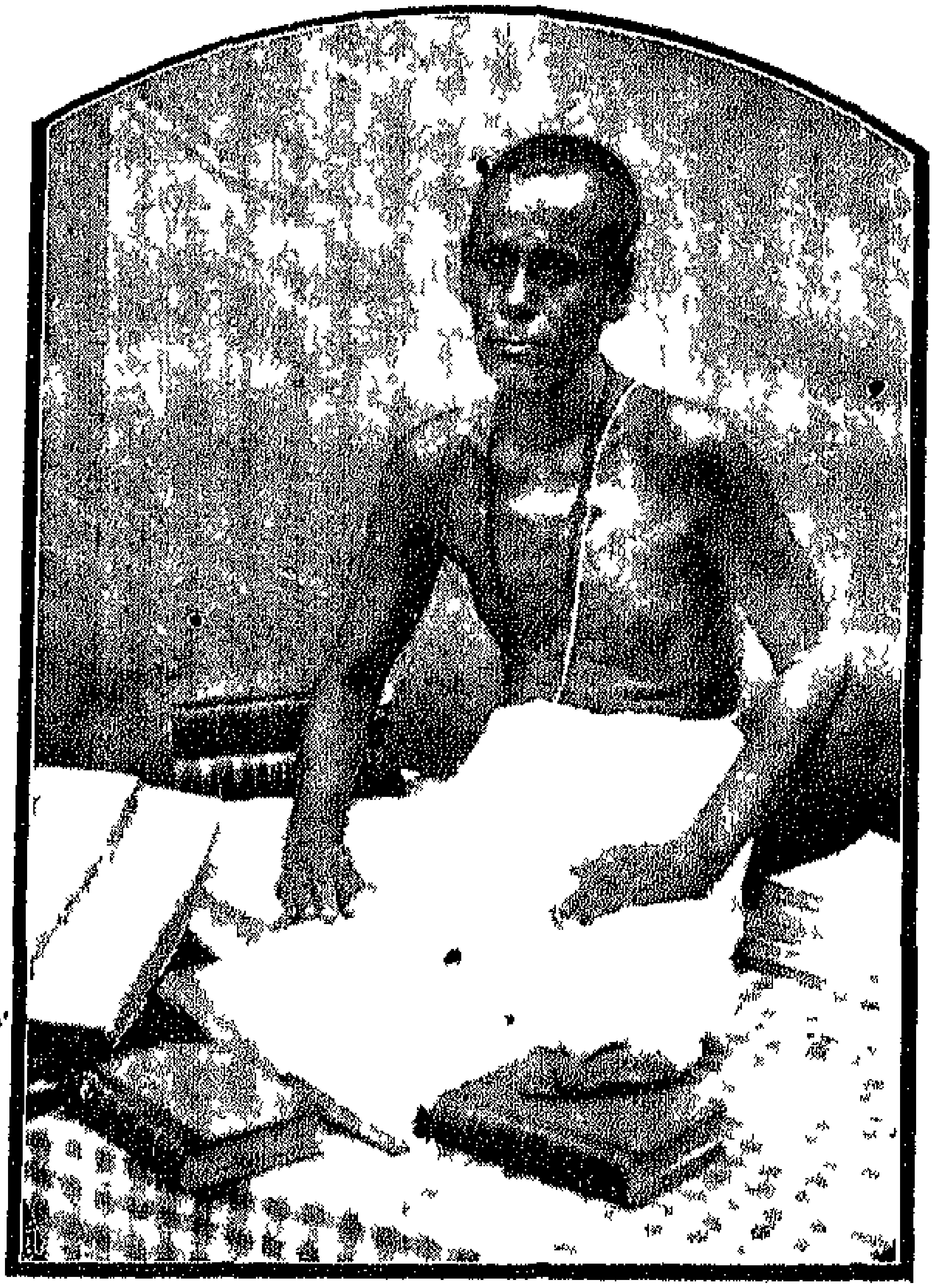
,, শ্রীনিবাস বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ।

,, সরোজনাথ ঘোষ।

,, সুরেশচন্দ্র সিংহ বাহাদুর।

শ্রীমতী সুভাষিণী দেবী।

শ্রীযুক্ত হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায়।



মহামহোপাধ্যায শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার।

আরতি।

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

তৃতীয় বর্ষ।] ময়মনসিংহ, আষাঢ়, ১৩০৯। [প্রথম সংখ্যা।

মাঙ্গলিক।

রক্তিম উষার
তরুণ আলোক সাথে জেগে উঠে প্রাচী-পথে
আভায় আশার ;
মুক্তাবৎ জ্বলি' উঠে শ্যামতৃণ চঞ্চুপুটে
তুহিন তুষার
স্বর্ণালোকে রক্তিম উষার।
নদীকোলে বীচিমালা নাচিছে সুবর্ণ-আলা,
প্রকৃতির কুঞ্জ মাঝে হাসিছে কুসুমবালা,
পল্লবে আবরি' তনু অশরীরী বাণী সম
বিহগী বিহগ
মাতাইয়া চারি ভিত গাইল মঙ্গল গীত,
স্নিগ্ধ মধু ভাবাবেশে দশ দিশি পরকাশে
হর্ষে ডগমগ !
শ্রবণ-বিবর দিয়া মরম পরশে গিয়া,
সুপ্ত ভুবন যায় উঠে চকিতে জাগিয়া,
জীবনের ব্রত ল'য়ে মন্ত্রপূত চলে ধেয়ে
নিখিল সংসার।
স্বর্ণালোকে আরক্ত উষার।
আশা পথে শিব শুভ ভুবন লভুক আর
সুবিধান হউক সুসার
দিব্যালোকে মঙ্গল উষার

অৰ্দ্ধকালী।

"নাম্না শ্রীজয়দুর্গেয়মর্দ্ধকালীতি গীয়তে।
কলৌ কুলপরিত্রার্থমাবিরাসীম্মহীতলে॥"

ঢাকা জেলার অন্তর্গত মাণিকগঞ্জ মহকুমার ৬ মাইল পূর্ব্বদিকে মিতরা নামক গ্রাম। মিতরার ভট্টাচার্য্যগণ বারেন্দ্রশ্রেণীয় ব্রাহ্মণ। তাঁহারা দেশ-বিখ্যাত ও মাননীয়। প্রায় তিন শত বৎসর পূর্ব্বে, ইহাঁদের বংশ পবিত্র করিয়া শ্রীশ্রীজগন্মাতা "অর্দ্ধকালী"রূপে আবির্ভূতা হইয়াছিলেন। তাঁহার সমসাময়িক বিশ্বদেব আচার্য্য "রাঘব দীপিকা" নামক সংস্কৃত গ্রন্থে তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবন-চরিত লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। আমরা মহামায়ার সেই অদ্ভুত লীলা-কাহিনী কিঞ্চিৎ বিবৃত করিব।

ব্রহ্মপুত্র নদের পশ্চিমদিকে ময়মনসিংহ জেলায় মুক্তাগাছার নিকটবর্ত্তী পণ্ডিতবাটী নামক গ্রামে দ্বিজদেব নামক একজন ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তিনি কোন পূর্ব্ব জন্মে কঠোর তপশ্চর্য্যা ও ভক্তিসাধনা দ্বারা ভগবতীকে কন্যারূপে লাভ করিবার বর পাইয়াছিলেন। তিনি বহুশাস্ত্র অধ্যাপনা করিতেন, সেজন্য দেশ দেশান্তর হইতে অনেক ছাত্র আসিয়া তাঁহার বাড়ীতে থাকিয়া তাঁহার নিকট শাস্ত্রশিক্ষা করিত। এক দিন তাঁহার স্ত্রী নিতম্বিনী দেবী অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় স্বপ্নে দেখিলেন ত্রিনয়না নগেন্দ্রবালা বিশ্ববিমোহিনী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া তাঁহাকে মা বলিয়া ডাকিয়া তাঁহার কোলে বসিলেন। স্বপ্নবৃত্তান্ত শুনিয়া ব্রাহ্মণ নিজকে পরম সৌভাগ্যশালী জ্ঞান করিলেন। তাঁহার স্ত্রীর গর্ভে, একটী কন্যা জন্ম-গ্রহণ করিল। কন্যাটীর রূপ কিছু নূতন রকমের হইল। তাঁহার শরীরের বামার্দ্ধ হইল গৌরবর্ণ, আর দক্ষিণার্দ্ধ হইল শ্যামবর্ণ। ব্রাহ্মণ কন্যার নাম জয়-দুর্গা রাখিলেন। বালিকাটী ক্রমে বয়সে বড় হইল। সে তাহার সমবয়স্কা বালিকা-দের সহিত খেলা করিতে করিতে হঠাৎ অন্তর্হিত হইত। তাহার সখীগণ তাহার অদর্শনে অধীর হইয়া তাহাকে খুঁজিয়া বেড়াইত, তখন আবার সে হঠাৎ আসিয়া তাহাদিগকে দেখা দিত। তখন তাহাদের আনন্দের সীমা থাকিত না। জয়দুর্গা ফুল তুলিতে গেলে, বড় বড় গাছ সকল মাথা নোঁয়াইয়া তাহাকে পুষ্পোপহার প্রদান করিত। ব্রাহ্মণ এই সকল অলৌকিক ঘটনা জানিতে পারিলেন। তিনি বুঝিলেন তাঁহার কন্যা অলোকসামান্যা; * কন্যার বিবাহের বয়স হইলে, তিনি একটী উপযুক্ত বর খুঁজিতে লাগিলেন, কিন্তু

কন্যাটীর সেই অদ্ভুত রূপ দেখিয়া কেহই তাহাকে বিবাহ করিতে রাজি হইল না।

দ্বিজদেবের টোলে রাঘবরাম নামক একটী ছাত্র পড়িতেন। তিনি সর্ব্বদা অন্যমনস্ক হইয়া বসিয়া বসিয়া কি ভাবিতেন, সকলে বলিত তিনি গভীর শাস্ত্র-চিন্তা করেন। কেহ কেহ বলিত ওটী পাগল। একদিন তিনি তাঁহার সমপাঠি-গণের সহিত একটী খালে স্নান করিতে গিয়াছিলেন। সকলে বলিল, "এস ভাই আমরা মাছ ধরি।" সেই খালে প্রবল স্রোত ছিল, বাঁধ না দিলে মাছ ধরা যায় না। সকলে রাঘবকে বলিল, "ভাই, তুমি জলের মধ্যে বাঁধ হইয়া শুইয়া থাক, আমরা তোমার উপর মাটি চাপা দিয়া মাছ ধরি।" রাঘব বলিলেন "বেশ কথা।" তিনি সেই খালের মধ্যে জল আটকাইয়া শুইয়া রহিলেন, সকলে তাঁহার উপরে কাদা মাটি চাপাইয়া দিল। পরে তাহারা মনের সুখে মাছ ধরিয়া বাড়ী চলিয়া গেল, কিন্তু যাইবার সময় রাঘবের কথা ভুলিয়া গেল। রাঘব সেই মাটির নীচে চাপা পড়িয়া রহিলেন। তাহারা বাড়ী গিয়া যখন সেই মাছ দিয়া ভাত খাইতে বসিল, তখন রাঘবের কথা তাহাদের মনে পড়িল। তাহারা অনুতাপ করিতে করিতে তাড়াতাড়ি সেখানে আসিয়া দেখে রাঘব পূর্ব্ববৎ বাঁধ হইয়া পড়িয়া আছেন। তাহারা তাঁহাকে উঠাইল, উঠাইয়া দেখিল যে তিনি দম আটকাইয়া মরেন নাই। ইহাতে সকলে বিস্মিত হইল এবং তাঁহাকে একজন অলৌকিক পুরুষ বলিয়া ভক্তি করিতে লাগিল। তাহাদের গুরুও সেই দিন রাঘবকে একজন দৈব-প্রকৃতি-সম্পন্ন মানুষ বলিয়া চিনিতে পারিলেন। রাঘব যে খালটিতে বাঁধ হইয়া শুইয়াছিলেন, তাহা নাকি আজও "রাঘব খাত" নামে পরিচিত আছে।

রাঘবের পাঠ শেষ হইল, তিনি স্বগৃহে গমন করিবার জন্য গুরুর নিকট বিদায় চাহিতে গেলেন। গুরু বলিলেন, "আমার দক্ষিণা?" রাঘব বলিলেন, "আপনি কি দক্ষিণা চান, আজ্ঞা করুন।" গুরু বলিলেন, "আমি আর কোন দক্ষিণা চাই না—আমার কন্যাটিকে তুমি বিবাহ কর।" কি সর্ব্বনাশ! গুরু-কন্যার পাণিগ্রহণ? রাঘব বলিলেন, "তাহা আমি পারিব না। আপনি অন্য দক্ষিণা অনুমতি করুন।" শিষ্য পুরাণ শাস্ত্র ঘাঁটিয়া এক নজির বাহির করিয়া দেখাইলেন, "এই দেখুন, শুক্রাচার্য্যের শিষ্য, বৃহস্পতির পুত্র কচ অধর্ম্ম ভয়ে গুরুকন্যা দেবযানীকে বিবাহ করেন নাই। তবে আমি কেন করিব?"

গুরু বলিলেন, "বাপু হে! তোমার সে স্মৃতের নজির রাখিয়া দাও। আমি

তোমার গুরু তুমি আমার শিষ্য, আমি তোমার পিতা। আমি যে আদেশ করিব, তুমি বিনা বিচারে তাহা পালন করিবে। তাহাতে তোমার কোন অধর্ম্ম হইবে না।"

গুরুদেবেরও আইন নজিরের বিদ্যা কম ছিল না। তিনি দেখাইলেন পরশুরাম পিতার আজ্ঞায় মাতাকে পর্য্যন্ত মারিয়াছিলেন।

যাহা হউক, এইরূপে দ্বিজদেব রাঘবরামের হস্তে জয়দুর্গাকে সম্প্রদান করিলেন। রাঘবরাম স্ত্রী লইয়া মিতরা গ্রামে আসিয়া বাড়ী করিলেন।

কিন্তু এক বিপদ ঘটিল। তাঁহার আত্মীয় বন্ধুগণ কন্যাটির অদ্ভুত রূপ দেখিয়া নানা কথা বলিতে লাগিল। কেহ তাঁহার হাতে খাইতে চাহে না। পরে রাঘবের অনুনয় বিনয়ে সকলে তাঁহার গৃহে আহার করিতে সম্মত হইলেন। রাঘব একদিন সকলকে নিমন্ত্রণ করিলেন।

নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ ভোজনে বসিয়াছেন। শ্রীমতী জয়দুর্গা দেবী দুই হাতে থালা ধরিয়া অন্ন পরিবেশন করিতে আসিলেন। সকলের সম্মুখে হঠাৎ তাঁহার মাথার কাপড় বাতাসে উড়িয়া গেল। সভার মধ্যে নববধূর অবগুণ্ঠন উন্মোচন কি ভয়ানক লজ্জার কথা! কিন্তু উপায় নাই, তাঁহার দুই হাতই আটকা, দুই হাতই উচ্ছিষ্ট। কিন্তু ও কি! কি অদ্ভুত ব্যাপার! সেই নব বধূর আর দুই খানা হাত বাহির হইয়া মাথার ঘোমটা টানিয়া দিল! অর্দ্ধকালী জয়দুর্গা দেবী এইরূপে প্রকট হইলেন।

জয়দুর্গার গর্ভে রামদেব, রাজেন্দ্র, রামভদ্র ও রামেশ্বর এই চারিটি পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র রামদেব তপঃসিদ্ধিবলে অনেক অলৌকিক কার্য্য করিয়াছিলেন বলিয়া কিম্বদন্তী আছে। তাঁহার ডাক নাম ঠাকুর ভট্টাচার্য্য। কনিষ্ঠ পুত্র রামেশ্বরও নানা শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে আর একটি কিম্বদন্তী আছে। একদিন তিনি বিদ্যালয় হইতে বাড়ীতে আসিয়া দেখেন তাঁহার পিতা রাঘবরাম শারদীয়া পূজা উপলক্ষে চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া চণ্ডীপাঠ করিতেছেন। তিনি মাতাকে জিজ্ঞাসিলেন—"মা, ও কি পড়া হয়?" মা বলিলেন—"সে কি? তুমি কি কখনও চণ্ডীপড়া শুন নাই?"

পুত্র বলিলেন, "কি? চণ্ডীপাঠ? চণ্ডী বুঝি ঐ রকম পড়ে? শাস্ত্রের বিধান এই, নিষাদ গান্ধারাদি স্বরসংযোগে হ্রস্বদীর্ঘ প্লুতাদির সম্যক্‌রূপ উচ্চারণ করিয়া চণ্ডী পাঠ করিতে হয়। নচেৎ সেই চণ্ডীপাঠের বিপরীত ফল হয়।"

রাঘবরাম পুত্রের এই কথা শুনিয়া চটিয়া গেলেন। "কি? তুই আমার

ছেলে হইয়া আমার চণ্ডীপাঠের ভুল ধরিস্? পড়্, দেখি, তুই-ই চণ্ডী পড়্। দেখি তুই কেমন পড়িতে পারিস্।"

রামেশ্বর ভক্তিপূর্ব্বক দেবীকে স্তব করিয়া তদ্‌গত চিত্তে দেবী প্রতিমার দক্ষিণ দিকে পূর্ব্বাস্য হইয়া বসিয়া যথাবিধি সপ্তস্বর বিন্যাস পূর্ব্বক চণ্ডী পাঠ আরম্ভ করিলেন। তাঁহার বিশুদ্ধ চণ্ডীপাঠের ফলে দেবীপ্রতিমা ঘুরিয়া আসিয়া তাঁহার সম্মুখে পশ্চিমমুখী হইয়া অবস্থান করিলেন। সকলে দেখিয়া স্তম্ভিত হইল।

"পুত্রাদিচ্ছেৎ পরাজয়ম্।" সাধারণতঃ সকলে পুত্রের নিকট পরাজয় বাঞ্ছা করে। কিন্তু অভিমানী রাঘবরাম পুত্রের নিকট পরাজিত হইয়া নিজ গৌরব খর্ব্ব হইল মনে করিয়া ক্ষুণ্ণ হইলেন। এমন কি তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া পুত্রকে শাপ দিলেন, "আমার অশুদ্ধ চণ্ডীপাঠের ফলে তুই বেটা নির্ব্বংশ হ।" তিনি আরও বলিলেন, "যে চণ্ডীপাঠ বিশুদ্ধরূপে অনুষ্ঠিত হইলে সুফল ফলে, কিন্তু অশুদ্ধরূপে অনুষ্ঠিত হইলে কুফল প্রদান করে, আমার বংশের কেহ যেন কখনও তাহা না করে।" তদবধি মিতরার ভট্টাচার্য্য বংশে চণ্ডীপাঠ রহিত হইয়াছে। আর দেবী প্রতিমা পশ্চিমাস্য হইয়া রামেশ্বরের চণ্ডীপাঠ শুনিয়াছিলেন বলিয়া মিতরার ভট্টাচার্য্যদিগের পশ্চিমদ্বারী মণ্ডপে দেবীর অর্চ্চনা হইয়া থাকে।

রাঘবরামের বংশ এখন একাদশ পুরুষ পর্য্যন্ত নামিয়াছে। তাহার একটী শাখার বংশতালিকা নিম্নে দিতেছি :—

রাঘবরাম
|
রামদেব
|
রামচন্দ্র
|
রামগোবিন্দ
|
রামানন্দ
|
ব্রহ্মানন্দ
|
হরানন্দ
|
বিশ্বানন্দ
|
হৃদয়ানন্দ
|
সুরেশানন্দ।

শ্রীযুক্ত বিশ্বানন্দ ভট্টাচার্য্য এখনও জীবিত। তাঁহার বয়স ৭০ বৎসর। আমি তাঁহার নিকটে অনেক কথা শুনিয়া এই প্রবন্ধ লিখিলাম।

ভট্টাচার্য্য বংশে এখনও প্রত্যহ অন্ধকালী দেবীর পূজা হইয়া থাকে। অন্যান্য শক্তিমূর্ত্তির ন্যায় ইঁহারও মূলমন্ত্র আছে, স্তব কবচাদি আছে। তাঁহার ধ্যান ও স্তব নিম্নে দিলাম। স্তবটী বড়ই সুন্দর।

ধ্যান।

"নীলাব্জোপর গৌর বিগ্রহতমোগ্রস্তার্দ্ধচন্দ্রোপমা,
সারং চারুকরদ্বয়েন দধতী পাত্রং বিচিত্রাম্বরা।
বাহুভ্যামপি লজ্জিতেব পবনোড্ডীনাননস্থাম্বরা
কালিন্দী জললগ্ন নির্ম্মলসরিৎ কান্তিঃ সদা সেব্যতাম্॥"

শ্রীশ্রীজয়দুর্গাষ্টক।

(স্তব)

"শুদ্ধয়ে কলৌ কুলস্য কর্ম্মভূমিমাগতাং
শিষ্ট চিন্মনোরথস্য সাধনে সদা রতাং।
ভক্তকামপূরণায় বালিকাস্বরূপিকাম্
ত্বাং ভজামি দেবি! দিব্যমূর্ত্তিমর্দ্ধকালিকাম্॥ ১

তৎসমাপ্য বালকেলিমেত্য পত্যুরালয়ং
মর্ত্ত্যমানসানি চিত্রদর্শনাদ মোহয়ঃ।
চণ্ডিকা পবিত্র পাঠ কাম পুত্রবৎসলাং
ত্বাং ভজামি দেবি! দিব্যমূর্ত্তিমর্দ্ধকালিকাম্। ২

সংক্ষয়ে বিরাজমাপ্য ঘোর মোহ নিদ্রয়া
নাভি পঙ্কজে প্রসূয় পদ্মজং পুরা ত্বয়া।
বিষ্ণুনা হতং কুচিত্ত দৈত্যযুগ্মমম্বিকাম্
ত্বাং ভজামি দেবি। দিব্যমূর্ত্তিমর্দ্ধকালিকাম্। ৩

শম্ভু কুণ্ডলীত্বমাপ্য মূলপদ্মবাসিনীম্
সূক্ষ্ম বর্ত্মনোর্দ্ধমেত্য শম্ভুসংবিলাসিনীম্।
দেহ ষড়্‌পঙ্কজেষু যগাধুরন্তারিকাম্
ত্বাং ভজামি দেবি। দিব্যমূর্ত্তিমর্দ্ধকালিকাম্॥৪

দৈব ও দৈবিকৈরাশ্রিতেষু যজ্জগৎসুনির্ম্মলম্
কোঽপি বেত্তি নৈব তত্র তে বিচিত্র কৌশলম্।
স্রষ্টুমিচ্ছয়া প্রসূত তন্মুখ ত্রিমূর্ত্তিকাম্
ত্বাং ভজামি দেবি! দিব্যমূর্ত্তিমর্দ্ধকালিকাম্। ৫

শত্রুযোগনাশতেজোদ বাক্ষমাগণালিকা
তারকক্দবাত্তো স্বমাজোন কালিকা।
দুষ্ট চিত্ত সান্নিহত্য শিষ্টসংঘালিকাং
তাং ভজামি দেবি। দিব্যমূর্ত্তিমর্দ্দকালিকাম্ ॥৬
যামৃতে নচেতনীহ কোঽপি মোহনিদ্রয়া
চেতনাবলেন ভাতি জীবনজ্জগত্ত্রয়া।
বিশ্বলোকদীপনায় ভূরিরূপরোপিকাম্।
তাং ভজামি দেবি। দিব্যমূর্ত্তিমর্দ্দকালিকাম্ ॥ ৭
মায়য়া বিনির্জিতেষু তে জগৎ সুসপ্ততং
স্বপ্নবৎ বিলোকয়ৎসু বিপ্রবালিকে স্থতং।
যাং বিকাশ্য চেতনাং বংসলাদ্রমর্দ্দিকাম্
তাং ভজামি দেবি। দিব্যমূর্ত্তিমর্দ্দকালিকাম্ ॥ ৮”

শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ।

প্রাচীন সংস্কৃত ও বঙ্গসাহিত্যে নারীমর্য্যাদা।

বেদ, সূত্র, সংহিতা প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রে ও রামায়ণ, মহাভারত, ইত্যাদি ইতিহাসগ্রন্থে হিন্দুজাতির তীক্ষ্ণ নারীমর্য্যাদাজ্ঞানের কিরূপ স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহা বর্ত্তমান সনের বৈশাখের 'ভারতী'তে আলোচনা করিয়াছি। বর্ত্তমান প্রবন্ধে দেখাইব হিন্দুর সংস্কৃত নাট্য ও কাব্যসাহিত্য এবং প্রাচীন বঙ্গ কাব্যসাহিত্যেও তাদৃশ প্রমাণের অভাব নাই।

হিন্দুর কাব্য ও নাট্যসাহিত্য আলোচনা করিলে স্ত্রীজাতির প্রতি তাহাদের সম্মানজ্ঞানের একটি সুস্পষ্ট চিত্র হৃদয়মধ্যে দৃঢ়মুদ্রিত হইয়া যায়। (১) আশ্রম-সখী সুদক্ষিণার প্রতি দিলীপের সসম্ভ্রম স্নেহ ও সম্মানের বর্ণনা পাঠ করিয়া কে

(১) বিখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ উইলসন সাহেব বলেন (Hindu Theatre, Vol I. P. 77 note) :—The Hindu poets rarely dispraise their women ; they almost invariably represent them as amiable and affectionate. In this they might give a lesson to the bards of more lofty nations, and particularly to the Greeks, who both in tragedy and comedy, pursued the fair sex with implacable rancour. Aristophanes is not a whit behind Euripides, although he ridicules the tragedian for his ungallant propensities.” রোমান-গণও এ বিষয়ে কম ছিলেন না। কেটো বলেন—If the world were free from women, men would not be converse of gods. সিসিরোর মতে many motives will urge men to one crime, but one passion will impel women to all crimes.

বলিতে পারে পত্নীপ্রেম তৎকালে চরমোৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল না? ইন্দুমতীর মৃত্যুতে অজ রাজার বিলাপবাণী অনেক পত্নীবিয়োগবিধুরের হৃদয়ে অদ্যাপি সমবেদনার সুর জাগাইয়া দেয়। "রজনী শশীকে এবং চক্রবাকী সহচর চক্রবাককে পুনরায় পায় বলিয়া তাহারা ক্ষণস্থায়ী বিরহবেদনা সহ্য করিতে সক্ষম হয়। কিন্তু যখন এ জন্মের মত তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিলে, তখন আমার দেহ কেননা দগ্ধ হইবে? হে প্রেয়সি, তুমি আমার গৃহিণী, তুমি আমার রহস্যসখি, এবং ললিতকলা আলোচনায় তুমি আমার প্রিয়শিষ্যা ছিলে, অতএব নিতান্ত নিষ্ঠুর মৃত্যু তোমাকে হরণ করিয়া আমার কি না হরণ করিয়াছে?" (১) ভবভূতির উত্তররামচরিতে 'করুণস্য মূর্ত্তিরিব বা শরীরিণী বিরহব্যথৈব' জানকীর প্রতি রামের যে সুগভীর প্রেম সর্ব্বত্র ব্যক্ত, তদপেক্ষা মর্ম্মস্পর্শী বর্ণনা কোন দেশের কোন কাব্যে আছে কি না সন্দেহ। জানকীকে দেখিয়া রামের হৃদয়ে এতদূর আনন্দাবেগ হইত যে; 'আনন্দেন জড়তাং পুনরাতনোতি' এবং কবি এতদুভয়ের অনির্ব্বচনীয় প্রেমের তলস্পর্শ করিতে না পারিয়াই যেন বলিয়াছেন 'তত্তস্য কিমপি দ্রব্যং যোহি যস্য প্রিয়োজনঃ।' শকুন্তলার প্রতি দুষ্মন্তের প্রেমে অধিকতর লালসার মাদকতা থাকিলেও তাহার মাধুর্য্য কম নহে। পঞ্চমাঙ্কে পরস্ত্রীর প্রতি দুষ্মন্তের কি মহতী শ্রদ্ধা প্রকাশ পাইতেছে। খ্রীষ্টের জন্মের পূর্ব্বে রচিত মৃচ্ছকটিক নাটকে তদানীন্তন সমাজের যে চিত্র পাওয়া যায়, তাহা স্ত্রীজাতির পক্ষে বিশেষ অনুকূল বলিয়াই বোধ হয়। বসন্তসেনা গণিকা হইলেও কলানিপুণা, নাগরিকগণ তাহাকে নগরের সর্ব্বপ্রধান শোভা বলিয়া গণ্য করিত, তাহার গৌরব ও সমাদর 'বসন্তশোভেব' ও 'দেবতোপস্থানযোগ্যা' প্রভৃতি বিশেষণ দ্বারাই প্রকটিত। চারুদত্তের তৎপ্রতি সসম্ভ্রম ব্যবহার পাঠকমাত্রেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রাচীন গ্রীক ইতিহাসে পেরিক্লিস্ ও আস্পাশিয়ার যে কবিত্ব-সৌরভময়ী কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে, তদপেক্ষা ইহা কি কম মনোরম? যখন অভিমানিনী ভার্য্যা পতিকে নিম্নরূপ তীব্র ভর্ৎসনা দ্বারা উৎসাহিত করিতে পারিত, তখন যে সমাজে নারীজাতির যথেষ্ট প্রভাব ছিল এরূপ অনুমান অসঙ্গত নহে—"নিরস্তবিক্রম হইয়া ক্ষমাকেই যদি সুখের সাধন বিবেচনা কর, তবে কার্ম্মুক পরিত্যাগপূর্ব্বক জটাবল্কল ধারণ করিয়া অগ্নিতে হোম কর।" (২) মালবিকাগ্নিমিত্র ও রত্নাবলী এই উভয় নাটকেই

(১) রঘুবংশ, ৮ম সর্গ, ৫৭, ৬৮, শ্লোক। পাঠকগণ মেঘদূতের বিরহী যক্ষের কথাও বিস্মৃত হইবেন না।

(২) কিরাতার্জ্জুনীয়, ১ম সর্গ, ৪৪ শ্লোক।

রাজার উপর মহিষীর প্রভাব বিশেষরূপে দৃষ্ট হয়। অগ্নিমিত্রের মালবিকার প্রতি, এবং বৎসরাজের রত্নাবলীর প্রতি প্রেম যথাক্রমে মহিষী ধারিণী ও মহিষী বাসবদত্তার ভয়ে বহুকাল ব্যক্ত হইতে পারে নাই। উভয় নাটকেই মহিষীর নিকট ধরা পড়িবার আশঙ্কায় রাজা বহুকাল ভীত ছিলেন, এবং পরিশেষে উভয় নাটকেই মহিষীগণ সুপ্রসন্না হইয়া সম্মতি দিলেই তবে নৃপতিদ্বয় স্ব স্ব প্রণয়িনীর সহিত বিবাহিত হইতে পারিয়াছিলেন। কথা হইতে পারে, এস্থলে রাজার রাজ্ঞীভীতি প্রকাশ পাইলেও একনিষ্ঠার অভাবই প্রকটিত হয়। কিন্তু নারীজাতির প্রতি এই সম্মানের দিনেও ধনী ও রাজগৃহে একনিষ্ঠার দৃষ্টান্ত বহুতর দৃষ্টিগোচর হয় না। (১) হিন্দুর নারীমর্য্যাদার আর একটি প্রমাণ সংস্কৃত সাহিত্য হইতে উদ্ধার করা যাইতে পারে। পাদবন্দনা হিন্দুদিগের মধ্যে পূজ্যব্যক্তির অভিবাদনের সনাতন রীতি বলিয়া পরিগণিত। উত্তররামচরিতের প্রথমাঙ্কে রাম সীতার পদদ্বয় মস্তকে স্থাপন করিয়াছেন। রত্নাবলীর তৃতীয়াঙ্কে রাজা 'প্রিয়ে প্রসীদ প্রসীদ' বলিয়া মহিষীর 'পাদয়োঃ পতিত।' খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে বাঙ্গালী কবি জয়দেবও কৃষ্ণকে রাধার পদতলে* নিক্ষেপপূর্ব্বক 'দেহি পদপল্লবমুদারম্' বলাইতেছেন। (২)

অতি প্রাচীন বৈদিক যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া মধ্যযুগ পর্য্যন্ত হিন্দুরমণী জ্ঞান, বিজ্ঞান, ধর্ম্ম, দর্শন, রাজনীতি, সকল বিষয়েই পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিল। বৈদিক যুগে গার্গী ও মৈত্রেয়ী প্রভৃতির উল্লেখ হইতে তৎকালে বিদ্যাবতী রমণীর পরিচয় পাওয়া যায়। রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে অত্রিমুনির পত্নী তাপসী অনসূয়ার উল্লেখ আছে; রাম সীতাকে তাঁহার নিকট শিক্ষা লাভ করিতে আদেশ করেন। তিনিও সীতাকে অতি সুন্দর ভাষায় পাতিব্রত্যধর্ম্মে উপদেশ দেন। (৩) আরণ্যকাণ্ডে সিদ্ধা শবরী জটিলা তাপসীর কথা পাওয়া

(১) "We shall not be surprised by the fact that polygamy in its more or less modified forms, survived among monarchs during the earlier stages of European civilisation. As implied above, it was practised by Merovingian kings,,,And after being repressed by the church throughout other ranks, this plurality of wives and concubines long survived in the royal usage of having many mistresses, avowed and unavowed; polygamy in this qualified form remaining a privilege of royalty down to quite late times."—Herbart Spencer, Sociology. Vol. I, p. 696.

(২) ১০ম সর্গ, ৮ শ্লোক, গীতগোবিন্দ।

(৩) সপ্তদশাধিক শততম সর্গ।

যায়। (১) মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে সন্ন্যাসিনী সুলভা জনকবংশোদ্ভব রাজা ধর্ম্মধ্বজকে মোক্ষধর্ম্ম সম্বন্ধে জ্ঞানগর্ভ উপদেশ প্রদান করেন। (২) ভাগবতপুরাণে কপিলের মাতা দেবহুতি কপিলের সহিত আধ্যাত্মিক তত্ত্বালোচনা করিতেছেন। (৩) খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে সুপ্রসিদ্ধ গণিতশাস্ত্রবেত্তা ভাস্করাচার্য্যের কন্যা লীলাবতী বর্ত্তমান ছিলেন। তাঁহার অকালবৈধব্য দেখিয়া পিতা তাঁহাকে অঙ্কশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন করিয়া তাঁহার নামে "লীলাবতী" নামে গণিত গ্রন্থ রচনা করেন। "কর্ণকুতূহল" নামক গ্রন্থে কন্যাকে তিনি 'অয়ি বালে লীলাবতি!' বলিয়া সম্বোধন করিয়া সূত্রসঙ্কেতাদি রচনা করেন। ইহা হইতে লীলাবতীর বিদ্যাবত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। আর এক লীলাবতীর উল্লেখ আছে, তিনি বিখ্যাত নৈয়ায়িক উদয়নাচার্য্যের পত্নী। উদয়নাচার্য্যের সহিত মহাত্মা শঙ্করাচার্য্যের বিচারকালে তিনি মীমাংসক নিযুক্ত হন। স্বামীর পরাজয়ের পর ইনি শঙ্করাচার্য্যের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হন। যদিও ইনি বিচারে পরাজিত হন, তথাপি এই ঘটনা হইতে আমরা ইঁহার গভীর জ্ঞানের আভাস পাই। খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীতে মান্দ্রাজ প্রদেশে আবিয়ার নাম্নী এক বিদুষী রমণী আবির্ভূতা হইয়া "অতিশুদি" নামক লোকপ্রসিদ্ধ নীতিগ্রন্থ রচনা করেন। এই সমুদয় বিদুষী মহিলাগণের অস্তিত্ব হইতে এরূপ অনুমান অসিদ্ধ হইবে না যে তৎকালে স্ত্রীশিক্ষা সুপ্রচলিত ছিল।

ললিতকলা-চর্চ্চাতেও হিন্দুমহিলাগণের যথেষ্ট অধিকার ছিল। মহাভারতে বিরাটরাজার কন্যাগণকে নাট্যশিক্ষাদান মানসে অর্জ্জুন বৃহন্নলা নাম ধারণপূর্ব্বক বিরাটগৃহে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। বসন্তসেনা বিরলে চারুদত্তের চিত্রিত প্রতিমূর্ত্তির দিকে চাহিয়া থাকিতেন। শকুন্তলার ষষ্ঠাঙ্কে চেটীগণের চিত্রাঙ্কনের কথা উল্লেখিত আছে। রত্নাবলী মদনরূপে বৎসরাজের সুন্দর একখানি প্রতিকৃতি আঁকিয়াছিলেন, প্রিয়সখি সুসঙ্গতা তাহারই পার্শ্বে রতিবেশে রত্নাবলীর চিত্র অঙ্কিত করিয়াছিলেন। মালবিকা রাজ্ঞীর আদেশে গণদাস নামক নটাচার্য্যের নিকট অভিনয় শিক্ষা করিয়াছিলেন। হরিবংশে যাদবগণের জলবিহারের একটী বর্ণনা আছে। তাহাতে স্ত্রীপুরুষের একত্র নৃত্য, গান ও

---

(১) চতুঃসপ্ততিতম সর্গ।

(২) মোক্ষধর্ম্ম পর্ব্বাধ্যায়, একবিংশত্যধিক ত্রিশততম অধ্যায়।

(৩) ৩য় স্কন্ধ ২৬ অধ্যায়।

আহারের উল্লেখ আছে। (১) শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা দ্বারা গোপীগণের নৃত্যপটুতা সূচিত হয়। (২)

এখন প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের আলোচনা করা যাউক। বঙ্গীয় বৈষ্ণব কবিদিগের মধ্যে প্রাচীনতম ও প্রধানতম চণ্ডীদাস গাহিয়াছেন :—

পিরীতি সহজ কথা।
বিরিখের ফল নহে ত পিরীতি
নাহি মিলে যথা তথা॥
* * *
পিরীতি লাগিয়া, আপনা ভুলিয়া,
পরেতে মিশিতে পারে।
পরকে আপন করিতে পারিলে
পিরীতি মিলয়ে তারে॥
পিরীতি সাধন বড়ই কঠিন
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাস।
দুই ঘুচাইয়া এক অঙ্গ হও,
মিলিবে পিরীতি আশ॥

খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে ইংরেজ কবি চসারের সমকালে একজন বাঙ্গালী কবি প্রেমের যে উচ্চাদর্শ দেখাইয়াছেন, তদপেক্ষা উচ্চতর, পবিত্রতর প্রেম কল্পনার অনধিগম্য। নারীজাতির প্রতি প্রকৃষ্ট সম্মানজ্ঞান না থাকিলে এরূপ

(১) ১৪৬-৪৭ অধ্যায়। বলা উচিত, যাহাদের স্ত্রী ছিল না তাহাদের বারবনিতাসহ নৃত্যের উল্লেখ আছে। এসম্বন্ধে ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র বলেন—Hindu society has always looked upon fallen women with kind indulgent eyes—(Indo-Aryans, Vol. I, Chap. VIII). ইংলণ্ডের সামাজিক ঔপন্যাসিকদিগকে বিশ্বাস করিতে হইলে তথাকার উচ্চ সমাজেও অধুনা এই শ্রেণীর আধিপত্য বড় বেশী।

Ouidaর Under Two Flags দেখুন :—The Zu-Zu [a courtesan] is an openly acknowledged fact, moreover, daily becoming more prominent in the world, more brilliant, more frankly recognised, more omnipotent (পঞ্চম পরিচ্ছেদ)। ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে Zu-Zu একজন উচ্চবংশীয় ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলার সহিত একত্র পানভোজন করিতেছেন,—গোপনে নহে, সমাজের চক্ষুর সম্মুখে। যৌন নীতি সম্বন্ধে এই ইংলণ্ডই নাকি ইউরোপে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

(২) ১০ম স্কন্ধ, ৩৩ অধ্যায়।

কবিতা লেখনীদ্বারা কখনই নিঃসৃত হইতে পারিত না। (১) পুনশ্চ, মুকুন্দরামের চণ্ডীতে, সপত্নীক ধনপতি সওদাগরের নিকট লক্ষপতি বণিক কন্যা লহনাকে বিবাহ দেওয়ার মনন করিলে পত্নী রম্ভাবতী যে ভাষায় স্বামীর মন ফিরাইবার চেষ্টা করিয়াছিল, তদপেক্ষা স্পষ্টবাক্য এবং সুসভ্য দিলেও কোন পত্নী স্বামীর প্রতি প্রয়োগ করিতে সাহস পান কি না সন্দেহ। (২) দারান্তর গ্রহণ সেকালে অধিকতর প্রচলিত থাকিলেও বড় সহজ ছিল না, পূর্ব্বপত্নীকে নানা 'কপট সম্ভাষে' প্রবোধ এবং 'পরিতোষে পাট সাড়ী' ও 'পাঁচপণ সোণা গড়িবারে চুরি' দিয়া তাহার সম্মতি গ্রহণ আবশ্যক হইত। স্বামী বেচারাকে পুনর্ব্বিবাহের নিমিত্ত যে সকল ছল হেতুবাদের আশ্রয় লইতে হইত, তাহা হইতে গৃহিণীর ক্ষমতার বেশ পরিচয় পাওয়া যায়ঃ—"রূপ নাশ কৈলে প্রিয়ে রন্ধনের শালে। চিন্তামণি নাশ কৈলে কাঁচের বদলে॥ স্নান করি আসি শিরে না দাও চিরুণী। রৌদ্র না পায় কেশ শিরে বিন্ধে পানি॥ অবিরত ঐ চিন্তা অন্য নাহি গণি। রন্ধনের শালে নাশ হইল পদ্মিনী॥ মাসি পিসি মাতুলানী ভগিনী যাতনী। কেহ নাহি থাকে ঘরে হইয়ে রন্ধনী॥ যুক্তি যদি লয় মনে কহিনা প্রকাশি। রন্ধনের তরে তব কৈর্য়ো দিব দাসী॥ বসিয়া বামদিকেতে উনানে পাড় ফুক। কর্পূর তাম্বূল বিনা রসহীন মুখ॥"

মুকুন্দরাম খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তৎকালে অন্তঃপুরবর্ত্তিনীদিগের স্বভাবসম্বন্ধে উপরে আমরা যে আভাস পাইলাম, খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত যে তাহার হ্রাস হয় নাই, ভারতচন্দ্রে তাহার প্রমাণের অভাব নাই। বিদ্যার দুর্নীতি শ্রবণে রাণী যেরূপ তীক্ষ্ণ বাক্যবাণে রাজাকে

(১) খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দী Middle Agesএর অন্তর্ভুক্ত। এই মধ্যযুগে ইউরোপখণ্ডে কেবল ধর্ম্মযাজকগণই শিক্ষিত বলিয়া পরিগণিত হইতেন, কারণ বিদ্যানুশীলন তাঁহাদের মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল। তাঁহারা স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে কিরূপ ধারণা পোষণ করিতেন, তাহা ঐতিহাসিক Leckyর নিম্নোদ্ধৃত কথাগুলি দ্বারা প্রতিপন্ন হইবেঃ—"Chrysostom only interpreted the general sentiment of the Fathers, when he pronounced woman to be a necessary evil, a natural temptation, a desirable calamity, a domestic peril, a deadly fascination and a painted ill! Doctor after doctor echoed the same lugubrious strain, ransacked the pages of history for illustrations of the enormities of the sex, and marshalled the ecclesiastical testimonies on the subject with the most imperturbable earnestness and solemnity"—Rise of Rationlism, Vol I, page 78.

(২) আগু পাছু না গণিয়ে, কথায় বিহ্বল হয়ে, কেন দেহ হেন অনুমতি। হিতাহিত নাহি গণ, না লব কন্যার পণ, কেন প্রিয়ে করাব দুর্গতি॥ পড়ে শুনে হৈলে পশু, বাপ কবে শিশু যশু, কন্যা দিবে দারুণ সতীনে। ইত্যাদি। মুকুন্দরাম-চণ্ডী।

জর্জ্জরিত করিয়াছিলেন, তাহা আধুনিক রুচিবিগর্হিত হইলেও দাম্পত্যক্ষেত্রে রাণীর প্রাধান্যের পরিচয় দেয়। দ্বিপত্নীক ভবানন্দ মজুমদারকে উভয় পত্নীর মনোরক্ষা করিতে যথেষ্ট বেগ পাইতে হইত, অন্নদামঙ্গলের পাঠক মাত্রেই তাহা জ্ঞাত আছেন। ভারতচন্দ্রের হরগৌরীকে সেকালের আদর্শ বঙ্গীয় দম্পতী ধরিয়া লইলে অন্যায় হইবে না। স্বামী যখন আক্ষেপ করিতেন—

বিধাতার লিখন কাহার সাধ্য খণ্ডি।
গৃহিণী ভাগ্যের গুণে পাইয়াছি চণ্ডী॥
সর্ব্বদা কন্দল বাজে কথায় কথায়।
রস কথা কহিতে বিরস হয়ে যায়॥

তখন অষ্টাদশ শতাব্দীর বঙ্গীয় গৃহিণী যে ভাষায় তাহার প্রত্যুত্তর করিতেন (১) তাহা পাঠে আর যে ধারণাই হউক, তখন স্বামীর শাসন যে বিশেষ কঠোর ছিল এরূপ কিছুতেই বোধ হয় না; বরং মনে এই বিশ্বাসই প্রবল হয় যে, অন্তঃপুরে স্বামী বেচারাকে নিতান্তই খাট হইয়া থাকিতে হইত। ‘শিভাল্‌রি’ অথবা ‘গ্যালাণ্ট্রি’ বলিতে এখন নারীজাতির প্রভাববৃদ্ধিই প্রকাশ পায়। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য পাঠ করিয়া কে বলিবে সে কালে তাহাদের প্রভাব প্রবল ছিল না?

শ্রীজ্ঞানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার।

পাশ্চাত্য-জ্ঞানারুণ-সমুদ্ভাসিত ভারতবর্ষে যে সকল মহাপুরুষ বর্ত্তমান যুগে প্রাচ্য প্রাচীন জ্ঞান বিজ্ঞানালোচনায় পাণ্ডিত্যাগ্রগণ্য বলিয়া শ্রদ্ধাভক্তির পবিত্র পুষ্পচন্দন উপহার পাইতেছেন, আমাদের প্রবন্ধোক্ত মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার তাঁহাদের মধ্যে একজন। ভারতবর্ষ বহু প্রাচীন কাল হইতে সারস্বতগণের পবিত্র লীলা-নিকেতন বলিয়া প্রসিদ্ধ। প্রাচীন ভারতের সেই স্বর্ণ-যুগের সুখ সৌভাগ্যের কথা স্মৃতিপথারূঢ় হইলে, শক্তি অপেক্ষা ভক্তি এবং শস্ত্র-চর্চ্চা অপেক্ষা শাস্ত্র-চর্চ্চার মাহাত্ম্যই আমরা স্পষ্টরূপে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হই। বর্ত্তমান ভারত সর্ব্বস্বান্ত হইলেও সুধীগণের আবাস স্থান বলিয়া সর্ব্বত্র সংপূজিত।

(১) অন্নদামঙ্গল, হরগৌরীর কন্দল দেখ।

বঙ্গদেশে সংস্কৃত চর্চ্চার জন্য দুইটী স্থান চিরপ্রসিদ্ধ,—পশ্চিমবঙ্গে নবদ্বীপ, পূর্ব্ববঙ্গে বিক্রমপুর। কিন্তু চন্দ্রকান্তের অভ্যুদয়ে তৃতীয় আর একটী স্থানও প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গের প্রান্তভাগাস্থিত ময়মনসিংহ জেলার অরণ্য-সঙ্কুল সেরপুর নামক গ্রামে, শাণ্ডিল্য গোত্রীয় রাঢ়ীয় বন্দনায় বন্দ্যবংশে ১২৪৩ সনের ১৯শে কার্ত্তিক বৃহস্পতিবারে চন্দ্রকান্ত জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। "একশ্চন্দ্র-স্তমোহন্তি" এক চন্দ্রকান্তের অভ্যুদয়ে অন্ধতমসাচ্ছন্ন ময়মনসিংহ আজ অত্যুজ্জ্বল গৌরব-প্রভায় দীপ্তিমান। চন্দ্রকান্তের পূর্ব্বপুরুষগণ মানকোণের চক্রবর্ত্তী নামে সুপরিচিত ছিলেন। তাঁহার পিতামহ মানকোণ পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্ম-পুত্রের শাখা সেরী নদীর তীরে সেরপুর নামক গ্রামে বাসস্থান মনোনীত করেন। বঙ্গের সুবিখ্যাত সমাজসংস্কারক বল্লালসেন কান্যকুব্জ হইতে যে পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়াছিলেন, চন্দ্রকান্তের আদিপুরুষ ভট্টনারায়ণ তাঁহাদের অন্যতম। সুতরাং বংশমর্য্যাদায়ও চন্দ্রকান্ত অতি উচ্চ সম্মানের অধিকারী। চন্দ্রকান্ত উপযুক্ত পিতার উপযুক্ত সন্তান; তাঁহার পিতা ৺ রাধাকান্ত সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়ও সংস্কৃতজ্ঞ সুপণ্ডিত বলিয়া তাৎকালিক পণ্ডিতসমাজে বিশেষরূপ সম্মানের পাত্র ছিলেন।

উপযুক্ত পিতা রাধাকান্ত উপযুক্ত বয়সে পুত্রের বিদ্যারম্ভের ব্যবস্থা করিলেন। পিতার পদতলে বসিয়া পুত্র কঠোর ব্যাকরণশাস্ত্রালোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন; কিন্তু এ সুবিধাভোগ অধিক দিন ঘটিয়া উঠিল না;—কালের কঠোর হস্ত রাধা-কান্তকে ভবধাম হইতে সরাইয়া লইল। পিতার মৃত্যুতে চন্দ্রকান্তের বিদ্যা-শিক্ষার নানাপ্রকার বাধা বিঘ্ন উপস্থিত হইল সত্য, কিন্তু রাধাকান্ত পুত্রের হৃদয়ে যে জ্ঞান-পিপাসার উদ্রেক করিয়া দিয়াছিলেন, তাহা কিছুতেই দমিত হইল না; বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে চলিল। সুতরাং অনন্যোপায় হইয়া বালক চন্দ্র-কান্ত বিক্রমপুর পুরাপাড়া-নিবাসী বিখ্যাত পণ্ডিত দীননাথ ন্যায়পঞ্চাননের নিকট স্মৃতি অধ্যয়ন জন্য উপস্থিত হইলেন। যত জল বাড়ে, পদ্মনাল ততই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়;—চন্দ্রকান্তের শাস্ত্রজ্ঞান যত বাড়িতে লাগিল তাঁহার শিক্ষাপ্রবৃত্তি ততই বেগবতী হইয়া চলিল। চন্দ্রকান্ত বিক্রমপুরে সম্বৎসরের বেশী তিষ্ঠিতে পারিলেন না। বিদ্যার পবিত্র পীঠস্থান নবদ্বীপ নগরে গমন করিয়া বিখ্যাত স্মার্ত্ত ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন ও হরিদাস শিরোমণির নিকট স্মৃতি, প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক শ্রীনন্দন তর্কবাগীশ ও প্রসন্নচন্দ্র তর্করত্নের নিকট ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলেন; এবং প্রথিতনামা বেদান্তবিদ্ পণ্ডিত কাশীনাথ শাস্ত্রীর নিকট বেদান্ত দর্শন পাঠ

করিয়া তর্কালঙ্কার উপাধিতে ভূষিত হইলেন। এখানেই তাঁহার টোলের পাঠ পরিসমাপ্ত হইল; কিন্তু জ্ঞানপিপাসার নিবৃত্তি হইল না, বুঝি বা এ জীবনে হইবার নয়। টোল পরিত্যাগের পর চন্দ্রকান্ত ঘরে বসিয়া অশেষ যত্ন ও অদম্য অধ্যবসায় সহকারে সংস্কৃত সাহিত্য, অলঙ্কার ও দর্শনাদি পাঠ করিয়া ভূয়োদর্শন ও অদ্ভুত বিচারশক্তি লাভ করিয়াছেন ও করিতেছেন। ষড়্‌দর্শনে সবিশেষ ব্যুৎপন্ন হইলেও মহর্ষি কণাদ প্রণীত বৈশেষিক দর্শনেই তাঁহার অসীম অধিকার দেখিতে পাওয়া যায়। ছন্দোবন্ধে নিবদ্ধ সংস্কৃতকারিকাকারে লিখিত "তত্ত্বাবলী" নামে তিনি উপর্যুক্ত দর্শনের যে ভাষ্য প্রকাশিত করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে তাঁহার অসীম পাণ্ডিত্য, গভীর গবেষণা, অপূর্ব্ব তর্ক ও মীমাংসা শক্তির পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

চন্দ্রকান্তের প্রতিভা সর্ব্বতোমুখী। ব্যাকরণ, কাব্য, স্মৃতি, ন্যায়, দর্শন প্রভৃতি শাস্ত্রশিক্ষার্থীদিগকে তিনি সমভাবে শিক্ষাদান করিয়া থাকেন। একাধারে এবম্বিধ সুগভীর পাণ্ডিত্য সাতিশয় বিরল।

হুতাশন চিরকাল ভস্মাচ্ছাদনে নিষ্প্রভ থাকিবার সামগ্রী, সুযোগ সুবিধা প্রাপ্ত হইলেই সে আপনার লেলিহান রসনা সম্প্রসারিত করে। যে প্রতিভাবহ্নি সেরপুরের নিবিড় কাননান্তরালে লুক্কায়িত ছিল, কালক্রমে আগ্নেয়গিরির অগ্নিপ্রবাহের ন্যায় তাহা চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। প্রত্নতত্ত্ববিদ্ স্বর্গীয় রাজেন্দ্রলাল মিত্র চন্দ্রকান্তের প্রতিভায় আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে কলিকাতার সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপনা-কার্য্যে ব্রতী করিবার জন্য বিশেষরূপ ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। কিন্তু পরসেবাদ্বেষী স্বাধীনচেতা চন্দ্রকান্ত এ কার্য্য গ্রহণে সহসা স্বীকৃত হইবেন না জানিতে পারিয়া মিত্র মহাশয় তাঁহাকে স্বীয় অভিপ্রায় জ্ঞাপন করেন নাই। সংস্কৃত কলেজের বৃদ্ধ পণ্ডিত গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়ের অবসর গ্রহণের কাল নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিলে, কলেজের অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয় চন্দ্রকান্তকে উক্ত পদ গ্রহণের জন্য অনুরোধ করিয়া পাঠান। চন্দ্রকান্ত উত্তরে লিখেন "এখনও সময় আছে, ইতিমধ্যে মতামত স্থির করিয়া জানাইব।" বিদ্যারত্ন মহাশয়ের অবসর গ্রহণকালে ন্যায়রত্ন মহাশয় পুনরায় চন্দ্রকান্তকে ঐ কার্য্যে ব্রতী হওয়ার জন্য অনুরোধপত্র প্রেরণ করেন। চন্দ্রকান্ত এবারও লিখিয়া পাঠান "আত্মীয় স্বজনের অভিমত জানিয়া পরে জানাইব।" তিনি রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও কৃষ্ণদাস পালের নিকট এ বিষয়ের

পরামর্শজিজ্ঞাসু হইয়া চিঠি প্রেরণ করিলেন, তাঁহারা উভয়ে তাঁহাকে কলিকাতা যাইতে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন।

ইতিমধ্যে কলিকাতার স্বনামপ্রসিদ্ধ রেজিষ্ট্রার শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র ঘোষ সংক্রান্তি (চল ও স্থিতি) বিষয়ক একটী প্রশ্নের উত্তরপ্রার্থী হইয়া অনেক প্রসিদ্ধ-নামা পণ্ডিতের নিকট লিপি প্রেরণ করেন। উত্তরে চন্দ্রকান্ত যাহা লিখিয়া পাঠান তাহাই তাঁহার নিকট অধিকতর মনঃপূত হইয়াছিল। চন্দ্রকান্তকে কলিকাতায় আনিবার জন্য প্রতাপ বাবু স্বতঃ পরতঃ বহুবিধ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। প্রতাপচন্দ্র ঘোষ এই সময় এসিয়াটিক্ সোসাইটীর এসিষ্টাণ্ট সেক্রেটারী ছিলেন এবং সংস্কৃত গ্রন্থালোচনায় তাঁহার সমধিক আসক্তিও জন্মিয়াছিল। "গোভিল সূত্র" নামক গ্রন্থের কোন পরিশুদ্ধ ভাষ্য না থাকায় প্রতাপ বাবুর অনুরোধে চন্দ্রকান্ত ঐ গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়দ্বয়ের ভাষ্য প্রস্তুত ও মুদ্রিত করিয়া নমুনা স্বরূপ পাঠাইয়া দেন।

প্রতাপ বাবু কর্ত্তৃক এই ভাষ্য গ্রন্থ এসিয়াটিক্ সোসাইটীর একটী বিশেষ অধিবেশনে উপস্থাপিত হইলে সমবেত সভ্যগণের সকলই এক বাক্যে টীকাকারের গভীর জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের ভূয়সী প্রশংসা করেন; এবং রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রমুখ কয়েক জন প্রধান সভ্য ঐ টীকা সম্পূর্ণ করিবার জন্য চন্দ্রকান্তকে লিখিয়া পাঠান। তদনুসারে চন্দ্রকান্ত "গোভিল সূত্র ভাষ্য" নামক যে গ্রন্থ রচনা করেন তাহাই এসিয়াটিক্ সোসাইটীর ব্যয়ে মুদ্রিত হইয়া বিদ্যার্থীর জ্ঞানানুশীলনের সহায়তা করিতেছে। এই গ্রন্থ প্রচারের সঙ্গে সঙ্গেই চন্দ্রকান্তের যশোগীতি সহস্র কণ্ঠে গীত হইতে আরম্ভ হইল এবং সমুদ্রের পরপারে জর্ম্মনী, ফ্রান্স, আমেরিকা, হলণ্ড ও ইংলণ্ড প্রভৃতি স্থানের বুধমণ্ডলীর রসনা হইতে সে সঙ্গীত-ধ্বনির প্রতিধ্বনি উত্থিত হইতে লাগিল। এই সময়ে প্রতাপচন্দ্র, কৃষ্ণদাস ও রাজেন্দ্রলাল প্রভৃতি তর্কালঙ্কারকে কলিকাতায় পাইবার জন্য আগ্রহাতিশয্য প্রকাশ করায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন চন্দ্রকান্তকে কলেজের অধ্যাপকের পদ গ্রহণ জন্য তৃতীয় বার চিঠি লিখেন। উত্তরে তর্কালঙ্কার মহাশয় লিখেন "আমি এ পর্য্যন্ত চাকুরী করি নাই এবং করিবার প্রবৃত্তিও বড় নাই। তবে কলিকাতা গেলে গঙ্গাতীরে বাস হইবে, ও আপনাদের মত মহোদয় ব্যক্তিগণের সহিত সর্ব্বদা দেখা সাক্ষাৎ ঘটিবে, বিশেষতঃ বিবিধ প্রকারের গ্রন্থাদি পাঠেরও সুবিধা হইতে পারে, এই সকল বিষয় চিন্তা করিয়া আমার কলিকাতা যাওয়ার ইচ্ছা বলবতী হইয়াছে।"

তদনন্তর ১৮৮৩ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে তর্কালঙ্কার মহাশয় কলিকাতায় আসিয়া সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপনা-কার্য্য গ্রহণ করেন। তিনি গভীর জ্ঞান বিজ্ঞানের অধিকারী হইলেও কলেজের অধ্যাপনা-কার্য্যে সম্যক্‌রূপে কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন কি না তদ্বিষয়ে অনেকেই আশঙ্কান্বিত হইয়াছিলেন। কিন্তু যখন অধ্যাপকের আসনে বসিয়াই চন্দ্রকান্ত সাংখ্য তত্ত্ব ও নৈষধের জটিলতম অংশ সকল অতি প্রাঞ্জলভাবে ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন তাঁহার শিক্ষাদান প্রণালী ও অত্যদ্ভুত শাস্ত্রজ্ঞান দর্শনে সকলকেই স্তম্ভিত হইতে হইয়াছিল।

এই সময় পণ্ডিতপ্রবর বিদ্যাসাগর মহাশয় তর্কালঙ্কারের দর্শনেচ্ছু হইয়া তাঁহাকে স্বীয় আবাস-ভবনে সসম্মানে আহ্বান করেন। চন্দ্রকান্ত তথায় উপস্থিত হইলে, পণ্ডিতে পণ্ডিতে আলাপ পরিচয়ে উভয়ের মধ্যে গভীর প্রীতি সংস্থাপিত হয়।

১৮৮৭ সনে ভারত সম্রাজ্ঞী মহারাণী ভিক্টোরিয়ার জুবিলী উপলক্ষে চন্দ্রকান্ত "মহামহোপাধ্যায়" এই সম্মানসূচক উপাধি লাভ করেন। চন্দ্রকান্ত প্রতিবৎসরই বিনা প্রার্থনায় রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ ও এম. এ. পরীক্ষার পরীক্ষক মনোনীত হইয়া থাকেন।

তর্কালঙ্কার মহাশয়ের সর্ব্বদর্শিনী প্রতিভা "গোভিল সূত্র ভাষ্য" ও "তত্ত্বাবলী" নামক গ্রন্থ প্রণয়নেই পর্য্যবসিত হইয়া যায় নাই। তিনি কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, বৈদিক ব্যাকরণ সূত্র, স্মৃতি, দর্শন ও ন্যায় প্রভৃতি বিষয়ে এ পর্য্যন্ত ন্যূনাধিক ৪০ খানা গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। প্রত্যেক গ্রন্থই তাঁহার স্বাধীন চিন্তা, গভীর পাণ্ডিত্য ও অপূর্ব্ব গবেষণা শক্তির পরিচয় প্রদান করিতেছে। উপরি উক্ত গ্রন্থ সকলের মধ্যে "বৈদিক ব্যাকরণ", "কাতন্ত্র ছন্দঃ প্রক্রিয়া" ও "কুসুমাঞ্জলির টীকা" পাশ্চাত্যভূমে সমধিক আদরের সহিত গৃহীত হইয়াছে। পণ্ডিতাগ্রগণ্য মোক্ষমূলর, বেণ্ডেল, ডাক্তার রোষ্ট, অধ্যাপক কাউয়েল ও ডাক্তার বেবর প্রমুখ মনীষীগণ চন্দ্রকান্তের অসীম পাণ্ডিত্য দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া আবেগসংক্ষুব্ধহৃদয়ে যে সকল দীর্ঘায়তন চিঠি প্রেরণ করেন, তাহা পাঠ করিলে মনে হয়, চন্দ্রকান্তের জীবন ধারণ সার্থক হইয়াছে এবং চন্দ্রকান্তের জননী বলিয়া আজ বঙ্গভূমি অতি উচ্চ সম্মানের অধিকারিণী হইয়াছেন। স্থানের অল্পতা হেতু পাঠকবর্গকে সে চিঠিগুলির চিত্তপ্রফুল্লকর অমৃতরসাস্বাদনে বঞ্চিত করিতে হইল।

১৮৯৩ সনে তর্কালঙ্কার মহাশয় এসিয়াটিক্ সোসাইটীর সম্মানিত সভ্যরূপে

গৃহীত হন। ১৮৯৬ সনের ২রা নভেম্বর তিনি কলেজের অধ্যাপনা-কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। আজ ৫ বৎসর যাবৎ কলিকাতার সুখ্যাত শ্রীগোপাল মল্লিক প্রদত্ত বেদান্ত দর্শনের প্রবন্ধের জন্য বার্ষিক ৫০০০৲ টাকা বৃত্তি ভোগ করিতেছেন। এতদ্ব্যতীত টোলের সাহায্য স্বরূপ গবর্ণমেণ্ট হইতে মাসিক ২৫৲ টাকা প্রদত্ত হইতেছে।

তর্কালঙ্কার মহাশয় একাদিক্রমে ৫টী দারপরিগ্রহ করিয়াছিলেন। সপ্তদশ বর্ষ বয়ঃক্রমে তাঁহার প্রথম পরিণয় ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। প্রায় চতুর্দ্দশ বর্ষ অতীত হইল তাঁহার পঞ্চম পত্নীও পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার দুইটী পুত্র ও দুইটী কন্যা বর্ত্তমান।

প্রাকৃতিক নিয়মে জগতের যাবতীয় বস্তুরই অবশ্যম্ভাবী পরিণাম ধ্বংশ। কিন্তু মহাপুরুষগণের অমর নাম ধরা-পৃষ্ঠ হইতে একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যায় না। কালের অবশ্যম্ভাবী নিয়মাধীনে চন্দ্রকান্তের পাঞ্চভৌতিক দেহ পঞ্চভূতে বিলীন হইয়া গেলেও যতদিন জগতে সংস্কৃত ভাষার অস্তিত্ব থাকিবে, যত দিন মানুষ জ্ঞানবিজ্ঞানালোচনাকে পরম পুরুষার্থ মনে করিবে, তত দিন মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কারের নাম স্মৃতির সুবর্ণমন্দিরে উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত থাকিবে।

কবে।

কবে দিবে দেখা ? কোন্ বসন্তপ্রভাতে
উল্লাসে মুঞ্জরি তৃণ হরিত শোভাতে,
আচ্ছাদিবে বিবসন সরমে ব্যাকুল
লাঞ্ছনম্র-প্রাণ মোর ? কবে নিরাকুল
মঞ্জুল নিকুঞ্জবন হৃদয়-মন্দিরে
বেষ্টিয়া দেবতাটীরে করিবে বন্দী রে।
কবে আসি পিককুল আলোকছায়ায়,
অশোক কুসুম টুটি' কম্বিত গলায়,
প্রভাত আরতি গান তুলিবে পঞ্চমে।
কূলে কূলে কলকলি ছাপিয়া মরমে,
বহে যাবে স্রোতস্বিনী ছায়াপথ দিয়া,
পূজা করা ফুলগুলি ঠেকিয়া ঠেকিয়া

কবে যাবে ভাসি প্রেম-জলধির পানে,
কবে দিবে দেখা কোন্ বসন্তাবসানে ?

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি. এ.,
শিবপুর।

বৈজ্ঞানিকের কুটীর।

দৃষ্টিশক্তির হ্রাসবৃদ্ধি।*

সে কালের লোকের দৃষ্টিশক্তি বেশী দূরদর্শিনী ছিল, কি একালের লোকের বেশী, তাহা জানিতে অনেকেরই কৌতূহল হয়। আমাদের দেশে অল্প বয়সে চক্ষুতে প্রতিচক্ষু (চস্‌মা) ব্যবহারের বাহুল্য দেখিয়া, স্বতঃই মনে হয় যে বর্ত্তমান সময়ে দৃষ্টিশক্তির হ্রাস হইয়াছে। প্রাচীন কালের লোকেরা (অন্ততঃ উচ্চবর্ণের লোকেরা) ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে শয্যাত্যাগ করিয়া উন্মুক্ত বায়ুতে মাঠে যাইয়া মলমূত্র ত্যাগ করিতেন, প্রাতঃস্নান করিয়া সুশীতল প্রভাতবায়ু সেবন করিতে করিতে নয়নরঞ্জন সুরভি কুসুম ও স্নিগ্ধ হরিৎ দূর্ব্বা চয়ন করিতেন, এবং পরিশেষে "সচন্দন পুষ্প-বিল্বপত্র" দ্বারা ভক্তিভরে প্রাতঃসন্ধ্যা ও আহ্নিক সমাপন করিতেন। এইজন্য তাঁহাদের সর্ব্বাঙ্গীণ স্বাস্থ্য, বিশেষতঃ চক্ষুর দৃষ্টিশক্তি,

---

* এই প্রবন্ধে 'দৃষ্টিশক্তি' শব্দ 'দূরদর্শিনী দৃষ্টিশক্তি' অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। সুতরাং যাহার দৃষ্টি দূরগামিনী নহে, তাহারই দৃষ্টিশক্তি অল্প বলা হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে যে ব্যক্তি দূরের বা সম্মুখের কোন বস্তুই স্পষ্টরূপে দেখিতে পায় না, কুজ্ঝটিকাচ্ছন্ন দেখিতে পায়, কেবল তাহারই দৃষ্টিশক্তি কম বলা উচিত।

অতিরিক্ত অধ্যয়ন দ্বারা বিদ্যালয়ের ছাত্রদের দূরদর্শন ক্ষমতারই হ্রাস হয়, কদাচিৎ বাস্তবিক দর্শনশক্তিরও হ্রাস হয়; তখন তাহারা দূরের কাছের সকল জিনিষই ঝাপ্‌সা দেখিয়া থাকে।

অনেকের বোধ হয় জানা নাই যে অতিরিক্ত অধ্যয়ন বা অতিরিক্ত লেখনীসঞ্চালন ব্যতীতও লোকে হ্রস্বদৃষ্টি (short sighted) হইয়া পড়ে. এবং হইয়া থাকে। কথাটা খুলিয়া বলিতেছি :—

ছাত্র ও কেরাণীদিগকে কিছু বেশী মাত্রায় লিখিতে পড়িতে হয়, অর্থাৎ অত্যধিক পরিমাণে নিকটের বস্তুর পানে তাকাইয়া থাকিতে হয়। তাহার ফলে তাহাদের অক্ষিগোলক (যাহা দূরবীক্ষণের কাচপুটের কার্য্য করিয়া থাকে), কিয়ৎ পরিমাণে বেশী কুব্জ (convex) হইয়া পড়ে; এবং সেই জন্য তাহারা যখন কোন দূরের বস্তুর দিকে দৃষ্টিপাত করে, তখন, চক্ষুর যে বিন্দুতে বস্তুর প্রতিবিম্ব পড়িলে আমাদের সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন দর্শনজ্ঞানের সঞ্চার হয়, সেই বিন্দুতে সেই দূরস্থ বস্তুর প্রতিবিম্ব না পড়িয়া যৎকিঞ্চিৎ সম্মুখভাগে পতিত হয়, সেই জন্য বস্তুটী স্পষ্ট দেখা

প্রায় অক্ষুণ্ণ থাকিত ; জীবন-পথে বহুদূরে অগ্রসর হইবার পূর্ব্বে তাহারা নাসিকায় সেতুবন্ধনের আবশ্যকতা অনুভব করিতেন না। কিন্তু "সে রাম নাই, সে অযোধ্যাও নাই।" এখন, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধাতাপুরুষদিগের অনুকম্পায় আমাদের বালক ও যুবকবৃন্দকে "নিশীথ রজনীর তৈলের সৎকার করিতে হয়;" সুতরাং পরদিন ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে উঠা দূরে থাক্, বিষ্ণু বা শিব মুহূর্ত্তেও উঠা হয় না। প্রাতঃস্নান করিতে গেলে 'হিষ্টোরী' পড়িবার সময় পাওয়া যায় না, পুষ্প ও দূর্ব্বা চয়ন করিয়া প্রাতঃসন্ধ্যা তো দূরের কথা।

কথাগুলি অনেক অংশে ঠিক। তবে ইহার সঙ্গে নীচের কয়েকটী কথা মনে রাখিলেই বিষয়টীর প্রতি সুবিচার করা হইল, বলা যায়। এখনকার মত সেকালে এত চস্‌মার, বিশেষতঃ ভাল চস্‌মার, প্রাপ্তি-সৌকর্য্য ছিল না। "অদ্য সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে জয়দ্রথকে বধ করিব," অর্জ্জুনের এই ভয়াবহ প্রতিজ্ঞার ন্যায় তৎকালীন গবর্ণমেণ্টের এমন কোন প্রতিজ্ঞা ছিল না যে "যাহাকে লইতে হয় পঁচিশ বৎসর বয়সের মধ্যেই গভর্ণমেণ্ট সার্ভিসে নিব।" ফলতঃ জীবন-সংগ্রাম তখন এমন প্রাণান্তক ছিল না। সুতরাং নিতান্ত অনুপায় না হইলে কেহই চস্‌মার আশ্রয় লইত না। মোটা চাউল খাইয়া, মোটা কাপড় পরিয়া, মোটা তুলট কাগজে, মোটা বাঁশের কলমে, মোটা মোটা আখর বসাইতে চস্‌মার প্রয়োজন প্রায় ছিল না বলিলেই হয়।

যায় না। কিন্তু কাহারও কাহারও চক্ষু শৈশবকাল হইতেই অর্থাৎ হাতে খড়ি না হইতেই একটু অধিক পরিমাণে কুব্জতা প্রাপ্ত। সেই সকল ব্যক্তিও দূরের বস্তু ভালরূপ দেখিতে পায় না। কিন্তু বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেকের চক্ষুরই কুব্জতা হ্রাস পায়; অর্থ অক্ষিগোলক গুণ-মুক্ত ধনুর ন্যায় একটু ঋজুপৃষ্ঠ হয়। সুতরাং যাহারা শৈশবে হ্রস্ব-দৃষ্টি থাকে, প্রবীণ বয়সে তাহারা স্বাভাবিক দৃষ্টি পায়, অন্ততঃ পাইবার কথা; আর যাহারা শৈশবে স্বাভাবিক দৃষ্টিসম্পন্ন থাকে, বেশী বয়সে তাহারা দীর্ঘ-দৃষ্টি (long-sighted) হইয়া থাকে। সেইজন্যই দেখিতে পাওয়া যায় যে, অধিকাংশ বৃদ্ধ কোন একখানা চিঠি পড়িতে হইলে কাগজখানা একটু দূরে ধরিয়া ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া পড়িয়া থাকে।

এইরূপ যাহাদের দৃষ্টিশক্তি স্বাভাবিক, তাহারা চক্ষুর অতি সন্নিকটস্থ কোন লেখা পড়িতে হইলে প্রকৃতিদত্ত শিক্ষার ফলে ভ্রূ-যুগল কুঞ্চিত করিয়া থাকে; এবং কোন সুদূরবর্ত্তী বস্তু নিরীক্ষণ করার বেলায় উদাসনয়নে বিস্ফারিতলোচনে চাহিয়া থাকে। (প্রথমোক্ত স্থলে অক্ষিগোলকের কুব্জতা বাড়াইয়া নেওয়া হয় ও শেষোক্ত স্থলে কমাইয়া নেওয়া হয়।)

চক্ষুর কার্য্য অর্থাৎ দর্শন ব্যাপার সম্বন্ধে আরও অনেক লিখিবার ছিল, কিন্তু ফুট নোটে তাহা লিখিতে গেলে কাঁকুড়ের বীচি অত্যধিক পরিমাণে বাড়িয়া যায়; অতএব ইতি।

সত্য বটে মানুষ বর্ত্তমান ও অতীত লইয়া বিচার করিতে বসিলে, অতীতের প্রতি অনেক স্থলেই পক্ষপাত করিয়া থাকে। নাট্যালয়ের দৃশ্যপটের ন্যায় অতীতের ছবিও, দূর হইতে দৃষ্ট বলিয়া, বড়ই সুন্দর দেখায়। শিশু ছেলেবেলায় মা বাপ, পাঠশালার গুরু প্রভৃতি কত জনের হাতে প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত মা'র খায়, প্রতি পদে কত আছাড় খায়, খর্ব্বাকৃতি বলিয়া শিকের গুড়টুকু নিজ হাতে পাড়িয়া খাইতে পারে না, অজ্ঞ বলিয়া কাচের আলমারীর অভ্যন্তরস্থ ঐ দৃশ্যমান লজেঞ্জুষ খাইতে পারে না। তার পরে বই হারাইয়া, ছাতা হারাইয়া, জুতা ছিঁড়িয়া, কাপড় ছিঁড়িয়া (এবং বলিতে লজ্জা কি ?—রাত্রে বিছানা নষ্ট করিয়া) আত্মীয়বর্গের কাছে কত রকমে তিরস্কৃত ও লাঞ্ছিত হয়। তথাপি সেই শিশু বড় হইয়া, নিজে একটী সংসারের অখণ্ডপ্রতাপ অধীশ্বর হইয়া, সজল সতৃষ্ণ নয়নে যৌবন-সমুদ্রের অপর পারস্থ শৈশব-রাজ্যের পানে তাকাইয়া থাকে, বুঝি মৃত্যুর পরে দেহ-বিচ্যুত আত্মাও এমন করুণ নয়নে সেই দেহের পানে তাকাইয়া থাকে না। ইহার কারণ কি ? সদ্যঃ নিঃসৃত উপলখণ্ডের ন্যায় বর্ত্তমান—অতীব বন্ধুর-দেহ ও অশোভন ; আর দীর্ঘপথসমানীত উপলখণ্ডের ন্যায় অতীত—সুডৌল, সুগোল ও সুন্দর। কিন্তু অতীতের এই সম্মোহন-মন্ত্রের বিষয় জানা থাকা সত্ত্বেও আমরা বলিতে বাধ্য যে অন্ততঃ আমাদের দেশে লোকের দৃষ্টিশক্তি বর্ত্তমান সময়ে হ্রাস পাইয়াছে। য়ুরোপের কথা স্বতন্ত্র ; সেখানে নাকি দিন দিন লোকের দেহযষ্টি দৈর্ঘ্যে ও বিস্তারে উন্নতি লাভ করিতেছে। আমাদের দেশে "নূতন পঞ্জিকা"র সেই পুরাতন কথা, অর্থাৎ একবিংশতি হস্ত মানবদেহের কথা, বিশ্বাস না করিলেও আমরা যে আকারে পরিসরে ক্রমশঃই খর্ব্বাকৃতি হইতেছি, তাহাতে সন্দেহ নাই।

এক্ষণে প্রাদেশিক ভাবে না দেখিয়া সার্ব্বভৌমিকাহিসাবে এই বিষয়টীর বিচার করা যাক্।

দুর্ভাগ্যক্রমে প্রাচীন ইতিহাস ও কিংবদন্তী এ বিষয়ে যে সাক্ষ্য প্রদান করে, তাহা কর্ণরেখার ন্যায় পরস্পর বিপরীতমুখাবলম্বী।

হাম্বোল্ট লিখিয়াছেন যে, প্রাচীন কালে আরব দেশে দৃষ্টিশক্তি পরীক্ষার্থ, Great Bear (Ursa major) নামক নক্ষত্রের* অন্তর্গত একটী ক্ষুদ্র

* সংস্কৃত জ্যোতিষ গ্রন্থে "নক্ষত্র" ও "তারা" শব্দের অর্থে কিঞ্চিৎ পার্থক্য আছে। 'তারা' বলিতে একটী মাত্র জ্যোতিষ্ক, ও নক্ষত্র বলিতে 'তারাপুঞ্জ' বুঝায়। পুনর্ব্বসু (Pollux) ও মঘা (Regulus)—ইহারা নক্ষত্র ; পক্ষান্তরে, ধ্রুব ও অগস্ত্য—ইহারা তারা। আমরা এই প্রবন্ধে এই পার্থক্যের অনুসরণ করিলাম।

তারাকে মধ্যস্থ মানা হইত। অর্থাৎ যে ব্যক্তি ঐ তারাটী দেখিতে পাইত, তাহাকে প্রখরদৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন বলিয়া মনে করা হইত। এমন কি এই দৃষ্টি-পরীক্ষা-কার্য্যে ব্যবহৃত হইত বলিয়া আরবী ভাষায় এই তারাটির নামকরণ হইয়াছিল—সৈদক্ (পরীক্ষা)। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে অধিকাংশ লোকই এই তারাটিকে নিরবচ্ছিন্ন চর্ম্ম-চক্ষের সাহায্যে দেখিতে পায়। ইহা হইতে আপাততঃ মনে হইতে পারে যে, মানুষের দৃষ্টিশক্তি কালসহকারে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু হইতেও পারে যে ঐ তারাটীর দ্যুতি সম্প্রতি বৃদ্ধি পাইয়াছে, অথবা উক্ত নক্ষত্রের মধ্যবর্ত্তী যে তারকাটির সান্নিধ্য বশতঃ উহা এত কাল দৃষ্টি-দুর্লভ ছিল*, কাল সহকারে সেই তারকা হইতে ইহার দূরত্ব বর্দ্ধিত হইয়াছে। (যাবতীয় লক্ষণ বিবেচনা করিলে এই শেষোক্ত কারণই বরং সত্য বলিয়া মনে হয়।)

এক্ষণে সংক্ষেপে ৩টী "পক্ষান্তরে" দিতেছি।

খৃষ্টের জন্মের বহুশতাব্দী পূর্ব্বে, দূরবীক্ষণ যন্ত্রের ভ্রূণ সঞ্চারেরও বহু আগে, প্রাচীন জ্যোতিষীরা বুধগ্রহ আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু এক্ষণে (সূর্য্যের সান্নিধ্য বশতঃ) ঐ গ্রহটীকে পর্য্যবেক্ষণ করা আয়াসসাধ্য হইয়াছে। ইহাতে মনে হয় পুরাকালে লোকের দৃষ্টিশক্তি তীক্ষ্ণতর ছিল।

Andromeda নামক নক্ষত্রের অন্তর্গত প্রসিদ্ধ নীহারিকাটী বর্ত্তমান সময়ে দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্য ব্যতীত সুষ্ঠুরূপে দৃষ্টিগোচর হয় না। কিন্তু প্রাচীনেরা খৃষ্টজন্মের বহু শতাব্দী পূর্ব্বে শুধু চর্ম্ম-চক্ষের মধ্যবর্ত্তিতায় ইহার সহিত ঘনিষ্ঠ-ভাবে পরিচিত হইয়াছিলেন।

প্রাচীন কাল্‌ডীয় জাতির পুরাণ অনুসারে তাহাদের "অসুর" নামক দেবতা ও শনৈশ্চর নামক গ্রহ বিশিষ্ট ভাবে সংসৃষ্ট।

উক্ত দেবতার যে সকল বিগ্রহ এসিরিয়া দেশে পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে অঙ্গুরীয়-পরিবেষ্টিত একটী মনুষ্য-মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। এক্ষণে সকলেরই বোধ হয় জানা আছে যে শনৈশ্চর গ্রহ দুইটী বৃত্তাকার অঙ্গুরীয় দ্বারা বেষ্টিত। ইহা হইতে স্বতঃই কি মনে হয় না যে কাল্‌ডীয় জাতি শনৈশ্চরের অঙ্গুরীয়ের বিষয় অবগত ছিল? অথচ, ইহাও বোধ হয় অনেকের জানা আছে যে, এই

---

* আকাশ-পটে দুইটী তারা অতি নিকটবর্ত্তী থাকিলে উহাদের মধ্যে উজ্জ্বলতর তারাটীর জ্যোতিঃপ্রভাবে অপরটি অনেক সময়ে নির্ব্বাণ অর্থাৎ অদৃশ্য হইয়া যায়। পূর্ণিমার জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে তারকার দৈন্য ও দিবাভাগে সূর্য্যালোকে তারকার সম্পূর্ণ তিরোভাব এই কারণেই ঘটিয়া থাকে। বড়র কাছে চিরদিনই ছোটর মরণ।

অঙ্গুরীয়যুগলকে উক্ত গ্রহের দেহ হইতে পৃথক্ ভাবে দেখা নিরাশ্রয় চক্ষুর আয়ত্ত নহে। হইতে পারে যে চারি হাজার বৎসর পূর্ব্বে এই যুগলাঙ্গুরীয়, যে কোন কারণেই হউক্ না, অপেক্ষাকৃত দর্শন-সুলভ ছিল ; কিন্তু ইহাও হইতে পারে যে প্রাচীনকালের সেই আলো-উপাসক কাল্‌ডীয় জাতি আমাদের অপেক্ষা খরতর দৃষ্টিসম্পন্ন ছিল।

দৃষ্টিশক্তি বিষয়ে প্রাচীন কি নবীন সৌভাগ্যশালী, তাহা মীমাংসা করিতে অসমর্থ হইয়া আমরা এক্ষণে বিষয়ান্তরে অবতরণ করিলাম।

ধূলি-ধূম কুজ্ঝটিকাদি বর্জ্জিত পরিচ্ছন্ন বায়ু যে আমাদের দূরদৃষ্টির পরম সহায় তাহা বলা বাহুল্য। কল-কারখানা-কণ্টকিত কোয়াসা-পরিহিত য়ুরোপে এই জন্য সুদূরব্যাপিনী দৃষ্টির উদাহরণ অতি বিরল। হাম্বোল্ট্ লিখিয়াছেন যে, *নিরক্ষবৃত্তের উপরিস্থ কুইটো নগরের সমীপবর্ত্তী পার্ব্বত্য* প্রদেশের বায়ু এত পরিচ্ছন্ন ও স্বচ্ছ যে, প্রায় সতর মাইল দূরবর্ত্তী একজন অশ্বারোহীর শুভ্র জামা তিনি, কোনরূপ কাচ-পুটের সাহায্য ব্যতিরেকেই সুস্পষ্ট দেখিতে ও চিনিতে পারিয়াছেন। আমেরিকার সর্ব্বজনবিদিত 'প্রেরি' (Prairies) নামক তৃণসমাকীর্ণ প্রদেশও, ধূলি বালী ও কোয়াসা হইতে নির্ম্মুক্ত বলিয়া, দূরদৃষ্টির প্রকৃষ্ট অনুকূল ক্ষেত্র।

যে কারণে ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে এইরূপ ক্ষেত্রের এত অভাব, তাহা পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে। তবে ভূপৃষ্ঠের সমান্তরাল ভাবে না চাহিয়া অধভাবে চাহিলে, ইংলণ্ডেও যে সুদূরবর্ত্তী পদার্থ দেখিতে পারা যায়, বেলুন-আরোহীদিগের দ্বারা তাহা সময়ে সময়ে পরীক্ষিত হইয়াছে। ফলতঃ বায়ুমণ্ডলের বেশী ঊর্দ্ধে ধূলি বা ধূমের প্রবেশাধিকার নাই ; কুজ্ঝটিকা-বর্জ্জিত আকাশ তো অনেক সময়েই পাওয়া যায়। যখন প্রসিদ্ধ বিমানচারী মেঃ গ্লেশার লণ্ডন নগরের চারি মাইল উপর দিয়া বেলুনারোহণে যাইতেছিলেন, তখন তিনি, শুধু বিধি-দত্ত চক্ষু দুইটীর সাহায্যে, ১২০ মাইল দূরবর্ত্তী সমুদ্র পর্য্যন্ত দেখিতে পাইয়াছিলেন।

১৭৯৮ খৃঃ অব্দে এক নিদাঘের অপরাহ্নে দক্ষিণ ইংলণ্ডের অন্তর্গত হেষ্টিংস্ নগরের নিকটবর্ত্তী সমুদ্রতটে যে এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহার উল্লেখ এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। *ঐ দিন দলে দলে লোক হেষ্টিংস্ নগর-অভি-*মুখে ধাবিত হইয়াছিল। তাহারা যাইয়া দেখিতে পাইল যে, সমীপবর্ত্তী বেলা-ভূমি হইতে সমুদ্রের অপর পারস্থ ফ্রান্সের সুদূরবিস্তৃত উপকূল সুস্পষ্ট দেখা যাইতেছে। অথচ উভয় উপকূলের দূরত্ব অন্ততঃ ত্রিশ মাইল। বায়ুর

অপরিচ্ছন্নতার বিষয় না ধরিলেও, শুধু ধরাপৃষ্ঠের কুব্জতাই উক্ত উপকূলদ্বয়ের একটীকে অপরটী হইতে অদৃশ্য রাখিবার কথা। তবে কেন এমন ঘটিয়াছিল? যে কারণে মরুভূমিতে মরীচিকা দেখা যায়, ঠিক সেই কারণেই ইহা হইয়াছিল।*

যেমন কাগজে তৈল বা জল মাখাইলে তাহা অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছ হয়, ঠিক্ সেই রূপ বায়ুতে বাষ্পাধিক্য হইলে উহাও ন্যূনাধিক পরিমাণে স্বচ্ছ হয়, এবং দূরদৃষ্টির পক্ষে সহায়তা করে। কিন্তু বায়ুর এই স্বচ্ছত্ব অদূরবর্ত্তিনী বৃষ্টির পূর্ব্বাভায, তাহা অনেকেরই জানা আছে। এই জন্যই ইংরাজীতে একটি প্রবচন আছে যে

যখনই দূরদৃষ্টি,
তখনই নিকট বৃষ্টি।

বাষ্পভারপীড়িত বায়ুর অপর কার্য্য এই যে ইহা আলোরশ্মিকে বহুদূরবর্ত্তী আকাশে, মূর্চ্ছন ও বক্রণ (reflection and refraction) প্রণালীতে আনয়ন করিয়া থাকে। এই জন্য ইংলণ্ডের উত্তর পশ্চিম প্রদেশে যে সকল কল-কারখানা আছে, তাহাদের অগ্নিকুণ্ডসমুত্থিত আলো সময়ে সময়ে পঞ্চাশ মাইল দূরবর্ত্তী আকাশে দৃষ্টিগোচর হয়। আর নর্থ-ফোর্‌লেণ্ড নামক স্থানে যে আলো-গৃহ আছে, তাহার আলো পঁচিশ মাইল দূরেও দেখা যায়। এবং যখনই রাত্রিকালীন প্রহরীরা এই দূরাগত আলো দেখিতে পায়, তখনই তাহারা দুর্দ্দিনের আশঙ্কা করে। এইরূপ লণ্ডন নগরের উপকণ্ঠবর্ত্তী স্থান হইতে যখনই সহরের আলো-শিখা আকাশপটে অপেক্ষাকৃত স্পষ্টরূপে দেখিতে পাওয়া যায়, তখনই সেই সকল স্থানের অধিবাসীরা আগামী ঝড়বৃষ্টির জন্য প্রস্তুত হয়। কলিকাতা হইতে যে ষ্টীমার প্রকাণ্ড বিদ্যুতালোক কণ্ঠে ধরিয়া সুন্দর-বনের মধ্য দিয়া নারায়ণগঞ্জ আইসে, তাহার আকাশগামী রশ্মিফলক তখনই সুস্পষ্ট পরিলক্ষিত হয়, যখন অদূর ভবিষ্যতে আমাদের জন্য বৃষ্টি প্রতীক্ষা করিতে থাকে।

যুদ্ধ-ক্ষেত্রে হেলিওগ্রাফ (heliograph) নামক যন্ত্রের সাহায্যে সুদূরবর্ত্তী বা

---

* অল্প কয়েক বৎসর হইল উত্তর আমেরিকার অন্তর্গত এলাস্কা প্রদেশে সমুচ্চ নভোমণ্ডলে পুষ্পবাটিকাসমন্বিত একটি সুদৃশ্য নগরী দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল, এবং সেই সময়ে এ দেশের কোন কোন হিন্দুধর্ম্ম-মুখপাত্র সংবাদপত্র পুরাণবর্ণিত গন্ধর্ব্বলোক বা কিন্নরলোক এতদিন পরে আবিস্কৃত হইল বলিয়া কিঞ্চিৎ নির্দ্দোষ আস্ফালন করিয়াছিল। বলা বাহুল্য ইহাও সেই মায়াবিনী মরীচিকার কারচুপি মাত্র।

অনধিগম্য স্থানে সংবাদ প্রেরণ করা হয়। এই যন্ত্রের মূল তত্ত্ব এই যে একটী কাচফলকে প্রতিবিম্বিত সূর্য্যালোক ইচ্ছামত ঘুরাইয়া ফিরাইয়া বহুদূরে নিক্ষিপ্ত করা হয়, এবং সংবাদ-প্রেরক ও সংবাদ-গ্রাহকের পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট কোন পরিচিত সঙ্কেতের সাহায্যে কার্য্যোদ্ধার করা হয়। বিগত ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের ওয়াজিরী অভিযানের সময়ে এই প্রণালীতে সত্তর মাইল ব্যবহিত দুইস্থানের মধ্যে সংবাদের আদান প্রদান চলিয়াছিল। আর যখন ঐ আলোক নভোবিহারী মেঘের গায়ে নিক্ষিপ্ত করিয়া সংবাদ প্রেরণ করা হইয়াছিল, তখন একশত নব্বই মাইল ব্যাপী ব্যবধানও কোন প্রতিবন্ধকতা করিতে পারে নাই। *

বৈজ্ঞানিক উপায়ে অর্থাৎ যন্ত্রের সাহায্যে দৃষ্টিশক্তি কতদূর বর্দ্ধিত করা যাইতে পারে, তাহা এখানে নির্ণীত হয় নাই। তবে বর্ত্তমান সময়ে যেরূপ বৃহৎ কাচপুটবিশিষ্ট সুবৃহৎ দূরবীক্ষণ নির্ম্মিত ও ব্যবহারোপযোগী করিয়া স্থাপিত হইয়াছে, কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তাহা অসম্ভব ছিল। এবং বর্ত্তমান সময়ের বৃহত্তম কাচপুট অপেক্ষা বৃহত্তর কাচপুট আমরা শীঘ্রই দেখিতে পাইব, এরূপ আশা করি। তবে এ বিষয়ে প্রকৃতিদত্ত এমন একটী প্রতিবন্ধক আছে যে, তাহা দূরীকৃত করা মানবী শক্তির সাধ্য কি না সন্দেহ। বৃহৎ কাচপুট নির্ম্মাণ করিতে হইলেই তদনুযায়ী স্থূল কাচের প্রয়োজন। কিন্তু যতই স্থূল হইবে, ততই উহা বেশী আলো শোষণ করিবে; সুতরাং ততই দর্শনীয় পদার্থ অস্পষ্ট দৃষ্ট হইবে; অর্থাৎ "যত্র আয়, তত্র ব্যয়" হইয়া দাঁড়াইবে। †

* বিজ্ঞান ও বিজ্ঞাপনপ্রিয় য়ুরোপে সময়ে সময়ে এই রূপে আকাশ-বিহারী মেঘের গায়ে তাঁদের শৈশবকালীন বর্ণমালার অনুরূপ সুবৃহৎ অক্ষরে বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য উহা বহুদূরবর্ত্তী বহু লোকে দেখিতে পায়; সুতরাং, বিজ্ঞাপন-দাতার-উদ্দেশ্য সমধিক পরিমাণে সফল হয়।

† দূরবীক্ষণ যন্ত্র দুই প্রকার;—মূর্চ্ছন-পর ও বক্রণপর (reflecting and refracting)। যে যন্ত্রে দ্রষ্টব্য পদার্থের প্রতিহত (reflected) আলো কাচপুটের এক পৃষ্ঠে প্রবেশ করিয়া অপর পৃষ্ঠ দিয়া বহির্গত হয়, তাহা বক্রণপর দূরবীক্ষণ। আর যে যন্ত্রে কাচ-পুট ব্যবহৃত হইয়া কাচ বা কোনরূপ ধাতু নির্ম্মিত দর্পণ ব্যবহৃত হয়, এবং উক্ত প্রতিহৃত আলো এই সকল দর্পণে পুনঃ প্রতিহত হইয়া সংহত আকারে দ্রষ্টার অক্ষি-গোলকে প্রবেশ করে, তাহা মূর্চ্ছনপর দূরবীক্ষণ। এই শেষোক্ত দূরবীক্ষণে দ্রষ্টব্য পদার্থ হইতে সমাগত আলোর কাচ কর্তৃক অপহৃত, শোষিত হইবার আশঙ্কা খুব অল্প। কিন্তু এ স্থলে আলো পথবর্ত্তী বায়ু সমধিক পরিমাণে পরিচ্ছন্ন হওয়া আবশ্যক। অথচ আমেরিকার পূর্ব্বোল্লিখিত যে "প্রেয়রী" নামক তৃণক্ষেত্রে বা পর্ব্বতের উপত্যকা প্রদেশে বায়ু সর্ব্বাপেক্ষা নির্ম্মল, সেইখানেও এই দূরবীক্ষণ যন্ত্রের দ্বারা দৃষ্টির পক্ষে বিশেষ সাহায্য পাওয়া যায় নাই। সুতরাং এই দূরবীক্ষণেও একটা বিশেষ মুস্কিল রহিয়াছে, এবং কোন মুস্কিল-আসানেরও আবির্ভাব সম্ভাবনা দেখা যায় না।

পিতৃবৎসলা।

(১)

মেদেলি নগর, পারস্য সম্রাটের শাসনাধীন কুর্দ্দিস্থান প্রদেশের অন্তর্গত। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে, সম্রাট মির্জ্জা আব্বাসের শাসন সময়ে উক্ত নগরের কোনও ক্ষুদ্র কুটীরে দুইটী স্ত্রীলোক বাস করিত। একটী বৃদ্ধা, অপরটী বালিকা। বৃদ্ধা অতি কষ্টে বালিকাটীকে প্রতিপালন করিয়াছিলেন। শৈশবে মাতৃহীনা বালিকা এ পর্য্যন্ত অপর কোনও আত্মীয়ের মুখ দেখিতে পায় নাই। সুতরাং এই পালয়িত্রী বৃদ্ধার প্রতি সাতিশয় অনুরক্তা ছিল।

আমরা যে সময়ের কথা উল্লেখ করিতেছি, তখন বালিকার বয়ঃক্রম চতুর্দ্দশ বর্ষ অতিক্রম করিয়াছে। ইহ জগতের সুখ দুঃখ, সম্পদ বিপদ, বুঝিবার শক্তি তাহার সম্যক্‌রূপে জন্মিয়াছে। সে সময়ে সময়ে সমবয়স্কা প্রতিবেশী কন্যাদিগের সহিত মিলিত হইয়া আমোদ প্রমোদে মত্ত থাকিলেও, স্বীয় অবস্থা ও বৃদ্ধার অশেষ স্নেহ ও অনুরাগের কথাপ্রসঙ্গে অশ্রুবর্ষণ করিত। ইতিমধ্যে এক দিন তাঁহাদের কুটীরে একজন আগন্তুক আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইনি এই দীন দুঃখী পরিবারের পুরাতন সুহৃদ। সুতরাং বৃদ্ধা ও বালিকা উভয়ে মিলিয়া তাঁহার সমুচিত অভ্যর্থনা করিলেন। প্রত্যাবর্ত্তন কালে আগন্তুক বহুক্ষণ বালিকার সহিত নির্জ্জনে কথোপকথন করিলেন; বৃদ্ধা তাহার কোনও সন্ধান পাইলেন না। এই ঘটনার পর হইতে বালিকার মানসিক ভাবের বিশেষ পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইল। তদবধি আর তাহাকে সমবয়স্কাদিগের সহিত মিলিত হইতে দেখা যাইত না। একাকিনী কোনও নিভৃত স্থানে বসিয়া অশ্রুপাত করিলেই যেন তাহার যন্ত্রণার উপশম হইত। বৃদ্ধা বালিকার এই আকস্মিক বিমর্ষতার কারণ কিছুমাত্র হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া বিবিধ প্রকারে তাহাকে সান্ত্বনা করিতে প্রয়াস পাইতেন। কিন্তু কিছুতেই বালিকার বিষাদ-মলিন মুখ প্রফুল্ল হইত না। অনেক সময়ে বৃদ্ধা তাহাকে পার্শ্বে বসাইয়া এই আকস্মিক বিমর্ষতার কারণ জিজ্ঞাসা করিতেন; কিন্তু বালিকা কোন প্রকার বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া কেবল অশ্রুজলে বক্ষ ভাসাইত। নিশিতে উভয়ে একত্রে শয়ন করিতেন। সহসা নিদ্রাভঙ্গ হইলে বৃদ্ধা বালিকার অস্ফুট ক্রন্দনরব শুনিতে পাইতেন এবং তাহাকে স্নেহভরে আলিঙ্গন করিয়া বিবিধ উপায়ে সান্ত্বনা করিতে সচেষ্ট হইতেন; কিন্তু, বালিকার ব্যাকুল হৃদয় কোন প্রকারেই সান্ত্বনা লাভ করিত না।

(২)

একদিন বালিকা শুনিতে পাইল পূর্ব্বোক্ত সুহৃদের মৃত্যু হইয়াছে। এই সংবাদে তাহার চিত্ত কিছু মাত্র বিচলিত হইল না। কালবিলম্ব না করিয়া সে পালয়িত্রী বৃদ্ধার সমীপে উপস্থিত হইল, এবং তাহার চরণযুগল বেষ্টন করিয়া বলিতে লাগিল, "পিসিমা। আমি আজ আপনার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করিতে আসিয়াছি। এত কাল প্রাণের কথাগুলি লুকাইয়া রাখিয়া আপনার মনে যে অশেষ কষ্ট দিয়াছি তজ্জন্য আমাকে ক্ষমা করুন। আজ যাহার মৃত্যুসংবাদ শুনিলাম, আমাদের সেই প্রিয় সুহৃদের নিকট প্রতিশ্রুত ছিলাম যে তাঁহার জীবদ্দশায় কখনও সে সকল কথা কাহারও নিকট ব্যক্ত করিব না। ব্যক্ত হইলে প্রিয়জনের প্রাণনাশের সম্পূর্ণ

আশঙ্কা ছিল। সম্প্রতি তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে, সুতরাং আমিও প্রতিজ্ঞা হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছি। আজ আপনাকে দুঃখের কথাগুলি খুলিয়া বলিব। পিসিমা! আপনি আমায় বলিয়াছিলেন যে আমি একজন তাঁতির কন্যা এবং বজ্রাঘাতে আমার পিতামাতার মৃত্যু হওয়াতে আপনি আমাকে প্রতিপালন করিয়াছেন।"

বৃদ্ধা। "হাঁ বাছা! তা ত সকলই সত্য।"

বালিকা। "সত্য বটে, আমার পিতা মেলিআরেথ এক সময়ে তাঁতের কর্ম্ম করিতেন, কিন্তু সম্রাট মির্জ্জা আব্বাসের শত্রুগণের সহিত সংগ্রাম করিয়া তিনি যে অসীম সাহসিকতার পরিচয় দেন তজ্জন্য সম্রাট তাঁহাকে প্রধান সেনাপতির পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এক সময়ে স্বীয় রণকৌশলে ও শৌর্য্যবলে তিনি সম্রাটের সাতিশয় প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিয়াছিলেন। শুনিয়াছি তখন আমাদের অর্থের অভাব ছিল না। আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধবের সমাগমে সর্ব্বদাই আমাদের গৃহ পূর্ণ থাকিত। প্রশস্ত অট্টালিকায় আমার পিতা মাতা বাস করিতেন। শুনিয়াছি সেই অট্টালিকার কোনও প্রকোষ্ঠে আমার জন্ম হয়। আজ প্রায় দুই বৎসর হইল এ সকল কথা আমি সেই আগন্তুক সুহৃদের মুখে শুনিয়াছি। বল দেখি পিসিমা! এ সকল কথা কি সত্য?"

বৃদ্ধা তখন লজ্জা, ঘৃণা ও অভিমানে অধোমুখী হইয়া বলিলেন:—"হাঁ বাছা! এ সকলই সত্য।"

বালিকা বলিতে লাগিল:—

"আমার পিতার সমধিক উচ্চপদ, দেশব্যাপ্ত গৌরব ও বিপুল সম্মান দর্শনে সম্রাটের পারিষদবর্গের মধ্যে কাহারও কাহারও মনে সাতিশয় ঈর্ষার সঞ্চার হয়। তিনি সম্রাট মির্জ্জা আব্বাসের সমধিক প্রিয়পাত্র হইয়াছেন ইহাতে তাহাদের মনে বিদ্বেষানল প্রজ্বলিত হয়। তখন সেই দুর্নিবার শত্রুগণ মিলিত হইয়া আমার পিতার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র আরম্ভ করে। তখনও তাঁহার চরিত্রে কোনও দোষ লক্ষিত হয় নাই। কিন্তু চক্রান্তকারী নীচাশয়েরা তাঁহার বিরুদ্ধে অসত্য অলীক অভিযোগ আনয়ন করিল। বিবিধ অসদুপায়ে তাহারা পিতৃদেবের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহিতার গুরুতর অপরাধ সপ্রমাণ করিল। তজ্জন্য তিনি পদচ্যুত হইলেন। তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব রাজভাণ্ডারে বাজেয়াপ্ত হইয়া গেল। পিসিমা, আর বলিব কি? বজ্রাঘাতে আমার পিতার বিনাশ ঘটে নাই। সম্রাটের ক্রোধানলেই তাঁহার সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে। আমার সদাশয় পিতা সম্রাটের নিকট স্বীয় নিষ্কলঙ্ক চরিত্র প্রতিপন্ন করিতে অশেষ প্রয়াস পাইয়াছিলেন, কিন্তু সম্রাট আর তাঁহার বাক্যে কর্ণপাত করিলেন না। এই নিদারুণ সংবাদে, গভীর ক্ষোভ এবং মর্ম্মযাতনায় অভাগিনী জননী অকালে ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন।" মর্ম্মস্পর্শী যাতনায় বালিকার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল। তখন বৃদ্ধা বলিতে লাগিলেন:—

"বিশ্বস্ত ভাবে তিনি যাহার সেবা করিয়াছিলেন, সেই নির্দ্দয় প্রভুর কঠোর আদেশে প্রিয় ভ্রাতা মেলিআরেথ ফাঁসিকাষ্ঠে প্রাণ হারাইয়াছেন। সম্রাট আদেশ করেন যে তাঁহার রাজ্যে আর কেহ সেনাপতি মেলিআরেথের নাম মুখে আনিতে পারিবে না। বাছা! রাজাজ্ঞার অধীন হইয়াই এ সকল কথা তোমার নিকট গোপন করিয়াছি।"

বালিকা দুই হস্তে চক্ষুর জল মুছিয়া বলিল ঃ—

"আপনি যাহা শুনিতে পান নাই আমি তাহা শুনিয়াছি; ঘাতকের হস্তে আমার পিতার মৃত্যু ঘটে নাই। আমার পিতার ন্যায় শৌর্য্যশালী সৈন্যাধ্যক্ষকে ঘাতকের হস্তে নিক্ষেপ করিতে সম্রাট সঙ্কুচিত হইয়াছিলেন। পিসিমা! বলিতে কি, এখনও আমি পিতৃহীনা হই নাই।

বৃদ্ধা চমকিত হইয়া বলিলেন ঃ—"বাছা, তুই বলিস্ কি?"

বালিকা। "সেই আগন্তুকের মুখে যাহা শুনিয়াছি তাহাই আপনাকে বলিতেছি। আমার পিতা অদ্যাপি জীবিত আছেন। ষোড়শ বৎসর অতীত হইতে চলিল, তিনি কারাগারের দুর্ব্বিসহ যাতনায় দিন যাপন করিতেছেন। তাঁহার দুঃখের কথা ভাবিয়াই আমি এতকাল নয়ন জলে ভাসিয়াছি। এই কারণেই ম্লানমুখে একাকিনী বসিয়া কেবল কাঁদিয়া কাঁদিয়া নিশি পোহাইয়াছি। এখনও আশা আছে তাঁহাকে কারাগৃহ হইতে মুক্ত করিয়া লইয়া আসিতে পারিব। কিন্তু হায়, আমার তেমন শক্তি কোথায়? আর তাহার উপায়ই বা কি আছে?" শোককাতরা বালিকার পুনরায় কণ্ঠরোধ হইল। ভ্রাতুষ্পুত্রীর গলদেশ জড়াইয়া ধরিয়া বৃদ্ধা ক্ষণকাল অশ্রুপাত করিলেন। পরম স্নেহের ভ্রাতাকে ভগবান অদ্যাপি জীবিত রাখিয়াছেন, এই ভাবিয়া ভক্তিভরে প্রণত হইয়া ভগবানের নিকট অন্তরের গভীর কৃতজ্ঞতা ব্যক্ত করিলেন।

বালিকা বলিতে লাগিল ঃ—"পিসিমা, আপনি অধীরা হইবেন না, পিতার উদ্ধার রূপ দুর্জ্জয় ব্রত উদ্‌যাপনে আমি কৃতসঙ্কল্প হইয়াছি। আজ এই দণ্ডেই আমি পিতৃচরণ সন্দর্শন করিতে যাত্রা করিতেছি। আশীর্ব্বাদ করুন যেন আমার মনোরথ পূর্ণ হয়।"

(৩)

আজ মাসাধিক কাল হল্‌মেহি পদব্রজে অবিশ্রান্ত চলিতেছে। অতি প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া দিবা দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত আপন গন্তব্যপথে অগ্রসর হইতেছে। মধ্যাহ্ন সময়ে কখনও বা পান্থনিবাসে, কখনও বা কোন গৃহস্থের আলয়ে আশ্রয় নিয়া কিঞ্চিৎ আহার ও বিশ্রামলাভ করিয়া পুনরায় চলিতেছে; এবং রাত্রিকালেও যতক্ষণ পথ দেখিতে পাওয়া যায় ততক্ষণ আর ক্ষান্ত হইতেছে না। অসহায়া বালিকা বিদেশে একাকিনী ভ্রমণ করিতে বিন্দুমাত্রও কাতরা হয় নাই। পিতার চরণ স্মরণ করিয়া দ্রুতপদে স্বীয় গন্তব্য স্থানের অভিমুখে ধাবিত হইতেছে। লোকে কত প্রকার ভয়প্রদর্শন করিল, কত প্রকার বাধা জন্মাইবার প্রয়াস পাইল, কিন্তু ভগবান এই সকল বাধাবিঘ্নের হস্ত হইতে তাহাকে রক্ষা করিলেন। মাসাধিক এইরূপ অবিশ্রান্ত পরিশ্রমের পর, হল্‌মেহি কারাগারের নিকটবর্ত্তী সহরে গিয়া উপস্থিত হইল। কিন্তু তখন তাহার পাথেয় সমস্ত ফুরাইয়া গিয়াছে, অথচ তাহার দুরূহ ব্রত উদ্‌যাপন এখনও সবিশেষ আয়াসসাধ্য।

এই সময়ে আহার অভাবে জীবনধারণ করা তাহার পক্ষে দুষ্কর হইয়া উঠিল। হল্‌মেহি তখন ভৃত্যবেশ ধারণ করিয়া শারীরিক পরিশ্রম দ্বারা স্বীয় জীবিকার সংস্থান করিতে সঙ্কল্প করিল এবং তথাকার এক বণিকের আলয়ে ভৃত্যবেশে উপস্থিত হইয়া কর্ম্মপ্রার্থী হইল। বণিক তাহাকে ভৃত্যরূপে গ্রহণ করিলেন। এখানে কিছুকাল অবস্থান করিলে পর প্রভুর বিশ্বস্ত এবং বিশেষ প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিল। হল্‌মেহি একদিন অবসর বুঝিয়া প্রভুর নিকট স্বীয় নাম এবং

স্বকীয় সুদৃঢ় সঙ্কল্পের বিষয় জ্ঞাপন করিল। বণিক্ তাহার এই দুরূহ ব্রত সাধনের সঙ্কল্প শুনিয়া বিস্মিত হইলেন। এ ব্রত সাধন করা যে তাহার পক্ষে অসাধ্য তাহা বুঝাইয়া দিবার নিমিত্ত বলিলেন—"বালিকা, তুমি কি আজও শুনিতে পাও নাই যে কারাগৃহটী টাইগ্রীস্ নদীর মধ্য-স্থলে অবস্থিত? নৌকা ব্যতীত তথায় পৌঁছিবার অন্য কোন উপায় নাই। নাবিকদিগের তথায় প্রবেশ নিষিদ্ধ। নৌকাসমূহ কারাগার হইতে অন্যূন তিন শত গজ ব্যবধানে রক্ষিত হয়। কেহ এই সীমা অতিক্রম করিলে, সম্রাটের আদেশে তাহার প্রাণদণ্ড হইবে। সুতরাং প্রাণনাশের ভয়ে কেহ তোমাকে তথায় লইয়া যাইবে না।" হলেমেহি প্রত্যুত্তর করিল,—"আমি সাঁতার কাটিতে জানি, তবে না হয় আমি সাঁতরাইয়া তথায় পৌঁছিব। যে কোন প্রকারে হউক আমি অবশ্য পিতৃচরণ দর্শন করিব।"

(৪)

হলেমেহি নদীতে সন্তরণ অভ্যাস করিতে লাগিল। বিপরীত স্রোতের মধ্যে কিরূপে সাঁতার কাটিতে হয় তাহা অভ্যাস করিতে কৃতসঙ্কল্প হইল। প্রথম দিন নদীস্রোত ভেদ করিয়া সন্তরণ করিতে সাতিশয় ক্লান্তি বোধ হইল। কিয়দ্দূর যাইতে না যাইতেই ক্লান্ত হইয়া পড়িল। সে দিন আর সাঁতার কাটা হইল না।

পরদিন প্রত্যুষে উঠিয়া আবার নদীতে ঝাঁপ দিয়া পড়িল। সে দিন অতি কষ্টে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইল। কিন্তু অধিকক্ষণ স্রোতে থাকিতে পারিল না। নদী-স্রোতে তাহাকে অনেকটা ভাসাইয়া লইয়া গেল। সুতরাং ক্ষণকাল পরেই আবার নদীবক্ষ হইতে ফিরিয়া আসিতে হইল। তাহার পর দিন তদপেক্ষা অধিক দূরে যাইতে সমর্থ হইল। অমনি বালিকার মনে আশার সঞ্চার হইল। সে দিন হইতে নদীবক্ষোপরি ভাসমান কারাগৃহটী লক্ষ্য করিয়া সন্তরণ করিতে আরম্ভ করিল। এক্ষণে হলেমেহির জীবনের আর কোনও উদ্দেশ্য নাই, আর কোনও লক্ষ্য নাই। টাইগ্রীস্ নদীর বক্ষে সন্তরণ করাই তাহার জীবনের প্রধান কার্য্য হইয়া উঠিল। এইরূপে মাসাধিক কাল পরিশ্রম করিয়া একদিন কারাগৃহের অতি নিকটে গিয়া উপস্থিত হইল। কিন্তু কারাগারের দ্বার লৌহশলাকা দ্বারা আবদ্ধ। কি উপায়ে পিতার সন্ধান পাইবে এই ভাবিয়া হলেমেহি চিন্তাকুল হইল। কারাগারের চতুষ্পার্শ্বে সন্তরণ করিতে করিতে একদিন দেখিতে পাইল, একটী নির্জ্জন প্রকোষ্ঠে একজন বৃদ্ধ স্তিমিত নেত্রে ভগবানের আরাধনা করিতেছেন। দেখিবামাত্র তাহার হৃদয়ে সহসা তড়িদ্বেগ সঞ্চারিত হইল। বালিকার হৃদয় যুগপৎ হর্ষ ও বিষাদে পূর্ণ হইয়া উঠিল। এত কাল পরে পিতার চরণ দর্শন পাইয়াছে ভাবিয়া তাহার হৃদয়ে আর আনন্দ ধরে না। কিন্তু কিরূপে তাঁহার নেত্রপথে পতিত হইবে, এই বৃদ্ধই কি তাহার কারারুদ্ধ পিতা, তাহা হইলেও বা তিনি কি রূপে তাহার পরিচয় পাইবেন, এই সকল বিষয় ভাবিতে ভাবিতে বালিকার হৃদয় পুনরায় বিষাদে পূর্ণ হইল। অমনি তীরবেগে কারাগৃহের সম্মুখীন হইয়া নানা প্রকার সঙ্কেত করিতে লাগিল। যাহাতে বন্দীর দৃষ্টি নদীবক্ষে নিপতিত হয় তজ্জন্য নানা উপায়ে ইঙ্গিত করিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু তাঁহার দৃষ্টি আর তৎপ্রতি পতিত হইল না। তখন বালিকা হতাশহৃদয়ে গৃহাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। আসিবার কালে মনে মনে চিন্তা করিল "কাল অবশ্যই তিনি আমায় দেখিতে পাইবেন।" কিন্তু পরদিনও বালিকাকে নৈরাশ্যপূর্ণ অন্তরে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইল। বন্দী ভ্রমেও নদীবক্ষে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন না। এইরূপে হলেমেহি প্রত্যহ কারাগৃহের গবাক্ষগুলির নিকটে আসিয়া নানাপ্রকার সঙ্কেত করিতে আরম্ভ করিল; কিন্তু কারারুদ্ধ বন্দীর দৃষ্টি আর সে দিকে নিপতিত হইল না। হলেমেহি গবাক্ষের নিকটে গিয়া কখনও কখনও বৃদ্ধকে তথায় উপবিষ্ট দেখিতে পাইত, কখনও বা তথায় কোন প্রাণীর সাড়াশব্দ পর্য্যন্তও শুনিতে পাইত না। গবাক্ষের নিকটে বৃদ্ধকে উপবিষ্ট দেখিতে পাইলে সে বিবিধ প্রকারে সঙ্কেত করিতে ত্রুটী করিত না। কিন্তু দুঃখের বিষয় বন্দী কদাচ তৎপ্রতি লক্ষ্য করিতেন না। হলেমেহি নৈরাশ্যপূর্ণ হৃদয়ে প্রত্যুষে গৃহে প্রত্যা-বর্ত্তন করিয়া নির্জ্জনে অশ্রুপাত করিতে করিতে মনে মনে ভাবিতে লাগিল "আর আমার এ কঠিন ব্রত সাধন করা হইল না। যে আশায় বুক বাঁধিয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইয়াছিলাম,

আজ সে আশায় জলাঞ্জলি দিয়া গৃহে ফিরিয়া যাইতে হইল। পিতৃচরণে লুণ্ঠিত হইতে পারিব না। আমার সকল উদ্যোগ ব্যর্থ হইয়া গেল। পিতৃদর্শন আমার অদৃষ্টে ঘটিয়াছে। কিন্তু যাহা দেখিয়াছি তাহাতে আমার হৃদয়ের যাতনা কিছু মাত্র উপশান্ত না হইয়া বরং শতগুণে বাড়িয়া উঠিয়াছে। নির্জ্জন কারাগৃহবাসী পিতার অসহনীয় যাতনা স্বচক্ষে দেখিতে পাইয়াই বা আমি কিরূপে জীবন ধারণ করিব?" সে রাত্রিতে আর তাহার নিদ্রা হইল না। সারানিশি জাগিয়া পিতৃচরণ ধ্যান করিতে লাগিল। অবশেষে মনে মনে স্থির করিল—"আর বৃথা প্রয়াস করিয়া ফল কি? পিতার মুক্তিলাভ সাধন করা আমার পক্ষে অসাধ্য; কিন্তু গৃহে গিয়া বাস করিতে পারিব না। যত দিন বাঁচিয়া থাকিব পিতার সেই সৌম্য মূর্ত্তি স্মৃতিপথ হইতে বিলুপ্ত হইবে না। আমি আর সংসারে গিয়া বাস করিতে পারিব না। অতএব কোনও ধর্ম্ম-মন্দিরে যাইয়া ঈশ্বরের সেবায় জীবন উৎসর্গ করিব।" এইরূপে বিবিধ চিন্তায় নিমগ্ন থাকিয়া বালিকা আর নিদ্রাদেবীর শান্তিময় ক্রোড়ে স্থান পাইল না। কিন্তু ভাবিতে ভাবিতে সহসা তাহার চিত্তে একটী নূতন ভাবের উদয় হইল। কে যেন তাহার পশ্চাৎ হইতে অভয়বাণী শুনাইল; কর্ত্তব্যপথে অগ্রসর হইতে প্রোৎসাহিত করিতে লাগিল। কে যেন অকস্মাৎ তাহার অন্তরে একটী নূতন উপায় উদ্ভাবন করিয়া দিল।

(৫)

প্রায় ষোড়শ বৎসর অতীত হইতে চলিল বৃদ্ধ মেলিআবেথ কারাগারের অশেষ যাতনায় দিন যাপন করিতেছেন। এত কাল তাঁহার শক্তি সামর্থ্য যথেষ্ট ছিল, কিন্তু এক্ষণে কেশ শুভ্র, শরীর শিথিল হওয়াতে বার্দ্ধক্য অবস্থায় উপনীত হইয়াছেন। এ বয়সে আর মুক্তিলাভের আশা কোথায়? এ সংসারে তাঁহার আত্মীয় কেহ জীবিত আছে, এ চিন্তাও তাঁহার চিত্তে স্থান পায় না। সময়ে সময়ে সহায়সম্পত্তিবিহীন কন্যার কথা মনে উঠিলে বৃদ্ধ দুই এক বার দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়াই ক্ষান্ত হইতেন। মাতৃহীনা শিশুটি যে এতকাল জীবিত আছে, তদ্বিষয়ে তিনি সম্পূর্ণ সন্দিগ্ধচিত্ত ছিলেন। কিন্তু এত কালের পর সেই পিতৃমাতৃবিহীনা অসহায়া বালিকা স্বীয় জীবনের আশায় জলাঞ্জলি দিয়া তাঁহার উদ্ধারার্থ তথায় উপস্থিত হইবে ইহা কল্পনার তুলিকায় অঙ্কিত করাও তাঁহার পক্ষে সুকঠিন হইয়াছিল। সুতরাং তিনি সংসারের সুখ দুঃখের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন থাকিয়া পারলৌকিক চিন্তায় কালযাপন করাই শ্রেয়ঃ মনে করিয়াছিলেন। বৃদ্ধ সায়ংকালীন উপাসনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন; এমন সময় সহসা নদীবক্ষ হইতে একটী অস্ফুট রব তাঁহার কর্ণগোচর হইল। ধ্যানমগ্ন বৃদ্ধ চমকিত হইয়া নদীবক্ষে নেত্রপাত করিলেন; দেখিলেন একখণ্ড বস্ত্রোপরি তাঁহার প্রিয়তমা বালিকা হল্‌মেহির নাম অঙ্কিত রহিয়াছে। অমনি বিদ্যুদ্বেগে পূর্ব্বস্মৃতি জাগিয়া উঠিল। বৃদ্ধ দ্রুতপাদবিক্ষেপে অগ্রসর হইতে যাইয়া বাতাহত কদলীবৃক্ষের ন্যায় মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

(৬)

পরদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে হল্‌মেহি পুনরায় কারাগৃহের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল। কিন্তু অল্প ব্যবধান থাকিতেই পিতার সৌম্য মূর্ত্তি গবাক্ষদ্বারে দেখিতে পাইল। আজ বৃদ্ধ সন্ধ্যালোকে বসিয়া বালিকার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। গবাক্ষের নিকটবর্ত্তী হইবামাত্র বৃদ্ধ দুই হস্ত প্রসারণ পূর্ব্বক বালিকাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। বালিকা ধীরে ধীরে গবাক্ষের নিম্নদেশে স্রোতোপরি সন্তরণ করিতে লাগিল। সমস্ত নিশি জাগরণ করিয়া বৃদ্ধ একগাছি রজ্জু প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলেন। বালিকা গবাক্ষের নিকটবর্ত্তী হইবামাত্র রজ্জুটী নামাইয়া দিলেন। হল্‌মেহি তখন একখানি ছুরি রজ্জুর পার্শ্বে বাঁধিয়া দিল। ছুরিখানি কাগজে মোড়া ছিল। কাগজখানা খুলিবামাত্র বৃদ্ধ তাহাতে এই কয়টী কথা লিখিত আছে দেখিতে পাইলেন:—"আপনি নামিয়া আসিতে চেষ্টা করিবেন। আমি সমস্ত রাত্রি এই শৈল মধ্যে লুক্কায়িত থাকিয়া আপনার আগমন প্রতীক্ষা করিব।"

হল্‌মেহি অদূরে লুক্কায়িত থাকিয়া পিতার কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিল। মেলি-আবেথ স্বহস্তে গবাক্ষের লৌহশলাকা কর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিলেন। বালিকা অদূরে থাকিয়া

ভগবানের নিকট তাঁহার মুক্তিলাভের জন্য প্রার্থনা করিতে লাগিল। অনেক রাত্রি হইয়া গেল, তবুও হলমেহি পিতার কার্য্য শেষ হইবার কোনও সাড়া শব্দ শুনিতে না পাইয়া বিষম দুর্ভাবনায় নিমগ্ন হইল। সহসা গবাক্ষ হইতে কড়মড় ধ্বনি উত্থিত হইয়া নৈশ প্রকৃতির নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া দিল। বালিকা তখন বুঝিতে পারিল পিতার উদ্ধারের পথ উন্মুক্ত হইয়াছে।* পাছে প্রহরিগণ এই শব্দ শুনিয়া জাগিয়া উঠে এই ভাবনায় আবার তাহার প্রাণ আকুল হইয়া উঠিল। বালিকা তখন একমনে যুক্তকরে ভগবানের নিকট পিতার মুক্তিলাভের জন্য প্রার্থনা করিতে লাগিল। চারিদিক তখন ঘনঘটাচ্ছন্ন। পূর্ণিমার চন্দ্র মেঘাড়ম্বরে সমাচ্ছন্ন হওয়াতে কিছুই দৃষ্টিগোচর হইতেছে না। অকস্মাৎ কারাগৃহের বাহিরে একটী অস্ফুট ধ্বনি তাঁহার কর্ণগোচর হইল। বালিকা চমকিত হইয়া উঠিল। ক্ষণকাল পরেই পলিতকেশ গলিতচর্ম্ম বৃদ্ধ চকিত পাদবিক্ষেপে তাহার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। হলমেহি দুই বাহু প্রসারণ করিয়া পিতাকে আলিঙ্গন করিল। বৃদ্ধ অত্যধিক পরিশ্রমে কাতর হওয়াতে বালিকার পার্শ্বে শুইয়া পড়িলেন। হলমেহি ধীরে ধীরে তাঁহার মুখের ঘর্ম্ম মুছাইয়া দিতে লাগিল। দুর্গ হইতে অবতরণকালে তাঁহার শরীরে কোন কোন স্থান ক্ষত হইয়া যায়। ক্ষতস্থান দিয়া রুধিরধারা বহিতেছিল। অঞ্চলে করিয়া জল আনিয়া হলমেহি রক্ত মুছাইয়া দিল। তাহার হৃদয় আজ আহ্লাদে নৃত্য করিতেছে। জীবনের মহাব্রত আজ উদ্‌যাপিত হইয়াছে। এক্ষণে পিতার ক্রোড়ে মুখ লুকাইয়া নানাপ্রকার মিষ্টবাক্যে বৃদ্ধের ষোড়শ-বর্ষ-ব্যাপিনী দুর্নিবার জ্বালা যন্ত্রণার উপশম করিতে লাগিল। হলমেহি এক্ষণে পিতাকে নিরাপদ ভাবিয়া আনন্দে গৃহাভিমুখে যাত্রা করিল। কিন্তু বৃদ্ধ সাতিশয় ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। বহুকাল সন্তরণ করিতে অনভ্যস্ত। এই অত্যধিক পরিশ্রমের পর সন্তরণ করিয়া টাইগ্রীস্ নদী উত্তীর্ণ হওয়া সুকঠিন। [illegible] কিন্তু কালবিলম্ব করিলে পশ্চাতে বিষম বিভ্রাট উপস্থিত হয় এই আশঙ্কায় ভগবানের নাম লইয়া নদীবক্ষে ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন। কিন্তু দুর্ব্বল দেহে প্রতিকূল স্রোতে বহুক্ষণ সন্তরণে তাঁহার হস্তদ্বয় ক্রমশঃ অবশ হইয়া পড়িল। সুতরাং স্রোতের উপরে ভাসিয়া থাকা তাঁহার পক্ষে অসাধ্য হইয়া উঠিল। তখন কাতরস্বরে বালিকাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন ঃ—"মা, আর কেন? এখন আমায় বিদায় দাও। আর আমি সাঁতার কাটিতে পারিব না। শরীর ক্রমশঃ অবসন্ন হইয়া পড়িতেছে, বুঝি বা নদীবক্ষেই প্রাণ হারাইলাম।" বালিকা তখন উচ্চৈঃস্বরে 'বাবা' 'বাবা' বলিয়া চেঁচাইতে লাগিল; এবং স্বীয় বস্ত্র দ্বারা পিতার দেহ জড়াইয়া তাঁহাকে আসন্ন বিপদ হইতে রক্ষার জন্য প্রবল স্রোতের বিরুদ্ধে প্রাণপণে সংগ্রাম করিতে লাগিল। ক্রমশঃ প্রবল স্রোতোবেগ হইতে স্রোতবিহীন গভীর জলরাশির উপরে তাঁহাকে লইয়া গিয়া পুনরায় সাঁতার কাটিতে আরম্ভ করিল।

এ দিকে কারাগারে হুলস্থুল পড়িয়া গেল। প্রহরিগণ গবাক্ষের দ্বার উন্মুক্ত এবং লৌহ-শলাকাগুলি ভগ্ন দেখিয়া যোলআবেদের গৃহে প্রবেশ করিল। প্রকোষ্ঠ জনশূন্য দেখিয়া মহা-কোলাহল করিয়া উঠিল। "বন্দী পলাইয়াছে" এই সমাচার চারিদিকে ব্যক্ত হইয়া পড়িল। অমনি সৈনিক পুরুষগণ নৌকা-যোগে বন্দীর উদ্দেশে ধাবিত হইল; নদীবক্ষে ইতস্ততঃ অন্বেষণ আরম্ভ করিল, কিন্তু বন্দীর সন্ধান পাইল না। এ পর্য্যন্ত আকাশ তমসাচ্ছন্ন ছিল। সুধাংশুর সমুজ্জ্বল মুখমণ্ডল মেঘাবৃত হইয়া রহিয়াছিল। সহসা মেঘমুক্ত হওয়াতে চারিদিক্ পুনরায় চন্দ্রা-লোকে আলোকিত হইয়া উঠিল। কারারক্ষকগণ এই আলোকে পলায়মান বৃদ্ধ বন্দীকে অদূরে সন্তরণ করিতে দেখিতে পাইল, এবং তাহাকে লক্ষ্য করিয়া তীর নিক্ষেপ করিল। তীর বালি-কার গাত্রে বিদ্ধ হইল। পিতৃবৎসলা বালিকার দেহ হইতে রুধিরধারা নির্গত হইয়া টাইগ্রীস্ নদীর জল কলঙ্কিত করিল। বালিকা সংগ্রামে পরাভূত হইল। তাহার শরীর অবশ হইয়া আসিল। ক্ষতদেহে পিতাকে জড়াইয়া ধরিয়া টাইগ্রীস্ নদীর অতল জলে ডুবিয়া গেল।

কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা এখনও পূর্ণ হয় নাই। হলমেহির জীবনের শেষ অঙ্ক এখনও উপস্থিত হয় নাই। বন্দীকে ডুবিতে দেখিয়া প্রহরিগণ তৎক্ষণাৎ নদীস্রোতে ঝম্প দিয়া পড়িল এবং স্বল্পকাল মধ্যেই পিতা ও কন্যা উভয়কে জলমধ্যের [illegible] হইতে উদ্ধার করিল। কিন্তু

করাল কালকবল হইতে রক্ষা পাইলেও দুর্দ্ধর্ষ প্রহরিগণের নির্ম্মম হস্ত হইতে রক্ষা পাইল না। পিতা ও কন্যা পুনরায় কারাগৃহে নীত হইলেন। হল্‌মেহি এই আকস্মিক বিপদে কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া ভগবানের মঙ্গল ইচ্ছার উপর নির্ভর করিয়া রহিল। এখন সে বুঝিতে পারিয়াছে যে তাহার জীবনের মহাব্রত সাধিত হইয়াছে; পিতৃচরণ দর্শন করিয়াছে। এক্ষণে কারাগারে পিতৃসেবায় নিয়োজিত রহিলে জীবন সার্থক হইবে।

(৭)

অদ্য হল্‌মেহি ও তাহার পিতা বিচারালয়ে আনীত হইয়াছেন। হল্‌মেহির নামে গুরুতর অভিযোগ উপস্থিত। যে বন্দীর নাম গ্রহণ করিলে সম্রাটের আদেশে প্রাণদণ্ড হয়, হল্‌মেহি সেই বন্দীকে কারাগৃহ হইতে উদ্ধার করিবার ষড়যন্ত্র করিয়াছে। অভিযোগ গুরুতর। সুতরাং বসোরা প্রদেশের সুবাদার স্বয়ং বিচারভার স্বহস্তে গ্রহণ করিলেন। হল্‌মেহি সুবাদারের নিকট আত্মবৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিল। অম্লানবদনে স্বীয় অপরাধ স্বীকার করিল। পিতার উদ্ধারসাধনে তাহার জীবন উৎসর্গ করিয়াছে জলদগম্ভীর স্বরে সেই বাক্য প্রকাশ্য বিচারালয়ে ব্যক্ত করিল। পিতার প্রতি কঠোর কর্ত্তব্যসাধন করিতে গিয়া এইরূপে বিপদ্‌গ্রস্ত হইবে ইহা তাহার অবিদিত ছিল না। সুতরাং উপস্থিত বিপদে সে কিঞ্চিন্মাত্রও কাতরা হয় নাই। কিন্তু বালিকার আত্মকাহিনী শ্রবণে বিচারকের হৃদয় বিচলিত হইল না। তিনি হল্‌মেহি ও তাহার পিতা উভয়ের প্রাণদণ্ডের আদেশ করিলেন।

হল্‌মেহির আশ্রয়দাতা সেই দয়ার্দ্র বণিক্ ও বসোরার জনসাধারণ মিলিত হইয়া এই আদেশের বিরুদ্ধে সম্রাট্ সদনে পিতৃবৎসলা বালিকা ও তাহার পিতার জীবন ভিক্ষা চাহিলেন। সম্রাট্ মির্জ্জা আব্বাসের কঠোর হৃদয় বিগলিত হইল। তিনি হল্‌মেহি ও তাহার পিতার সকল অপরাধ মার্জ্জনা করিলেন।

এ দিকে সম্রাটের আদেশলিপি পৌঁছিবার পূর্ব্বেই ঘাতকের কঠোর হস্তে উভয়ের প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া গেল।*

শ্রীরমণীমোহন দাস।

---

* বৈদেশিক গল্প।

স্থান অভাবে বিজ্ঞাপিত সমুদয় প্রবন্ধ প্রকাশিত হইল না। আশা করি গ্রাহকগণ ত্রুটী মার্জ্জনা করিবেন। আঃ-সঃ।

৩৫৮

আরতি।

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

তৃতীয় বর্ষ।] ময়মনসিংহ, শ্রাবণ, ১৩০৯। [দ্বিতীয় সংখ্যা।

কৈলাসপতি কপিশাঞ্জন।

"জয় মহেশ্বর, শিব জটাধর, ঈশান ঈশ্বর, অজেয় গিরিশ।
হিমাংশু-ভালক, মদন-দাহক, মুক্তি-প্রদায়ক, অমর-উমেশ॥
বৃষভবাহন, হর পঞ্চানন, বিজয়ে পালন কর হে ভূতেশ॥"

স্তুবন্তি ত্বাং সততং সর্ব্ব বেদা
গায়ন্তি ত্বাং গৃহিণো ব্রহ্মনিষ্ঠাঃ।
নমামঃ সর্ব্বে শরণার্থিনস্ত্বাং
প্রসীদ ভূতাধিপতে মহেশ॥"

(বিজয়গীতিকা)।

প্রাচীন হিন্দুর পবিত্র ধর্ম্মশাস্ত্র অমূল্য রত্নরাজির অপূর্ব্ব ও অগাধ ভাণ্ডার স্বরূপ। এক সহস্রাধিক বৎসরের বিদেশীয় শাসনে হিন্দু জাতি হীনবীর্য্য ও হীনসামর্থ্য হইয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু তাহাদের অসামান্য শাস্ত্র-ভাণ্ডারের অপূর্ব্ব রত্নরাজি এখনও অক্ষয়, অব্যয় ও অক্ষুণ্ণ ভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই অনন্ত রত্নভাণ্ডার পতিত হিন্দুর পুরাতন প্রখ্যাতির প্রকৃষ্ট প্রমাণ স্বরূপে বর্ত্তমান। হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্রকে অসংখ্য আদর্শ মহাপুরুষের অনন্যসাধারণ আদর্শ-চরিত্রের সুবিশাল চিত্রপট বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। প্রাচীন হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্র পবিত্র নর নারীর আদর্শ-চরিত্রের চিন্ময় চিত্রণে পরিপূর্ণ। হিন্দুর সমাজ ও রাজনীতির অধুনাতন অবস্থা অমাবস্যার অন্ধকারের ন্যায় অরুদ্ধ বলিয়া অনুভূত হইলেও এই সকল আদর্শ-চরিত্র তামসগামী রজনীর তমোমণি (খদ্যোৎ) দিগের ন্যায় আশার আনন্দময় আলোককে অক্ষিসম্মুখে আনয়ন করিয়া শুষ্ক

শীর্ণ ও সুষুপ্ত হিন্দুকে সজীব সরস ও সচেতন করিতে সম্পূর্ণ সমর্থ বলিয়া বোধ হয়। এই সকল মহাবলী ও মহামতি "মহাপুরুষ"দিগের আদর্শ-চরিত্রকে বর্ত্তমান কালের অধঃপতিত হিন্দুর শিক্ষক ও সহায়ক স্বরূপে গ্রহণ করা উচিত। ভারতের নরনারীর নয়ন সম্মুখে এই আদর্শ চরিত্র, অমূল্য জ্ঞান ও অমূল্য শিক্ষার সুন্দর অনুকরণের উপকরণ স্বরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছে; অজ্ঞ ও অলস ভারতবাসী এই সকল অমূল্য রত্নকে 'হেলায় হারাইয়া' দিনে দিনে হীন ও হেয় হইয়া পড়িতেছে। আমাদের সংস্কৃত সাহিত্যে এবং শাশ্বত শাস্ত্রে এই সকল পুরুষপুঙ্গবের আদর্শ-চরিত্রের চিন্ময় চিত্রণ দ্বারা আমাদের শিক্ষা, দীক্ষা, উৎসাহ, উদ্দীপনা সাহস, সাধুত্ব, দয়া, ধর্ম্ম, পরোপকার, আত্মোন্নতি, স্বদেশ-প্রেমিকতা, ভগবদ্ভক্তিপরায়ণতা, বিদ্যা, বিনয়, গতি, মুক্তি, শৌর্য্য, বীর্য্য, সুখ, সভ্যতা প্রভৃতির জন্য আর্য্য মহর্ষি, দেবর্ষি ও ব্রহ্মর্ষিগণ আদর্শ দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন। এই সকল দৃষ্টান্তকে শিক্ষক ও সহায় রূপে অনুকরণ করা আমাদের মৃত দেহে নবজীবন সঞ্চার করিবার অমোঘ, অব্যর্থ ও উন্নত উপায় স্বরূপ। জলে, স্থলে, অরণ্যে, পর্ব্বতে, লোকালয়ে, নির্জ্জন নিভৃতে, যে দিকেই দৃষ্টিপাত করি, প্রাচীন হিন্দু সমাজে আদর্শ-চরিত্রের বহুলতা দেখিয়া বিস্মিত হই। বোধ হয় এক সময়ে গ্রামে গ্রামে—গৃহে গৃহে আদর্শ-চরিত্রের হিন্দু নরনারীর সংখ্যা সুপ্রচুর ছিল। পাপিষ্ঠ পিশাচ পরিপূর্ণ পঞ্চবটীর মহারণ্যের দিকে তাকাইলে আদর্শ মহাপুরুষ রাজীবলোচন রামচন্দ্রকে দেখিতে পাই; শ্যামসলিলা যমুনার তটদেশে মোহন মুরলীধারী মহাপুরুষ শ্রীমাধবের মনোরঞ্জন মূর্ত্তির সাক্ষাৎ প্রাপ্ত হই; রাজ-সিংহাসনে যোগীন্দ্র জনক, জন-কোলাহলে "ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রের" আহবে মহাবলী অর্জ্জুন, নবদ্বীপের নবোৎসাহী নগরে ভক্তির অবতার মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য অভ্রভেদী অত্যুচ্চ অশ্বত্থতলে ধ্যানমগ্ন ধ্রুব, প্রাসাদ-স্তম্ভের পার্শ্বে প্রার্থনাপরায়ণ পরম প্রেমিক প্রহ্লাদ, শ্মশান-সৈকতে শৈব্যা ও হরিশ্চন্দ্র, ঘোর কঠোর পরীক্ষা-স্থলে অবিচল-প্রতিজ্ঞ দাতা কর্ণ, মহীরুহ-মূলে সতী সাধ্বী সাবিত্রী, অনন্ত অশোক অরণ্যে পতিপ্রাণা মা জানকী, কাননস্থ মায়াময় সিংহাসন-সম্মুখে ব্রহ্মবাদিনী অঙ্গিরাদুহিতা, গুহাগহ্বরমধ্যে ঋষিকুলমণি বিপ্র-শিক্ষক বিপ্রসার, দুর্গম পথে দয়াময় ঠাকুর লক্ষ্মণ, বিশাল বারিধিবক্ষে গো ব্রাহ্মণ ও রমণীরক্ষক ধনুকধারী বাল-ব্রহ্মচারী বৈতাল, বিমানপথে দেবগণ সম্মুখে দেবযানী, ন্যায়ের রাজ্য স্থাপনে—স্বদেশোদ্ধারে—বৃত্রাসুর-যুদ্ধে জীবিত শরীরের পৃষ্ঠাস্থি-দাতা সহাস্যবদন দধীচি মুনি এবং সাগর-সৈকতে অথবা

জলধির তরঙ্গবক্ষে ভক্তাধিকভক্ত মহাবলী মহামতি মহাধার্ম্মিক রাঘব হৃদয় পবননন্দন হনুমান, প্রভৃতি দেবদুর্লভ "মহাপুরুষ"দিগের আদর্শ চরিত্রে হিন্দু শাস্ত্রশরীর কি অপূর্ব্ব সুন্দর শোভায় সুদৃশ্যমান!! পাঠক মহাশয়! এবারে এক বার কাননের কঠোরতা, নগরের কোলাহল, রণক্ষেত্রের রক্তাক্ত দৃশ্য অথবা সংসারের স্বার্থপর বিরস দৃশ্য হইতে নয়নদ্বয় প্রত্যাহার করিয়া রজত রংএ রঞ্জিত হিমাদ্রির ধবল শিখরের দিকে চাহিয়া দেখুন দেখি! দুগ্ধফেননিভ হিমাচলের কৈলাস-শিখরে এক আদর্শ-চরিত্র মহাপুরুষের মহামোহন মূর্ত্তি দেখিতে পাইতেছেন কি? ভারতের সর্ব্ব উত্তর প্রান্তে ভারতের রক্ষকরূপে হিমাচল-শিখরে, জটাজুটসমাযুক্ত, দ্বীপিচর্ম্মপরিহিত, ভস্মাচ্ছাদিত-দেহী, এক উদাসী মহা-পুরুষের জগন্মনোমোহন মূর্ত্তি দেখিতে পাইতেছেন কি?—এই কপিশ-অঞ্জন মহামূর্ত্তির নাম কৈলাসপতি মহাদেব; বৃষভবাহন স্বয়ম্ভু সাধারণতঃ "শিব" নামে সুপ্রসিদ্ধ। হিমাচলবক্ষ তুষারে আবৃত হইলেও পাদপ ও ব্রততীপুঞ্জে স্থানে স্থানে পরিপূর্ণ। এই মহাকাননের এক দিকে প্রচুর পবিত্র প্রসূনপুঞ্জ সুগন্ধ বিস্তার করিয়া দিগ্‌দিগন্ত মধুময় করে এবং আর এক দিকে শবদেহসমাচ্ছাদিত শ্মশান ক্ষেত্রের বৈরাগ্যব্যঞ্জক ভীষণ দৃশ্য দেখাইয়া নরজগতের অনিত্যতা প্রতিপাদন করিতে থাকে। এখানে কাহার মৃত দেহ অথবা কাহারই বা শ্মশান তাহা স্বয়ং স্বয়ম্ভু ভিন্ন কে বলিয়া দিতে পারে? এই মহাশ্মশানস্থলের মধ্যভাগে প্রস্তরবিনি-র্ম্মিত, কুসুমকুঞ্জসমাবৃত, পবিত্র আশ্রমাভ্যন্তরে, নন্দী ভৃঙ্গীকে সঙ্গে লইয়া ববম্ ববম্ বম্ রবে চারিদিক প্রতিধ্বনিত করিয়া, কপিশাঞ্জন মহাদেব কি সুন্দর ভাবে সমাবিষ্ট! এই মহামূর্ত্তি দেবতাদিগেরও দেবতা, সেই জন্য ইনি দেবাদিদেব মহাদেব নামে প্রখ্যাত। কবির মধ্যে যেমন উশনা, স্রোতস্বতীর মধ্যে যেমন জাহ্নবী, মহীরুহের মধ্যে যেমন অশ্বত্থ, মুনিদিগের মধ্যে যেমন কপিল, অথবা গজেন্দ্রদিগের মধ্যে যেমন ঐরাবত, দেবতাদিগের মধ্যে তেমনি কৈলাসপতি কপিশ-অঞ্জন মহাদেব। এই নাম কি মধুর! এই মূর্ত্তি কি সুন্দর! ঐই হিমাদ্রি-প্রদেশ কি পবিত্র! মাতৃরূপিণী এই হিমগিরির কোমল ক্রোড়ে উপবেশন করিলে মন প্রাণ শীতল হয়, এইজন্য বুঝি ইহার প্রাণশীতলকারী "হিম" নাম হইয়াছে! এই ধবলগিরির কৈলাস প্রদেশে মহাদেব মূর্ত্তি এত সুন্দর এবং এত উচ্চ আদর্শের আদর্শ যে, মানবের কল্পনায় এত সুন্দরতা সহজে আসে না এবং এরূপ "মহাদর্শ" পুরুষের চরিত্র মানবের লেখনীর বর্ণনায় সম্পূর্ণ সুস্পষ্টভাবে বিবৃত হইতে পারে না।

হিমালয়বাসী কৈলাসপতি মহাদেব ভারতের কেবল রক্ষক নহেন, এই স্বয়ম্ভু শঙ্কর ভারতবাসীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষক। ইঁহার শিক্ষকতা ভূতলে অতুল, এমন প্রাচীন ও প্রকৃষ্ট প্রাজ্ঞ ধরাতলে দ্বিতীয়বিহীন। এই দেবাদিদেব মহাদেবের জ্ঞানবত্তা মহাসাগর হইতেও মহাগভীর, ইঁহার জ্ঞানের প্রশস্ততা ক্ষীরোদসাগরাপেক্ষাও প্রশস্ততর এবং ইঁহার বহুদর্শন ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই ত্রিকালব্যাপী; সমগ্র বিশ্বসংসারের সমগ্র বিদ্যা ও জ্ঞান কৈলাসপতি কপিশাঞ্জনের নখাগ্রে দর্পণের ন্যায় অবস্থিত। কত যুগের পর কত যুগ চলিয়া গেল, কত মহাপ্রলয়ের পর মহাপ্রলয় অতিবাহিত হইয়া গেল, তথাপি ইঁহার বয়সের কেহ নির্ণয় করিয়া উঠিতে পারিল না; শ্মশানে মশানে ঘুরিয়া ঘুরিয়া, হাড়ের মালা গলায় দিয়া, ভূত প্রেতকে সঙ্গী করিয়া, সকল ঋদ্ধি এবং সকল সিদ্ধির সারার্থাস্বাদনজনিত ব্রহ্মানন্দে মাতোয়ারা হইয়া হিমাচলের ভোলানাথ ববম্ ববম্ বম্ রবে সুষুপ্ত সংসারের চৈতন্য বিধান করেন; ইনি সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই তিন গুণের অতীত সুতরাং নির্গুণ; এবং ইঁহার ভালদেশে শত শত জ্যোতিরিঙ্গণের জ্যোতিঃসমতুল্য বিভাবসুর ধক্ ধক্ জ্বালা দিবানিশি ইঁহার মুখমণ্ডলকে আলোকিত করে,—এই মহাগ্নির তেজে এক সময়ে কামদেব (মদন) ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছিল। এমন অদ্ভুত দেবতা পৃথিবীর ধর্ম্মসাহিত্যে আর নাই, ইনি গুরুর গুরু, পিতার পিতা এবং পতির পতি। এমন সর্ব্বগুণময় ভোলা মহেশ্বর পৃথিবীতে অদ্বিতীয় ও অতুলনীয়।

"অতি বড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ।
কোন গুণ নাহি তাঁর কপালে আগুন॥"

ইনি পবিত্রতর হইতেও পবিত্রতম; সকল পবিত্রতার সারাৎসার পতিতপাবনী জাহ্নবী ইঁহার শিরোদ্ভবা; শিব যাহার শিক্ষক ও সহায়, তাহার জীবন সকল সুখের আকর, সকল গুণের সাগর। শিব-চরিত্র জলন্ত আত্মোৎসর্গের জীবন্ত দৃষ্টান্ত। একাধারে সাংসারিক জীবনের চরমোৎকর্ষ এবং আধ্যাত্ম জীবনের পরাকাষ্ঠা শিব-চরিত্রে সুন্দররূপে সমাযুক্ত। এমন সুন্দর শরীর—এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সবল দেহ—এমন পূর্ণতাপ্রাপ্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কেবল আদর্শচরিত্রের মহাপুরুষেই সম্ভবে। স্বাস্থ্য রক্ষা দ্বারা শরীরের উন্নতি করা সকল সাধনের, সকল উন্নতির কারণের কারণ স্বরূপ, ইহা তিনি প্রত্যক্ষ দেখাইতেছেন। দেবাদিদেব মহাদেব বিবাহিত হইয়াও সংসারে নির্লিপ্ত, ইন্দ্রিয়সংযুক্ত হইয়া সাংসারিক জীবন যাপন করিয়াও ইনি জিতেন্দ্রিয় এবং সংসারী হইয়াও উদাসী। কে

বলিবে না দেবাদিদেব মহাদেব উমাপ্রাণ হইয়াও সদা উদাসী? ইনি সকল ইন্দ্রিয়ের অতীত; ইঁহার নয়নের জ্যোতিতে স্বয়ং কাম (মদন) ভস্মাবশেষে পরিণত হইয়াছিল। ইঁহার কটাক্ষে কামের কাম—মদনের মদনত্ব চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়াছিল। এমন কামবিজয়ী, জিতেন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়াতীত, সংসারী মহাপুরুষকে আর কেহ কোথায় দেখিয়াছে কি? হলাহল পান করিয়া ইনি শমন-সদনে গমন করেন নাই, বরং মৃত্যুকে জয় করিয়া মৃত্যুঞ্জয় নামে মহিমান্বিত হইয়াছেন; বিষ পান করিয়া ইনি "নীলকণ্ঠ" নামে জগদ্বাসীকে বিস্মিত ও বিমোহিত করিয়াছেন। এত গুণ, এত সামর্থ্য না থাকিলে পৌলস্ত্য প্রাজ্ঞপ্রবর দশানন কি কখন ইঁহার সেবকত্ব স্বীকার করিত? বাসবকে যিনি বিজয় করিয়াছিলেন, শমনকে যিনি প্রহরী রূপে নিযুক্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, রাঘবের সহিত সমর ঘোষণা করিতে যিনি সাহসী হইয়াছিলেন, সেই দশাননসমাযুক্ত রাবণ দেবাদিদেব মহাদেবের মহাদাস ও মহাভক্ত।। শিবের জটায় গঙ্গা, কণ্ঠে বিষ এবং গলায় কালসর্প; শিবের বাহন বৃষভ, অনুসঙ্গী ভূত প্রেত, আস্তরণ শার্দ্দূল এবং সহধর্ম্মিণী ভবানী। এমন সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন, সর্ব্বগুণাকর, সর্ব্বজ্ঞানের বিজ্ঞানস্বরূপ মহাগুরু আর কোথাও দেখিয়াছ কি? এমন দেবদুর্লভ দেহ, এমন সুমহান্ মন, এমন নিষ্কলঙ্ক চরিত্র এবং এমন আদর্শ-জীবন ইউরোপ বা আমেরিকায় নাই। তৈল ও জল একত্রে অবস্থান করিলেও যেমন পরস্পর সম্মিশ্রিত হয় না, পদ্মপত্রে বারি অবস্থান করিলেও যেমন তাহা পত্রে সমাযুক্ত হয় না, কৈলাসপতি মহাদেব সংসারী হইয়াও—বিবাহিত হইয়াও, সংসারে সদাই নিষ্কামী ও নির্লিপ্ত। ইনি সংসারী হইয়াও শ্মশানবাসী; ইহলোক ও পরলোককে, জন্ম ও মৃত্যুকে, সাংসারিক মায়া ও সাংসারিক বৈরাগ্যকে, সুখের সংসারস্বর্গ ও বৈরাগ্যের শ্মশানক্ষেত্রকে এই উভয়কে একাধারে তিনি তাঁহার নিজের জীবনে সুস্পষ্টভাবে দেখাইয়া দিতেছেন। শ্মশানবাসী হইয়াও এই বিবাহিত মহাপুরুষ সহধর্ম্মিণীর প্রতি অমনোযোগী নহেন; জটাজূটসমাযুক্ত, শার্দ্দূলচর্ম্মপরিহিত এবং ভস্মমাখা দেহী হইয়াও ইনি নারী জাতির মর্য্যাদা, সতীত্ব বা লজ্জাশীলতার সংরক্ষণে উদাসী নহেন। বৈরাগ্যময় শ্মশান-প্রান্তরে অবস্থান করিয়াও ইনি সংসারের কল্যাণে বীতস্পৃহ নহেন, নিজে ক্রিয়াতীত হইয়াও নিষ্ক্রিয় নহেন এবং সর্ব্বত্যাগী হইয়াও পরোপকারে কদাচ পরাঙ্মুখ নহেন। এত গুণ, এত সামর্থ্য, এত প্রেম না থাকিলে, ত্রিতাপনাশিনী ধরিত্রীধাত্রী অন্নপূর্ণা কি কখনও ইঁহার পত্নীত্ব স্বীকার করিতেন? ইঁহার প্রেমে

সর্পকুল বশ্যতা স্বীকার করিয়াছে, বিষের বিষত্ব উড়িয়া গিয়াছে, শ্মশানক্ষেত্র সুখকর ত্রিদিবধামে পরিণত হইয়াছে, শার্দ্দূল ও বৃষভ একত্রে সখ্যতা-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছে এবং ভূত প্রেত পিশাচ দাসত্ব স্বীকার করিয়া জীবন চরিতার্থ করিয়াছে। ধন্য সেই ভারতবর্ষ, যে দেশের কৈলাসপতি কপিশাঞ্জন শিক্ষক, রক্ষক, সহায়ক ও আদর্শ-চরিত্রের আদর্শ-দেবতা। এমন আদর্শ-শিক্ষক না হইলে কি ভারতবাসী "শিবরাত্রি" ব্রত পালন করিয়া, উপবাসের কষ্ট স্বীকার করিয়াও, মহানন্দে মহোৎসবের উদ্‌যাপন করিত ?

কৈলাসপতি কপিশাঞ্জনের সহধর্ম্মিণী রমণীকুলে অদ্বিতীয়া, এমন অতুলনীয়া রমণী আদর্শ-দেশ ভারতবর্ষেই সম্ভবে। সকল গুণের গুণমণি হইয়াও এই মহারমণী নিগুর্ণা এবং ইন্দ্রিয়াতীতা। জ্ঞানে বিজ্ঞানে, রূপে গুণে, শৌর্য্যে সাহসে, বিদ্যা বিনয়ে, ধর্ম্মে সুকর্ম্মে, চরিত্রে বীরত্বে, সতীত্বে ও সাধ্বীতে এই রমণী অদ্বিতীয়া। ইনি অন্নপূর্ণা, মহিষমর্দ্দিনী, সিংহবাহিনী, বিদ্যারূপিণী, বরদা, সারদা, মোক্ষদা, ভবানী, জগদ্ধাত্রী, ঈশানী এবং দুর্গতিহারিণী দুর্গা। রাজীবলোচন রামচন্দ্রের ইনি উপাস্য এবং সিদ্ধিদাতা গণেশের ইনি মাতা। উপযুক্ত পতির উপযুক্তা পত্নী না হইবে কেন ? সুপ্রসিদ্ধ দক্ষ রাজা ইঁহার পিতা। রাজা দক্ষ এক সময়ে এক মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া স্বর্গ মর্ত্ত্য ও পাতালবাসীকে যজ্ঞক্ষেত্রে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, কিন্তু কোনও বিশেষ কারণ বশতঃ স্বীয় জামাতা শিবকে নিমন্ত্রণ করেন নাই। শিবপ্রাণা সতী ভগবতী পিতৃগৃহে স্বকীয় স্বামীর এরূপ অপমান দর্শন করিয়া যজ্ঞস্থলেই প্রাণ পরিত্যাগ করেন ; সতী সাধ্বীর এই পতিভক্তি পৃথিবীর ইতিহাসে অতুলনীয়। সতী রমণী-দিগের দেহের প্রত্যেক অঙ্গই পবিত্র হইতেও পবিত্রতর, সেইজন্য পতিতপাবনী মাতা ভগবতীর নিষ্কলঙ্ক দেহের যে যে অংশ যে যে স্থানে পতিত হইয়াছিল সেই সেই স্থান মহাপবিত্র পীঠ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। আত্মমর্য্যাদা জ্ঞানের সর্ব্বোৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত সতী ভগবতীর জীবনে দেখিতে পাইতেছ কি ? ইনি রমণীরূপে মানবী বটেন, কিন্তু দিব্যচক্ষু দিয়া দেখিলে ইঁহাকে জগতের মাতা বলিয়া বুঝিতে পারিবে। দক্ষালয়ে মা অন্নপূর্ণা প্রাণ পরিত্যাগ করিলে পর তাঁহার মৃত দেহ, দেবাদিদেব মহাদেব ভূতল হইতে গ্রহণ করিয়া স্বীয় স্কন্ধে স্থাপন করেন ; মরণের পরেও সতী স্ত্রীলোক স্বামীর সখ্যতা হইতে স্বতন্ত্রা হয় না, শিব ইহাই দেখাইলেন। সতীদেহ স্কন্ধে শিবের মূর্ত্তি কি পবিত্র কি

সুন্দর!! এমন পবিত্র ও সুন্দর মূর্ত্তি আর কখনও দেখিয়াছি বলিয়া বোধ হয় না। হর বম্ বম্ বম্! ববম্ ববম্ বম্! বম্ ভোলা!!

ভগবৎপরায়ণ কাব্যকারেরা শিবমনোমোহিনী, দুর্গতিহারিণী, পতিতপাবনী, মাতা জগদম্বার এইরূপে স্তুতি করিয়াছেন—

সর্ব্বমঙ্গলামঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥
চতুর্ব্বর্গস্বরূপিণী ত্বং হি শক্তি মহামায়ে।
বর দে বরদে মাতঃ দানবাক্রান্ত সন্তানে॥

জয় হর বম্ বম্ ভোলা! জয় হরিহর ববম্ ববম্ বম্ ভোলা! আইস, আর একবার ঐ কৈলাসপতি কপিশাঞ্জনের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কৃতকৃতার্থ হই। ঐ ধ্যানমগ্ন মহাদেব জ্ঞানানন্দরূপে সমাবিষ্ট হইয়া আনন্দামৃত পান করিতেছেন; ঐ যোগীন্দ্রের শ্রীমুখকান্তিতে সমগ্র হিমালয় অপূর্ব্ব আলোকে জ্যোতিষ্মান্ হইয়া উঠিয়াছে।

"ধ্যানাবস্থিততদ্গতেন মনসা পশ্যন্তি যং যোগিনো-
যস্যান্তং ন বিদুঃ সুরাসুরগণা দেবায় তস্মৈ নমঃ।"

ঐ জবাকুসুমসঙ্কাশ, কাশ্যপের দ্যুতি শিব-শঙ্করের সাংসারিক ও আধ্যাত্মিক জীবন মহান্ হইতেও মহত্তর, তাঁহার সমস্ত জীবন, সংসারের—জগতের কল্যাণের জন্য যাপিত হয়। এই ভোলা মহেশ্বর "আপন ভুলিয়া" আপন জীবন বিশ্বসংসারের মঙ্গলার্থে আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন; তিনি নিজের স্বার্থে, নিজের সুখ, নিজের স্বচ্ছন্দতার দিকে আদৌ দৃষ্টিপাতও করেন নাই। কুবের যাঁহার পদাশ্রিত, শমন যাঁহার সেবকানুসেবক, মাতা জগদম্বা যাঁহার পত্নী, সিদ্ধিদাতা গণেশ যাঁহার সন্তান, সকাম ও নিষ্কাম সাধনার যিনি পরাৎপর গুরু, সমগ্র জ্ঞানের যিনি বিজ্ঞান, সুখের যিনি আকর, গুণের যিনি সাগর এবং ভোগের যিনি ভোগ, তিনি পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করিয়া শার্দ্দূলচর্ম্মে এবং ছাই ভস্মে দেহ আচ্ছাদন করিয়াছেন; আহারের বা আরামের দিকে দৃষ্টি নাই; কেবল পরোপকার আর পরোপকার! কেবল জগতের হিতকামনায় আত্মবিস্মৃতি এবং আত্মোৎসর্গ!! এরূপ স্বার্থত্যাগের মহামহিমান্বিত দৃষ্টান্ত সম্মুখে বর্ত্তমান থাকিতে আমেরিকা বা ইউরোপের ইতিহাস অনুসন্ধান করিতে যাওয়া লজ্জার কথা ভিন্ন আর কি বলিব? দেবাদিদেব মহাদেব স্বয়ং বলিয়াছেন—

"পিবন্তি নদ্যঃ স্বয়মেব নাম্ভঃ
স্বয়ং ন খাদন্তি ফলানি বৃক্ষাঃ।

নাদস্তি শস্তং খলু বারিবাহাঃ
পরোপকারায় সতাং বিভূতয়ঃ ॥”

পার্ব্বতীয় প্রদেশের প্রত্যেক পাদপ ও ব্রততী, প্রত্যেক ফল ও ফুল, প্রত্যেক মূল ও গুল্ম অনুসন্ধান ও পরীক্ষা করিয়া জগদ্বাসীর কল্যাণার্থ ঔষধের ব্যবস্থা করিতেছেন, সংসারী মানবের শরীরকে নীরোগ ও পরমায়ুকে বর্দ্ধিত করিবার জন্য তরু লতা হইতে নব নব ঔষধ আবিষ্কার করিয়া প্রচার করিতেছেন। মহাদেবই ভৈষজ্য-বিদ্যার স্রষ্টা। উদ্ভিদ্‌বিদ্যায় ইনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; এমন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষক ও চিকিৎসক আর দ্বিতীয় নাই। আকর হইতে ধাতু উত্তোলন করিয়া পরীক্ষা দ্বারা দোষ গুণের বিচার করিতে দেবাদিদেব মহাদেব অদ্বিতীয়; শিব ভিন্ন চিকিৎসা নাই, শিব ভিন্ন বিজ্ঞান নাই, শিব ভিন্ন রসায়ন নীরস ও বিরস। সমরকুশলতায়, ধনুর্বিদ্যায়, স্থাপত্য-বিদ্যায় শিব-শঙ্কর তুলনারহিত। শ্মশানে মশানে মৃতদেহ পরীক্ষা করিয়া শারীর বিজ্ঞানের নব নব প্রয়োজনীয় তত্ত্বের আবিষ্কার করিতেছেন; দেহস্থ নাড়ী, শিরা, প্রশিরা প্রভৃতি পরীক্ষা দ্বারা জীবের শ্বাস প্রশ্বাসের গতি নির্ণয় করিয়াছেন; সুষুম্না পিঙ্গলা ইড়া প্রভৃতি মহাপ্রয়োজনীয় নাড়ীর পরীক্ষা দ্বারা যোগবিদ্যার সৃষ্টি করিয়াছেন এবং যোগাভ্যাস দ্বারা ইন্দ্রিয়সংযম, স্বাস্থ্যরক্ষা, পরমায়ুর বৃদ্ধি এবং ত্রিকালজ্ঞানের উপায় নির্ণয় করিয়া দিয়াছেন। আর আধ্যাত্ম বিদ্যায় শিবের তুল্য প্রবীণ ও প্রাজ্ঞতর আর কেহ আছে কি? ইহকাল ও পরকালের সমস্ত তত্ত্ব ইঁহার কণ্ঠে লিখিত। বল দেখি, শিব যাহাতে সম্পর্ক রাখেন না, এমন কোনও বিদ্যা বা জ্ঞান আছে কি? শিব শম্ভু কেবল আনন্দময় নহেন, ইনি পূর্ণ জ্ঞানানন্দ স্বরূপ, ইনিই পূর্ণব্রহ্ম স্বয়ং ভগবান্—সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্। আর্য্য দেবর্ষিগণ তাহা বুঝিয়াছিলেন, তাহাতেই ‘শিব’ শব্দের অর্থে বলিয়াছেন “অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽমরঃ শিবঃ”। মহর্ষিগণ এই জন্য এই “অতি বড় বৃদ্ধ পতি, সিদ্ধিতে নিপুণ” ইন্দ্রিয়াতীত নির্গুণ মহাদেবের স্তুতি করিতে গিয়া কাতর-কণ্ঠে প্রার্থনা করিয়াছেন—

“যদি মে ন দয়িষ্যসে
তদা দয়নীয়স্তব নাথ! দুর্লভঃ ॥”

শিবের এই মহান্ পরোপকারপ্রিয়তা আমাদের মহাশিক্ষার আদর্শ দৃষ্টান্ত।

মহতেরা জগতের কল্যাণার্থই মানবজন্ম ধারণ করেন এবং সংসারের মঙ্গলার্থই তাঁহারা জীবন যাপন করেন। কবি বলেন—

কত জল নদীগণ দেখ গর্ভে ধরে।
কিন্তু তার কিছুমাত্র পান নাহি করে॥
কত শত ফল দেয় দেখ তরুগণ।
কিন্তু তার একটিও না করে ভক্ষণ॥
আকাশ হইতে মেঘ ঢালে কত জল।
নিজে কিন্তু নাহি পায় কিছু তার ফল॥
তাই বলি এ সংসারে মহৎ যেই জন।
পর-উপকারে তাঁর সার্থক জীবন॥

কৈলাসপতি কপিশাঞ্জনের জলন্ত ও জীবন্ত আত্মোৎসর্গ মৃতদেহে নবজীবন সঞ্চার করে, সুষুপ্তকে জাগ্রত করে এবং ঔদাস্যপরায়ণ পতিত মানবকে উৎসাহ ও উদ্দীপনায় সতেজ করিতে সমর্থ হয়। এমন এক দিন ছিল, যে দিনে ভারতের ঘরে ঘরে আত্মোৎসর্গের শিব শোভা পাইতেন; পরের জন্য প্রাণ দিতে শিখিয়াছিল বলিয়া, সংসারের হিতকামনায় জীবন যাপন করিতে শিখিয়াছিল বলিয়া, সত্যের জন্য ধর্ম্মের জন্য স্বদেশের জন্য স্বজাতির জন্য সমগ্র বিশ্বসংসারের জন্য হাসিতে হাসিতে আত্মোৎসর্গ করিতে শিখিয়াছিল বলিয়া প্রাচীনা ভারতভূমি স্বর্গভূমি বলিয়া প্রখ্যাতি লাভ করিয়াছিল। মহর্ষি, দেবর্ষি, ব্রহ্মর্ষি, যতি, মুনি, উদাসী, ইঁহারা বনের ফল এবং ঝরণার জল মাত্র সম্বল লইয়া নগ্নপদে নগ্নশিরে সত্যের জন্য, ধর্ম্মের জন্য, দেশের জন্য, জাতির জন্য, সমগ্র মানবজাতির জন্য জীবন যাপন করিতেন। ভারত এখনও ভারত আছে, হিমালয় এখনও হিমালয় আছে, ভারতে এখন সর্ব্বত্রই শ্মশান ও মশান, কিন্তু দেবাদিদেব মহাদেব আর নাই; এখন আর শিব নাই, এখন আর শিবমনোমোহিনী মা জগদম্বা নাই। কৈলাসে আর কৈলাসপতি কপিশাঞ্জন নাই। আবার কি শিবচরিত্র, আবার কি ভবানীচরিত্র দেখিতে পাইব? আবার কি এমন আদর্শ-চরিত্রের আদর্শ-নরনারী ভারতভূমিতে জন্মগ্রহণ করিয়া হতভাগ্য হীনবীর্য্য হিন্দুজাতিকে পবিত্র ও মহিমান্বিত করিবেন? হায়! ভারতশ্মশানে সকলই আছে কিন্তু শ্মশানগুরু শিব কোথায়? পালেস্তাইনের দিকে লক্ষ্য করিয়া মহাত্মা যিশুখৃষ্ট অতীব দুঃখ সহকারে বলিয়াছিলেন, The harvest is truly plenteous but the labourers

are few, pray ye therefore to the Lord of the harvest that He will send forth labourers into His harvest. আমাদেরও অবস্থা ঠিক তাহাই, আমাদের আবার কার্য্যকরী শক্তির প্রয়োজন, আবার স্বার্থত্যাগী আত্মোৎসর্গী মহাপুরুষদিগের প্রয়োজন। কিন্তু আবার কি মহাপুরুষদিগের আবির্ভাব হইবে, আবার কি নিরাশার তামসে আশার আনন্দময় আলোক দেখিতে পাইব ?

মাতর্ভারতভূমি!
যাতাস্তে দিবসাস্তথা তান্ সাম্প্রতম্।
হা! হা! কস্য ন মানসং বদ মহাশোকাম্বুধৌ মজ্জতি॥

শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

ভারতের ব্রাহ্মণ।

ভারতের ব্রাহ্মণ বলিতে আমি বর্ত্তমান কালের ব্রহ্মণ্যতেজবিরহিত, কেবল শিখাসূত্রধারী, নামমাত্রাবশেষ ব্রাহ্মণের বিষয় বলিতেছি না; অনন্তজ্ঞানী, পরমতত্ত্বজ্ঞ, সংযমী, নির্ভীক ও উদারচেতা প্রাচীন ঋষিসম্প্রদায়ই আমার লক্ষ্যস্থানীয়। নিবিষ্টচিত্তে আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, প্রাচীন ভারতের ব্রাহ্মণ জাতির ন্যায় নিঃস্বার্থ পরোপকারী ও চিন্তাশীল জাতি ভূমণ্ডলের আর কুত্রাপি অভ্যুদিত হয় নাই। তাঁহারা ভারতীয় আর্য্য সমাজের শীর্ষস্থানীয় হইয়া, লোকশিক্ষার জন্যই সর্ব্বত্যাগী হইয়াছিলেন; ভিক্ষা তাঁহাদের উপজীবিকা, তৃণমাত্র শয্যা, পর্ব্বতগুহা অথবা তরুতল আশ্রয়স্থান এবং ফলাম্বু ও শাকান্ন তাঁহাদের ভোজন। ঈদৃশ মানব সম্প্রদায়ের প্রতি যাঁহারা স্বার্থপরতার ও নীচতার কলঙ্কারোপ করেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই একদেশ-দর্শী অথবা অন্ধ।

ফলতঃ প্রাচীন ভারতের ব্রাহ্মণের ন্যায় নিষ্কামধর্ম্মাবলম্বী মানব জগতে দুর্লভ। শূদ্রাদি ও অন্যান্য অন্ত্যজ জাতির প্রতি ঋষিপ্রচারিত ব্যবস্থা-শাস্ত্রের কতকগুলি বিধির উপর কেহ কেহ তীব্র কটাক্ষপাত করিয়া ব্রাহ্মণ জাতিকে একদেশদর্শী অথবা স্বার্থপর বলিতে কুণ্ঠিত হন না; প্রকৃত প্রস্তাবে শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা কথিত প্রকার স্বার্থপ্রণোদিত বলিয়া প্রতিপন্ন হইলে, ঋষিসম্প্রদায়

অবশ্য কলঙ্কভাগী; কারণ তাঁহাদের হস্তেই বিধি ব্যবস্থা প্রণয়নের ভার ন্যস্ত ছিল। অভিনিবেশ সহকারে বিচার করিলে, বিরুদ্ধবাদিগণের এতাদৃশ ধারণা ভ্রান্তিবিজৃম্ভিত বলিয়াই ধার্য্য হইবে। ব্রাহ্মণ অস্ত্রবলহীন, ভোগলালসা-শূন্য এবং ভিক্ষাজীবী হইয়াও, কোন্ মহাশক্তিপ্রভাবে আর্য্য সমাজের শীর্ষ-স্থানীয় হইয়াছিলেন এবং সিংহাসনারূঢ় বলদৃপ্ত বিপুল পরাক্রমশালী সম্রাট্, কেনই বা ব্রাহ্মণের নিদেশানুবর্ত্তী হইয়াছিলেন, কেনই বা তাঁহার ভাস্বর রত্নোজ্জ্বল কিরীট ব্রাহ্মণের চরণ চুম্বন করিত, তাহা ভাবিবার বিষয় বটে; কোন্ শক্তির অভাবেই বা বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় অধঃপতিত ও সকলের ঘৃণার্হ হইয়াছেন তাহাও বুঝিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। এ কথা অব্যভিচারী যে, বিশেষ কোনও ক্ষমতা না থাকিলে কেহ কখনও সমাজে উচ্চাসন লাভে অধিকারী হয় না। আমরা দেখিতে পাই যে, জ্ঞান-বল, ধন-বল ও পাশবিক বলই সমাজের উচ্চাবচ স্থান নির্দ্ধারণের নিয়ামক। কোনও সমাজে জ্ঞানবলের, কোথায়ও বা ধনবলের এবং অন্যত্র পাশবিক বলের প্রাধান্য স্বীকৃত হইয়াছে। অধুনা অধিকাংশ সভ্য সমাজেই ধন-বলের প্রাধান্য লক্ষিত হয়; কেবল প্রাচীন ভারতের আর্য্য সমাজই উভয়বিধ বলের উপর জ্ঞান-বলের প্রাধান্য স্বীকার করতঃ পরমজ্ঞানী ব্রাহ্মণ জাতিকে সমাজের উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত করিয়া-ছিলেন। এতদ্দ্বারা তাঁহারা যে সমাজ গঠিত করিয়াছিলেন তাহা অধঃপতিত হইয়াও, আজও অনেক সমাজ হইতে উৎকৃষ্ট, এ কথা বোধ হয় অনেকেই স্বীকার করিবেন। জ্ঞানালোকের অল্পতাই বোধ হয় ভারতীয় সমাজের বর্ত্তমান দুর্দ্দশার কারণ। যে সকল শাস্ত্রজ্ঞানহীন ব্রাহ্মণ কেবল বৃথা জাত্যভিমান করিয়া সকলের উচ্চাসনলাভাকাঙ্ক্ষা করেন, তিনি নিশ্চয়ই লাঞ্ছিত ও অপদস্থ হইবেন, কারণ ইহাই স্বাভাবিক, প্রকৃতিবিরুদ্ধ কার্য্য সংসারে চলিতে পারে না। যে গুণে আমি সমাজে বরণীয়, তাহা পদদলিত করিব, অথচ সাহঙ্কারে আস্ফালন করিয়া সকলের সম্মানার্হ হইতে স্পর্দ্ধা করিব, ইহা নিতান্তই অসম্ভব এবং আকাশকুসুমবৎ অলীক কল্পনা! যদি ব্রাহ্মণ পূর্ব্ববৎ সকলের মান্য হইতে ইচ্ছা করেন, তবে তাঁহাকে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতে হইবে, এক কথায় ব্রাহ্মণ হইয়া ব্রহ্মণ্য-গৌরবাকাঙ্ক্ষী হইতে হইবে; নতুবা বিড়ম্বিত হইতেই হইবে।

আমি পাঠ্যাবস্থায় কোন জ্ঞানবৃদ্ধ হিতৈষীর মুখে শুনিয়াছিলাম যে, ব্রাহ্মণ হওয়াও ভাল এবং পণ্ডিত হওয়াও ভাল, কিন্তু 'ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত' হওয়াটা বড় সুবিধাজনক নহে; এ কথার মূলে যে কতকটা সত্য নিহিত নাই, তাহা

বলিতে পারি না। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত বলিতেই আমাদের মনে যেন কিম্ভূত-কিমাকার একটী কল্পনা উদিত হয়। শাস্ত্রজ্ঞানহীন বর্ত্তমান দাম্ভিক ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণের অপব্যবহারই বোধ হয় আমাদের ঈদৃশ ধারণার মূল। এই ক্ষেত্রে যে কেবল ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতই দোষার্হ তাহা নহে, আমরাও কতকটা সেই দোষ-ভাগী। বর্ত্তমান কালে বঙ্গসমাজে জ্ঞানবলের উপর ধনবলেরই প্রসার বৃদ্ধি উপলক্ষিত হইতেছে এবং আমাদের ধনী সম্প্রদায়ের অধিকাংশই অসংযত এবং উচ্ছৃঙ্খল, সমাজও সুতরাং সেই পথাবলম্বী হইতেছে। ধনবান্ ব্যক্তির নিকট পণ্ডিতমণ্ডলী সমাদৃত হইতেছেন না, ইহার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম এই হইতেছে যে, পণ্ডিতমণ্ডলী এইক্ষণ জীবিকার জন্য বাধ্য হইয়া অন্য পথাবলম্বী হইতেছেন, সমাজও অধঃপতনের শেষ সীমায় অগ্রসর হইতেছে। এখন বৈদেশিক ভাব ও দ্রব্যাদির প্রতি অনেকেরই স্পৃহা বলবতী, বর্ত্তমানকালে একটু ইংরেজী ভাষায় অধিকার না থাকিলে মনুষ্যপদবাচ্য হওয়া দুরূহ, অতএব কেবলমাত্র সংস্কৃতসাহিত্যশাস্ত্রাধ্যায়ী পণ্ডিতগণ উপেক্ষিত হইতেছেন। অধুনা কায়স্থসভা, বৈদ্যসভা প্রভৃতি অনেক সভা সমিতি গঠিত হইয়াছে, কিন্তু পরিতাপের বিষয় ব্রাহ্মণ জাতির উন্নতি ও রক্ষা কল্পে কোনও চেষ্টাই হইতেছে না। ভারতের ব্রাহ্মণ কর্তৃকই সর্ব্ববিধ জ্ঞানের প্রাথমিক বীজ রোপিত হইয়াছিল এবং তাহা হইতেই এখন মহামহীরুহ উৎপন্ন হইয়া জগৎকে সুশীতল ছায়া ও অমৃতময় ফল দানে তৃপ্ত করিতেছে, কিন্তু তল্লাভে আমরা বঞ্চিত হইয়া ছায়ামাত্রাবলম্বী হইয়াছি, অমৃতফল উত্তালতরঙ্গমালা-বিক্ষোভিত অনন্ত সাগর এবং অভ্রভেদী তুঙ্গশৃঙ্গ মহীধর উল্লঙ্ঘিত হইয়া বিদেশে নীত হইয়াছে, আমরা এখন পরের দ্বারে ভিক্ষার্থী হইয়াছি। ঈদৃশ দশা-বিপর্য্যয় নিতান্ত শোচনীয়, অথবা ইহা সর্ব্বনিয়ন্তারই অভিপ্রেত, নতুবা এমন ঘটনা হইবে কেন?

সদাশয় ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট টোল-পরীক্ষার পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত করিয়া সংস্কৃত-চর্চ্চার পথ কতকটা প্রশস্ত করিয়া দিয়াছেন, কিন্তু ইহা "একা বিদ্যা সুশিক্ষিতা" হওয়ার পক্ষে যথেষ্ট নহে। অধুনাতন বিদ্যার্থীরা কেবলমাত্র পল্লবগ্রাহী হইয়া দাঁড়াইতেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী শিক্ষিত ব্যক্তিগণের যে দশা ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরও তাহাই হইবে। কি প্রণালীতে টোল-পরীক্ষা পরিচালিত হইলে প্রাচীন ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের ন্যায় জ্ঞানগম্ভীর এবং প্রশান্তচেতা পণ্ডিতমণ্ডলীর পুনরভ্যুদয় হয়, তাহা দেশহিতৈষী ব্যক্তি মাত্রেরই ভাবিয়া দেখা কর্ত্তব্য। আমার বোধ হয় এ বিষয়ে প্রাচীন ভারতের ক্ষত্রিয়ের আদর্শ যথাশক্তি অনুকরণীয়;

তাঁহারা যেমন ব্রাহ্মণমণ্ডলীর ভরণপোষণের ভার গ্রহণ করিয়া জ্ঞানালোচনার পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন, দেশীয় ধনী সম্প্রদায়েরও কথঞ্চিৎ পরিমাণে সেই পন্থা অবলম্বন করা বিধেয়; অন্যথা ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত অন্যপথচারী হইবে; ইহার গতি রোধ করা অসম্ভব।

পাশ্চাত্য বিদ্যায় সুশিক্ষিত ব্রাহ্মণ-সন্তানগণের নিকট সানুনয়ে অনুরোধ, তাঁহারা যেন হেলায় ব্রহ্মণ্যদেবকে পদাঘাতে বিদূরিত না করেন; যদি পাশ্চাত্য-বিজ্ঞান এবং ভারতবর্ষীয় জ্ঞানের কখনও সমন্বয় সম্ভবপর হয়, তবে সেই মহৎ কার্য্য তাঁহাদিগের দ্বারা হইবে, সে দিন ভারতের এক শুভ দিন বলিতে হইবে। ফলতঃ জ্ঞান বিজ্ঞানের শুভ সংযোগ একান্ত বাঞ্ছনীয়। সময় থাকিতে উদ্বোধিত হওয়া সর্ব্বথা প্রার্থনীয়, নতুবা অচিরে আমরা দুর্দ্দশার চরম সীমায় উপনীত হইব এবং পরিণামে কেবল অশ্রুজল ও হাহাকার সার হইবে। উপসংহারে বক্তব্য এই যে, কোনও সম্প্রদায় বিশেষের প্রতি কটাক্ষ অথবা স্বজাতিপক্ষপাতিতা আমার প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে, কেবলমাত্র প্রকৃত অবস্থা বিবৃত করাই এই প্রবন্ধের লক্ষ্য; উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে কি না তাহা সুধীগণ বিচার করিবেন।

শ্রীকুমুদচন্দ্র সিংহ শর্ম্মণঃ।

সে দেশ।

কোথায় যেতেছি চলে, কাহারে সুধাই?
কে বলিবে এ রহস্য কিবা?
কে যেন দিতেছে সাড়া, ছুটিয়াছি তাই
অবিরাম, নাহি রাত্র দিবা।
লাবণ্যে ভূষিত দেহ, সুখের ভবন,
আ'জ আছে কা'ল তাহা নাই।
আঁখি পালটিতে হায়! হয় নিমগন,
ভাবিলে অবাক্ হ'য়ে যাই।
কোথা পরকাল, কিবা, কে বুঝাবে মোরে?
জীবাত্মা বা কোথা চলি যায়?
মানবের শেষ "ছাই" এই মনে পড়ে,
আত্মা গিয়ে অনন্তে মিশায়।

কি যেন আভাস এক প্রাণের ভিতরে,
কি মধুর জ্যোতিঃ এক ভাসে!
এই দেখি এই নাই, যায় যেন সরে
প্রাণে আসি চপলতা পশে।
কে যায় বাহিয়া তরী অলক্ষিতে হায়!
কে বলিবে ধ্রুব বিবরণ।
যে দেশে চলিয়া যাই সে দেশে তাহায়
হেরিতে কি পাইব কখন?
মনে হয় আছে এক জ্যোতির্ম্ময় দেশ,
শত জ্যোতিঃ নিত্য সুবিকাশ!
সে দেশে অনন্ত জ্যোতিঃ বিকাশে দিনেশ
এ মরত সে করে প্রকাশ!
নিয়ত বসন্ত, ফুল ফুটে লতিকায়
নীলিমায় হাসে সুধাকর!
তরঙ্গের ঝিকিমিকি সোণা বহি যায়,
পাখী ঢালে সুধামাখা স্বর,
জ্ঞানের আলোক জেলে বিবেক নয়নে,
কর মন তাঁরে অন্বেষণ।
দেখিতে পাইবি তাঁরে হৃদয়-আসনে,
প্রেমময় অনন্ত মোহন।

শ্রীবিন্দুবাসিনী সরকার।

ল্যাপচা জাতির ইতিবৃত্ত।

পঞ্চ শত বৎসর কি তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্ব হইতেই ল্যাপচা জাতির ইতিহাস আছে। পঞ্চ শত বর্ষ পূর্ব্বে তার্ভি ল্যাপচাদিগের "পানো" বা রাজা ছিলেন। তার্ভির মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র সিংহাসনারূঢ় হইয়াছিলেন। শুনিতে পাওয়া যায় তার্ভি-পুত্র একবার ভ্রমণব্যপদেশে গণ্টক হইতে যুকসমে অশ্বারোহণে যাইতেছিলেন। যুকসমের অধিবাসিগণ দূর হইতে তাঁহাকে দেখিয়া

বলিয়াছিল 'অদ্ভুত পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া এবং একটী বৃহৎ জন্তুর উপর আরোহণ করিয়া ঐ যে আমাদিগের পানো আসিতেছেন।' তৎকাল পর্য্যন্ত তিব্বতীয়গণ কখন সিকিমে গিয়াছিল না। তখন তাহারা মনে করিত যে সিকিম দুরধিগম্য বনশ্রেণীসমাকুল পার্ব্বত্য ভূমি মাত্র—সেখানে যাইবার পথ নাই,—গেলেও বাসের স্থান নাই। ল্যাপচা জাতিই সিকিমের প্রাচীন অধিবাসী মধ্যে পরিগণিত। তাহারা সিকিমের নাম রাখিয়াছিল—"নেলিয়াং"; বর্ত্তমান যুগেও ল্যাপচাগণ সিকিমকে "ডিমং" বলিয়া অভিহিত করে।

যাহা হউক, তার্ভি রাজবংশের শেষ রাজার মৃত্যুর পর দুই জন ল্যাপচা সিকিমে রাজত্ব করিয়াছিলেন। সিকিমের শেষ "পানো" ১৬৮৬ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার রাজত্ব সময়ে সিকিমের প্রভূত উন্নতি হইয়াছিল। তিনি নিজেও অতিশয় সদাশয়, সৎ এবং প্রজারঞ্জক ছিলেন। তিনিই প্রজাপুঞ্জের মধ্যে লিখনপ্রণালীর প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন এবং বর্ণমালারও সৃষ্টি করিয়াছিলেন। সে সকল অক্ষরের সহিত আমাদের পরিচয় নাই।

একবার ফুনসোনামগ্যাল নামক একজন তিব্বতবাসী কৃষক জেলেপ গিরিসঙ্কটের নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহে কার্য্যান্তরে আসিয়াছিলেন। সে বোধ হয় ১৭১১ সালের কথা হইবে। সেই সময়েই তিনি সিকিমে প্রবেশ করিয়া প্রায় গণ্টক পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন; ইহার কিছু দিন পরই সিকিম তাঁহার করায়ত্ত হইয়াছিল। সিকিমের ইতিহাসে ইহা একটী স্মরণীয় ঘটনা; কারণ তখন হইতেই সিকিম ল্যাপচা জাতির হস্তবিচ্যুত হইয়া বিদেশী তিব্বতীয়দিগের হস্তে পতিত হইয়াছিল।

ফুনসো যদিও তিব্বতীয় ছিলেন, কিন্তু তিনি ও তাঁহার বংশধরগণ ল্যাপচা-রমণীদিগকে পত্নীত্বে বরণ করিয়াছিলেন। সেই জন্যই তিব্বতীয়দিগের মধ্যে ল্যাপচা রীতি নীতির চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়।

ক্রমে সিকিমে লামাদিগের প্রতিষ্ঠা হইতে লাগিল। তিব্বতীয় লামারাই সিকিমের প্রাচীন ও সরল ধর্ম্মের উপর বিষম আঘাত করিয়াছিলেন। সিকিম অধিবাসীদিগের মধ্যেও অনেকে ক্রমে ক্রমে লামাদিগের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। তিব্বতীয় লামাগণ সিকিমে উপস্থিত হইয়া ল্যাপচাদিগের সমুদয় পুস্তক ধ্বংশ করিয়া ফেলিয়াছিলেন এবং আপনাদিগের কতকগুলি পৌরাণিক কাহিনী ল্যাপচা ভাষায় অনুবাদ করিয়া তাহাদিগের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তাঁহারা বিজিত ল্যাপচাদিগকে কখনও স্নেহের চক্ষে

দেখেন নাই বরং প্রেতোপাসক বলিয়া তাহাদিগকে ঘৃণা করিতেন, উপেক্ষা করিতেন, এবং সময়ে সময়ে হয়ত যন্ত্রণা দিতেও ছাড়িতেন না। এই ঘৃণা ও উপেক্ষা, যন্ত্রণা ও অপমান ল্যাপচাদিগের সরল হৃদয়ে গরল সৃষ্টি করিতে লাগিল। তাহাদিগের ধর্ম্মের উপর, রীতি নীতির উপর ও সমাজের উপর যে নিষ্ঠুর আঘাত হইয়াছিল তাহারা আর শেষে উহা সহ্য করিতে পারিল না। সকল কার্য্যেরই একটী সীমা আছে; সেই সীমা অতিক্রম করিলেই মানুষ হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হয়—মরিয়া হইয়া পড়ে। শান্তপ্রকৃতি ল্যাপচা জাতিও সেই সীমা অতিক্রম করিতে বাধ্য হইয়াছিল। তাই ১৮২৫ সালে তাহারা বিদ্রোহীপতাকানিম্নে সমবেত হইয়াছিল। তখন সুকফুনাম-গ্যাল সিকিমের রাজা। তিনি মনে করিলেন বুঝি তাঁহার ল্যাপচা মন্ত্রী রাথুপ গুর্খাদিগের সহিত মিলিয়া তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবার ব্যবস্থা করিতেছে। এই সন্দেহে পড়িয়া সুকফু রাথুপের আত্মীয় স্বজনদিগের তপ্ত রক্তে হিমালয়ের কঠিন তুষারশীতল প্রস্তরগাত্রও উষ্ণ করিয়া-ছিলেন। শোকসন্তপ্ত ভীত রাথুপ উপায়ান্তর না দেখিয়া নেপালের পূর্ব্ব সীমায় ইলাম প্রদেশে পলায়ন করিয়া জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন। এখনও সেখানে রাথুপের বংশধরগণ দৃষ্ট হয়। যাহা হউক, সেই পুর্ব্বকথিত সুকফুর বংশই অদ্যাপি সিকিমের রাজা।

এখনও যেমন পূর্ব্বেও তেমনি ল্যাপচা জাতি কখনই এক স্থানে ঘর বাঁধিয়া সংসার পাতিয়া বাস করিতে জানিত না বা ভালবাসিত না। তাহারা এখনও পূর্ব্বের ন্যায় বংশনির্ম্মিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটীরে বা গিরিগহ্বরে বাস করে। হিমালয়ের বিশাল বক্ষে অনন্ত বনশ্রেণী। সেই সকল কাননদুর্গ দুর্ভেদ্য প্রাকৃতিক অস্ত্রশস্ত্রে সুরক্ষিত। ল্যাপচাদিগের গৃহস্থালী তদ্রূপ কানন মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায়। প্রায় ৬০০০ ফিট নিম্নে যে সকল অপেক্ষাকৃত উর্ব্বর ভূমি আছে তাহারা সেই সকল স্থানে খণ্ড খণ্ড জমী লইয়া ধান, গম প্রভৃতি শস্য বপন করে। ল্যাপচাজাতি বানরের মাংস বড় ভালবাসে এবং নিজেরাও তাহাদিগেরই মত কাননে কাননে ঘুরিয়া বেড়াইয়া নানাবিধ ফল ফুল সংগ্রহ করিয়া থাকে। ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিবার অভ্যাস ল্যাপচাদিগের কোন দিনই নাই। তাহারা কত যত্ন ও পরিশ্রম করিয়া যে সকল শস্য উৎপন্ন করে—দুই তিন মাস মধ্যেই সে সমস্ত ফুরাইয়া ফেলে; তার পর আহারের জন্য গাছের ফল, ঝরণার জল ও বনের বানরের তল্লাসে বাহির হয়।

ল্যাপচাদিগের আহারেও যেমন কোনরূপ পারিপাট্য দৃষ্ট হয় না, পোষাক পরিচ্ছদেও তাহাই। গরম পশমের একটী ঢিলা জামা হইলেই তাহাদিগের চলে। জামাগুলি কিছু লম্বা, প্রায় জানুদেশ পর্য্যন্ত ঝুলিয়া পড়ে। পশমগুলির উপর লম্বা লম্বা নীল দাগ দেখিতে পাওয়া যায়। সেই সকল জামা গায়ে দিয়া, কোমর বাঁধিয়া "বাণ" বা ছুরি হস্তে ল্যাপচারা স্বচ্ছন্দচিত্তে যেখানে সেখানে যাতায়াত করে। ছোরা রাখিয়া নিরস্ত্র থাকা ল্যাপচার ইতিহাসে লেখে না। যদিও তাহারা তীক্ষ্ণধার ছোরা লইয়াই সর্ব্বদা ভ্রমণ করিয়া থাকে, কিন্তু তাহাদিগের স্বভাব এতই শান্ত এবং তাহারা এতই নিরীহ যে কখনই কাহাকেও অস্ত্রাঘাত করে না। এমন কি নিজেদের মধ্যেও বিবাদ করিয়া রক্তপাত করে না। তাহাদিগের গৃহে অতিথিসৎকারের অভাব নাই। তাহারা পাত্রাপাত্র বিবেচনা করে না। হিমালয়ের সেই সকল সরল সবল সন্তান উন্মুক্তহৃদয়ে সকলেরই জন্য তাহাদিগের কুটীরদ্বার খুলিয়া রাখে।

আদিম ল্যাপচাগণ কোন ধর্ম্মই মানিত না—তাহাদিগেরও কোন ধর্ম্ম ছিল না। সৎ এবং অসৎ এই উভয়বিধ প্রেত ভিন্ন তাহাদিগের অন্য কোন দেব দেবীও ছিল না। কিন্তু সৎ প্রেত অর্থাৎ যাহারা অনিষ্টকারী নহে—তাহারা ল্যাপচাদিগের নিকট পূজা পাইত না। ল্যাপচারা বলিত, 'যাহারা সৎ তাহারা চিরদিনই আমাদিগের মঙ্গল করিবে। আমরা পূজা করি আর না করি তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। কিন্তু অনিষ্টকারী প্রেতদিগকে সন্তুষ্ট রাখিবার জন্য পূজা করা আবশ্যক। তাহারা প্রত্যেক বৃক্ষে, প্রতি পর্ব্বত-শৃঙ্গে, সকল গিরি-গহ্বরেই প্রতিনিয়ত বাস করে। সুতরাং প্রতিদিনই তাহাদিগের নিকট যাইতে হয়।' ল্যাপচাদিগের এইরূপ ধর্ম্মবিশ্বাসে সরলতার চিহ্ন সুস্পষ্ট। যাহারা প্রকৃতই অনিষ্টকারী নহে তাহাদিগকে পূজা করিতে হয় না। দুষ্টকে শিষ্ট রাখিতে হইলেই পূজার আবশ্যক হয় ইহা নিত্য প্রত্যক্ষীভূত বিষয়।

অধুনা ল্যাপচাদিগের সে ধর্ম্মভাব পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। এখন অনেকেই বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী। এখন প্রত্যেক ল্যাপচা জাতিরই একজন করিয়া পুরোহিত আছে। যিনি পুরোহিত তিনিই আবার চিকিৎসক। ল্যাপচারা মনে করে যে পূর্ব্বকথিত দুষ্ট প্রেতদিগের কোপেই যত প্রকার ব্যাধি হয়। তাই ল্যাপচা পুরোহিতগণ মন্ত্র ও অর্ঘ্যের সাহায্যে তাহাদিগকে সন্তুষ্ট রাখে এবং কোন প্রকার ব্যাধি হইলেও মন্ত্র প্রভৃতি দ্বারা তাহার শান্তি করিতে চেষ্টা করে।

ল্যাপচাদিগের বিবাহপদ্ধতিও সাধারণ নহে। অতিশয় বাল্যকালেই বর

ও কন্যা নির্দ্দিষ্ট হয় এবং বিবাহের প্রস্তাব হইয়া সমস্তই স্থির হইয়া থাকে। কখন কখন আবার কন্যা ক্রয় করিয়াও বিবাহ করিবার প্রথা দেখা যায়। অনেক সময় ইহাও দেখা গিয়াছে যে, ভাবী শ্বশুরের মনোরঞ্জন করিয়া তাহার কন্যাকে বিবাহ করিবার মানসে ল্যাপচা যুবকেরা কতই না পরিশ্রম করে। ল্যাপচাদিগের ভিতর আন্তর্জাতিক বিবাহের প্রথা দেখিতে পাওয়া যায়। জাতি-ভেদ সকল স্থানেই—তবে আকারের পরিবর্ত্তন আছে। যাহা হউক সেই আন্তর্জাতিক বিবাহের ফলে যে সকল সন্তান জন্মগ্রহণ করে তাহারা পিতার অনু-গামী হয়—মাতৃকুল তাহাদিগের জন্য নহে। বহু বিবাহ ল্যাপচাদিগের মধ্যে বড় সম্মানের বিষয়। যাহার অনেকগুলি পত্নী ও বহু সন্তান সে-ই ল্যাপচা-দিগের মধ্যে ধনী বা "ফুগু" বলিয়া পরিচিত। একই রমণীর সহিত বহুপুরুষের বিবাহ-প্রথা ল্যাপচাদিগের চক্ষেও ঘৃণিত বলিয়া গণ্য।

ল্যাপচা সমাজে প্রধানতঃ দুইটী বিভাগ দেখিতে পাওয়া যায়—(১) বার-ফুং-মো অর্থাৎ প্রধান বা কুলীন (Nobles) এবং (২) আ-ডেন অর্থাৎ সাধারণ (Commoners)। ল্যাপচাদিগের বিচারে তিব্বতীয়গণ বার-ফুং-মো এবং তাহারা নিজে আ-ডেন। পর্ব্বতের উচ্চ সানুদেশ সমূহে তিব্বতীয়দিগের বাস দেখিতে পাওয়া যায়। তাই ল্যাপচারা আ-ডেন হইয়া বার-ফুং-মোদিগের বাসস্থানের নিকটে আপনাদের ঘর বাড়ী বাঁধে না। প্রায়ই নদী বা জলের ধারে পর্ব্বতের নিম্নপ্রদেশে ল্যাপচাদিগের গৃহ দেখিতে পাওয়া যায়। কিরাতী অথবা লিম্বুজাতি ল্যাপচাদিগের এক স্তর নিম্নে। লিম্বুদিগের ক্রীতদাসদিগকে "থাওন" বলে। এখন অবশ্য ক্রয় বিক্রয়ের প্রথা বর্ত্তমান নাই; কিন্তু "থাওন" বংশ আছে। ল্যাপচাদের বিশ্বাস যে, পাপপুণ্যের তারতম্যানুসারে কখন বা এক জন ল্যাপচা নিম্নস্তরে নামিয়া পরজন্মে লিম্বু বা থাওন হইয়া জন্মগ্রহণ করে—কখন বা একজন থাওন অথবা লিম্বু পরজন্মে ল্যাপচা হয়।

ল্যাপচাদিগের স্বর্গ ও নরকের কল্পনা বড় কৌতুহলোদ্দীপক। তাহাদিগের বিশ্বাস যে জন্মের সময় তাহারা পাপশূন্য হইয়া জন্মায় এবং মৃত্যুর সময়েও তাহাদিগের পাপরাশি আর থাকে না—সমস্তই অন্তর্হিত হয়। কারণ পাপ শরীরগত,—আত্মার সহিত তাহার কোন সংস্রব নাই; সুতরাং নরক যন্ত্রণার ভয় তাহাদিগের নাই। রৌরবের ভয়ে বৃদ্ধ ল্যাপচার পক্ককেশ কম্পিত হয় না। তাহাদিগের বিশ্বাস যে, প্রভু ট্যাং ডিং লেয়ামের অনুজ্ঞায় তাহারা জননী ধরিত্রীর স্নেহক্রোড় পরিত্যাগ করিয়া এই আ-ডেনে আসিয়াছে। তাহার কতকগুলি

কার্য্য সম্পন্ন করাই তাহাদিগের আগমনের কারণ। দেবাভীপ্সিত সেই সকল কর্ত্তব্য ল্যাপচাদিগের নিকট অপরিজ্ঞাত। তিনি যে সমুদয় জানেন। যখনই যাহার কর্ত্তব্য ফুরাইয়া যায় তখনই সে পুনরায় ধরিত্রীর ক্রোড়ে ফিরিয়া যায়।

ল্যাপচাদিগের ধর্ম্মপুস্তকে আছে যে প্রত্যেক পুরুষের আত্মা ৮টী ও প্রত্যেক রমণীর আত্মা ৬টী। মৃত্যুর পর তাহাদিগেরই একটী আত্মা আকাশমার্গে উত্থিত হয়। অন্যান্য জাতি যে স্থানকে স্বর্গ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছে, সেই স্বর্গ কিরূপ, সিকিমের মত কি না ইহাই দেখিবার জন্য মানব "আপেলের" অর্থাৎ আত্মার আকাশে গমন। একটী ত গেল;—অবশিষ্ট কয়েকটী আর বিলম্ব না করিয়া জননী ধরণীর নিকট প্রত্যাবর্ত্তন করে।

স্বর্গধাম যে মহাশূন্যে আমাদিগের মস্তকের উপর কিরূপে নিরাশ্রয় অবস্থায় রহিয়াছে ইহা ল্যাপচাদিগের কল্পনা-বহির্ভূত। এ কথা স্মরণ করিয়া তাহারা আমাদিগকে বাতুল ভাবিয়া হাস্য করে। তাহারা মনে করে যে, তাহাদিগের বাসস্থান হইতে নিম্নে কোন উচ্চ প্রদেশেই স্বর্গ অবস্থিত। তাই যে সকল মৃত ব্যক্তিকে বাক্সের ভিতর আবদ্ধ করিয়া অর্থাৎ coffinএ বদ্ধ করিয়া মৃত্তিকা-নিম্নে চিরদিনের জন্য প্রোথিত করা হয়, তাহাদিগের কথা স্মরণ করিয়া ল্যাপচার সরল হৃদয়ে বড় কষ্ট হয়। কারণ তাহাদিগের স্বর্গগমনের সম্ভাবনা আদৌ নাই! তাহারা যে মৃত্যুর পরই বাক্সের ভিতর আবদ্ধ হইয়া থাকে—আবার বাহির হইবে কিরূপে?

প্রত্যেক জাতিরই অনেক উপকথা আছে। সেই সকল উপকথায় জাতি-বিশেষের বিশেষত্ব কিয়ৎপরিমাণে লক্ষিত হয়। ল্যাপচা জাতিরও অনেক উপ-কথা আছে। আমরা তাহার আলোচনা করিয়া পাঠকের সময় নষ্ট করিতে ইচ্ছা করি না।

শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য, বি. এ.।

শ্রীক্ষেত্রে জগন্নাথ।

শ্রীক্ষেত্র হিন্দুদিগের একটি প্রসিদ্ধ তীর্থ স্থান। ৺ জগন্নাথদেব এই তীর্থের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা। ৺ বলরাম ও সুভদ্রা জগন্নাথের অন্যতম দেব দেবী। জগন্নাথ বলরামের মধ্যবর্ত্তিনী সুভদ্রা দেবী, জগন্নাথ ও বলরামের ভগিনী বলিয়া জনসমাজে পরিচিত। কিন্তু উড়িষ্যাবাসীদের ধর্ম্মগ্রন্থ জগন্নাথ-মাহাত্ম্যে

সুভদ্রা দেবীর সম্বন্ধে বিরুদ্ধকর উক্তি থাকা দৃষ্টিগোচর হয়। উক্ত গ্রন্থের স্থল বিশেষের মর্ম্ম এইরূপ ঃ—

ত্রেতাযুগে নারায়ণ, রাম লক্ষ্মণ ভরত শত্রুঘ্ন এই চারি অংশে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। কলিযুগেও নারায়ণ সেই চারি অংশেই জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রা ও সুদর্শন নামে অবতীর্ণ হইয়াছেন। জগন্নাথ বলরামই রাম লক্ষ্মণ, সুভদ্রা, ভরত এবং সুদর্শন, শত্রুঘ্ন। কোন কোন পণ্ডিত বলেন দ্বাপর যুগের বসুদেবনন্দন কৃষ্ণ বলরামই কলিযুগে জগন্নাথ বলরাম; সুদর্শন অর্জ্জুন, এবং সুভদ্রা, কৃষ্ণপুত্র প্রদ্যুম্ন। শ্রীক্ষেত্রের সাধারণ লোকেরা কিন্তু বলরামকে বড় ঠাকুর, এবং জগন্নাথকে মহাপ্রভু বলিয়া থাকে।

জগন্নাথের বাম পার্শ্বে জগন্নাথের সুদর্শন রক্ষিত আছে। নারায়ণের হস্তে যেরূপ সুদর্শন চক্র থাকে, এ সুদর্শন সেরূপ নহে। দৈর্ঘ্যে প্রায় চারি হস্ত, প্রস্থে অনুর্দ্ধ অর্দ্ধ হস্ত পরিমিত বস্ত্রাবৃত একটি নিম কাষ্ঠখণ্ডকেই সুদর্শন কহে।

জগন্নাথের রথযাত্রার সময় জগন্নাথ, বলরাম ভিন্ন ভিন্ন রথারোহণে "গুণ্ডিচা-বাড়ী" অভিমুখে অগ্রসর হন। শ্রীমতী সুভদ্রাও ভিন্ন রথে আরোহণ করিয়া তাঁহাদের পশ্চাদনুসরণ করেন। "গুণ্ডিচা বাড়ীর" বিষয় পরে বক্তব্য। সেই সময় একমাত্র সুদর্শনই নিঃসহায়া সুভদ্রার পার্শ্বে দণ্ডায়মান থাকিয়া তাঁহার শরীররক্ষকের কার্য্য সম্পাদন করে।

জগন্নাথের পুরীর কারুকার্য্য যেমন বিচিত্র, ভোগপ্রণালী এবং পূজাদির বিধি বিধানও সেইরূপ অদ্ভুত ও বিস্ময়জনক। অতি প্রত্যুষে জগন্নাথের মঙ্গল আরতির শঙ্খ ঘণ্টা ধ্বনিত হইতে আরম্ভ হয়, আর লোকপ্রবাহ পুরী অভিমুখে প্রবাহিত হইতে থাকে। সে এক অদ্ভুত সমারোহ ব্যাপার। এই সময় পুরীর প্রশস্ত প্রাঙ্গণ প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায়, অসংখ্য জন সমাবেশে এক সুবিশাল মানব-সমুদ্র সৃজিত হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু সে সমুদ্রে তরঙ্গ ভঙ্গিমা নাই, গভীর গর্জ্জন নাই; আছে নিস্তব্ধতা ও শান্তির সুপ্রতিষ্ঠা। কার্ত্তিক, মাঘ ও বৈশাখ মাসে এই জনতা অত্যধিক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। আরতি সমাধা হইলে জগন্নাথের মুখ প্রক্ষালন ও স্নান ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। এই ক্রিয়ার নাম 'অবকাশ'। অবকাশের সময় জগন্নাথ বলরাম ও সুভদ্রার শরীরের বসন ভূষণ ও ফুলের মালা খুলিয়া লওয়া হয়। মুখ প্রক্ষালনের সময় দাঁতনকাঠি দ্বারা দাঁতন করাইবার ব্যবস্থা আছে। এ সমস্ত কার্য্যই উদ্দেশে সম্পন্ন হয়। তৎপর জগন্নাথের রত্নাসনের সম্মুখে জগন্নাথের বাসমন্দির "মণিকোঠা"র ভিতর তিন

খানি আসন পাতা হয়; তৎপার্শ্বের তিনটি পিতলের পাত্র রাখিয়া তাহার ভিতর তিনখানি দর্পণ স্থাপিত হয়। সেই পাত্রস্থিত দর্পণের ভিতর জগন্নাথ বলরাম ও সুভদ্রার মূর্ত্তি প্রতিফলিত হইলে, সেই মূর্ত্তিত্রয়কে পাণ্ডারা যথারীতি মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক দধি জল দ্বারা স্নান করায়। এই অবকাশের জল অর্শব্যাধি-বিনাশক বলিয়া শ্রীক্ষেত্রে খ্যাত।

অবকাশের পর জগন্নাথ পুনরায় বসন ভূষণ পরিধান করেন এবং শত পুষ্পমাল্যে সুসজ্জিত হইয়া ভক্তবৃন্দের মনোহরণ করেন।

অবকাশের পর হইতেই ভোগ আরম্ভ হইয়া থাকে। সমস্ত রাত্রি দিনে সাত বার ভোগ হয়। ভোগের নাম ঃ—(১) বল্লব ভোগ, (২) রাজ ভোগ, (৩) ছত্র ভোঁগ, (৪) মধ্যাহ্ন ভোগ, (৫) সন্ধ্যা ভোগ, (৬) বড় সিঙ্গাইর ভোগ; বড় সিঙ্গাইরের পর ডাব, সন্দেশ, মুড়কি, দৈ ও নারিকেলের সন্দেশ আহার হয়। তৎপর (৭) খিচুড়ী ভোগ হয়। এই সব ভোগের বিষয় বিস্তারিত লিখিতে গেলে প্রবন্ধ বাড়িয়া যায়, অতএব বাধ্য হইয়াই বিরত রহিলাম। এই সপ্ত ভোগ ব্যতীত কার্ত্তিক মাসে আর একটি বিশেষ ভোগ হইয়া থাকে, এই ভোগের নাম বালভোগ; এই বালভোগ সম্বন্ধে বেশ সুন্দর একটী কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে, তাহা বারান্তরে লিখিবার ইচ্ছা রহিল।

জগন্নাথের পুরীতে দিন লক্ষ লক্ষ টাকার ভোগ হয়। এই ভোগ রন্ধন করিবার জন্য এক শত দশ জন সুপকার নিয়োজিত আছে।

এই সব সুপকারেরা মিষ্ট খিচুড়ী এবং পোলাও (কাঁনিকা) ইত্যাদি অনেক জিনিস বেশ রন্ধন করিতে পারে। জগন্নাথের মন্দিরে নানাবিধ পিষ্টক তৈয়ার হয়। গোটা কয়েক পিষ্টকের নাম নিম্নে প্রদান করিলাম ঃ—

১ কান্তি, ২ সরপুলি, ৩ মাটপুলি, ৪ এন্ডরি, ৫ কাঁকড়া, ৬ চোড়া, ৭ মনোহর নাড়ু, ৮ আরিশা, ৯ নারী, ১০ তিপুরী, ১১ চড়াই নদা, ১২ মাণ্ডু, ১৩ মাল পুয়া, ১৪ ছানার তারিয়া, ১৫ বিরির তারিয়া (মাষকলাই), ১৬ রসাবলি, ১৭ খাজা, ১৮ মজক লাড়ু, ১৯ জগন্নাথ বল্লভ, ২০ খরচুর, ২১ খরচী লাড়ু, ২২ নিসকি-মতিচুর, ২৩ লক্ষ্মীবিলাস, ২৪ পুরী, ২৫ মোহনভোগ, ২৬ নারিকেল সন্দেশ, ২৭ সরচিত, ২৮ সোতপুরী, ২৯ বিন্নুয়া, ৩০ সরর ঢাল, ৩১ সরপদ, ৩২ সোয়ারি পিঠা, ৩৩ পাখাল ভাত বা ভিজে ভাত। এতদ্ব্যতীত জগন্নাথের মন্দিরে যে কত রকম পিষ্টক ও মিষ্টান্ন প্রস্তুত হয় তাহা নির্ণয় করা একরূপ অসাধ্য।

শ্রীঅম্বুজাসুন্দরী দাস গুপ্তা।

দিল্লীর আফগান শাসনের প্রকৃতি।

১২০৬ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ ঘোরী শত্রুহস্তে মানবলীলা সম্বরণ করিলে কুতুব উদ্দীন স্বনামে খোতবা ও শিক্কা প্রচলিত করিয়া স্বাধীন ভাবে রাজ্য শাসন করিতে প্রবৃত্ত হন। কুতুব উদ্দীন মহম্মদ ঘোরীর ক্রীতদাস ছিলেন, কিন্তু স্বীয় প্রতিভা-বলে ক্রমশঃ উন্নতিলাভ করিয়া অবশেষে ভারতবর্ষের প্রথম মোসলমান সম্রাট্ হন। কুতুবের উত্তরাধিকারিগণ মধ্যেও প্রথমে দুইজন ক্রীত-দাস ছিলেন। এজন্য এই বংশীয় সুলতানগণ দাসরাজ বলিয়া ইতিহাসে প্রসিদ্ধি-লাভ করিয়াছেন। দাস বংশের রাজত্ব বিলুপ্ত হইলে খিলিজী, তোগলক, সৈয়দ ও লোদী বংশীয় সুলতানগণ ক্রমান্বয়ে দিল্লীতে আধিপত্য স্থাপন করেন। এই সমস্ত বংশ সাধারণতঃ পাঠান অথবা আফগান নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

লোদী বংশের শেষ সম্রাটের নাম এব্রাহিম। ১৫২৬ খৃষ্টাব্দে এব্রাহিম লোদী যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ পরিত্যাগ করিলে ভারত সাম্রাজ্য আফগান বংশের হস্তচ্যুত হয় ও মোগলগণ দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করেন।

আফগানগণ বিংশাধিক তিন শত বৎসর হিন্দুস্থানে রাজত্ব করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা সাধারণতঃ এ দেশের হিতকল্পে শাসনকার্য্য পরিচালনা করেন নাই। আফগান সুলতানগণ কোন প্রদেশ অধিকার করিলে তথায় জনৈক সেনাপতি শাসনকর্ত্তৃপদে নিযুক্ত হইতেন। প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তৃবর্গের কার্য্যাবলী নিয়মিত করিবার জন্য কোন প্রণালীবদ্ধ ব্যবস্থা না থাকায় সেনাপতিগণ যদৃচ্ছাক্রমে শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। এজন্য তাঁহারা স্ব স্ব প্রধান ও আত্মপরায়ণ ছিলেন। রাজস্ব সংগ্রহ এবং যুদ্ধকালে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক সৈন্য প্রেরণ করিতে পারিলেই দিল্লীর সম্রাট্গণ তাঁহাদের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেন না। এই আত্মপরায়ণ শাসনকর্ত্তৃবর্গ হিন্দু প্রজার সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করিতেন, তাহা তাঁহাদের লক্ষ্যের বিষয় ছিল না।

আফগান শাসনপ্রণালী ভারতবাসীর মঙ্গলজনক ছিল না। ইহা বিজেতা ও বিজিতের মধ্যে সাম্য সংস্থাপন করিয়া হিন্দুদিগকে মোসলমান শাসনের পক্ষপাতী করিয়া তুলিতে পারিয়াছিল না। আফগান নরপতিগণ হিন্দুদিগকে সৈন্য ও রাজস্ব বিভাগের কার্য্যে নিযুক্ত করিতেন। বিশেষতঃ রাজস্ব সংক্রান্ত কার্য্যে হিন্দুর স্বাভাবিক পারদর্শিতা ছিল বলিয়া উক্ত বিভাগ তাহাদের দ্বারাই পরিপূর্ণ থাকিত। বাবর স্বরচিত জীবনবৃত্তান্তে লিখিয়াছেন যে, তিনি যে সময়

ভারতবর্ষে উপনীত হন, তখন মোসলমানাধীন অধিকাংশ রাজস্ব কর্ম্মচারী হিন্দু ছিলেন। আফগানিগণ যে হিন্দুদিগকে রাজকার্য্যে নিয়োগ করিতেন তাহার মূলে হিন্দু-প্রীতি বর্ত্তমান ছিল না, উহা কার্য্যোদ্ধারের উপায় স্বরূপ ছিল। আফগান নরপতিগণ হিন্দুধর্ম্মবিদ্বেষী ছিলেন। তাঁহারা দেবালয় ভগ্ন ও দেব-মূর্ত্তি বিকলাঙ্গ করিয়া গৌরবান্বিত হইতেন এবং তরবারির সাহায্যে হিন্দুর জাতি-পাত করিতেন। তাঁহারা হিন্দু প্রজার প্রীতি আকর্ষণ করিবার জন্য চেষ্টা করেন নাই। আফগানগণ যথেচ্ছাচারী শাসনকর্ত্তা ছিলেন। হিন্দু প্রজা মোসলমান অধিপতিগণের ক্ষমতা প্রতিরোধ করিতে পারিত না বলিয়াই তাঁহাদের আদেশ নীরবে প্রতিপালন করিত। (১)

কেহ কেহ ন্যায়দর্শী বিচক্ষণ শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তাঁহাদের যত্নে ও প্রভাবে শাসনকার্য্য শৃঙ্খলামুখীন হইত। বিচারকার্য্য পরিচালনার্থ কোন প্রকার নিয়ম বিধিবদ্ধ না থাকা সত্ত্বেও তাঁহারা অপক্ষপাতে ন্যায় বিচার করিতেন বলিয়া হিন্দু প্রজা শ্রদ্ধা সহকারে তাঁহাদের নাম স্মরণ করিত। কিন্তু ন্যায়নিষ্ঠ সুশাসকের সংখ্যা অত্যল্প ছিল; তদুপরি তাঁহারা বহিঃশত্রুর আক্রমণ ও অন্তর্বিপ্লব নিবারণ জন্য সর্ব্বদা বিব্রত থাকিতেন বলিয়া প্রজার হিতসাধন-কল্পে তাদৃশ মনোনিবেশ করিতে পারিতেন না। দাস বংশের আলতমাস এক জন ন্যায়দর্শী বিচক্ষণ নরপতি ছিলেন। তাঁহার পুত্র নাশির উদ্দীনও (২) প্রজা-

(১) দিল্লীর আফগান বংশীয় সুলতানগণ কি প্রণালীতে শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন তাহা প্রদর্শন জন্য আমরা সুবিখ্যাত পারসী কবি আমির খসরুর অসিকা, (Ashika) নামক কবিতা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি। The whole country, by means of the sword of our holy warriors has become like a forest denuded of its thorns by fire. The land has been saturated with the water of the sword and the vapours of infidelity have been dispersed. The strong men of Hind have been trodden under foot, and all are ready to pay tribute. Islam is triumphant, idolatry is subdued Had not the law granted exemption from death by the payment of poll-tax, the very name of Hind, root and branch would have been extinguished. *Amir Khasru's Ashika. Translated by Prof. John Dowson.*

(২) নাশির উদ্দীন এক জন সংসারানাসক্ত নরপতি ছিলেন। তিনি দরবেশের ন্যায় সামান্য ভাবে জীবন যাপন করিতেন। তিনি নিজের ব্যয় নির্ব্বাহার্থে পুস্তক নকল করিয়া বিক্রয় করিতেন। তাঁহার খাদ্য অতি সামান্য ছিল। তদীয় মহিষী উহা স্বহস্তে প্রস্তুত করিতেন; রাজ-মহিষীর সাহায্যার্থে দাস দাসীও ছিল না। একদা তাঁহার হস্ত অগ্নিতে দগ্ধ হইলে তিনি একজন দাসীর প্রার্থনা করেন। নাশির উদ্দীন তদুত্তরে বলেন যে প্রজার অর্থ তিনি স্বকীয় সুখের জন্য ব্যয়

হিতৈষী ন্যায়পরায়ণ শাসনকর্ত্তা ছিলেন। কিন্তু সন্ধি বিগ্রহেই তাঁহাদের শাসনকাল অতিবাহিত হইয়াছিল বলিয়া তাঁহারা শাসনকার্য্য প্রণালীবদ্ধ করিবার অবসর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন না। যাঁহারা শাসনপ্রণালী সংস্কার করিতে সংকল্প করিতেন অবসরাভাবে তাঁহাদের অভিলাষ কার্য্যে পরিণত হইত না এবং অধিকাংশ নরপতিই দুর্ব্বলচিত্ত ও কুক্রিয়ান্বিত ছিলেন, এজন্য রাজ্যের সর্ব্বত্র উচ্ছৃঙ্খলতা ও অত্যাচারমূলক শাসন বিস্তৃত ছিল।

দাসবংশীয় কায়কোবাদ এক জন কুক্রিয়ান্বিত ইন্দ্রিয়াসক্ত শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তাঁহার সময়ে রাজদরবারে বিলাস-স্রোত অপ্রতিহতভাবে প্রবাহিত হইয়াছিল; পারিষদবর্গ প্রায় উলঙ্গ ভাবে প্রকাশ্য স্থানে উপস্থিত হইতেন এবং বিচারক প্রভৃতি প্রধান প্রধান রাজপুরুষগণও সুরাপানে মত্ত হইয়া রাজপথে বিচরণ করিতেন।

কায়কোবাদের মৃত্যুর পর খিলিজী বংশীয় গিয়াস উদ্দীন দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করেন। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র আলা উদ্দীন একজন বিচক্ষণ শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তিনি প্রবল হিন্দুবিদ্বেষী ছিলেন, এজন্য তাঁহার রাজত্বকালে হিন্দু জাতির দুর্দ্দশার একশেষ হইয়াছিল।

আলা উদ্দীন হিন্দুবিদ্বেষ চরিতার্থ ও এসলাম ধর্ম্মের গৌরববর্দ্ধন জন্য চতুর্দ্দশ সহস্র অশ্বারোহী ও বিংশতি সহস্র পদাতিক সৈন্য কাম্বে রাজ্য দেবালয়পূর্ণ ছিল বলিয়া ধ্বংস করিতে প্রেরণ করেন। তৎকালে কাম্বে হিন্দুস্থানের অন্যান্য নগরাপেক্ষা অধিক জনাকীর্ণ ও সমৃদ্ধিশালী ছিল। কাম্বে প্রকৃতির রমণীয় স্থানে সংস্থিত এবং বিচিত্র প্রাসাদমালায় সুশোভিত ছিল। আলাউদ্দীনের প্রেরিত সৈন্যদলের অমানুষিক অত্যাচারে তাদৃশ শোভা ও সম্পদের আধার নগর জনশূন্য ও শ্রীহীন হইয়া পড়ে। বিজয়োন্মত্ত রাজসৈন্য নৃশংস হত্যাকাণ্ডের অনুষ্ঠান করতঃ রক্ত-স্রোতে সমস্ত নগর প্লাবিত করে; কিন্তু ইহাতেও তাহাদের হিন্দু-বিদ্বেষ পরিতৃপ্ত না হওয়ায় তাহারা নগর লুণ্ঠন পূর্ব্বক অপরিমিত ধনরত্ন হস্তগত ও বাল বৃদ্ধ নির্ব্বিশেষে নগরবাসীদিগকে বন্দী করে। কথিত আছে যে বিংশতি সহস্র

করিতে পারেন না। নাশির উদ্দীন একমাত্র রাজ্ঞীতে অনুরক্ত ছিলেন, তিনি দ্বিতীয় দার-পরিগ্রহ করেন নাই, তাঁহার কোন উপপত্নী ছিল না। নাশির উদ্দীন অত্যন্ত সাহিত্যানুরাগী ছিলেন। তাঁহার ধনভাণ্ডার সাহিত্যসেবিগণের সাহায্যার্থ সর্ব্বদা উন্মুক্ত থাকিত। তদীয় রাজসভা বিদ্বজ্জনপূর্ণ ছিল। তাঁহার উৎসাহেই তাবক্ত নাশেরী নামক উৎকৃষ্ট ইতিহাস গ্রন্থ রচিত হয়। নাশির উদ্দীন নিজেও পারসী রচনায় পারদর্শী ছিলেন।

রূপলাবণ্যবতী অনূঢ়া বালিকা কামলোলুপ শত্রুহস্তে বন্দী হইয়া সতীত্ব-ধনে জলাঞ্জলি দেয়। কাম্বে নগর দেবমূর্ত্তিতে পূর্ণ ছিল, তন্মধ্যে সোমনাথ নামধেয় শিবমূর্ত্তি সর্ব্বলোকপূজ্য ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া সম্মানিত হইত। মোসলমান সৈন্য অন্যান্য দেবালয় ও দেবমূর্ত্তি মর্দ্দিত করিয়া সর্ব্বজনারাধ্য সোমনাথ মূর্ত্তির প্রতি হস্ত প্রসারণ করিলে হতাবশিষ্ট হিন্দুগণ একান্ত ব্যথিতচিত্তে অসংখ্য রত্ন বিনিময়ে উহা ক্রয় করিবার প্রস্তাব করে; কিন্তু ধর্ম্মান্ধ মোসলমান সৈন্য তাদৃশ প্রস্তাব অবজ্ঞাভরে প্রত্যাখ্যান পূর্ব্বক সোমনাথ-মূর্ত্তি চূর্ণ করিয়া জুম্মা মসজিদের সোপানাবলী শোভিত করিবার জন্য দিল্লীতে লইয়া যায়। আলাউদ্দীনের হিন্দুবিদ্বেষানলে আরও নানাস্থান এইরূপে পর্য্যুদস্ত হইয়াছিল।

আলাউদ্দীনের অত্যাচারে হিন্দু প্রজার দুর্দ্দশা এত দূর বর্দ্ধিত হইয়াছিল যে, তাহারা অশ্বে আরোহণ, অস্ত্রধারণ, উৎকৃষ্ট বস্ত্র পরিধান অথবা অন্য কোনও প্রকার বিলাস-দ্রব্য ব্যবহার করিতে পারিত না। তাঁহার উৎপীড়নে কৃষককুল নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের অতিরিক্ত ভূমি, ভৃত্য ও গোমেষাদি রাখিতে পারিত না। হিন্দু মোসলমান কাহারও ধনসম্পত্তি নিরাপদ ছিল না। (১)

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য।)

শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত।

---

(১) আমরা এখানে আলাউদ্দীন সম্বন্ধে একটী কৌতুকাবহ ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। একদা আলাউদ্দীন জনৈক কাজিকে জিজ্ঞাসা করেন যে, হিন্দু প্রজার নিকট হইতে করসংগ্রহ বিষয়ে শাস্ত্রে কি প্রকার বিধান আছে। তাঁহার উৎপীড়নে হিন্দু প্রজার যে দুর্দ্দশার একশেষ হইয়াছিল তাহা কাজি সাহেব অবগত ছিলেন না। এজন্য তিনি উত্তর করেন যে, হিন্দুদিগকে করদাতা বলে। রাজস্ব কর্ম্মচারী রৌপ্যমুদ্রা চাহিলে তাহাদের স্বর্ণমুদ্রা দেওয়া কর্ত্তব্য। যদি রাজকর্ম্মচারিগণ তাহাদের মুখে আবর্জ্জনা নিক্ষেপ করেন তবে উহা গ্রহণ করিবার জন্য তাহাদের বদন ব্যাদান করা কর্ত্তব্য। এই প্রকার ব্যবহার করিলেই রাজকর্ম্মচারিগণের প্রতি সমুচিত সম্মান প্রদর্শন করা হয়। ঈশ্বরের নিকট তাহারা ঘৃণ্য, তাহাদিগকে অধীনতা-পাশে আবদ্ধ করাই তাঁহার আদেশ। হিন্দুকে পদানত রাখা ধর্ম্মানুমোদিত কর্ত্তব্য কার্য্য। পয়গম্বর আদেশ করিয়াছেন যে, তাহাদিগকে এসলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত কর অথবা তাহাদিগকে হত্যা কি দাসত্বশৃঙ্খলে আবদ্ধ ও ধনসম্পত্তি বিচ্যুত কর। সুলতান আলাউদ্দীন কাজি সাহেবের শাস্ত্র ব্যাখ্যা শুনিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়াছিলেন, কোন উত্তর দেন নাই।

বৈজ্ঞানিকের কুটীর।

১। শিরস্ত্রাণ ও বাসস্থান।

আমাদের দেশে নিষ্কর্ম্মা দরজীর কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে একটা কুৎসিত অপবাদ রাষ্ট্র আছে। ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশেও বলে যে, "নিষ্কর্ম্মা হস্তের জন্য সয়তান কার্য্য সংগ্রহ করিয়া আনে।"

এই জন্যই কি জগতে আজকাল এত নূতন নূতন মত বাহির হইতেছে? কোন মানুষের মুখের আকৃতি দেখিয়া তাহার প্রকৃতি জানিতে পারা যায়*; মানিলাম ইহা কতকটা সত্য। কিন্তু তাই বলিয়া কর লেখার সহিত যে মানুষের ভূত ভবিষ্য বর্ত্তমান অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ আছে, তাহাও কি মানিতে হইবে? আবার কেহ কেহ মুখে-কলমে বলে যে কাহারও হাতের লেখা দেখিয়া তাহার প্রকৃতি নির্ণয় করা যাইতে পারে; অর্থাৎ মানুষের হস্তাক্ষর তাহার স্বভাবের উপরেই নির্ভর করে, কিন্তু শৈশবকালীন সেই পাঠশালার গুরু মহাশয়ের লিপি-ভঙ্গীর উপরে না কি নির্ভর করে না।

কয়েক বৎসর হইল আর একটা কথা শুনা গিয়াছিল যে, কাহার চর্ম্মপাদুকার কোন্ অংশ অগ্রে এবং কোন্ অংশ পশ্চাৎ ক্ষয় পায়, তাহা দেখিয়া সেই পাদুকাধারীর প্রকৃতি অনুমান করা যাইতে পারে। †

মানিলাম জগতে কিছুই অসম্ভব নহে, মানিলাম ঐ গগনবিহারী সুদূরবর্ত্তী চন্দ্র সূর্য্যের সহিত আমার ঐ গোদা দাদার অঙ্গবিশেষের সম্বন্ধ আছে, (তাহা অন্যে অস্বীকার করিলে কি হয়? গোদা দাদা নিজে অমাবস্যা ও পূর্ণিমা তিথিতে ভাল রকমই টের পান), মানিলাম হ্যাম্‌লেট্ নামক ঐ পাগ্‌লা বখাটে ছোঁড়াটা ঐ যে বলিয়া গিয়াছে যে "এই স্বর্গ মর্ত্ত্যে এমন অনেক পদার্থ আছে যাহা বিজ্ঞানশাস্ত্রের চতুঃসীমার মধ্যে নাই"; এ কথাটা নিতান্ত মিথ্যা নহে; কিন্তু তাই বলিয়া Inductive Logic এর অপমান করিয়া, দুটা চারটা দৃষ্টান্তের উপরে নির্ভর করিয়া যে যাহা সিদ্ধান্ত করিয়া বসিবে, তাহাই সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে, এমন কোন কথা নাই। যত দিন না উহা রাশি রাশি দৃষ্টান্ত দ্বারা দৃঢ়ীভূত হয়, তত দিন উহাকে 'বিজ্ঞান' না বলিয়া 'অপ-বিজ্ঞান' বলিব।

---

* বঙ্কিম বাবু যে এত বড় ছিলেন, সে নাকি তাঁহার নাকের জোরে। ("বালক"।)

† এই শাস্ত্রের নাম দেওয়া হইয়াছিল—Sho ology.

মনে আছে ছেলেবেলা বটতলার প্রকাশিত "হনুমান্‌-চরিত্র" নামক একটী পুস্তক লইয়া সমবয়সীদের সঙ্গে কতই না সময় অতিবাহন করিয়াছি। উহার পরিশিষ্টে "কাক-চরিত্র" নামক অধ্যায়ে লিখিত আছে যে, কাক যদি বাড়ীর পূর্ব্বদিকে প্রাতে 'কাওয়া' 'কাওয়া' শব্দ করে, তবে সেই বাড়ীতে শীঘ্রই কোন অমঙ্গল ঘটিবে, ···ইত্যাদি ইত্যাদি। যাঁহারা এই সকল সূত্রের সত্যতায় বিশ্বাস করিতে পারেন, তাঁহারা বাড়ীতে নারিকেল বৃক্ষ রোপণ করার বিরুদ্ধে আমার ঠাকুরমার প্রদর্শিত যুক্তিটীও যেন বিশ্বাস করেন। ঠাকুরমা বলেন যে, যে বছর আমাদের বাড়ীতে প্রথম নারিকেল বৃক্ষ রোপণ করা হয়, সেই বছরই আমার ঠাকুরদাদার 'কাল' হয়। যদি ঐ গাছটী রোপণ না করা হইত, তবে নিশ্চয়ই এত অল্প বয়সে (মাত্র পঁচাশি বৎসর) তাঁহার মৃত্যু হইত না। আহা! ঠাকুরমার হাতের লোহা সীঁথার সিন্দুর বজায় রহিয়া এত দিন তিনি কত সুখেই কাল কাটাইতে পারিতেন! [টীকা—ঠাকুরমার চৌদ্দটী সন্তানের মধ্যে এখনো নয়টী বর্ত্তমান।]

যাহা হউক, অদ্য একটী অভিনব মত (theory) পাঠকের সমক্ষে উপস্থিত করিতেছি। লেখক* বলেন যে, জগতের অধিকাংশ জাতির শিরস্ত্রাণ তাহাদের বাসগৃহের অনুকরণে নির্ম্মিত। কথাটা সম্পূর্ণ নূতন। নিজের কথা সপ্রমাণ করিবার জন্য তিনি যে সকল উদাহরণ উপহার দিয়াছেন, তাহা অনেককে কাকতালীয় ন্যায়ের কথা স্মরণ করাইয়া দিবে। তাঁহারা বলিবেন যে, নিজের মনের মত কয়েকটী সাক্ষীকে তিনি আদালতে উপস্থিত করিয়া মোকদ্দমায় ডিক্রী পাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু যে সকল সাক্ষী তাহার বিরুদ্ধে যাইতে পারে, তাহাদিগকে আদৌ শমনই দেন নাই। চীন জাতির টুপী তাহাদের প্যাগোডারই অনুরূপ; কিন্তু বর্ত্তমান ইংরেজ জাতির টুপী দেখিতে ধুচুনীর মত, তাই বলিয়া কি তাহাদের বাসগৃহও ধুচুনীর মত?

লেখক আত্মমত সমর্থনার্থ ক্লেশ স্বীকার করিয়া যে সকল দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা চৈত্রসংক্রান্তির শক্তুর ন্যায় এক ফুৎকারে উড়াইয়া না দিয়া নির্জ্জনে লইয়া ভাবা উচিত। হইতে পারে, মানুষ রৌদ্রবৃষ্টির উৎপাত হইতে স্বীয় সমগ্র দেহটী রক্ষার্থ যে গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছিল, কাল সহকারে সভ্যতা-মন্দিরের কয়েক ধাপ উপরে উঠিয়া যখন সে একটী মস্তকাবরণের অভাব অনুভব করিল, তখন সম্মুখে 'হোয়াইট্ এওয়ে লেইড্ল' কোম্পানির সচিত্র কেটে-

* Mr. Allan Poe Newcomb, in the *Honolulu Commercial Advertiser.*

লগ্ বা অন্য কোন আদর্শ না পাইয়া, সর্ব্বাপেক্ষা সম্মুখে অর্থাৎ মাথার উপরে যে প্যাটার্ণ দেখিতে পাইল, তাহারই পকেট সংস্করণ নির্ম্মাণ করিয়া মাথায় দিতে লাগিল।

লেখক বলেন, পৃথিবীর প্রত্যেক জাতিরই বাসগৃহ ও শিরস্ত্রাণের মধ্যে ন্যূনাধিক পরিমাণে সাদৃশ্য আছে। কিন্তু কেন এ সাদৃশ্য রহিয়াছে, তাহা তিনি জানেন না।

কোন কোন জাতির মস্তকাবরণ তাহাদের সমগ্র বাসগৃহের অনুরূপ; যেমন মিশর, লাপলাণ্ড ও হাউই দ্বীপনিবাসীদিগের বেলা আবার কোন কোন জাতির বেলা উহা সমগ্র বাসগৃহের অনুরূপ না হইয়া কেবল গৃহের শীর্ষদেশের অনুরূপ; যেমন গ্রীক্, রোমক, রুশ ও তুরুস্কদেশবাসীর।

হাউই দ্বীপের অধিবাসীরা পূর্ব্বে তৃণনির্ম্মিত গৃহে বাস করিত; তাহাদের তদানীন্তন মস্তকচ্ছদ ঠিক্ গৃহের আকারবিশিষ্ট ও তৃণনির্ম্মিত ছিল। মিশর দেশের দেবমন্দিরের গঠন ও টুপীর গঠন প্রায় একরূপ; অর্থাৎ ঐ টুপীর উপরিভাগ সমতল ও চতুষ্পার্শ্ব ঈষৎ নত।

প্রাচীন গ্রীক্ জাতির যে সকল প্রতিমূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে, তাহাদের শিরস্ত্রাণ ঐ জাতির ত্রিভুজাকৃতি ছাদবিশিষ্ট গৃহেরই অনুরূপ। প্রাচীন রোমক জাতির আবাসগৃহের গম্বুজের সহিত তাঁহাদের মস্তকাবরণের সৌসাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। তুর্ক (তুরুস্ক) জাতির ধর্ম্মমন্দিরের (মস্‌জীদের) গম্বুজ ও তাহাদের টুপী প্রায় একরূপ। যে সকল য়ুরোপীয় ক্রুসেড্ নামক প্রসিদ্ধ ধর্ম্মযুদ্ধে মাতোয়ারা হইয়া আহার নিদ্রা ভুলিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহারা প্যালেষ্টাইনে বাস করিবার কালে যে প্রকার বস্ত্র-মণ্ডপ (তাঁবু) ব্যবহার করিতেন, তাঁহাদের তাৎকালিক শিরশ্ছদও প্রায় সেই প্রকার ছিল, তবে বেশীর ভাগ—তাহার উপরে একটী করিয়া ত্রিশূল অর্থাৎ ক্রস্ থাকিত। মধ্যযুগে য়ুরোপে সম্ভ্রান্তা মহিলারা মস্তকে মোচকবৎ এক প্রকার দীর্ঘাকৃতি সূক্ষ্মাগ্র টুপী ব্যবহার করিত, সেই সময়ের গির্জার চূড়াও সেইরূপ ছিল। ফ্রান্সে যখন সাধারণতন্ত্রের বীজ রোপিত হয় নাই, সেই পুরাতন কালে ঐ দেশের রাজারা প্রকাণ্ডকায় পরচুলা দ্বারা মস্তকের স্বাভাবিক কেশ-দৈন্য লুক্কায়িত রাখিতেন। ঐ দেশের ঐ সময়ের স্থাপত্য-সৌন্দর্য্যও কতকটা সেইরূপ কৃত্রিমতাদুষ্ট ছিল। আমাদের দেশের দুর্গা-প্রতিমার পুরোভাগ রং ও রাং সংযোগে কেমন সুন্দর, কিন্তু উহার পশ্চাদ্ভাগে দৃষ্টিপাত করিলে কেবল—গোবর, দড়ি, খড়, বাঁশ আর

মাটি। ঐ স্থাপত্য-সৌষ্ঠবও ঠিক্ এইরূপ অন্তঃসার-বিহীন ছিল। তাহার কারুকার্য্য দেখিতে ঠিক্ ঐ কুণ্ডলিত পরচুলার মত ছিল। স্পেন দেশীয় রমণীদের টুপীর প্রান্তদেশ 'করগেটেড্ টিন্'এর ন্যায় তরঙ্গায়িত। তাঁহাদের বাসগৃহ ও ধর্ম্মমন্দিরের ছাদও একপ্রকার ঢেউ-তোলা টালির দ্বারা নির্ম্মিত। উত্তর আমেরিকার আদিম অধিবাসীরা, বর্ত্তমান সময়ের মগ প্রভৃতি অসভ্য জাতির ন্যায়, পাখীর পালক দ্বারা আপনাদের টুপীর শোভাবর্দ্ধন করিত; তাহাদের আবাস-গৃহও ঐরূপ পত্র-পল্লব-পালক-শোভিত ছিল। প্রসিদ্ধ ধর্ম্মব্রত প্যুরিটান্দিগের শিরস্ত্রাণ ও তাঁহাদের নব-ইংলণ্ডস্থ উপাসনা-মন্দিরের চূড়া উভয়েই মোচকাগ্রের আকারবিশিষ্ট ছিল। ৬০।৭০ বৎসর পূর্ব্বে ইংলণ্ডের সীমান্ত প্রদেশের গৃহাদি একটু অশোভন সাদাসিদে রকমের, কিন্তু বেশ শক্ত ছিল; সেই সময়ের প্রাচীনারা যে টুপী ব্যবহার করিতেন, তাহাও একটু সাদাসিদে ধরণের ছিল; কিন্তু উহা যেমন শক্ত ছিল, তেমন সূর্য্য-তাপ নিবারণে সমর্থ ছিল। পূর্ব্বোল্লিখিত লাপলাণ্ড দেশের অধিবাসীরা কঠোর শীতের তাড়নায় পশুচর্ম্মনির্ম্মিত নলাকৃতি এক প্রকার টুপী ব্যবহার করিত। বর্ত্তমান সময়ে সৌখীন য়ুরোপীয় মহিলারা রোমাচ্ছাদিত এক প্রকার মৃগচর্ম্ম দ্বারা চুঙ্গার মত তৈয়ার করাইয়া তন্মধ্যে দুইটী হাত প্রবিষ্ট করিয়া রাখেন। ঐ টুপী অনেকটা এই হস্তাবরণের মত। লাপলাণ্ড দেশের বাস-গৃহও দেখিতে তদ্রূপ, অর্থাৎ আমাদের দেশের ধানের গোলার মত। ঐ গৃহের নিম্নদেশে একটী গোলাকার অনতিক্ষুদ্র ছিদ্র আছে; তাহা দ্বারা লোকে গৃহে গমনাগমন করিয়া থাকে।

২। প্রাকৃতিক দিগদর্শন যন্ত্র।

বনের মধ্যে বা পর্ব্বতে দিগ্‌ভ্রম হইয়া যদি কেহ পথহারা হয়, তবে নিম্ন-লিখিত লক্ষণগুলির সাহায্যে সে দিঙ্‌নির্ণয়ে সমর্থ হইতে পারে।

অন্যান্য বৃক্ষ সকল হইতে যে বৃক্ষটী একটু দূরে ও একান্তে অবস্থিত, এমন একটী পরিণতবয়স্ক বৃক্ষকে পর্য্যবেক্ষণ করিতে হইবে। ইহার দক্ষিণদিকের বল্কল অপেক্ষাকৃত কঠিন ও শুষ্ক দৃষ্ট হইবে; আর দেখা যাইবে যে, সেই বল্কলের বর্ণ অপেক্ষাকৃত পাতলা রকমের, অর্থাৎ গাঢ় নহে। উত্তর দিকের বল্কলের বর্ণ গাঢ় হইবে, এবং অনেক সময়ে উত্তর দিকের বৃক্ষমূলে শৈবাল দেখা যাইবে। (এই শৈবালকে সাধারণ লোকে গাছের দাদ্ অর্থাৎ দদ্রুরোগ

বলিয়া থাকে।) বৃক্ষটী যদি নির্য্যাস-স্রাবী হয়, অর্থাৎ যদি উহার দেহ হইতে গঁদ নিঃসৃত হয়, তবে উহার দক্ষিণ দিকের গঁদ কঠিন ও উত্তর দিকের গঁদ কোমল হইবে। শীত-সমাগমে যখন বৃক্ষ তাহার পর্ণভূষণ পরিত্যাগ করিয়া বৈধব্য বেশ ধারণ করে, তখন বন্ধুর-গাত্র প্রবীণ বৃক্ষের দক্ষিণ দিকেই কীটে বাসা নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। ঐ দিকে বড় বড় শাখা ও কর্কশ বল্কল দৃষ্ট হইবে। অশ্বত্থ, বট, ওক্ (বিলাতী) প্রভৃতি স্থূলসার বৃক্ষের গাত্রে উত্তর দিকে শৈবাল পাওয়া যাইবে। দক্ষিণ দিকের পাতা অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র, কিন্তু শক্ত হইবে, ঐ পত্রের পর্শুকা (শিরা-রেখা) কিছু অস্পষ্ট হইবে; পক্ষান্তরে, উত্তর দিকের পাতা কিছু বড় ও আনম্য হইবে, তাহার শিরাগুলি বেশী স্পষ্ট হইবে। উর্ণনাভ সাধারণতঃ দক্ষিণ দিকে বাণ্ডরা বিস্তার করিয়া বসিয়া থাকে।

বৃক্ষের কাণ্ড ভূপৃষ্ঠের সমান্তরাল ভাবে কর্ত্তন করিলে, উহাতে যে সকল ঐককেন্দ্রিক বৃত্ত বা অঙ্গুরীয় দৃষ্ট হইবে, দক্ষিণ দিকে তাহাদের পরিধিরেখা স্থূল দৃষ্ট হইবে; সুতরাং উহাদের কেন্দ্র ঠিক মধ্যস্থলে না হইয়া একটু উত্তর দিক ঘেঁষিয়া হইবে।

পর্ব্বতের প্রস্তরের দক্ষিণ দিক্ প্রায়শঃ উদ্ভিজ্জ-বর্জ্জিত হইবে; শৈবাল থাকিলে সাধারণতঃ উত্তর দিকে থাকিবে। দক্ষিণ দিকে শৈবাল থাকিলেও তাহা অর্দ্ধশুষ্ক দৃষ্ট হইবে। পর্ব্বতের উত্তর দিকের দেহে ঢেকি শাঁক জাতীয় উদ্ভিদ ও শৈবালাদি পাওয়া যাইবে।

অধিকাংশ বন্য পুষ্পের মুখ দক্ষিণ দিকে আনত দৃষ্ট হইবে।

বলা বাহুল্য এ সমস্তই সূর্য্যদেবের কারখানা; আর নিরক্ষ বৃত্তের উত্তর দিকের, বিশেষতঃ কর্কটক্রান্তিবৃত্তের উত্তর দিকের, প্রদেশের প্রতিই ঐ কথাগুলি খাটে। সুতরাং আমাদের দেশেও ঐ লক্ষণগুলি প্রযুজ্য।

শ্রীশ্রীনিবাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

মাসিক সাহিত্য।

ভারতী, আষাঢ় ১৩০৯। অধিকাংশ প্রবন্ধই সুখপাঠ্য। তন্মধ্যে "পুরীর আদালত" এবং "প্রাচ্য ও প্রতীচী" বিশেষ উল্লেখযোগ্য। "বাঙ্গালীর বিদেশিনীবিবাহ" একটি জটিল সমাজ-সমস্যা। ইহার লেখক উদারপ্রকৃতির লোক এবং সামাজিক বিষয়ে কখনও একদেশদর্শী নহেন; তাঁহার কথাগুলি সকলেরই মনোযোগের সহিত চিন্তা করা উচিত। "বৈদ্য জাতির ইতিবৃত্তে"

অনেক অশ্রুতপূর্ব্ব তথ্য ও অগাধ যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে; এইরূপ প্রবন্ধে দেশের যে কোনও উপকার হইবে ইহা আমরা একেবারেই মনে করি না; তবে যদি এতদ্দ্বারা বৈদ্যজাতির কিঞ্চিন্মাত্র মঙ্গল সাধিত হয়, ভরসা করি কায়স্থগণ তাহাতে প্রীতি ভিন্ন দুঃখানুভব করিবেন না।

নবপ্রভা, বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ ১৩০৯। যদি সেবক চন্দ্রশেখর সেনের "প্রস্তাবিত অনাথাশ্রম" সম্বন্ধীয় করুণ আবেদন একটি হৃদয়ও দ্রব করিতে সমর্থ হয়, এবং "আমগাছ্‌ জীবন" একটি নিরাশ হৃদয়কেও কর্ত্তব্যের পথ দেখাইতে পারে, তবে এই দুই সংখ্যার নবপ্রভা বৃথায় বাহির হয় নাই বলিতে হইবে। "সীতা" লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবির সুযশ কতদূর অক্ষুণ্ণ রাখিবে, আমরা তাহা এখনও বুঝিতে না পারিয়া একটুকু চিন্তিত আছি।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা—অষ্টম ভাগ, চতুর্থ সংখ্যা। সমস্ত প্রবন্ধই গবেষণাপূর্ণ এবং বৈজ্ঞানিক রীতিতে লিখিত।

সই।

তখনো এ দীন বালা
জানে না প্রাণের জ্বালা,
কহিলে ব্যথার কথা
নাহি পাতে কান,
দেখিলে নয়নে জল
চে'য়ে থাকে ঢল-ঢল,
অবাক্‌ হইয়া শুনে
বিষাদের গান!
তখনো সে নিজ মনে
আকাশের তারা গণে,
পুতুলের বিয়ে দেয়
গেঁথে, ফুলমালা.
তখনো সে ধূলিমাটি
ল'য়ে করে খুটিনাটি,
তখনো ধূলির অন্ন
রাঁধে সেই বালা!
আকাশের পাখিদলে
তখনো সে ডেকে' বলে,
সোণার খাঁচায় তার
আছে নানা ফল,

তখনো মধুর বোলে
তুলিয়া বসা'লে কোলে,
তরঙ্গ তুলিয়া বালা
হাসে খল-খল !
সেই সে বয়সে হয়
দুজনার পরিচয়,
গলাগলি, বলাবলি,
ভালবাসাবাসি,
নাহি তল, নাহি বেলা,
অমৃতের সিন্ধু খেলা,
দুজনার ভাব-নীরে
দুজনায় ভাসি !
সে হ'তে মলয় বায়
লাগে না কোমল গায়,
সে হ'তে সৌরভ নাই
কুসুমেতে আর,
চাঁদ সে হাসে না হাসি,
মধুর বাজে না বাঁশী,
সে হ'তে সে-ময় দেখি
নিখিল সংসার !
সেই হ'তে সে আমার
জীবনের সুধা-সার
সেই হ'তে জানি না ক
আর তারে বই,
সেই হ'তে করে তার
দি'ছি মন উপহার,
সেই হ'তে সোণামুখী
সে আমার সই !

শ্রীসুভাষিণী দেবী।

আরতি।

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

তৃতীয় বর্ষ।] ময়মনসিংহ, ভাদ্র ও আশ্বিন, ১৩০৯। [৩য় ও ৪র্থ সংখ্যা।

সতীর জয়।

(বেহুলা।)

ভরা তটিনীর উর্ম্মি ভ্রূকুটি
করিয়া হেলা ;
অয়ি সুন্দরি! চলেছ কোথায়
ভাসায়ে ভেলা ?
তেয়াগি ধরণী মৃত্যু-আলয়,
নিরাশা-দহন, বিচ্ছেদ-ভয়,
হৃদয়ের নিধি প্রিয়তম-তনু
লইয়া পাশে,
কোন্ নিরুদ্দেশে চলেছ ওগো
কিসের আশে ?

নির্ভয় নহে বাঁধিয়া ধরায়
লোহার ঘর,
সেথাও গোপনে পশেছিল আসি'
মরণ-চর ;
অধরের কাছে সুধাধার খানি
ধরি অদৃষ্ট, ল'য়ে গেছে টানি,
ফিরে নিতে পুনঃ পারিবে কি যুঝি'
তাহার সাথে ?

ঘন মেঘে ঘেরা শ্রাবণ গগন
গরজে মাথে।
ললাটে তোমার শুভ-চন্দন
এখনো আঁকা;
উষার মতন রক্তিম বাসে
মাথাটি ঢাকা!
বাহুতে কনক কাঁকণ দুগাছি
ধ্বনিছে পতির কল্যাণ যাচি,'
সীমন্তে তব সিন্দূর রাঙা
আয়তি-লেখা;
শঙ্খ বলয়ে চির মঙ্গল
চিহ্ন-রেখা!

বিনিময় মালা র'য়েছে গলায়,
কি শোভা ধরি'!
পতি পদ পানে আছ আঁখি দুটি
আনত করি;
ধরা তুলে নেছে মিলন শয়ন,
যেতেছ খুঁজিতে নূতন ভুবন;
যেথায় দুজনে পরাণে পরাণে
যাইবে মিশি,
দুজনারে ঘিরি রহিবে অশেষ
বাসর নিশি।
যাক্ ভেসে তবে দুলিয়া দুলিয়া
সাধের ভেলা;
দুধারে তোমার কোটী বাঁকা ঢেউ
করিবে খেলা!
বায়ু উড়াইবে সোণালি আঁচল
তর তর নদী ক'বে চল চল,
তরী হ'তে'নেয়ে ডাকি' সুধাইবে,

যেতেছ কোথা’ ?
নম্র বদনে　　তুমি ভেসে যাবে
না ক’য়ে কথা।

দক্ষিণে বামে　　দুটি তটদেশ
চলিবে সাথে,
কত সুখ, দুখ,　　তরু ঘেরা গ্রাম
রাখি পশ্চাতে।
চাষী যায় ক্ষেতে, মাঠে গরু চরে,
তরী ভাসাইয়া জেলে মাছ ধরে
প্রতি দিবসের　　নিত্য কর্ম্ম
করিবে তারা,
তুমি ভেসে যাবে　　ছিন্ন বাঁধন
বিহগী পারা।
পশ্চিমে তুলি　　কনকাভা জাল
রবির তরী,
অস্ত অচল　　আড়ালে পশিবে
আঁধার করি’ ;
দুই পাশে তব দূর তীর রেখা,
মসী লেখা সম যাবে ক্ষীণ দেখা,
ভুলে যাবে তুমি　　জগতের কথা,
নীলিমা পাখা
প্রসারি’ বিজন　　শান্তি তোমায়
দিবেক ঢাকা।

হেরিবে সমুখে　　মহান্ সিন্ধু
দিগন্তে মিশি,
পূরবে উঠিছে　　পূর্ণ চন্দ্র
আলোকি’ দিশি !
চির মিলনের রহস্য কোন্

এ অকূল তলে র'য়েছে গোপন,
কল কল জল কৌতুক ভরে
উঠিছে হাসি,
জল্ জল্ ভাতে আশার মতন
জোছনা রাশি!
ক্ষীণ বাহু যুগে লভি' নব বল
বাঁধিয়া নাথে,
বাম পাশে তুমি করিবে শয়ন
সে সুখ রাতে;
চৌদিক হ'তে তরঙ্গ শত,
গভীর নিবিড় নিদ্রার মত
অগাধের মাঝে, ল'বে তলাইয়া
অজানা দূরে;
সহসা জাগিয়া হেরিবে আপনা
সলিল পুরে!

স্বপনের সম নব জাগরণে,
দেখিবে চেয়ে,
ঘিরি তোমাদের বসি শত শত
জলের মেয়ে!
তুষার ধবল সুচারু বদন,
ঘন কেশ শিরে মেঘের মতন,
মুকুতা দশন, অরুণ অধর
সুধার খনি;
আঁখি তারা দুটী স্বচ্ছ উজল
সুনীল মণি!
স্নিগ্ধ, সরস, মধুর পরশ
পুলক ভরা,
সুন্দর তনু, শ্যাম শৈবাল
বসন পরা;

নানা বরণের মণি দীপ করে,
সারি সারি নারী সলিলের ঘরে ;
বসি তার মাঝে প্রবাল বেদীতে
বিবাহ বেশে
তোমরা দুজন নব বর বধূ
নূতন দেশে !

শঙ্খ বাজায়ে মঙ্গল করি,
বীণার রবে
অমর প্রেমের জীবনী মন্ত্র
পড়িয়া সবে
বাঁধিবে দোঁহারে জীবনে মরণে
অটুট মিলন সোণার বাঁধনে !
চিরদিন তরে বিদূরিত হ'বে
বিরহ-ভয়,
গাহিবে জলধি কল্লোল ভাষে
"সতীর জয় ।"

শ্রীবিনয়কুমারী ধর ।

দিল্লীর আফগান শাসনের প্রকৃতি ।

২ ।

খিলিজীবংশীয়গণের পর তোগলকগণ দিল্লীর সাম্রাজ্য অধিকার করেন। তোগলক বংশের প্রথম অধিপতি গিয়াস উদ্দীন একজন প্রজাহিতৈষী ন্যায়-পরায়ণ শাসনকর্ত্তা বলিয়া ইতিহাসে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। তিনিও রাজস্ব বন্দোবস্ত কালে যাহাতে হিন্দুগণ ধনশালী হইতে না পারে তদনুরূপ কর নির্দ্ধারণ করেন।

গিয়াস উদ্দীনের পর মহম্মদ তোগলক দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার রাজত্বকালে মোসলমান কৃত অত্যাচারের মাত্রা চরম সীমায় উপনীত হইয়াছিল। মহম্মদ দোয়াব প্রদেশ হইতে অত্যধিক পরিমাণে রাজস্ব সংগ্রহ

করিবার জন্য আদেশ প্রদান করেন। রাজকর্ম্মচারিগণ তাঁহার আদেশানুসারে এতদূর কঠোরভাবে রাজকর সংগ্রহ করিয়াছিল যে প্রজাবর্গ অচিরাৎ কপর্দ্দক-শূন্য হইয়া পড়ে। তাঁহার উৎপীড়ন সহ্য করিতে না পারিয়া সম্পত্তিশালী প্রজাবর্গ বিদ্রোহ অবলম্বন করায় শস্যক্ষেত্র বিধ্বস্ত ও কৃষিকার্য্য সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হইয়াছিল। হিন্দু প্রজা আপনাদের শস্যভাণ্ডারে অগ্নি প্রদান এবং পালিত গোমেষাদি পশুগৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া সুলতানের হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিবার জন্য পলায়ন করে। সুলতানের আদেশক্রমে রাজ-কর্ম্মচারিগণ বিদ্রোহী প্রজাবর্গের জীবন নাশ অথবা চক্ষুরুৎপাটন করিয়াছিল। তাঁহার অভূতপূর্ব্ব অবিমৃষ্যকারিতায় কৃষিকার্য্য বন্ধ এবং ভিন্ন স্থান হইতে শস্যের আমদানী রহিত হওয়ায় সমগ্র দোয়াব এবং দিল্লী ও তাহার চতুঃপার্শ্বে দারুণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়া সহস্র সহস্র নরনারীকে অকালে মৃত্যুমুখে বিসর্জ্জিত করে। ইহাদের দুর্দ্দশার কাহিনী রাষ্ট্র হইয়া পড়িলে দূরবর্ত্তী প্রদেশের কৃষককুলও ভাবী বিপদাশঙ্কায় ভয়ব্যাকুলচিত্তে জঙ্গলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। মহম্মদ প্রজাকুলের এই ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া মৃগয়াব্যপদেশে বহু সৈন্য সমভিব্যাহারে পলাতক প্রজাকুলের আশ্রয়ভূমি জঙ্গলপূর্ণ প্রদেশের চতুর্দ্দিক বেষ্টনপূর্ব্বক তন্মধ্যস্থ নির্দ্দোষ কৃষক ও পল্লীবাসী সকলকে বন্য পশুর ন্যায় বধ করেন।

মহম্মদ সপ্তবিংশ বর্ষ কাল দিল্লীর সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন; তাঁহার অবিমৃষ্যকারিতায় দিল্লীর রাজশক্তি একান্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। মহম্মদের মৃত্যুর পর ফিরোজ তোগলক সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি একজন প্রজাহিতৈষী শাসনকর্ত্তা ছিলেন। (১) ফিরোজের পর দ্বিতীয় গিয়াস, আবু বেকার, নাশির উদ্দীন ও মাহমুদ, এই চারিজন তোগলক ক্রমান্বয়ে রাজপদ অধিকার করেন। ইঁহারা সকলেই সিংহাসনাধিকারী মাত্র ছিলেন; তাঁহাদের কোন ক্ষমতাই ছিল না, মন্ত্রিগণ তাঁহাদিগকে লইয়া যদৃচ্ছামত ব্যবহার করিতেন। মাহমুদের রাজত্বকালে দিগ্বিজয়ী তৈমুরলঙ্গ পঙ্গপাল সদৃশ অগণ্য সৈন্য সমভিব্যাহারে ভারতবর্ষে আগমন করেন। তাঁহার অদৃষ্টপূর্ব্ব অমানুষিক অত্যাচারে সমগ্র দেশ শ্মশানভূমিতে পরিণত হয় এবং মাহমুদ পলায়ন করিয়া আপনার প্রাণরক্ষা করেন।

তৈমুর লুণ্ঠন-কার্য্য সমাধা করিয়া বিজয়-গৌরবে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন

(১) তাঁহার শাসনকালে প্রজার হিতকর বহুবিধ ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল।

করিলে দেশমধ্যে অরাজকতা উপস্থিত হয় এবং সেই সুযোগে সুলতানের শাসনকর্ত্তা সৈয়দবংশীয় খিজির খাঁ দিল্লীর সিংহাসন গ্রাস করেন। খিজির খাঁর পর তিনজন সৈয়দ ক্রমান্বয়ে রাজত্ব করিলে সৈয়দ শাসন ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এই চারিজন সুলতানের রাজত্বকালেই দেশ অন্তর্বিপ্লবে পরিপূর্ণ ছিল। অন্তঃদ্রোহ নিবারণেই তাঁহাদের সমস্ত সময় অতিবাহিত হইয়াছিল বলিয়া তাঁহারা প্রজারঞ্জনে মনোনিবেশ করিতে পারেন নাই। সৈয়দ বংশের পর দিল্লীতে লোদী বংশের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বংশের প্রতিষ্ঠাতার নাম বিলোললোদী। বিলোলের পর সেকন্দর এবং সেকন্দরের পর এব্রাহিম রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত হন। ইঁহাদের সময়ও সন্ধিবিগ্রহেই অতিবাহিত হইয়াছিল। এব্রাহিমের সময়ে চারিদিকে অরাজকতা পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল।

আফগানগণ একমাত্র তরবারির সাহায্যেই তাঁহাদের প্রভুত্ব রক্ষা করিতেন বলিয়া অতি সামান্য আঘাতেই তাঁহাদের সিংহাসন কম্পিত হইত। এজন্য দুরাকাঙ্ক্ষ রাজপুরুষগণ সর্ব্বদা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকিতেন। এক জনকে রাজ্যচ্যুত করিয়া আর এক জনকে রাজ্যভার প্রদান করিবার জন্য অনবরত মন্ত্রণা চলিত। আফগানগণ বিংশাধিক তিনশত বৎসর দিল্লীতে রাজত্ব করিয়াছিলেন; কিন্তু ইঁহাদের কোন বংশই ৫।৬ পুরুষের অধিক রাজত্ব করিতে পারেন নাই। আফগানবংশীয় ২৮ জন অধিপতি দিল্লীতে রাজত্ব করিয়াছেন। তন্মধ্যে ১৬ জন শত্রুকর্ত্তৃক পদচ্যুত অথবা নিহত হইয়াছেন। সুলতানগণ সর্ব্বদা অন্তর্বিপ্লব এবং মোসলমান সেনাপতি ও শাসনকর্ত্তৃগণের বিদ্রোহদমনজন্য ব্যাপৃত থাকিতেন। এ কারণ বহিঃশত্রু মোগলগণ প্রোৎসাহিত হইয়া বারম্বার ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছে। এতদ্ব্যতীত প্রতিদ্বন্দ্বী স্বাধীন হিন্দু নরপতিগণও মোসলমানাধীন ভারতবর্ষে নানা বিশৃঙ্খলা ঘটাইতেন। এই সকল কারণে আফগানশাসনকালে দেশ অরাজকতা পূর্ণ ছিল।

আফগান শাসনের ঈদৃশ প্রকৃতি প্রযুক্ত একটী সুফল ফলিয়াছিল। বিলাসিতা, ইন্দ্রিয়সেবা, দেশলুণ্ঠন, সন্ধিবিগ্রহ ও ষড়যন্ত্রেই আফগান নরপতিগণের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হইত। এজন্য রাজস্বসংগ্রহ এবং হিন্দুর জাতিপাত ও এসলাম ধর্ম্মের প্রচার ব্যতীত আর কোন আভ্যন্তরিক ব্যাপারে তাঁহাদের হস্তক্ষেপ করিবার অবসর ছিল না। সুতরাং দেশের আভ্যন্তরীণ শাসন ব্যাপারে অধিকাংশ বিষয়ে হিন্দুগণের স্বাতন্ত্র্য ভাব ছিল; এই সকল বিষয় তাঁহারা নিজেদের ইচ্ছা মতই চালাইয়া লইত।

অরাজকতার নামান্তর ও হিন্দুবিদ্বেষপূর্ণ আফগানশাসন হিন্দু প্রজার হৃদয়-অধিকারে অসমর্থ ছিল। এজন্য তাহারা উহার অনুরক্ত ছিল না। ইহার ফলে তাহারা অন্তর্বিপ্লব ও বহিঃশত্রুর আক্রমণ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিল ও কেবলমাত্র স্ব স্ব প্রাণ ও সম্পত্তি রক্ষার জন্য ব্যস্ত থাকিত এবং উহা রক্ষা পাইলেই কৃতার্থ হইত। প্রবল শত্রুর আক্রমণে সমস্ত দেশ আলোড়িত হইলে তাহারা কখন বা অন্যত্র পলায়ন করিত; তৎপর পুনর্ব্বার শান্তি স্থাপিত হইলে স্ব স্ব আবাসে প্রত্যাবর্ত্তন করিত। রাজার পরিবর্ত্তনে হিন্দু প্রজা কিছুমাত্র ক্ষুব্ধ না হইয়া অভিনব রাজার বশ্যতা স্বীকার করিত।

পূর্ব্বোল্লিখিত কারণপরম্পরায় দিল্লীর সাম্রাজ্য ক্রমশঃ এত দূর অবনত হইয়াছিল যে, যে সময় এব্রাহিম লোদী সিংহাসনে উপবিষ্ট হন, তখন অধিকাংশ প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা দিল্লীর বশ্যতা উল্লঙ্ঘন করিয়া স্বাধীনভাবে শাসনদণ্ডের পরিচালনা করিতেছিলেন এবং মোসলমান রাজ্যের পার্শ্বেই স্বাধীন হিন্দুনরপতিগণ সগৌরবে রাজ্য শাসন করিতেছিলেন। দিল্লীর সম্রাট দিল্লী হইতে বারাণসী পর্য্যন্ত বিস্তৃত স্থানে আধিপত্য করিতেছিলেন। আমরা ভারতবর্ষের তৎকালীন রাজনৈতিক অবস্থা সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিতেছি।

বঙ্গদেশে স্বাধীন মোসলমান অধিপতি সুলতান নশরৎশাহ প্রবল পরাক্রমে শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছিলেন। তৎপূর্ব্বে দিল্লীর সম্রাট বহুবার বঙ্গদেশের মোসলমান নরপতির স্বাধীনতা হরণ করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া অবশেষে বাঙ্গালার স্বাধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হন। উড়িষ্যায় গঙ্গাবংশীয়গণ রাজত্ব করিতেছিলেন। মোসলমান তখনও উৎকল রাজ্যে পদার্পণ করে নাই। দক্ষিণাপথে দ্রাবিড়, ত্রৈলিঙ্গ, কর্ণাট ও মহারাষ্ট্র রাজ্যে মোসলমানগণ প্রবেশ করিয়াও তাহাদের স্বাধীনতা হরণ করিতে পারিয়াছিলেন না। তত্রত্য হিন্দুরাজগণ স্বাধীনভাবে রাজকার্য্য পরিচালনা করিতেছিলেন। মোসলমান কর্ত্তৃক বিধ্বস্ত হওয়ায় সমস্ত দক্ষিণাপথে অরাজকতা উপস্থিত হইয়াছিল। সেই সুযোগে প্রাচীন হিন্দুরাজ্য সমূহের ধ্বংসাবশেষ মধ্যে যদুবংশীয় বক্কুরায় বিজয়নগরের রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। বিজয়নগর রাজ্য অতি অল্প কাল মধ্যেই সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠে। এই সময়ে তত্রত্য হিন্দু নরপতি প্রবল পরাক্রমে রাজ্যশাসন করিতেছিলেন। খান্দেশে স্বাধীন মোসলমান রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত ছিল। উহার রাজধানী বোরহানপুর তৎকালে সুদৃশ্য সৌধমালায় সুশোভিত ছিল। দিল্লীর সেনাপতি জাফর খাঁ দক্ষিণাপথে

এক পরাক্রান্ত স্বাধীন মোসলমান রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। জাফর খাঁ পুরুষকারের জলন্ত দৃষ্টান্ত জাফর খাঁ প্রথমে একজন ব্রাহ্মণের ক্রীতদাস ছিলেন। ভাগ্যলক্ষ্মী জাফরকে বরমাল্যে সুশোভিত করিলে তিনি পূর্ব্ব প্রভুর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন জন্য বাহমনী উপাধি ধারণ করেন। এজন্য তাঁহার প্রতিষ্ঠিত রাজ্যও বাহমনী নামে বিখ্যাত হইয়াছে। এই সময় বাহমনী রাজ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাঁচ ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু এই অধঃপতন স্বত্বেও প্রত্যেক বিভাগই স্বাধীন ছিল। গুজরাটে স্বাধীন মোসলমান রাজ্য সংস্থাপিত ছিল। এই সময়ে গুজরাট রাজ্যের চরম উন্নতির অবস্থা। কিন্তু গুজরাটাধিপতি তাহাতেও পরিতৃপ্ত না হইয়া পার্শ্ববর্ত্তী রাজ্যসমূহ স্বাধিকার ভুক্ত করিতে ব্যাপৃত ছিলেন। দিল্লী ও গুজরাটের মোসলমান রাজন্যবর্গ রাজপুতানার রাণাদিগকে বশীভূত করিবার জন্য পুনঃপুনঃ চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারিয়াছিলেন না। রাজপুত রাজগণ ন্যায়ধর্ম্মানুমোদিত বিধানানুসারে শাসনদণ্ডের পরিচালনা করিতেছিলেন। পঞ্জাবের মোসলমান শাসনকর্ত্তা বিদ্রোহী হইয়াছিলেন। ভূস্বর্গ কাশ্মীরে স্বাধীন মোসলমান রাজ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল।

এব্রাহিম লোদীর রাজত্বকালে ভারতবর্ষ এই রূপ খণ্ড খণ্ড স্বাধীন রাজ্যে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। আফগান সাম্রাজ্যের এইরূপ দুর্দ্দশার সময় মোগল বংশোদ্ভব বাবর ভারতবর্ষে আগমন করিয়া পানিপথের প্রশস্ত প্রান্তরে সম্মুখ যুদ্ধে এব্রাহিম লোদীকে নিহত করিয়া দিল্লীর রাজসিংহাসন অধিকার করেন। ইহার পর দিল্লীর আফগান রাজত্ব বিলুপ্ত হইয়া যায় ও মোগল শাসন প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত।

জাতিভেদ ও অর্থনীতি।

জাতিভেদ প্রাচীনকালে হিন্দুসমাজের অনেক উপকার করিয়াছিল; ক্ষতিও বিস্তর করিয়াছে। তৎসমুদয় অদ্যকার আলোচ্য নহে; শুধু অর্থনীতির হিসাবে জাতিভেদ সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা বলাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

জাতিভেদে ভেদনীতি অতিশয় কুটিলত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু এই প্রবন্ধের জন্য মোটামুটি ভাবে ধরিয়া লইব যে, এক একটি জাতি এক একটি নির্দ্দিষ্ট ব্যব-

সায়ে লিপ্ত এবং কোনও পুরুষই স্বজাতীয়া ব্যতীত কোনও রমণীর পাণিগ্রহণ করিতে পারে না।

জাতি ও ব্যবসায় সম-প্রসার হইলে প্রত্যেক ব্যক্তিকেই পৈত্রিক ব্যবসায় অবলম্বন করিতে হয়। ইহার একটি বিশেষ সুবিধা আছে। জন্মাবধি বিনা ব্যয়ে ও অতি অল্প আয়াসে পিতার নিকটই সন্তান শিক্ষা লাভ করিতে পাবে। তদ্ভিন্ন, প্রথম ব্যবসায় আরম্ভ কালে পিতার যন্ত্রাদি এবং কার্য্যালয় দ্বারাও বিলক্ষণ সাহায্য হইয়া থাকে। ইহাতে মূলধনের আবশ্যকতা লঘুতর হয়। অধিকন্তু যাহাদের সহিত পিতার কারবার চলে, তাহারা পুত্রেরও কৃতকার্য্যতার পন্থা সুগম করিয়া দেয়। সাধারণ লোকের পক্ষে এই সকল সুবিধা অতিশয় মূল্যবান্।

আত্মলব্ধ নৈপুণ্য সন্তানে অক্ষুণ্ণ রাখিবার সম্ভাবনাজনিত আনন্দ এবং উৎসাহ সন্তানের শিক্ষা বিধানে পিতাকে অতিশয় যত্নশীল করিত। কারণ শারীরিক ভাবে বংশরক্ষার ন্যায় মানসিক বংশরক্ষাও মানুষের অতিশয় স্পৃহণীয়। তাই এই ভাবেও জাতিভেদ এদেশে শিল্পোন্নতির সহায়তা করিয়াছে।

গুণনিচয়ের পুরুষানুক্রমিক সংক্রমণের নিয়মানুসারে পুত্র পিতার ব্যবসায় অবলম্বন করিলে তাহাতে সমধিক উৎকর্ষ লাভের সম্ভাবনা। কারণ পিতা চিরজীবন যে কার্য্যে নিযুক্ত, সন্তানও তৎকার্য্যানুকূল প্রবৃত্তি লইয়া জন্ম গ্রহণ করে। দুই এক পুরুষে তাদৃশ উৎকর্ষ প্রত্যক্ষীভূত না হইতে পারে, কিন্তু দীর্ঘকাল বংশ বিশেষ অক্লান্তভাবে পূর্ব্ব পুরুষের ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকিলে সুদূর বংশধরগণ নিশ্চয়ই তাহাতে স্বাভাবিক প্রবণতা প্রদর্শন করিবে। কারণ প্রতি পুরুষে জন্মগত প্রবৃত্তি জীবনব্যাপী কার্য্যজনিত মনের গতির সহিত মিলিত হইয়া, বর্দ্ধিত তেজে সন্তানে সংক্রামিত হয়। অতএব জাতিভেদ এক একটি ব্যবসায় এক এক জাতির জন্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া প্রত্যেক ব্যবসায়ের সমধিক বিকাশের সুবিধা করিয়া দিয়াছিল।

বিবাহক্ষেত্র সমব্যবসায়-সম্প্রদায়ে নিবদ্ধ হওয়াতে জন্মগত নৈপুণ্যের আধিক্য সম্ভাবনা দেখা যায়। কারণ ইহাতে পিতা মাতা উভয়েই স্ব স্ব পিতৃপুরুষ হইতে স্বজাতীয় ব্যবসায়ানুকূল প্রবৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া দ্বিগুণিত ভাবে তাহা সন্তানকে প্রদান করেন। বোধ হয় ভারতবর্ষে সূক্ষ্ম শিল্পের এতাদৃশ উন্নতির ইহা এক প্রধান কারণ।

জাতিভেদ পরাধীন ভারতে শিল্পগুলিকে বিনাশ হইতে রক্ষারও কথঞ্চিৎ

সাহায্য করিয়াছিল সন্দেহ নাই। কোন জাতি পরাধীন হইলে তাহার শারীরিক, মানসিক, নৈতিক, আর্থিক, সর্ব্ববিধ অবনতি ঘটে। ইহাই সাধারণ নিয়ম। বৈদেশিক রাজা বিজিত দেশের শিল্পীদিগের পরিবর্ত্তে স্বজাতীয় শিল্পিকুলকে উৎসাহ দিতেই অধিকতর প্রস্তুত হন। কিন্তু তথাপি মুসলমান-ভারতে শিল্পের অবনতি ঘটে নাই। মুসলমান রাজগণ হিন্দু শিল্পীদিগের প্রতি নিতান্ত বিমুখতা প্রদর্শনের পরিবর্ত্তে বরং তাহাদিগকে উৎসাহিতই করিতেন। হিন্দু শিল্পীদিগের স্বাভাবিক উৎকৃষ্ট কারুনৈপুণ্য ব্যতীত ইহার আর কি কারণ থাকিতে পারে? এবং সেই নৈপুণ্য অনেকাংশে জাতিভেদ জনিত, পূর্ব্বেই উল্লিখিত* হইয়াছে।

মোগল সম্রাটদিগের অধীনে কিঞ্চিদধিক শতবর্ষ কাল বাদ দিলে সুলতান মামুদের আক্রমণ হইতে ইংরেজ রাজ্য প্রতিষ্ঠা পর্য্যন্ত সুদীর্ঘ শতাব্দী সমষ্টি অবিশ্রান্ত যুদ্ধ ও বিদ্রোহ বিপ্লবেই পর্য্যবসিত বলিয়া মনে হয়। সেই অরাজকতার কালেও যে হিন্দুশিল্প আত্মরক্ষা করিতে পারিয়াছিল, জাতিভেদ তাহার এক প্রধান কারণ। পূর্ব্ব পুরুষের ব্যবসায়ই এক মাত্র অবলম্বন হওয়াতে শিল্পিগণ নানা অসুবিধার মধ্যেও স্ব স্ব ব্যবসায় কথঞ্চিৎ অনুসরণ করিয়াছে। আবার যখনই বর্ষাকালে সূর্য্যকিরণের ন্যায় ক্ষণকাল দেশে শান্তির আবির্ভাব হইয়াছে, তখনই তাহারা তাহাদের প্রচ্ছন্ন পারদর্শিতা দর্শন করিয়া সকলকে মুগ্ধ করিয়াছে। যদি হিন্দুগণ পৈত্রিক ব্যবসায় অবলম্বন করিতে বাধ্য না হইত, তবে মুসলমান নরপতিগণ সময়ে সময়ে পারস্য, তুরস্ক, মিসর প্রভৃতি দেশ হইতে শিল্পী আনয়ন করিয়া বিলাসভবনাদি নির্ম্মাণ করাইতে পারিতেন বটে, কিন্তু এ দেশে কাশ্মীর, লাহোর, জয়পুর, লক্ষ্ণৌ, বারাণসী, মুর্শিদাবাদ, ঢাকা প্রভৃতি স্থানের অতুলনীয় শিল্পগৌরব প্রতিষ্ঠিত হইত কি না বিশেষ সন্দেহের বিষয়।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, জাতিভেদ হিন্দুদিগের শিল্পনৈপুণ্য ও শিল্পরক্ষার সহায়তা করিয়াছে। এই দুইটি অর্থনীতিক্ষেত্রে জাতিভেদের প্রশংসার কথা; এবং ইহা সামান্য প্রশংসা নহে। কিন্তু এই প্রশংসা অতীত যুগ সম্বন্ধেই প্রযুজ্য; বর্ত্তমান সম্বন্ধে নহে।

দেশে এখন চিরশান্তি বিরাজিত; অরাজকতায় শিল্পের অবনতির ভয় নাই। কাজেই শিল্প রক্ষার জন্য সমাজের তাদৃশ অলঙ্ঘ্য-সীমা-বিশিষ্ট বিভাগ এখন নিষ্প্রয়োজন।

প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের আধুনিক উন্নতি ন্যূনাধিক পরিমাণে সমগ্র ভারতের

শিল্প সাধন-পদ্ধতির প্রকৃতি পরিবর্তিত করিতেছে। বাষ্পীয় যন্ত্র আবিষ্কারের পূর্ব্বে সমুদয় শিল্পকার্য্যই প্রধানতঃ হস্তযোগে নিষ্পন্ন হইত। কিন্তু আজ কাল শিল্পগুলিকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়—হস্তশিল্প ও যন্ত্রশিল্প। যন্ত্র-শিল্প বর্ত্তমান সভ্যতার অবিচ্ছেদ্য সহচর। যতই দিন যাইতেছে, ততই শিল্প সমূহে যন্ত্রবাহুল্য ঘটিতেছে।

যন্ত্রশিল্পে তিন শ্রেণীর কার্য্যকারক আবশ্যক—প্রথম, ইঞ্জিনিয়ার প্রভৃতি, দ্বিতীয়, ফোরম্যান এবং তৃতীয়, মজুর। প্রথম শ্রেণীর যে শিক্ষা আবশ্যক, তাহা পরিবার মধ্যে সম্পন্ন হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব; সে জন্য অতি উচ্চ অঙ্গের কলেজ চাই। আমাদের কারুকরশ্রেণী সমূহ হইতে দুই এক জন তাদৃশ শিক্ষার যোগ্য লোক বাহির হইতে পারে, কিন্তু মোটের উপর সে শিক্ষা তাহাদের ক্ষমতার অতীত। এদেশীয় কারুকরগণ মধ্যে ফোরম্যানের পদের যোগ্য লোক কয়েকটী জুটিতে পারে; কিন্তু তজ্জন্যও উচ্চবিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ আবশ্যক; পিতার নিকট তদুপযোগী শিক্ষা লাভ হইতে পারে না। মজুর-দিগের নৈপুণ্যের আবশ্যকতা অতি অল্প, শারীরিক পরিশ্রমপটু হইলেই তাহাদের দ্বারা কাজ চলিতে পারে। সুতরাং যন্ত্রশিল্পে পিতার নিকট শিক্ষা লাভ সম্বন্ধে কোন সুবিধা নাই।

যন্ত্রশিল্পের জন্য যে নৈপুণ্য আবশ্যক বিদ্যালয়, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগার, এবং কার্য্যক্ষেত্রেই তাহা লাভ হইতে পারে; ইয়োরোপ তাহা প্রমাণিত করি-য়াছে। সেজন্য বিবাহ ভেদের বিশেষ কোন প্রয়োজনীয়তা নাই। আজ কাল হস্তশিল্পও বিদ্যালয়ে শিক্ষিত হয়। ব্যবসায় শিক্ষার জন্য কোন শিল্পীর নিকট শিক্ষানবিশী করিবার যে রীতি পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল, ইয়োরোপ হইতে তাহা প্রায় সম্পূর্ণরূপে লুপ্ত হইয়াছে, এ দেশেও ক্রমে ক্রমে লোপ পাইতেছে। কাজেই আজ কাল কি যন্ত্রশিল্প, কি হস্তশিল্প উভয়ই ব্যবসায় ও বিবাহভেদা-ত্মক, জাতি ভেদ নিরর্থক।

আধুনিক শিল্প প্রণালী অন্য এক ভাবেও প্রাচীন প্রণালী হইতে বিভিন্ন। তাহার একটু বিস্তৃত আলোচনা আবশ্যক।

শ্রমবিভাগ শিল্পোন্নতির বিশেষ সহায়। অর্থনীতিবিদ্‌গণ তাহার কয়েকটি কারণ নির্দ্দেশ করেন। প্রথমতঃ, নানাকার্য্যে নিযুক্ত না হইয়া সর্ব্বদা এক কার্য্য করিলে তাহাতে দক্ষতা বৃদ্ধি পায়; দ্বিতীয়তঃ, এক কার্য্য ত্যাগ করিয়া অন্য কার্য্যের যন্ত্রাদি লইয়া প্রস্তুত হইতে যে সময় ব্যয় হয়, নিরন্তর এক কার্য্যে

লিপ্ত থাকিলে সে সময়টুকু বাঁচিয়া যায়; তৃতীয়তঃ শ্রমবিভাগের নিয়ম থাকিলে যে যে কার্য্যের সর্বাধিক উপযুক্ত, তাহাকে শুধু সেই কার্য্যে নিযুক্ত করা যায়; নিপুণ শিল্পীকে সামান্য কাজ করিয়া শক্তি ও সময় অপচয় করিতে হয় না। শ্রমবিভাগ নীতির পক্ষে একটি বিশেষ কথা এই যে, নিরন্তর এক কার্য্যে নিয়োগের দরুণ শিল্পী স্বকার্য্য সাধনানুকূল নানাবিধ যন্ত্র আবিষ্কারে প্রবৃত্ত ও সমর্থ হয়।

আলপিন প্রস্তুত করিতে হইলে, (১) গুণা তৈয়ার করা, (২) গুণা গুলি কাটিয়া আলপিনের আকার করা, (৩) অগ্রভাগ সূক্ষ্ম করা, (৪) চেপ্টা মাথা প্রস্তুত করা, (৫ সেগুলিকে আলপিনের সঙ্গে লাগাইয়া দেওয়া, (৬)পালিস করা, ইত্যাদি অনেক কাজ করিতে হয়। শ্রম বিভাগের নিয়মানুসারে ইহার প্রত্যেক কাজের জন্য বিভিন্ন কারুকর নিযোগ কর্ত্তব্য। তাহাতে অপরিসীম উপকার হয়। একজন লোক এই সমুদয় কাজ করিলে এক দিনে ঊর্দ্ধ বিশটির অধিক আলপিন প্রস্তুত করিতে পারে না; কিন্তু বিভিন্ন ব্যক্তির উপর উক্ত বিভিন্ন কার্য্যের ভার থাকিলে দশ জন লোকে ঐ সময়ে ৫০,০০০ আলপিন প্রস্তুত করিতে সমর্থ হইবে (Fowcett's Political Economy)। ইহাতেই শ্রমবিভাগের অসাধারণ উপকারিতা প্রতিপন্ন হয়।

জাতিভেদকে অনেকে শ্রমবিভাগ নীতির প্রয়োগ বলিতে চাহেন। স্থূল দৃষ্টিতে একথা যথার্থ বলিয়া বোধ হয়। সমগ্র সমাজকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক শ্রেণীর জন্য এক একটী ব্যবসায় নির্দ্দিষ্ট করাতে মোটামুটি ভাবে শ্রমবিভাগ সাধিত হইয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু যে শ্রমবিভাগ আধুনিক শিল্পপদ্ধতির মূল নীতি, জাতিভেদের সহিত তাহার কোনও সম্পর্ক নাই। জাতিভেদ সর্ব্বাবয়ব একটি শিল্প শিল্পী বিশেষে নিবদ্ধ করে; কিন্তু অর্থনীতি শাস্ত্রে শ্রমবিভাগ অর্থ একই শিল্পের বিভিন্ন অঙ্গের সম্পাদন বিভিন্ন ব্যক্তির হস্তে অর্পণ। হার প্রস্তুত করিতে হইলে স্বর্ণকে নির্ম্মাণোপযোগী করা, গুণা তৈয়ার করা, শৃঙ্খলাকারে সে গুলি নিবদ্ধ করা, রং দেওয়া বা অন্য সর্ব্ববিধ কার্য্যই এদেশে এক স্বর্ণকারের কর্ত্তব্য। কিন্তু এই সব বিভিন্ন কার্য্যের জন্য বিভিন্ন কারুকর নিয়োগই প্রকৃত শ্রমবিভাগ।

জাতিভেদ শুধু একই শিল্পের সর্ব্বাঙ্গ একজনের হস্তে ন্যস্ত করিয়াই ক্ষান্ত নহে; প্রত্যুত বহু শিল্পে এক জনকে ব্রতী করে। ছুরী, কাঁচি, দা, বটি, খন্তা, কুড়াল, কোদালী, পাতাম, গজাল, মাদুলী, লাঙ্গলের ফাল, ঘোড়ার নাল

প্রভৃতি দ্রব্যের সমুদয় অথবা অনেক গুলি প্রত্যেক কর্ম্মকারই নির্ম্মাণ করে। শ্রমবিভাগ সাধিত হইলে এই সমুদয় দূরে থাকুক, ইহার একটি দ্রব্যও এক জনে নির্ম্মাণ করিত না। সূত্রধর, কুম্ভকার প্রভৃতি সম্বন্ধেও সেই কথা। সুতরাং জাতিভেদ প্রাচীন অর্থে শ্রমবিভাগ হইলেও আধুনিক এবং প্রকৃত অর্থে নহে। যদি জাতিভেদ শ্রমবিভাগ মূলক হয়, তবে বর্ত্তমান কালে যন্ত্রশিল্পের জন্য ইঞ্জিনিয়ার, ফোরম্যান ও মজুর নামক তিনটি নূতন জাতি গঠন আবশ্যক। কিন্তু এমন কোনও জাতি হইতে পারে না যাহার অন্তর্গত প্রত্যেক ব্যক্তি প্রথমোক্ত দুই কার্য্যের উপযোগী শিক্ষা লাভ করিতে পারে। পক্ষান্তরে হিন্দুসমাজে এমন জাতি অল্পই আছে যাহার মধ্যে দুই এক জন তদুপযোগী লোক মিলিবে না।

তার পর হস্তশিল্পের জন্য কর্ম্মকার, কুম্ভকার, স্বর্ণকার প্রভৃতি জাতির পরিবর্ত্তে, খনিত্রকার, কীলককার, হলকার, ঘটকার, প্রতিমাকার, স্বর্ণকার, রৌপ্যকার, তাম্রকার, প্রভৃতি অসংখ্য জাতি সৃষ্টি করিতে হইবে। আবার ইহার প্রত্যেক জাতিকে প্রত্যেক শিল্পের বিভিন্ন অঙ্গ সাধনার্থ বিভিন্ন উপজাতিতে বিভক্ত করিতে হইবে, ইত্যাদি ইত্যাদি। এই রূপে প্রতিপন্ন হয় যে, পূর্ব্বকালে জাতিভেদের যে সকল প্রশংসনীয় লক্ষণ ছিল, এখন সে গুলি নিরর্থক হইয়া দাঁড়াইয়াছে; কিন্তু দুঃখের বিষয়, দোষগুলি এখনও ফলপ্রসূ।

সমাজে যে দ্রব্যের যে পরিমাণ আবশ্যক হয়, ঠিক সেই পরিমাণই প্রস্তুত হইয়া থাকে, ইহা অর্থনীতি শাস্ত্রের একটী মূল সূত্র। জাতিভেদের অস্তিত্ব এই নীতির ঠিক বিপরীত। প্রথম যখন ব্যবসায় ভেদে জাতিভেদের উদ্ভব হয়, তখন সমাজে যে ব্যবসায়ে যত শ্রমজীবীর আবশ্যক ছিল ঠিক তত শ্রমজীবীই তদ্ব্যবসায়রত জাতিতে পরিণত হইয়াছিল সন্দেহ নাই। কিন্তু কালক্রমে কোন জাতির সংখ্যাধিক্য, কাহারও বা সংখ্যা হ্রাস ঘটিবেই। মনে করা যাউক কোনও এক সময়ে কুম্ভকার জাতি অ'তশয় সংখ্যাবহুল হইয়া উঠিল। কিন্তু সুধু কুম্ভকার সংখ্যা বৃদ্ধিতে সমগ্র সমাজে আবশ্যকীয় মৃৎপাত্রের পরিমাণে উল্লেখযোগ্য কোন বৃদ্ধি ঘটিবে না। কাজেই যদি কুম্ভকারদিগের অন্য ব্যবসায় অবলম্বনে অধিকার না থাকে, তবে পূর্ব্বে যে পরিমাণে মৃৎপাত্রজাত আয় অল্পসংখ্যক কুম্ভকারের ভোগ্য হইত, এখনও সেই পরিমাণ মৃৎপাত্রজাত আয়ই অধিকসংখ্যক কুম্ভকারের মধ্যে বিভক্ত হইয়া তাহাদিগকে দরিদ্রতর করিবে। ভাষান্তরে—আবশ্যক সংখ্যক শ্রমজীবীর মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা বশতঃ

তাহাদের পারিশ্রমিকের হার ন্যূনতর হইবে। পক্ষান্তরে যদি কুম্ভকারদিগের সংখ্যা কমিয়া যায়, এবং অন্য কোন জাতির কুম্ভকার হওয়ার অধিকার না থাকে তবে কুম্ভকারগণ প্রয়োজনানুরূপ মৃৎপাত্র নির্ম্মাণে অসমর্থ হইবে। ইহার ফলে মৃৎপাত্রের মূল্য বৃদ্ধি বশতঃ সমাজের ব্যয়বাহুল্য ঘটিবে, এবং অনেকে তদ্রূপ উচ্চ মূল্য দিতে অসমর্থ হওয়াতে উপযুক্ত রূপ মৃৎপাত্র ব্যবহার হইতে বঞ্চিত হইবে

জাতিবিশেষে শ্রমজীবীর সংখ্যা হ্রাস হওয়াতে সমাজের যে অসুবিধা হয়, তাহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। সকলেই জানেন, বঙ্গদেশের ধোবারা সমাজের উপর বিলক্ষণ অত্যাচার করিয়া থাকে। পয়সা ব্যয় করিতে ইচ্ছা থাকিলেও অনেকের ভাগ্যে বস্ত্রের পরিচ্ছন্নতা রক্ষা করা কঠিন হয়। এদেশে কৃত্রিম ব্যবসায় ভেদ না থাকিলে কখনই এই দুর্দ্দৈব ঘটিতে পারিত না।

জাতিভেদে নৈতিক ক্ষতিও বিস্তর। প্রতিদ্বন্দ্বিসংখ্যা অনির্দ্দিষ্ট থাকিলেও পরাভবের ভয়ে প্রত্যেক ব্যক্তি নিরন্তর স্ব স্ব শক্তির যথাসাধ্য প্রয়োগে মনোযোগী হয়। তন্নিবন্ধন নূতন নূতন কল কৌশলাদি উদ্ভাবিত হইয়া ব্যবসায়ের শ্রীবৃদ্ধি হইয়া থাকে। কিন্তু জাতিভেদ নিবন্ধন কোন ব্যবসায়েই নূতন লোকের প্রবেশাধিকার না থাকাতে কাহারও বড় এরূপ আশঙ্কা নাই যে, নিজের মুখের গ্রাস অপরে কাড়িয়া লইবে। তাই তদ্রূপ প্রখর উদ্যমেরও বড় প্রবৃত্তি জন্মে না। এইটী উন্নতির গুরুতর প্রতিবন্ধক।

জাতিভেদের আর একটি ঘোরতর দোষ আছে। সাধারণতঃ পৈত্রিক দোষ গুণের অধিকারী হইলেও সন্তানগণ স্থল বিশেষে পিতামাতার অননুরূপ হইতে পারে। অহরহই তাহার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়; বৈজ্ঞানিক গবেষণাও এই মত সমর্থন করে; তাই যদিও সাধারণতঃ পৈত্রিক ব্যবসায় অবলম্বন স্বাভাবিক প্রবৃত্তির অনুযায়ী হয়, তথাপি অনেক স্থলে তাহার ব্যতিক্রম ঘটে। তাদৃশ অবস্থায় পৈত্রিক ব্যবসায়ে কাহাকেও লিপ্ত রাখিবার চেষ্টা সময় ও শক্তির অপব্যবহার ব্যতীত আর কি নামে অভিহিত হইতে পারে? প্রত্যেকে স্ব স্ব শক্তি ও প্রবৃত্তি অনুসারে ব্যবসায় নির্ব্বাচন করিলে ব্যবসায়গুলির সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র সমাজের যাদৃশ উন্নতির সম্ভাবনা, অন্যথা তাদৃশ নহে। ইহার কারণ অনায়াসেই বোধগম্য হয়। প্রথমতঃ, হীনশক্তি ব্যক্তিকে উচ্চ কার্য্যে আবদ্ধ করিলে কখনও সাফল্য লাভ হয় না। অথচ তদ্রূপ কার্য্যে লিপ্ত থাকাতে তাহাদের শক্তির অনুরূপ সামান্য কার্য্যও তাহাদিগ হইতে পাওয়া যায় না। স্থূল বুদ্ধিকে

ন্যায়শাস্ত্র অধ্যাপন করিলে না সে নৈয়ায়িক হয়, না তাহা দ্বারা স্থূলবুদ্ধি-সাধ্য সাধারণ কার্য্যাদি হয়। দ্বিতীয়তঃ শুধু জন্মদুর্ব্বিপাকবশতঃ হীনজাতীয় কুশাগ্র বুদ্ধি ব্যক্তিদিগকে সামান্য কাজের উপরে উঠিতে না দিলে তাহাদের অনন্য-সাধারণ শক্তি সমাজের পক্ষে এবং তাহাদের নিজেদের পক্ষেও ব্যর্থ হয়। ব্যব-সায় ভেদ মানিয়া চলিলে সিন্ধিয়া, হোলকার প্রভৃতি রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিত না; কেশব বাবু ধর্ম্ম প্রচারক, কৃষ্ণদাস পাল রাজনীতিবিদ্ ও ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার চিকিৎসক হইতেন না। কৃত্রিম উপায়ে এই সকল পুরুষ-সিংহের প্রতিভা বিকাশ নিরোধ কি সমাজের অপূরণীয় ক্ষতি নয়? তৃতীয়তঃ প্রবৃত্তির অনুযায়ী কার্য্যে যে প্রকার আগ্রহ ও উৎসাহ জন্মে, প্রবৃত্তি বিরুদ্ধ কার্য্যে কদাপি সেই প্রকার জন্মে না। তাই তাহাতে সাফল্য সম্ভাবনাও অত্যল্প। অতএব উন্নতিপ্রয়াসী সমাজের পক্ষে ব্যবসায় নির্ব্বাচনে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা প্রদান সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। বস্তুতঃ যে দেশে প্রতিদ্বন্দ্বিতার দ্বার উন্মুক্ত, সে দেশে রাজনীতি, যুদ্ধ, সাহিত্য, বিজ্ঞান, কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি প্রত্যেক ক্ষেত্রে তদনুকূল সর্ব্বোৎকৃষ্ট শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ আবির্ভূত হন; এবং তাহাই জাতীয় শ্রীবৃদ্ধির দৃঢ়তম সোপান ও প্রকৃষ্টতম প্রমাণ।

কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও জাতিভেদ ব্যবসায়জগতে সুমেরু ও কুমেরু। জাতি-ভেদকে একচেটিয়া নাম দিলে বোধ হয় অন্যায় হয় না। সাধারণতঃ গভর্ণমেণ্ট কোন ব্যক্তি বা সমিতিকে ব্যবসায়বিশেষে যে অনন্য ভোগ্য স্বত্ব প্রদান করেন, তাহাই একচেটিয়া নামে পরিচিত। জাতিভেদও অবিকল তদ্রূপ অনন্যভোগ্য স্বত্ব। এই মাত্র প্রভেদ যে এই স্বত্ব গভর্ণমেণ্টের পরিবর্ত্তে সমাজের আদেশে উৎপন্ন, এবং ইহার ভোক্তা কোন ব্যক্তি বা সমিতির পরিবর্ত্তে জাতিবিশেষান্ত-র্গত সমুদয় ব্যক্তি।

জাতিভেদের অন্যতম লক্ষণ অন্নভেদ। অন্নভেদ সমুদ্র গমনাদি নিষেধ করিয়া আমাদের বাণিজ্যের বিঘ্নোৎপাদন করিতেছে। বাণিজ্যের নৈতিক প্রভাবও প্রচুর। বাণিজ্যবিহীন আমরা সেই প্রভাব হইতে দূরে থাকিয়া নৈতিকভাবেও দুর্ব্বল হইতেছি; এবং দেশের আর্থিক অবস্থার উপর এই নৈতিক দুর্ব্বলতার প্রতিক্রিয়া হয়, তাহা বলাই বাহুল্য।

শ্রীপরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

ইন্স্‌পেক্টিং গুরুর আত্মনিবেদন।

ভূমিকা।

পাঠক, কমলাকান্তের দপ্তর পড়িয়াছেন, চিনিবাস-চরিতামৃত পড়িয়াছেন, ইদানীং নেড়া হরিদাস্‌ও পড়িতেছেন। কিন্তু দেখিয়াছেন, এ কুলের নায়ক কোন গ্রন্থেই নাই। সাহিত্য জগতে এত ধুরন্ধর থাকিতে, ইন্স্‌পেক্টিং গুরুমহাশয় ফল্গু নদীর ন্যায় বিরাজ করিবেন, ইহা বড়ই কষ্টের বিষয়। সুতরাং ক্ষীণ লেখনীর সাহায্যে আমিই দয়াপরতন্ত্র হইয়া অথবা সখ্যানুরোধে তদীয় নিবেদনটী "আলোকে" ছাড়িয়া দিলাম। সহৃদয় পাঠক দেশের গতি চিন্তা করিতে থাকুন।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

উপরি-মাহাত্ম্য।

নর্ম্মালে ত্রৈবার্ষিক পরীক্ষায় পাস করিয়া পঞ্চবর্ষ বঙ্গ-বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করিয়াছিলাম, সে আজ অনেক দিনের কথা। তখন লোকে মনে করিত, চাকুরেরা বড় সুখী। সুখ ছিল বটে, কিন্তু ঢেঁকির সুখ স্বর্গেও নাই। অধিকন্তু সেখানেও নারদ মহাশয় তাহার পৃষ্ঠে অধিষ্ঠিত। একদা আমাকে এক বৃদ্ধ বেতনের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি এ কথা—সে কথা দিয়া চাপা দিতে চাহিলাম। কিন্তু বহুদর্শী পুরুষ ছাড়িবেন কেন? ৮।০ করিয়া হার ফেলিতে লাগিলেন। অগত্যা যাহা পাই, বলিলাম। শুনিয়া তিনি আমার "উপরি পাওনা" সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন। বৃদ্ধেরা মনে করিতেন "অন্নে কি হয়, কাপ্তেনিতে মারে।" যে উপরি না পায়, তাহার চাকুরি বৃথা। যাহার যত উপরি-প্রাপ্তি, সে তত বড় চাকুরে, বুদ্ধিমান ও ক্ষমতাপন্ন। সুতরাং তিনি যখন শুনিলেন, আমাদের কার্য্যে উপরি নাই, তখন ওষ্ঠাধর বক্র করিয়া বলিলেন, তথাপি আপনি এমন কার্য্যে আছেন? ইহা অপেক্ষা প্যাদাগিরিতেও পয়সা আছে। উপরি না পাইলে, এ চাকুরিতে কি হইবে। অর্থ চাই—অর্থ চাই। আপনি ভদ্র সন্তান—অন্য কার্য্যের চেষ্টা দেখুন।

বৃদ্ধের মন্তব্য শুনিয়া ঈষৎ হাসিয়া চলিয়া গেলাম। কিন্তু মনের মধ্যে বহুক্ষণ কথাগুলি বাজিতে লাগিল। ভাবিলাম, লোকে এইরূপেই অর্থ দ্বারা মানব-জীবনের সুখ দুঃখ—গৌরব অগৌরবের তৌল করিয়া থাকে; সাধুতা অসাধুতার প্রতি লক্ষ্য করে না। আমি শিক্ষকতা করিতেছি। ১৫টী টাকা বেতন পাই। আর ঐ যে গোমস্তাটী, মাত্র ৫৲ টাকায় নিযুক্ত আছে, সে আমা অপেক্ষা ভাগ্যবান্; কেননা, সে উপরি পায়। ভাবিতে ভাবিতে একটী গান মনের মধ্যে বাজিয়া উঠিল, "যার পয়সা নাই রে ভাই, সংসারে তার মরণ ভাল।" কথাটী অক্ষরে অক্ষরে সত্য। যদি সংসারী হইতে হয়, তাহা হইলে অর্থের প্রয়োজন অনিবার্য্য। কত রকম অভাবের তীব্র স্রোত আসিয়া আমাদিগকে ওতঃপ্রোত করিয়া তুলে, তাহার প্রতিকার চিন্তায় আমরা তখন অবশ হইয়া পড়ি। তখন আর কথায় চিঁড়া ভিজে না। সাধুতায় আত্মরক্ষা হয় না। পেটে ত কিছু গুঁজিতেই হইবে,—সম্মান ত রাখিতেই হইবে। সুতরাং অন্য কোন রূপ অর্থকর পথ অবলম্বন করিতে হয়। তাহা সৎই হউক আর অসৎই হউক, চিন্তার অবসর থাকে না। এই সংসারে কত বিএ-কে দেখিলাম, দারোগা বাবু হইয়া পশু সাজিয়াছেন। টাকার টুন্ টুন্

ঝুম্ ঝুন্ আর রসময় তদন্তের তড়িৎপ্রবাহ তাঁহাদিগের কলেজের মরেল্ ফিলজফিকে (নীতিদর্শন) কোথায় বিতাড়িত করিয়া ভাসাইয়া দিয়াছে। তখন তাহাতে, আর এণ্ট্রেন্স ফেল হেড্ কনেষ্টবলে কোন প্রভেদই রহে নাই। এমনি আশ্চর্য্য পরিণাম!!

শিক্ষা চর্চ্চা করিতে করিতে এবং নীতিমার্গ বাঁধিতে বাঁধিতে আমাদিগের ধারণা হইয়াছিল, অর্থে ও মনুষ্যত্বে অনেক প্রভেদ। ফলতঃ মনুষ্যত্ব জগতের অমূল্য সামগ্রী সন্দেহ নাই; কিন্তু লোকসমাজে অর্থের আসন অনেক উচ্চ। যে ব্যক্তি বিদ্যারত্নে ভূষিত, সেও অর্থের নিকট করযোড়ে দণ্ডায়মান;—কিছু উপকার হয় কি না? কিন্তু মনুষ্যত্বের চিন্তা করিয়া এই ভব-সংসারে কয়জনে আত্মবলি দিতে পারেন? কয় জন পেটের ক্ষুধা লইয়া, সংসারের অভাবজনিত তীব্র যন্ত্রণায় পীড়িত হইয়া স্থিরচিত্তে মনুষ্যত্ব রক্ষা করিতে পারেন? এইরূপ লোকের সংখ্যা অতি বিরল। কর গণিয়াই নাম নিঃশেষিত করা যায়। শিক্ষকতার পবিত্র আসনে সমাসীন থাকিয়া আমি মনুষ্যত্বের যতই গৌরব করিতেছিলাম না কেন, লোকে কিন্তু আমার সারবত্তা চিন্তা করিয়া বলিত, "ওঃ, পণ্ডিত! উঁহার লেখা পড়ার মূল্য ১৫ টাকা বৈ ত নয়। আমি যে সরকার মহাশয়ের কাছে, শিশুবোধক ও শুভঙ্করী শিখিয়াছিলাম, আমি অমন ১৫ টাকা বেতনের ২।৪ জন লোক অনায়াসে রাখিতে পারি। উপরি ব্যতিরেকে কি সংসার চলে? গ্রাম্য স্ত্রীসমাজে শুনিতে পাই, "উপরি ভাবের" কথা হইলে, প্রাচীনাগণ অতিশয় ব্যস্ত-সমস্ত হন। উপরিদৃষ্টি বলিলে, উপদেবতার আক্রমণের শঙ্কা হয়। কিন্তু বিষয়ী সমাজে "উপরি" কথাটী মদের চাট্নীর কার্য্য করিয়া থাকে।

যাহা হউক, নানারূপে বিরক্তি বোধ হইতে লাগিল। প্রথম নম্বর সেক্রেটরী বাহাদুরের প্রভাব। শিক্ষক মহাশয় তাঁহার অধীন; সুতরাং তাঁহার বিশ্বাস, তিনি মুরুব্বি। বিদ্যার দৌড় যতই থাকুক, হুকুমের চোটটা পূর্ণমাত্রায় চলিতেছিল। ২০ টাকা বেতনের রসিদ দিয়া ১৫ টাকা লইতে হয়, নতুবা গবর্ণমেণ্ট সাহায্য বজায় থাকে না, সঙ্গে সঙ্গে সেক্রেটরী বাবুর তহবিলেও কিঞ্চিৎ যোগদান হয় না। তথাপি উঠিতে বসিতে তাঁহার অসন্তোষ। একদিন একটী ছাত্র বিদায়ের দরখাস্ত আনিয়া উপস্থিত করিল। দেখিলাম, মাথাধরার জন্য ৫ দিনের ছুটি প্রার্থনা। কথাটা মিথ্যা বলিয়া সন্দেহ জন্মিল। বালককে তিরস্কার করিতেই, সে বলিয়া উঠিল, "পণ্ডিত মহাশয়েরা ১৫ টাকা পাইয়া যদি ২০ টাকা বেতন লিখিয়া দিতে পারেন, তাহা হইলে, আমাদের ৫টা দিন বরং মাথাই ধরিল।"

বালকের অশিষ্ট উত্তর শুনিয়া বড় রাগ হইল। সক্রোধে তাহার ৷৹ আনা জরিমানা করিলাম। কিন্তু কথাগুলি হৃদয়ে বাজিতে লাগিল। ভাবিলাম, এ জীর্ণ ভিত্তির উপর নীতির সৌধ কেমন করিয়া প্রতিষ্ঠিত থাকিবে? এত দুর্ব্বলতা কেন? সেক্রেটরীকে গোপনে এই পাঁচ টাকা উপরি দিয়া নরকের পথ প্রশস্ত করিতেছি কেন? এইরূপ ভাবিতে ভাবিতেও পূর্ব্ববৎ জীবনের পথ বাহিয়া চলিলাম। দেখিতে দেখিতে ছয় মাস কাটিয়া গেল। সুখে গেল, কি দুঃখে গেল, তাহার সূক্ষ্ম হিসাব দেওয়া অনাবশ্যক। তবে এ কথা ঠিক; যে দিন বাড়ীর পত্র আসিত, সে দিনই মাথা ঘুরিত। বড় ঘরের চালে ছন নাই;—বৃষ্টি আসিলেই ভিজিতে হয়; পাকের ঘরের খুঁটী নড়িতেছে; একটু ঝড় আসিলেই ধরণীর মুখ চুম্বন করিবে; মুদী খাতা বগলে ২।১ দিন পরেই তাড়া দিতেছে—অন্ততঃ গত বকয়া শোধ করিতে হইবে;

শ্যালিকা-দুহিতার সপ্তামৃতে নিমন্ত্রণ হইয়াছিল, মাঘের জন্য টাকা কাপড় পাঠাইতে হইবে; পিসীমার পৌত্র হইয়াছে, আগামী মাসেই অন্নপ্রাশন, কিছু আশীর্ব্বাদ না দিলে চলিবে না। কন্যা শৈলবালার শ্বশুর পরলোকগত হইয়াছেন,—শ্রাদ্ধে লৌকিকতা না দিলে, কুটুম্বিতায় ঘুণ ধরিবে, শৈল মুখ দেখাইতে পারিবে না। এদিকে বাড়ীতে গৃহিণীর বস্ত্রাভাব, সূচিকা-সূত্র-সংযোগে লজ্জা রক্ষা করিতেছেন, আর চলে না; পুত্রের জুতা পিরাণ নাই, কি লইয়া অন্নপ্রাশন দেখিতে যাইবে? সে দিন ছোট মামার জামাতা আসিয়াছিলেন, পর্য্যায়ের কুলীন, সুতরাং তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করিতে যাইয়া ক্ষেতুর পিসী হইতে পাঁচ টাকা হাওলাত করিতে হইয়াছে; এখন বাজার একটু রস দেখা যায়, ১০৲ টাকার চাউল রাখিয়া দিলে হইত। যে কাঠ মজুত ছিল তাহা এক প্রকার নিঃশেষ হইয়াছে, আর ৭।৮ দিন চলিতে পারে, সুতরাং এখন কাঠের সংগ্রহ না করিলে চাউল থাকিতেও "হরিবাসর" হইবে। ইত্যাকার বহু হিসাব মণ্ডিত অভাবমণ্ডলমুখরিত, কটুকষায়পদরাজিরঞ্জিত পত্রখানা, দর্শনে—হৃৎকম্পন, স্পর্শনে—ললাটে স্বেদ সঞ্চরণ, এবং পঠনে কণ্ঠতালব্য দন্তৌষ্ঠ বিশোষণ হইতে থাকিত। এদিকে শর্ম্মার তহবিলে তিনখানি মাত্র সিকি বর্ত্তমান; তন্মধ্যে সভাসুন্দর মহাশয় এখনই একখানা আবার করিয়া নিবেন। ওদিকে বেতনের প্রাপ্য মোটেই সপাদমুদ্রাদ্বয়ং অবশিষ্ট। সুতরাং যোগ বিয়োগের খতিয়ান করিয়া দেখিলে গৃহিণীর বরাবরে আনাদ্বয়াধিক সার্দ্ধ দ্বিতঙ্কা প্রেরণ করা যাইতে পারে। কিন্তু তাহা হইলে গৃহিণী হয় পিত্রালয়ে পলায়ন করিবেন নতুবা গলে রজ্জু আঁটিবেন। উপায় কি?

এ বিপদকালে হুঁকার ন্যায় নর্ম্মসহচরী দ্বিতীয় নাই। সুতরাং ধুস্তুরকুসুমসন্নিভ কলিকা-মুকুটার্পিতা শ্রীমতীর মুখারবিন্দে ওষ্ঠাধর সংলগ্ন ও অর্দ্ধভগ্ন কেদারায় পাঞ্চভৌতিক নশ্বর দেহ স্থাপন করিয়া বিধূত চরণে সজোরে ইঞ্জিন চালাইতাম। তখনকার উদাস দৃষ্টি লক্ষ্য করিলে আমাকে মহাভাবুক কবি বলিতে] কাহারও আপত্তি হইত, এরূপ বোধ হয় না। এইরূপ অবস্থায় কলিকামলদাহসম্ভূত দুর্গন্ধও আমার সংজ্ঞা প্রবুদ্ধ করিতে সক্ষম হইত না। নিতান্তই যখন আর ধূম নিঃসৃত হইত না, তখন অগত্যা হুঁকা প্রণয়িনীর সহিত বিচ্ছেদ সাধন করিতে হইত। তাহাকে বৈঠকরূপ জনকগৃহে সন্নিবেশিত করিয়া শয্যায় চিন্তাদগ্ধ কলেবর লম্বমান করিয়া দিতাম; অথবা দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক ডাক্তার বাবুর তাসের আড্ডায় যাইয়া আশ্রয় লইতাম।

জীবনের একটানা স্রোতে সময় সময় এইরূপ দুই একটি বেসামাল ঝড় উঠিত। সুখের বিষয় আমি জলমগ্ন হইয়াও মরিতাম না, তখন কবিতা মনে পড়িত—

"সাপে বাঘে যদি খায়, মরণ না হবে তায়,
চিরজীবী করিল গোঁসাই।"

এমন সময় একটী "সিভিল ওয়ার" (civil war) ঘটিবার অলক্ষ্যে সূচনা দেখা দিল। একদিন দেওয়ানজী মহাশয় প্রস্তাব করিলেন, সেক্রেটরী বাবুর ইচ্ছা, আমি তাঁহার পুত্রকে গৃহে শিক্ষা দেই। তিনি দুই টাকা বেতন দিতে প্রস্তুত আছেন। মাস মাস না পারিলেও বর্ষের সময় দেনা পাওনা পরিষ্কার হইবে। আমি দেওয়ানজীর উল্লেখ করাতে বোধ হয়, অনেকে

মনে করিতেছেন, সেক্রেটরী বাবুর আমলা অসংখ্য। ফলতঃ তাহা নহে। "সবে ধন নীলমণি।" বেতন ৫৲ টাকা মাত্র। লোকে বলে, ইহাতেই তিনি বার পোয়া তিন শত টাকা পাইয়া থাকেন। শত্রুগণ বলে, "বার আধে ছয় শ'র কম নহে।" উপরিতে লক্ষ্মী আছেন। দেওয়ানজী বলিলেন, "মন্দ কি? বার দ্বিগুণে চব্বিশ টাকা কেন ছাড়িয়া দিবেন?" আমি ভবিষ্যচ্চিন্তা করিয়া চাকরির মায়ায় স্বীকার না পাইবাই বা কি করি? বলিলাম সেক্রেটরী বাবুকে বলিয়া কহিয়া কিঞ্চিৎ "বৃদ্ধির" চেষ্টা দেখিবেন, এই অনুরোধ।

বৃদ্ধি যে হইবার নহে, তাহা পূর্ব্বেও জানিতাম, কার্য্যেও দেখিলাম। অধ্যাপনা চলিতে লাগিল। "কড়ি ও কোমলে" উপদেশ দিতে লাগিলাম, কিন্তু কিছুই ফলাহইল না। ছবির প্রলোভনে হৃদয় অধিকার করিতে প্রয়াস পাইতাম; সে ছবি দেখিয়াই কাটাইত; শব্দের প্রতি লক্ষ্যও করিত না। পীড়াপীড়ি করিলে ফ্যা ক'রিয়া কাঁদিয়া দিত এবং স্বীয় জননীর নিকট যাইয়া মিছামিছি বলিত,—আমায় পণ্ডিত মহাশয় একক্রমে ২০টা কাণমলা দিয়াছেন। গুণধর পুত্রের কথা অবিশ্বাস করিতে নাই। সুতরাং আমার উপর প্রায়ই বামাকণ্ঠে আশীর্ব্বাদবর্ষণ হইত। শেষে এমন হইয়া দাঁড়াইল যে, সেক্রেটরীকুলপ্রদীপ আদবেই পাঠগৃহ আলোকিত করিতেন না। মৎস্যনিধন, কপর্দ্দকবাসন, বিটপি-বিহরণ ও বিহঙ্গপোষণ—এই চতুর্ব্বর্গসাধনে তাহার বিশেষ অনুরাগ পরিলক্ষিত হইত। কেহ কেহ বলেন, এ সময় উপযুক্ত শিক্ষক পাইলে প্রাণিবিজ্ঞানে উঁহার অনেক উন্নতি হইতে পারিত। কিন্তু আমাদের সেই ট্রেনিংস্কুলের অধীত শিক্ষাপ্রণালী তাহাকে কিছুতেই করায়ত্ত করিতে সমর্থ হইল না। তখন ভাবিলাম;—

"লোচনেন বিহীনস্য দর্পণং কিং করিষ্যতি?"

দুই টাকায় প্রকাণ্ড আপদ কিনিয়াছি বটে। এ সময় আর একটি কৌতুকাবহ ঘটনা উপস্থিত হইল।

মধ্যম পরিচ্ছেদ।

গুপ্ত অধ্যাপনায় সুখ।

শ্যালক পর্য্যায়ে অনেক ভাবস্রোতঃ মধুরে প্রবাহিত হয়। পৃথিবীতে ভগিনী থাকিলেই শ্যালক হইতে হয়। তথাপি শ্যালক সম্বোধনে অতি বড় ভাল মানুষেরও অভিমান জাগে। প্রাকৃত লোকের যে মস্তিষ্ক উত্তপ্ত হইবে, তাহাতে আর বৈচিত্র্য কি? ইংরেজ এদেশে রাজত্ব না করিলে, শ্যালক সম্বোধনে ভগিনীপতিশাসন অসম্ভব হইত। সুতরাং মাদৃশ লেখকের হয়ত মানহানির দায়ে "সজুতচ্ছত্রপোর্টমেন্টম্" বিক্রয় করিয়াও হাজতে সরিষাফুল দেখিতে হইত। কিন্তু সাবধান আছি। পাঠক মহাশয়গণ বড়বুকে শ্যালক পর্য্যায়ে যেরূপ উপসর্গ আঁটিতে হয় আঁটুন। আমি অতি সন্তর্পণে বলিতেছি; যখন ঈদৃশ অধ্যাপনা-সুখ-লাভে কৃতকৃত্য হইতেছিলাম, তখন একদিন শুভ মধুমাসে সেক্রেটরী বাবুর সহধর্ম্মিণীর মাতুলপুত্র ভগিনী-ভাগিনেয় সন্দর্শনে আসিলেন। কলিকালে প্রাচীন ব্যক্তিগণ তরুণদলের শ্বশুরকুলানুরাগের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন। কিন্তু তাঁহারা পশ্চাদ্দৃষ্টিসম্পন্ন নহেন। নতুবা দ্বাপরেই যখন কুরুকুলে

শ্যালকের অথণ্ড প্রতিপত্তি ছিল, তখন একপাদধর্ম্মবিশিষ্ট কলিযুগে যে অতিথিসৎকার বিলুপ্ত হইবে, ইহা নির্ম্মম নিঃশঙ্কচিত্ত ব্যক্তি ভিন্ন কেহই কামনা করিবে না। এক দিন এই শ্রীমান্ চাপ্রেশ্বরের মামাবাবু সন্ধ্যাবেলা সেক্রেটারীবাবুর সহিত বৈঠকখানার প্রাঙ্গণে মলয়ানিলবিধূত চন্দনতরুবৎ বিরাজ করিতেছিলেন। নিকটে নীরেশ্বর দাঁড়াইয়া মনে মনে নিজকার্য্যের "রুটিন" করিতেছিল। মামাবাবু তাহাকে নিকটে টানিয়া নামধাম জিজ্ঞাসা করিলেন। নীরু পিতামহ ও প্রপিতামহের নাম বলিতে পারিল না। পরন্তু "কার দৌহিত্র?" জিজ্ঞাসা করায় সেক্রেটরী বাবুর নাম বলিয়া ফেলিল। মামা বাবু বলিয়া উঠিলেন "তুইও গাধা, তোর মাষ্টারও গাধা।" কি সর্ব্বনাশ। নন্দনের এই আকস্মিক পরাভবে সেক্রেটরী বাবু আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। সাক্ষাৎ করিবামাত্রই তিনি অগ্নিমুখে আমাকে বলিয়া উঠিলেন "আপনি অতি অযোগ্য—অতি অযোগ্য। আমি আপনার পাঁচ টাকা জরিমানা করিলাম।" আমি ত অবাক্, ব্যাপার কি তখন পর্য্যন্ত কিছুই বুঝিতে পারি নাই। সুতরাং হেতুজিজ্ঞাসু হইলাম। তিনি ভ্রূভঙ্গি করিয়া বলিলেন "ছেলেটা আমার বাপ-দাদার নাম বলিতে পারিল না, আপনি ভারি ত পড়াচ্ছেন। এ হ'লে, ওর পাছে আমি মাস মাস বৃথা এতটা খরচই বা কচ্ছি কেন?" আমি বলিলাম, "ক্ষমা করুন, অতঃপর মহাশয় কুলজীনামা দিলে, বাপদাদার নাম কেন, চতুর্দ্দশ পুরুষের নাম শিখাইয়া দিব। আমি ত পূর্ব্বে জানিতাম না, ইহাও পণ্ডিতের শিখাইতে হইবে।" কথা শেষ না হইতেই তিনি বলিয়া উঠিলেন, "আপনি বেশী কথা কহিবেন না। আপনার এখনও শিখিবার অনেক আছে।" আমি আর দ্বিতীয় বাক্যব্যয় না করিয়া, মনে মনে নিজকে ধিক্কার দিতে দিতে বাসায় আসিলাম। কালে পুত্রশোক পর্য্যন্ত শমিত হয়, সুতরাং এ অপমান জীর্ণ করিয়া লইলাম। পড়িয়া পাঠক অবশ্যই আমাকে গালি দিতেছেন। কিন্তু কি করিব? কুম্ভীরের সঙ্গে বিবাদ করিয়া নদীতে বাস করা অসম্ভব। এখন মনে মনে উৎকট আগ্রহ, কেমন করিয়া এ নদী পরিত্যাগ করি, "এডুকেশন গেজেট" দেখিয়া, সপ্তাহে সপ্তাহে দরখাস্ত পাঠাইতে লাগিলাম, কিন্তু টিকিট ব্যয়ই সার হইল। আমার গুণের মর্য্যাদা কেহই করিল না। এইরূপে দিনের পর দিন চলিয়া গেল।

এক দিন প্রভাতে উঠিয়া ধূমপানে মনঃসংযম করিয়া আছি, এমন সময় সেক্রেটরী বাবুর নিকট হইতে তলব আসিল। যাইয়া দেখি, কবিরাজ মহাশয় ও রামহরি ডাক্তার উপস্থিত। আমি যাইবামাত্রই সকলে বলিয়া উঠিলেন, "এই যে পণ্ডিত মহাশয় আসিয়াছেন।" সম্ভাষণেই বুক কাঁপিল। পর মুহূর্ত্তেই সেক্রেটরী বাবু গৃহমধ্য হইতে বাহিরে আসিলেন। একবার বসিতেও বলিলেন না। পরুষ ভাষায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি সত্যই নর্ম্মাল পাস্ করিয়াছিলেন?" কিছু বলিবার পূর্ব্বে প্রায়ই এইরূপ একটা ভূমিকা হইত। স্বরশ্রবণে ভাবিফল অনুমান করিতে তখন আর বিশেষ কষ্ট হইত না। সুতরাং আর প্রশ্ন করিলাম না। তিনি আপনিই বলিতে লাগিলেন। ছেলেটা কাল ১২টার সময় রাখালদের পুকুরে লক্ষ ডুব মারিয়াছে। ৫টার সময় শশীদের বাড়ীর জামরুল গাছে উঠিয়া ৫০০ জামরুল খাইয়াছে। আপনি তাহা শাসন করিতে পারেন নাই। আর আজ ছেলেটা জ্বরে মারা যায়। আহারাদি অপেক্ষাও কর্ত্তব্যনিষ্ঠা গুরুতর। ছেলের যদি তত্ত্বাবধান না লইতে পারেন, তবে আপনাকে

রাখিয়া লাভ কি? এজন্য ডাক্তার কবিরাজকে যাহা দিতে হইবে, তাহা আপনার বেতন হইতে কাটা যাইবে। আপনি কাল আসিয়া আপনার হিসাব পরিষ্কার করিয়া লইবেন।

ইহার উত্তর আর কি দিব? কেবল এই বলিলাম, "মহাশয় এক কথায়ই হিসাব পরিষ্কার করিয়াছেন। বোধ হয়, এখন আমার দেনা ব্যতীত পাওনা আর দুই মাসেও হইবে না। আমাদ্বারা ফলতঃই ইহার শিক্ষাবিধান অসম্ভব! এখন ঈশ্বর করুন, শ্রীমান্ সত্বর জ্বর হইতে মুক্ত হউক।" এই বলিয়া একখানা টুলের উপর বসিয়া পড়িলাম। সেক্রেটরী বাবু কবিরাজ মহাশয়কে সম্বোধন করিয়া আমার অযোগ্যতার ইতিহাস আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। যখন নিতান্ত অসহ্য বোধ হইল, তখন বিনা বাক্যব্যয়ে বাসায় চলিয়া গেলাম। পৃথিবীর উপরে কিঞ্চিৎ রাগ হইল। মানুষে কেন ধনীর মন রাখিতে গিয়া দুর্ব্বলতার পরিচয় দেয়? অত্যাচারের প্রতিবাদে কেন সাহসী হয় না? কিন্তু এ শর্ম্মাও যে ভীরু, তাহা তখন বিচারে আসিল না। লোকচরিত্রে এটুকুই বৈচিত্র্য!

বাসায় বসিয়া মনের ভিতর তুমুল ঝটিকার তাড়না অনুভব করিতেছি। একবার ভাবিতেছি, ইন্স্‌পেক্টর আফিসে সমস্ত খুলিয়া লিখি। তর্ক আসিল তাহাতে "ফলং নৈব চ নৈব চ"! পরন্তু আমারই বিপদ! আবার ভাবিতেছি, কুচক্র করিয়া স্কুল ভাঙ্গিয়া দি। বিবেক বলিল, তাহা নিতান্ত কাপুরুষের কার্য্য। তাহা অপেক্ষা তুমি পদ পরিত্যাগ কর না কেন? ভাবিতে ভাবিতে লিপিযন্ত্র লইলাম। এমন সময় ডাকহরকরা একখানা পোষ্টকার্ড ও একখানা লেপাফা দিয়া গেল। পোষ্টকার্ডে দেখিলাম, সপ্তাহের মধ্যেই ডেপুটী ইন্স্‌পেক্টর বাবু স্কুল পরিদর্শনে আসিবেন; সুতরাং স্কুলের সমস্ত কাগজ পত্র সুশৃঙ্খল করিয়া রাখিবার জন্য সব ইন্সপেক্টর বাবু উপদেশ দিয়াছেন। লেপাফা খানা ছিঁড়িয়া দেখি, একখানা সার্কুলারে বেত্রাঘাতের নিয়মানুশাসন।

শৈশবাবধি জানিতাম, "মূর্খস্য লাঠ্যৌষধম্"—মূর্খের ঔষধই লাঠী। অপরঞ্চ "লালনে বহবো দোষাস্তাড়নে বহবো গুণাঃ। তস্মাৎ পুত্রঞ্চ শিষ্যঞ্চ তাড়য়েৎ নতু লালয়েৎ॥" কিন্তু এখন আর সেই নীতি চলিতেছে না। এখন "শিষ্যং মিত্রবদাচরেৎ"। বাপু ধন বলিয়া, কখন বা ক্রীড়ায় স্বয়ং যোগদান করিয়া, সময়বিশেষে ভোজনের নিমন্ত্রণ করিয়া, ছাত্রের হৃদয় আকর্ষণ করিতে হইবে। একান্ত অসহনীয় দুশ্চরিত্রতা প্রকাশ পাইলে, কিঞ্চিৎ বেত্রপ্রহারের মৃদু মাত্রা (dose) চালাইতে হইবে। উচ্চ মস্তিষ্কের সিদ্ধান্ত এই, বেত্রাঘাত করিলেই আত্মসম্মান দেহত্যাগ করিবে। যাহারা যৌবনের সীমান্তে বা স্রোতে ভাসমান, বেত্র তাহাদের সম্মানে আঘাত করিয়া লজ্জায় ম্রিয়মাণ করিতে পারে। কিন্তু যে সকল বালক লক্ষ নালিশ উপস্থিত করিবে, তাহাদের পক্ষে বেত্রের ন্যায় সন্ত্রাসদণ্ড আর কিছুই নাই। ছাত্র পুত্রবৎ স্নেহাস্পদ। সুতরাং প্রহারের সময় কিঞ্চিৎ সাবধান হইলে, বিশেষ কি অনিষ্টের সম্ভাবনা আছে, বুঝি না। এত দিন বেত্রদণ্ডে উপকার ব্যতীত অপকার কিছু মাত্র পরিলক্ষিত হয় নাই। প্রত্যুত এতাবৎ উক্ত দণ্ডভোগীরাই আত্মমর্য্যাদার প্রকৃত দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গিয়াছেন। এখন কিন্তু আত্মমর্য্যাদার বৃদ্ধিতে মানের ক্ষতিপূরণের নালিশ অসংখ্য। অনেকে আবার ইহাকে একটা ব্যবসার সোপান করিয়া তুলিয়াছেন। যাহা হউক, ঊর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষের এ আদেশের পূর্ব্বেই কেহ কেহ এই সার্কুলারের মর্ম্ম প্রতিপালন করিয়াছেন।

আমি জানি, কোনও এণ্ট্রান্সস্কুলের হেড মাষ্টার বাবু নিদাঘের নিদারুণ গ্রীষ্মেও অন্যান্য মাষ্টারদের হাতে পাখা রাখিতে দিতেন না। ভয়, যদি পাখার বাঁটদ্বারা ছাত্রে প্রহার করা হয়। আমি বলি, এত ভয় থাকিলে, শিক্ষক মহাশয়দের মুখে এক একটা লাগাম আঁটিয়া দেওয়া ভাল, এবং হস্ত পদে রজ্জু সংযোগ করিয়া রাখাই নিরাপদ। নতুবা এমনও হইতে পারে, কোন শিক্ষক অন্যবিধ দণ্ড দিতে না পারিয়া হয়ত ক্রোধভরে ছাত্র দংশনে ধাবিত হইবেন। এখন দুর্ব্বল বাঙ্গালী-নন্দনকে টুলের উপর দাঁড় করাইলেও বিপদ। অনেক সময় অনেকে মূর্চ্ছিত হইয়া শিক্ষককে "ত্রাহি মধুসূদন" ডাকাইয়াছে। জরিমানা করাকে প্রকারান্তরে অভিভাবকের নিকট হইতে বলপূর্ব্বক চাঁদা সংগ্রহও বলা যাইতে পারে। যাহা হউক, আমার এ ক্ষীণ বক্তৃতায় কিছু আসিবে যাইবে না।

অনন্তর একদিন ডেপুটী ইন্সপেক্টর বাবু শরচ্চন্দ্রের ন্যায় আমার বিদ্যালয়-গগনে সমুদিত হইলেন। সঙ্গে বণিক্যবেশধারী সব ইন্সপেক্টর বাবু। ইঁহারা আর কিছু পারুন আর না পারুন, আমাদিগের উপর মুরুব্বিয়ানাটা বিলক্ষণ ঝাড়িয়া যান। ১ ঘণ্টার স্কুলের মধ্য হিসাব-ছাত্রপরীক্ষা সমাপ্ত করিয়া হুকুম দিলেন, "দপ্তরীকে দিয়া পরিদর্শনবহী পাঠাইবেন"। মস্তক পাতিয়া আদেশ গ্রহণ করিলাম। বলিতে কি, যাবৎ ডেপুটী ইন্সপেক্টর বাবু স্কুলে ছিলেন তাবৎ আমি গরুড় পক্ষীর ন্যায় করযোড়ে দণ্ডায়মান ছিলাম। যাইবার সময় সেক্রেটরী বাবুর দুর্ব্যবহারের কথা বলিয়া ইন্সপেক্টিং পণ্ডিতী প্রার্থনা করিলাম। তিনিও ভরসা দিলেন। তখন বুঝি নাই, "১১ হাত কাঁকুড়ের ১৩ হাত বীচি" আছে।

সেক্রেটরী বাবুর বাড়ীতে পরিদর্শক মহাশয়দের নিমন্ত্রণ ছিল এবং খান্‌সামাদের নিকট শুনিয়াছি, সে দিন অতিথিসৎকারে ১ মণ মিহি বাদশাভোগ চাউল খরিদ হইয়াছিল। সুতরাং সৎকৃত নিন্দাবাদ অক্ষরে অক্ষরে সেক্রেটরী বাবুর কর্ণে উঠিল এবং পরদিন আমারও তথাকার অন্নজল উঠিল।

শেষ পরিচ্ছেদ।

ভাগ্য পরিবর্ত্তনে ভব চিন্তা।

অবসর গ্রহণ করিয়া ছয় মাস বাড়ীতে ছিলাম। কিন্তু ইহাতেই আমি প্রকৃত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি। ভৌগোলিক পণ্ডিতগণ পৃথিবীকে কমলালেবু বা কদম্বকুসুমবৎ বর্ণনা করিয়াছেন। আমি সংসারকে মাকালফলবৎ গোলাকার দেখিতেছি। পৃথিবীর দুই দিক চাপা, কিন্তু ইহার সব দিকই চাপা। সংসার গোল বলিলে, কেহ কেহ সংশোধন করিয়া পূর্ব্বপদে সপ্তমী বিভক্তি প্রয়োগ করিতে উপদেশ দেন। আমি বলি, ইহাকে বিভক্তি চক্রে না ফেলিয়া দেখিলে, দ্বিবিধ উপায়ই সাধিত হইতে পারে। যেই সংসার, সেই গোল—বলিলেই বা ক্ষতি কি? ইহাতে কর্ম্মধারয় বিলক্ষণ বিদ্যমান আছে। আমি ব্যাকরণ নিয়া বড় ঘাঁটিতেছি, দেখিয়া সাহিত্যসংস্কারক ভায়া, বিশেষতঃ পণ্ডিতেতর ব্যক্তিগণ বিরক্ত হইতেছেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু পণ্ডিত সমাজের ইহা ব্যবসায়সিদ্ধ ধর্ম্ম। এ সমাজে এত চলাচলি যে, সিংহ মহাশয় হিন্স্‌ ধাতু হইতে উৎপন্ন। বর্ণ বিপর্য্যয়েও পণ্ডিতসমাজে

বঞ্চিত নহেন। যাহা হউক, সংসারকে আমি মাকালফলবৎই স্থির করিয়াছি। কারণ অভ্যন্তরে বাহ্য বর্ণের একান্ত অভাব। ইহা পৃথিবীর ন্যায় ইক্ষু ক্ষীর সর্পিঃ প্রভৃতি সমুদ্রগণ দ্বারা বেষ্টিত নহে। একটী লবণাক্ত লতায় ঝুলিয়া আছে। উহার নাম মায়া। এ লবণের বিশেষত্ব এই, একটু তীব্র সুরার অভ্যুক্ষণ আছে।

যাহা হউক, সপ্তম মাসে মায়াপাশ ছেদন পূর্ব্বক প্রাচীন ব্যাগের জীর্ণ সংস্কার সম্পাদন করিয়া ভাগ্যপরীক্ষায় বাহির হইলাম। আহা, উমেদারের কি মনোমোহন বেশ। মস্তকের কেশপাশ রচনা রাহিত্যে মলিন, বসন ও অঙ্গাবরণ রজক নিগ্রহে শ্রীহীন, পাদুকা যুগল বহুপর্য্যটনে ছিন্ন সন্ধি, আতপত্র বার্দ্ধক্য বশতঃ বিবর্ণ ও ছিদ্রসঙ্কুল, এবং সুদুর্ল্লভ মানবকলেবর অকাল ভোজন ও কদন্ন সেবনে বিশীর্ণ; তদুপরি দুশ্চিন্তা দুর্ভাবনায় সতত অবসন্ন। প্রভাতে যে আশার কমনীয় কর ধারণ করিয়া বহির্গত হইতে হয়; সন্ধ্যার সময় হয়ত তাহাকে হারাইয়া নৈরাশ্যের প্রকাণ্ড ভার মস্তকে বহনপূর্ব্বক বাসায় ফিরিতে হয়। সম্পৎসময়ে যিনি হয়ত দর্শনমাত্রে দণ্ডায়মান হইয়া "আসুন—আসুন" বলিয়া বসাইতেন, কালচক্রে তাঁহারই অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষায় কিম্বা একটী কথা শুনিবার বাসনায়, অবসর প্রতীক্ষা করিয়া মৎস্যলোলুপ বকাহকবৎ বসিয়া থাকিতে হয়। তথাপি বাবুর মেজাজ আর নাগে না। ইত্যাকার দশাবিপর্য্যয় চিন্তা করিতে করিতে বাহির হইলাম। আপনা আপনি মনে হইল, একবার জমীদার সরকারে কার্য্যের চেষ্টা করিয়া দেখি। শিক্ষাবিভাগে আর যাইব না।

মনে মনে তাহাই স্থির করিয়া ৪।৫ স্থানে দর্শন দিয়া আসিলাম। কিন্তু হায় হায়, যেখানেই যাই, সেখানেই বিফল। আমি স্কুল পণ্ডিত ছিলাম, শুনিয়াই কর্ত্তা ওষ্ঠ বক্র করিয়া একটু মুচ্‌কি হাসেন। মৌখিক সৌজন্য দেখাইয়া বলেন, আমার সরকারে আপনার উপযুক্ত কাজ ত দেখিতেছি না। মুহুরীগিরি কি আপনাকে শোভা পায়? অর্থাৎ তাঁহার অভিপ্রায় এই, যদি তিনি সাহস করিয়া আমাকে কোন কার্য্যে নিযুক্ত করেন, তবে তাহা মুহুরিগিরি। পাঠক, বুঝি সব; কিন্তু নীতি উপদেশ মন্থন করিতে করিতে কেমন একটা কু অভ্যাস হইয়া গিয়াছে। ন্যায়-পথটাই যেন ভাল লাগে। সুতরাং আমরা অযোগ্য। যাহা হউক, এ ক্ষেত্রে অভিমানই বলুন বা মূর্খতাই বলুন, আমার মুহুরীগিরিতে রুচি হইল না। বিশেষতঃ ভাবিলাম ৫।৬ টাকা বেতনে কিছুতেই পোষাইবে না। লাভের মধ্যে জাতি যাইবে, পেট ভরিবে না। পারিষদ্‌বর্গের সহিত আলাপ করিয়া জানিলাম,—কর্ত্তাদের মনে ধারণা, পণ্ডিতগণ বিষয়বুদ্ধিবিবর্জ্জিত নিরীহ ভাল মানুষ; সুতরাং জমীদারী-কার্য্যে অপটু।

তথাস্তু। আমিও পৃষ্ঠভঙ্গ দিলাম। স্থির করিলাম আমার ন্যায় ভাল মানুষের পক্ষে ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের শরণাগত হওয়াই পরামর্শসিদ্ধ। "শুভস্য শীঘ্রং" মনে করিয়া থার্ডক্লেড ব্যাগ ছত্র পাদুকা মণ্ডিত আমি ভূতপূর্ব্ব পণ্ডিত মহাশয় ডিষ্ট্রিক্ট্‌ বোর্ড নামক তীর্থাভিমুখে যাত্রা করিলাম। কথায় কথা মনে পড়ে। কোনও বিবাহ বাড়ীতে একটী বালক বরকে প্রশ্ন করিয়াছিল,—বল ত, "ভূতপূর্ব্ব" কি সমাস? বর অবিলম্বে বহুব্রীহি সমাসের উল্লেখ করিয়া বিগ্রহ বাক্য দিয়াছিল, পূর্ব্বে ভূত ছিল যে, সে ভূতপূর্ব্ব। বর শুদ্ধ কি অশুদ্ধ বলিয়াছিল তাহার বিচার এখন নিষ্প্রয়োজন, কিন্তু আমার পক্ষে এই সমাস প্রয়োগটী অন্বর্থই বটে। লোকে বলে

"দশচক্রে ভগবান্ ভূত" আমার জন্য তত চক্রেরও প্রয়োজন হয় নাই। এক সুদর্শন চক্রেই শিশুপালের শিশুপালত্ব ঘুচিয়াছিল।

সৌভাগ্য কি দুর্ভাগ্য বলিতে পারি না, কিন্তু ভাগ্যে এবার চাকরী জুটিল। একটী ইন্‌স্‌পেক্টিং পণ্ডিতের পদ শূন্য ছিল। ডেপুটী ইন্‌স্‌পেক্টর বাবুর অনুগ্রহে ও মেম্বর বাবুদের প্রতি অমোঘ চাটুপঞ্চশরপ্রয়োগে বাজি জিতিলাম। বাজি জিতিয়া এক প্রকার বাজী করিতেই প্রবৃত্ত হইলাম। এ সংসার যে ভোজের বাজী তাহা সকলেই জানেন। তবে অদৃষ্টানুসারে কাহারও বাজী ১ম নম্বর, কাহারও বা ৩য় নম্বর;—এই মাত্র প্রভেদ।

প্রথম প্রথম যে জন্তুকেই বন হইতে ধরিয়া আনা হয়, সেই পদে পদে অসন্তোষ প্রকাশ করে। সময় সময় ক্রোধও প্রকাশ করে, শাসন মানিতে চাহে না। কিন্তু শেষে সব সহিয়া যায়। আমার পক্ষে তাহাই হইল। এত কাল শান্তির কোমল কোলে থাকিয়া, পা দোলাইয়া কাটাইতেছিলাম, সে পা এখন পল্লীপথের কণ্টককঙ্কর-দলনে নিযুক্ত। হায় রে, ভাগ্যবিপর্য্যয় আর কাহাকে বলে। ভাবিতে ভাবিতে প্রথম প্রথম চক্ষুতে জল আসিত। কিন্তু ধীরে ধীরে সে ক্লেশ সহ্য হইয়া গেল। তখন আমি যে এক াধারে পরিদর্শক, কেরাণী ও ভাণ্ডারী, তাহা ভুলিয়া যাইতে লাগিলাম। পর-দৈপদে জঠর জ্বালা নিবারণকেই পরম লাভজনক মনে করিলাম। দেখিলাম, এ ক্ষেত্রে উপরি আছে, তাহা দুই রূপে বর্ত্তমান। একটি ভাতা, অন্যটী উদরান্নের নিশ্চিন্ত সংস্থান। ডাইরি লেখা শর্ম্মার এক্তিয়ার। হিসাব মিল থাকিলেই নিরাপদ। পাঠক, আমাকে অসাধু বলিতেছেন? বলিতে পারেন; কিন্তু ক্ষেত্রে পড়িয়া যদি সামলাইতে পারেন, তবে আপনি বাহাদুর। ঐ যে বিচারাসনে ধর্ম্মাবতার উপবিষ্ট আছেন, উনিও স্বমীমাংসিত মোকদ্দমাটী আপীলে না ফিরে, তজ্জন্য প্রাণপণে ভিত্তি সুদৃঢ় করিতে ব্যস্ত। ঊর্দ্ধতন কর্ত্তার তাড়া খাইয়া কৈফিয়তের শক্তি বাড়াইতে চিন্তিত এবং কর্ত্তৃপক্ষকে সন্তুষ্ট রাখিবার জন্য আসামীকে নিষ্কৃতি না দিতে সচেষ্ট। তবে আর আমি কে? ২০ মাইল দৈনিক ভ্রমণ না করিলে সব্‌ইন্‌স্‌পেক্টর বাবু নির্দ্দিষ্ট ভাতা পাইবেন না। তবে কি তিনি নিষ্কাম পরিব্রাজক হইয়া বেড়াইবেন। প্রত্যেক স্কুল অন্ততঃ ২।৩ ঘণ্টা পরিদর্শন করাও চাই, আবার ২০ মাইল ভ্রমণান্তে স্বপাক ভোজন করাও উচিত। এখন "শ্যাম রাখি কি কুল রাখি?" ভাগ্যে গুরু মহাশয়ের ইচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক, যথেষ্ট অতিথিভক্ত; তজ্জন্য সহজেই জঠর খানি নির্ব্বিঘ্নে তৃপ্ত হয়। নতুবা শয্যা, দপ্তর, ভোজ্যাধার বাহকের ভরসায় থাকিলে, তাঁহাদিগের বায়ু ভক্ষণে দিনযাপন অনিবার্য্য।

উচ্চপদস্থ মহাশয় ব্যক্তিগণেরই যখন এ অবস্থা, তখন আমাদের ন্যায় স্বল্পপরীর ত কথাই নাই। আমরা যদি স্বয়ং ভোজ্যাধার ও শয্যাভার মস্তকে করিয়া স্কুল পরিদর্শনে বাহির হই, তাহা হইলে বালকগণের বিনা ব্যয়েই "গোবিন্দ অধিকারীর সঙ" দেখা হয়। "মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা।" এই উপদেশ বাক্য স্মরণ করিতে করিতে, কর্ত্তৃপক্ষেরই অনুকরণ করিতেছি।

লোকে বলে ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের হাতে শিক্ষা বিভাগের এই আংশিক ভার যাওয়ায় এ বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছে। পূর্ব্বে সবইন্‌স্‌পেক্টর যেরূপ সম্ভ্রমের সহিত চলিতেন, এখন ডেপুটী ইন্‌স্‌পেক্টরও সেরূপ চলেন না। পূর্ব্বে মাসটী গেলেই বেতনটী হাতে আসিয়া পড়িত, এখন ৩।৪ মাস পড়িয়া থাকিলেও বিল্ পাশের জ্বালায় ও লোকেল বোর্ডের কেরাণী বাবুর নিগ্রহে লক্ষ্মী ঘরে

আসিতে নারাজ। ফলতঃ আমরা যে বিশেষ কোন উদ্দেশ্য সাধন করিতেছি, তাহা বোধগম্য করিবার উপায় নাই। তবে যদি ফল্গু নদীর ন্যায় আমাদিগের প্রভাব স্রোতঃ প্রবাহিত থাকে, তাহা হইলে গুরুগণের ভক্তিনেত্রে প্রভাসিত।

"গুরু"—নামটি বেশ গুরু বটে ; কিন্তু অধ্যাপনা প্রসঙ্গে প্রায় সর্ব্বত্রই লঘু। এতদ্ভিন্ন তাঁহারা গুরুই বটেন, কারণ ইঁহাদিগকে টানিতে আমাদিগের প্রাণান্ত। অনেকে নিম্ন প্রাইমেরী পড়িয়াও উচ্চ প্রাইমেরী পাঠশালা খুলিয়া বসেন। শিক্ষাপ্রণালী ত দূরের কথা ; তাহাদের না আছে বর্ণজ্ঞান, না আছে কর্ত্তব্য জ্ঞান। পরীক্ষা ক্ষেত্রে তাঁহারা ছাত্রগণের সাহায্য করিতে একান্ত যত্নপরায়ণ। কাক শৃগাল তাড়ান বরং সহজ, কিন্তু ইহাদিগকে তাড়াইতে অতি অতি ভাল মানুষেরও ক্রোধ সঞ্চার হয়। অনেকে এমনই ধুরন্ধর যে, রেজেষ্টারী পূরণ করিতেই জানে না। সেই ফল পুরস্কার পরীক্ষকগণ বেশ অবগত আছেন। ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের কল্যাণে তাঁহাদিগের সেই দুর্ভাগ্যের ক্রটী হয় নাই। অন্যান্য বিভাগের সংবাদ তত অবগত নহি। আমার এ বিভাগটি সৌভাগ্যক্রমে এবিষয়ে গুলজার।

আমি এ সব লিখিয়া নিজ রসদ বন্ধ করিতেছি কি না, জানি না ; কিন্তু সাহস আছে, আমার হাতে কিছু মাত্র কলকাঠি নাই, এরূপ নহে। ইঁহাদিগেরই বা দোষ কি ? শুনিয়াছি, প্রথম প্রথম ধরিয়া বাঁধিয়া মুন্সেফ ডেপুটী করিত। তাঁহারা নাম সহী মাত্র করিতে জানিতেন, বলিলে অত্যুক্তি হয় না। "আর কিছু করিতে না পারে, দারোগাগিরি করিয়া খাইবে।" এটীত সে দিনকার প্রবাদ বাক্য। কালে সকলেরই ঘোরতর পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এখন ছার্টিফিকেট না হইলে, ভাণ্ডারী কাজ পায় না। ছাত্রবৃত্তি পাশ না করিলে প্যাদাগিরি মিলে না। অধিক আর কি বলিব, আধুনিক রাইটার কনষ্টেবলটী পর্য্যন্ত পূর্ব্বতন আলা সদর আমিন অপেক্ষা বিদ্বান্। কাল, তুমি ধন্য। তুমি ক্রমে এদিকেরও পরিবর্ত্তন করিবে। কিন্তু তখন ত আর আমি ইনস্পেক্টিং পণ্ডিত থাকিব না। যাহা হউক, এক বিষয়ে ভাল আছি। গুরু-নিসেবিত হইয়া, নিজ চক্রে চক্রাকারে অতিথি ভাবে ভ্রমণ করিতেছি। হস্তে কমণ্ডলু, পশ্চাতে চেলা নাই বটে। অধিকাংশ স্থলেই তৎপরিবর্ত্তে জুতা ও খপাক চলিয়া থাকে।

গুরুগণের ভক্তি প্রশংসনীয়। সেই ফলে কোন সময় ক্ষৌরকার গৃহে, কোন সময় সফু মিঞার গোশালায়, কোন সময় গোপনন্দনের ঢেঁকিচালায়, চাদরাবৃত কম্বোপরে পরমানন্দে রাত্রি অতিবাহিত করি। যেরূপ পরিব্রজ্যা অদৃষ্টে জুটিয়াছে, তাহাতে ভরসা করিয়াছিলাম, ধীরে ধীরে সন্ন্যাস ধর্ম্ম অভ্যস্ত হইবে। কিন্তু ভগবানের লীলা মানব জ্ঞানের অতীত। খেসারির দালের একচ্ছত্র রাজত্বে বোধ হয় সত্বরেই মুক্তিমার্গ নিকটবর্ত্তী হইয়া উঠিতেছে। লিভার-প্লীহার অনুকম্পায় দেহের নশ্বর তনুত্বলাভের বিশেষ সম্ভাবনা। কিন্তু দুঃখ এই, পূর্ব্বার্দ্ধ সঙ্কীর্ণ করিয়া পরার্দ্ধের পুষ্টি চলিতেছে। সোমরস আর কোথায় পাইব ? ডিঃ গুপ্ত রস ঠুকিতেছি। কিন্তু কেহ কেহ আমার অবস্থা দর্শনে বলিতেছেন ; স্বয়ং ডিঃ গুপ্তের সহিত সাক্ষাৎকারের লক্ষণ দেখা যাইতেছে। এখন আমার অবসর গ্রহণ পূর্ব্বক নির্জ্জন সাধনা করা কর্ত্তব্য। অগত্যা তাহাই উত্তমকল্প মনে করিতেছি। কিন্তু এক বিপদ আজ দুই বৎসর যাবৎ স্কন্ধে চাপিয়াছে।

অফিশিয়েটিং সবইন্‌স্পেক্টর বাবুর নিকট কতকগুলি পুরস্কারের বহী আসিয়াছিল। তিনি

বিতরণ করিয়া যাইতে পারেন নাই; আমার নিকট রাখিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমান বাবু তাহা ছাড়িতেছেন না, বিতরণের আদেশও দিতেছেন না। এ দিকে আমি সরকারেও প্রত্যর্পণ করিতে পারিতেছি না। হোটেলের এক কোণে রাখিয়া দিয়াছি, সুযোগ পাইয়া কীটেরা ভোজনারম্ভ করিয়া দিয়াছে। কর্ত্তৃপক্ষে জানাইলে, সবইন্স্‌পেক্টর বাবু ক্রুদ্ধ হইবেন। খুটী নাটী ধরিয়া, বিরুদ্ধে তীব্র মন্তব্য লিখিবেন। তখন আমার কথা কে শুনিবে? বাবুর মেজাজ পাওয়া ভার। ক্রোধও কিছু বিচিত্র রকমের। পাঠশালা-পরিদর্শনকালে কোন গুরু হাঁচিলেও তিনি পরিদর্শন পুস্তকে তীব্র মন্তব্য লিখিয়া যান। একদিন এক পরিদর্শনকালে, তাঁহার লিখিত এক মন্তব্য দেখিলাম,—"*এই পাঠশালার গুরু প্রকাণ্ড অযোগ্য ব্যক্তি। তাহার স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য প্রায়শঃ* অশিষ্টতার পরিচয় দিয়া থাকে। কথা কহিবার সময় তাহার মুখ হইতে তাম্রকূটঘ্রাণ নিঃসৃত হইতেছিল। ইত্যাদি"।

পড়িতে পড়িতে দম ফাটিয়া হাসি আসিতেছিল। একটি ছাত্রকে শুভঙ্করী জিজ্ঞাসা ছলে তাহা দমন করিলাম। যাহা হউক, ইনি সদয়ও বটেন, যে হেতু অন্য সময় "পান হইতে চুণ খসিলেই" আমার বেতন কাটিবার অনুরোধ করেন বটে, কিন্তু সাল তামামীর কাগজ তৈয়ার করিবার সময়ে আমার যথেষ্ট সমাদর করিয়া থাকেন। কিন্তু তজ্জন্য এখন আর আমি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনের সময় পাইতেছি না। এ ভব দুঃখ আপাততঃ কিছু কালের জন্য ছেদন করিতে চলিয়াছি। বিদায়ের আবেদন করিয়াছি। যদি প্রাণ থাকিতে বিদায় মঞ্জুর হয়, তাহা হইলে তখন যথাকর্ত্তব্য দেখা যাইবে। আমার কথায় কেহ অসন্তুষ্ট হইবেন না। "নীচ যদি উচ্চ ভাষে, সুবুদ্ধি উড়ায় হেসে।" আশীর্ব্বাদ করিবেন, শীঘ্র শীঘ্র ভবদুঃখ-বারিধি উত্তীর্ণ হইয়া যাই। আমার এ আত্মনিবেদন এখানেই সমাপ্ত করিলাম এবং বন্ধুবরের হাতে দিয়া বিদায় হইলাম। তিনি নিজ নামে ইহা প্রকাশ করুন।

শ্রীহরিহর বন্দ্যোপাধ্যায়।

বৈজ্ঞানিকের কুটীর।

১। শক্তির অবিকল্পত্ব ও ভূগর্ভস্থ উত্তাপ।

এই জগতের শক্তি সমষ্টির হ্রাস বা বৃদ্ধি নাই, ইহা ঊনবিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক জগতের একটী প্রধান আবিষ্কার। মহাত্মা জেমস্‌ প্রেস্কট জুল্‌ (James Prescott Joule) ইহার আবিষ্কর্ত্তা। উহার ইংরেজী নাম Conservation of energy. আমরা বাঙ্গলায় উহার নাম "শক্তির অবিকল্পত্ব" রাখিলাম।

আমি সবলে আকর্ষণ করিয়া একটী ইস্পাতের পাতকে কুণ্ডলিত করিলাম।

আমার যে শক্তি ব্যয় করিয়া আমি এই কার্য্যটী নির্ব্বাহ করিলাম তাহা বৃথা যায় নাই। কারণ, আমার এই শক্তি উক্ত ইস্পাতে যাইয়া আসন লইয়াছে; তাই ঐ ইস্পাত এখন ঘড়ীর কাঁটা চালাইতে সমর্থ।

আমি একটী প্রস্তরখণ্ডকে অতি কষ্টে মাথায় বহিয়া একটী দ্বিতল অট্টালিকার ছাদে রাখিয়া আসিলাম ইহাতে আমার যে শক্তি প্রয়োগ (অর্থাৎ শক্তি ব্যয়) করিতে হইয়াছে, তাহা বৃথা যায় নাই। সেই শক্তি আমার মাংসপেশী হইতে চলিয়া প্রস্তরখণ্ডে আশ্রয় লইয়াছে। সেই জন্য উহা এখন একটী সবল মনুষ্যের মস্তকে পতিত হইলে, তাহা চূর্ণ বিচূর্ণ করিতে পারে। আমা কর্ত্তৃক উর্দ্ধে নীত হইবার পূর্ব্বে উহা একটী দুর্ব্বল মনুষ্যেরও কোন অনিষ্ট করিতে সমর্থ ছিল না।

ফলতঃ জগতে শক্তির কোন অপচয় নাই। শক্তি স্থান পরিবর্ত্তন করিতে পারে; রূপান্তর গ্রহণ করিতে পারে; কিন্তু আত্মহত্যা করিতে পারে না।

শক্তির জন্মদাতা অনেক—যথা, তাপ, বিদ্যুৎ, চুম্বকত্ব, রাসায়নিক ক্রিয়া ইত্যাদি।

তাপের সাহায্যে জলকে বাষ্পে পরিণত করা হয়; সেই বাষ্পে রেলগাড়ী, জাহাজ, কত কি চালিত হয়; ইহা তাপের শক্তির উদাহরণ।

বিদ্যুতের সাহায্যে কত দূরের একটী ক্ষুদ্র হাতুড়ি আঘাত করিয়া টেরে-টক্কা শব্দ উৎপাদন করা হয়। ইহা বৈদ্যুতিক শক্তির উদাহরণ।

এইরূপ চুম্বকত্ব, রাসায়নিক কার্য্য প্রভৃতিও শক্তির আধার। এরূপ হইবারই তো কথা। কারণ, রাসায়নিক ক্রিয়া হইতে তাপ উৎপন্ন হয়। সেই তাপ, বিদ্যুৎ, চুম্বকত্ব—ইহারা পরস্পরে পরিবর্ত্তনীয়। উহাদের একটীকে পাইলেই অপর দুটীকে পাওয়া যায়। উহাদের মধ্যে একটী বিশিষ্ট অন্তরঙ্গ ভাব আছে।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, তাপশক্তির সাহায্যে রেল গাড়ী চলে। সেই চলিষ্ণু বাষ্পীয় শকটের সাহায্যে আবার তাপ অনুভব করা যায়; এবং তাপ পাইলে বিদ্যুৎ ও চুম্বকত্ব পাওয়া যায়। প্রসিদ্ধ নায়েগ্রা জলপ্রপাত হইতে এইরূপে বৈদ্যুতিক আলো, গ্যাসের আলো ইত্যাদি কত কি আদায় করা হইতেছে। ফলতঃ শক্তি হইতে যেমন কার্য্য সাধিত হয়, কার্য্য হইতেও তেমন শক্তিলাভ হয়। সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গোচ্ছ্বাস একটী বিরাট ব্যাপার,—তাহা হইতে শক্তি আদায়ের চেষ্টা হইতেছে। এত বড় কার্য্যটা বৃথা যাইবে?

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, তাপের সাহায্যে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা যায় ; তাহা নানা উপায়ে হইতে পারে। তাপের সাহায্যে জলকে বাষ্পীভূত করিয়া সেই বাষ্পের বলে যন্ত্র পরম্পরার সাহায্যে এক টুকরা রেশম বস্ত্র ও একটী কাচদণ্ডকে পরস্পর ঘর্ষণ করিতে বাধ্য করা একজন যন্ত্রশিল্পীর পক্ষে কঠিন কার্য্য নহে। এইরূপ ঘর্ষণে যে তাড়িত উৎপন্ন হয়, তাহা বোধ হয় বলিয়া দিতে হইবে না। ইহা ছাড়া অন্যবিধ উপায়েও তাড়িত জন্মান যাইতে পারে, তাহাতে অত যন্ত্র মন্ত্রের সাহায্য দরকার হয় না। এক টুকরা এণ্টিমনি ধাতু ও এক টুকরা বিস্‌মথ ধাতু রাং-ঝালা দ্বারা যুড়িয়া দিয়া ঐ সম্মিলিত ধাতুখণ্ডদ্বয়ের এক প্রান্ত অগ্নিতে উত্তপ্ত করিলেই উহাদিগের মধ্যে তাড়িত উৎপন্ন হয়। প্রথমোক্ত তাড়িতকে স্থাবর ও শেষোক্ত তাড়িতকে অস্থাবর তাড়িত (Statical and Dynamical Electricity) বলে। শেষোক্ত স্থলে প্রবাহ বিশিষ্ট তাড়িত জন্মে ; প্রথমোক্ত স্থলে প্রবাহ থাকে না।

সম্প্রতী একজন প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক (M. L. Skvortzow) বলেন যে, ঠিক ঐ শেষোক্ত প্রণালীতে সৌরতাপ সংযোগে আমাদের পৃথিবীর গাত্রে এক তাড়িত-প্রবাহ জন্মিয়া উহাকে চক্রাকারে আবর্ত্তন করিতেছে; আর আমাদের পৃথিবীর আভ্যন্তরিক উত্তাপ, (যাহা ভূগর্ভে কূপ বা খনি খনন কালে স্পষ্ট অনুভূত হয়) সেই বিদ্যুৎ হইতেই উৎপন্ন। কিন্তু তিনি বলেন যে খুব সম্ভবতঃ এই উত্তাপ পৃথিবীর কেন্দ্র স্থল পর্য্যন্ত পৌঁছে নাই ; অর্থাৎ তাঁহার মতে পৃথিবীর অভ্যন্তর ভাগ শীতল। কিন্তু অধিকাংশ পূর্ব্বতন বৈজ্ঞানিকের মতে পৃথিবীর কেন্দ্র প্রদেশ এত উত্তপ্ত যে সেখানে যাহা কিছু আছে, বাষ্পের আকারে আছে। সুতরাং উভয় মতে আকাশ পাতাল প্রভেদ।

২। অষ্ট্রেলিয়ার অহল্যা।

এই দ্বীপে উইক্লেন্ নামক স্থানে একটী ক্ষুদ্র পর্ব্বত-শ্রেণী আছে, তাহা দেখিতে একটী উন্নতাঙ্গী রমণীর মত ; অবশ্য একটু হিসাব করিয়া অনুসন্ধিৎসু চক্ষু লইয়া দেখিতে হইবে, সঙ্গে সঙ্গে মনোমন্দিরবাসিনী কল্পনা দেবীকে একটু প্রবুদ্ধ করিয়া নিতে হইবে। নতুবা ঐ বীররমণীর দর্শন পাওয়া অসাধ্য। "শ্রীক্ষেত্রে তো অনেকেই যায়, সকলেই কি জগন্নাথ দেবের দর্শন পায়"? শুনিয়াছি, কেহ কেহ সুদূরবর্ত্তী আবাস গৃহের অলিন্দোপবিষ্ট স্বীয় নীলমণি বা গোপালকে দেখিতে পায় ; যাহারা ততোধিক দুর্ভাগ্য, তাহারা ছয় দিনের ব্যব-

ধানস্থিত আপনাদের জীর্ণ গোশালার ভগ্নচূড়াবিলম্বিত তুম্বী-ফল দেখিতে পায়।

এই ভীষণা রমণীকে ঐ দেশীয় লোকেরা "উইঞ্জেনের পাষাণী "(the Stone woman of Wingen) বলিয়া থাকে। আমরা ইহার নাম 'অহল্যা' রাখিলাম।

ইহাকে দেখিতে বোধ হয় যেন একটী ধূসরবর্ণা স্ত্রীলোক একটী ক্ষুদ্র পর্ব্বতে পৃষ্ঠ সংলগ্ন করিয়া বসিয়া আছে। তাহার মস্তক পর্ব্বতের শৃঙ্গদেশ হইতে ঈষৎ ব্যবহিত এবং পদযুগল ঐ গিরির পাদদেশজাত তরুরাজীদ্বারা সমাচ্ছন্ন এবং লোকলোচনের অন্তরালে অবস্থিত। তাহার জানুদেশে একটী গ্রন্থ উন্মুক্ত অবস্থায় রহিয়াছে। কিন্তু স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে সে উহা পড়িতেছে না। কারণ, তাহার চক্ষুদ্বয় পুস্তকের পত্র-সংলগ্ন নহে; স্থির গম্ভীর নয়নে সে অদূরবর্ত্তিনী দূরব্যাপিনী উপত্যকার দিকে চাহিয়া আছে, যেন কোন নব্যতন্ত্রের শিক্ষিতা অনূঢ়া রমণী উপন্যাস পড়িতে পাড়তে, নায়কের অত্যাচারে ব্যথিত ও নায়িকার সমবেদনায় পীড়িত হইয়া, উপন্যাস-পাঠ বন্ধ করিয়াছেন, এবং বিধাতার প্রত্যক্ষ-চ্ছবি প্রকৃতিমাতার পানে চাহিয়া নিজের ভূত ও ভাবী জীবন, সমাজের নির্ম্মম আচরণ ইত্যাদ বিষয় ভাবিয়া সান্ত্বনা ভিক্ষা করিতেছেন।

ইহার চরণপ্রান্ত হইতে মস্তক পর্য্যন্ত মাপিলে ৫০০ ফুট পাওয়া যায়। সুতরাং যদি কোন শ্রীরামের পদস্পর্শে বা সোণার কাঠীর স্পর্শে এই পাষাণী বীরবালা শাপমুক্ত ও পুনর্জ্জীবিত হইয়া একটী অনতিদীর্ঘ জৃম্ভন সহকারে দণ্ডায়মান হয়, তবে তাহার আপাদমস্তক উচ্চতা ৮০০ ফুটের কম হইবে না। আর এখন ইহার পার্শ্বদৃশ্য (in profile) মাত্র আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়, তখন ইহার পুরোদৃশ্যও দেখিতে পাওয়া যাইবে, আশা করা যায়। কিন্তু আর 'রবিষে' বা কবিষে প্রয়োজন নাই; সে শ্রীরাম বা মহারামের আগমনে আমাদের বিশ্বাস নাই, সে সোণার কাঠী ও রূপার কাঠী এখন দিদিমার কপোল কবলে লুক্কায়িত।

এই জগতে প্রকৃতির শিল্প-নৈপুণ্যের আরো অনেক পরিচয় বিদ্যমান রহিয়াছে; যথা জিব্রল্টারের 'সুপ্তসিংহ'ও এই অষ্ট্রেলিয়া দ্বীপেরই স্থানান্তরবর্ত্তী সিংহ মস্তক (ইহা ব্রোকেন-বে নামক উপসাগরের মধ্যবর্ত্তী একটী ক্ষুদ্রদ্বীপে অবস্থিত।) এই সঙ্গে বুট জুতার আকার বিশিষ্ট ইটালীদেশ, এরণ্ডপত্রোপম গ্রীশদেশ, আম্র ফলের আকার যুক্ত লঙ্কাদ্বীপ ও ঝিঙ্গে ফলের ন্যায় জাপান দ্বীপও

উল্লেখ করা যাইতে পারে। কিন্তু কলা-কুশলা প্রকৃতিদেবী কোথাও এমন একটী সমগ্র মনুষ্য মূর্ত্তি রচনা করিয়াছেন বলিয়া জানা যায় না।

শ্রীশ্রীনিবাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

দক্ষিণ বঙ্গ।

ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বৎসরের কথা বেশ মনে আছে। এই কালের মধ্যে দক্ষিণ বঙ্গের অনেক বিষয়ে বিস্তর পরিবর্ত্তন হইয়াছে।

নদনদী—জোয়ারের জল এখন বহুদূর উত্তর পর্য্যন্ত ধাবিত হইতেছে। ইহাতে নদীর জল লোণা সুতরাং বিস্বাদ হইতেছে। কোন কোন নদীর পরিসর বাড়িয়াছে ও গভীরতা কমিয়াছে। কোন কোন নদী মজিয়া যাইতেছে। নিম্ন বঙ্গের অধিকাংশ নদী, গঙ্গা ও পদ্মা হইতে নির্গত হইয়াছে। নির্গমস্থান বালুকাপূর্ণ হওয়ায় এখন তৎসমুদায় দিয়া গঙ্গা ও পদ্মার জল প্রবাহিত হয় না। উত্তরের জলের স্রোত বন্ধ হওয়ায় সমুদ্র জলের স্রোত অর্থাৎ জোয়ার প্রবলবেগে নদীতে প্রবেশ করিয়া বহুদূর উত্তর পর্য্যন্ত ধাবিত হইতেছে। সৈকতময় নদীতীর এখন কর্দ্দমময় হইয়াছে। পূর্ব্বে জোয়ার ভাটার এমন প্রাবল্য ছিল না। জোয়ারের সময়ে সমুদ্রবৈপরীত্যে ও ভাটার সময়ে সমুদ্রের দিকে অর্থাৎ জোয়ার ভাটার অনুকূলে গমন করাকে গোণে যাওয়া বলে। গোণের বিপরীত বেগোণ। বেগোণে যাওয়ায় কষ্ট, পূর্ব্বাপেক্ষা এখন অনেক বেশী হইয়াছে। সমুদ্র নিকটবর্ত্তী নদীর জলজ উদ্ভিদ্, এখন নদীর উত্তরাংশে জন্মিতেছে। রাত্রিকালে নদীর জল চক্মক্ করিয়া থাকে। উহা সামুদ্রিক কীটবিশেষের দেহনিঃসৃত আলোক।

ভৈরব যে একটী প্রবল নদ ছিল নামদ্বারা তাহা সূচিত হইতেছে। ভূতপূর্ব্ব ইন্‌স্পেক্টর উড্রো সাহেব বলিতেন, ভৈরব গঙ্গা অপেক্ষা প্রাচীন। ভৈরব হিমালয় হইতে নির্গত হইয়া সমুদ্রে মিলিয়াছিল, কালক্রমে গঙ্গা দ্বারা তাহা খণ্ডিত হইয়া গিয়াছিল। আমাদেরও বোধ হয় উত্তরবঙ্গের মহানন্দা ও দক্ষিণবঙ্গের ভৈরব, একই নদীর দুটী অংশ মাত্র। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দ হইতে এই নদে পদ্মার জল প্রবেশ বন্ধ হইয়া যায়। কপোতাক্ষ অতি সুজল নদ ছিল। বহুদূর দক্ষিণ পর্য্যন্ত এই নদীর উভয়তীর শিষ্টজনাধ্যুষিত গ্রামসমূহে সুশোভিত ছিল। কপোতাক্ষ ও ইছামতীর মধ্যবর্ত্তী ভূভাগ মহারাজ প্রতাপাদিত্যের রাজ্যের প্রধান

অংশ ছিল। এখন এই সকল নদীর তীরবর্ত্তী স্থানের অত্যন্ত দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত কারণে নদীর জল প্রায় অপেয় হইয়াছে। এখন কপোতাক্ষ নদের দক্ষিণ প্রদেশ, ক্রমশঃ লোকবসবাস শূন্য হইতেছে।

জঙ্গল—জঙ্গল বাড়িয়াছে। কয়েক বারের দুর্ভিক্ষে ২৪ পরগনা ও খুলনা জেলার দক্ষিণাংশ ত্যাগ করিয়া বিস্তর লোক অন্যস্থানে প্রস্থান করিয়াছে। সুতরাং সে সকল স্থান জঙ্গলে ভরিয়াছে। জঙ্গল বৃদ্ধি হওয়ায় হিংস্র জন্তুর উপদ্রব বাড়িয়াছে। অস্ত্র আইনের প্রভাবে, লোকে অস্ত্রহীন হওয়ায় উপদ্রব বাড়িয়া চলিতেছে। শৃগালের সংখ্যা কমিয়া গিয়াছে। কুকুর শৃগালের বৈরভাব চিরপ্রসিদ্ধ। পূর্ব্বে শৃগালের এত উপদ্রব ছিল যে, শয়ান কুকুর সমীপাগত শৃগালকে আক্রমণ করিতে সাহস পাইত না। কখন কখন গৃহস্থের কচি শিশু শৃগাল কর্ত্তৃক জঙ্গলে নীত হইত। অম্লোচ্চ ঘরের চালের উপর উঠিয়া শৃগাল ডাকিতেছে, ইহা দেখিয়াছি। এখন তেমন দেখা যায় না। শৃগাল কমিল কেন ? ইহা জিজ্ঞাসার যেরূপ উত্তর প্রদত্ত হইয়া থাকে তাহা লিখিতেছি ;—

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এক বন্য জাতীয় মনুষ্য এই প্রদেশে আগমন করে। তাহারা তাঁবুতে বাস করিত। শৃগালমাংস তাহাদের উপাদেয় খাদ্য ছিল। তাহাদের কেহ কম্বলাবৃত শরীরে জঙ্গলে গিয়া শৃগালের ন্যায় অবিকল চীৎকার করিত। উহার অনতিদূরে অন্য কয়েক ব্যক্তি কয়েকটী শিকারী কুকুর লইয়া নিস্তব্ধভাবে গোপনে বাস করিত. স্বজাতির শব্দ মনে করিয়া শৃগাল যেমন নিকটবর্ত্তী হইত, অমনি কম্বলাবৃত ব্যক্তি কর্ত্তৃক ধৃত হইত। তখনই শিকারী কুকুর আসিয়া ধৃত শৃগালকে মারিয়া ফেলিত। এইরূপে বহু শৃগাল মারা গিয়াছিল। শৃগালজগতে এইজন্য দারুণ ভয়ের সঞ্চার হয়। এই জন্য অনেক শৃগাল এতদঞ্চল ত্যাগ করিয়া গিয়াছে। ভয়দূর হইলে আবার তাহারা ফিরিয়া আসিবে। কেহ কেহ বলেন আবার ফিরিতে আরম্ভ করিয়াছে। কাকও কমিয়াছে, কাক কেন কমিল, ইহার উত্তর কেহ দিতে পারেন না। কাকভোজী, বন্যজাতিও বাঙ্গালার নানা স্থানে দেখিয়াছি।

লোকের অবস্থা—ভদ্রলোকের অবস্থা বড় শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে। অনেক গৃহস্থ, দুবেলা পেট ভরিয়া আহার করিতে পায় না। "অভাবে স্বভাব নষ্ট"— দারিদ্র্য দশায় পড়িয়া ভদ্রলোকে বিস্তর সদ্গুণ হারাইতেছেন। ব্রাহ্মণ কায়স্থ, বৈদ্য, বাঙ্গালী জাতির গৌরব স্বরূপ। বাঙ্গালী বুদ্ধিমান্ জাতি, এই তিন

জাতিকে দেখিয়াই ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের লোকের বিশ্বাস হইয়াছে। এই তিন জাতির সংখ্যা ক্রমশঃ কমিয়া যাইতেছে। বারুই, তাঁতি প্রভৃতি নবশাখ শ্রেণীস্থ জাতির উন্নতি দেখা যাইতেছে। তাঁতিজাতি, ক্রমশঃ সামলাইয়া উঠিতেছে। বারুই অতি পরিশ্রমী জাতি। ভগবান্, পরিশ্রমীকে অপুরস্কৃত রাখেন না। ধনবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, ব্রাহ্মণ কায়স্থের বিষয় সম্পত্তি ক্রমশঃ ইহাদের হাতে আসিয়া পড়িতেছে। এখন যেমন দেখা যাইতেছে, তাহাতে অনুমান করা যাইতে পারে, ভবিষ্যতে নবশাখ শ্রেণীস্থ জাতিগণ, হিন্দুসমাজের শীর্ষস্থান অধিকার করিবে, ব্রাহ্মণ কায়স্থ জাতির অবনতি হইবে।

এতদঞ্চলে বিবাহ, অন্নপ্রাশন, উপনয়ন প্রভৃতির ব্যয় বাড়িয়াছে। লোকের অবস্থা মন্দ হওয়ায় পূজা পার্ব্বণ কমিয়া যাইতেছে। বনিয়াদি গৃহস্থদের অনেকের চাকরাণ জমি বন্দোবস্ত আছে। কেহ প্রতিমা গড়ে, কেহ চিত্র করে, কেহ পাঁঠা দেয়, কেহ নৈবেদ্য বয়। অর্থের পরিবর্ত্তে তাহাদের সঙ্গে জমির বন্দোবস্ত আছে। যাহাদের এরূপ বন্দোবস্ত আছে তাহাদের পূজা বাদ যায় না। নূতন করিয়া আর কেহ প্রায় পূজা করে না। ভোজের ব্যয় বাড়িয়াছে। চিড়া দধির ফলার প্রায় উঠিয়া গিয়াছে। লুচির পাতে পূর্ব্বে ছোলা বুট মুগাঙ্কুর দেওয়া হইত, এখন তাহা দেওয়া হয় না। নানারূপ মিষ্টান্ন দেওয়া হইয়া থাকে। পূর্ব্বে আত্মীয় স্বজন বাটীতে আসিলে নারিকেল কোরা ও চিনিবাতাসা তাহাকে জল খাইতে দেওয়া হইত, এখন তাহা দিতে লোকে লজ্জা বোধ করিতেছে। হিন্দুর দেখাদেখি মুসলমানেরা ভোজের সময় নানা দ্রব্য সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। একটু ত্রুটি হইলে হিন্দুরা যেমন ভোজদাতার নিন্দা করে, মুসলমানেরা সেরূপ করে না। মুসলমানদের ভোজে মাংস প্রায় বাদ যায় না। প্রতি পাঁচ সাত বা দশ বার জনকে এক এক মালসা মাংস দেওয়া হয়। ইহাদের মধ্যে যে প্রধান তাহার নিকট মালসা দেওয়া হয়, অপরে সেই মাংস উঠাইয়া লয়। এই মালসার অধিকার লইয়া কখন কখন ইহাদের মধ্যে মারামারি পর্য্যন্ত হইয়া থাকে।

ধর্ম্মবিশ্বাস—ধর্ম্ম লইয়া কেহ আর মাথা ঘামায় না। দেবালয়ে পূর্ব্বের ন্যায় সেবার বন্দোবস্ত নাই। স্থানান্তরে গমনকালে প্রাচীন লোক ভিন্ন প্রায় কেহ দেবালয়ে প্রণাম করিয়া যায় না। পূর্ব্ব পুরুষদের প্রতিষ্ঠিত ঠাকুর সেবায় লোকে বিরক্তি প্রকাশ করিতেছে এবং উহা হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারিলে অত্যন্ত আনন্দিত হইতেছে। ঠাকুর ঘরের জীর্ণ সংস্কার হইতে বিগ্রহ

বিলম্ব হইতেছে। পূর্ব্বের ন্যায় ব্রাহ্মণদের বাটীতে সর্ব্বত্র শালগ্রামশিলা নাই। পূর্ব্বে ঠাকুর পূজা না হইলে গৃহস্থ বাটীর বয়স্থ স্ত্রীপুরুষে জলগ্রহণ করিত না, এখন কেহ ক্বচিৎ সে নিয়ম পালন করে। ঠাকুর দুই একদিন উপবাসীও থাকেন। সন্ধ্যা আহ্নিক প্রায় উঠিয়া গিয়াছে। শিক্ষিত লোকদের বার আনা কেবল পৌত্তলিকতা বিরোধী নয়, ধর্ম্ম সম্বন্ধেও নিতান্ত উদাসীন। পুরোহিত হাসিয়া হাসিয়া মন্ত্র পড়ান, যজমানও হাসেত হাসিতে মন্ত্র পড়েন, এমন ঘটনা আমরা চোখে দেখিয়াছি। পুরোহিত কখন কখন মন্ত্র সংক্ষেপ করেন, যজমান তাহাতে তুষ্ট বৈ কষ্ট হন না।

যে জাতির মধ্যে ধর্ম্মভাবের এমন দুরবস্থা, সে জাতিব পতন অনিবার্য্য। ইতর লোকে ভদ্রলোকের আচার ব্যবহারেব হাস্যজনক অনুকরণ করিতেছে। তাহাদের মধ্যে হরিসংকীর্ত্তনের প্রভাব বৃদ্ধি হইয়াছে। বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে না পারিষা নানারূপ কৌতুককর মতেব সৃষ্টি করিতেছে। "বন্দে গুরূণী-শভক্তান্" চৈতন্য চরিতামৃতের এই শ্লোকেব কতরূপই ব্যাখ্যা শুনিলাম। কোন ব্যক্তি ইহার এইরূপ অর্থ করিয়াছিল, "বন্দে গুরু তুই নীশ্"। ধড়বিচারী অর্থাৎ দেহতত্ত্ব সম্বন্ধে নানারূপ কূট হিয়ালী ইহাদের অতি প্রিয় বস্তু। একবার চণ্ডালজাতীয় একটী লোক কোন শ্রাদ্ধ সভায় সমাগত পণ্ডিত মণ্ডলীকে প্রশ্ন করিয়াছিল, "পিশাচ কারা?" পণ্ডিতগণ শাস্ত্রানুসারে ইহার যে উত্তর দেন, তাহা তাহার মনঃপূত হয় নাই। সে স্থানে উপস্থিত একজন মুসলমান উত্তর দেয় যে, "পিশাচ তিন জন, মা, মাটী ও নদী। নদী সমস্ত অপবিত্র পদার্থ বহন করে, মাতা ঘৃণাশূন্য হইয়া সন্তানের মল মূত্র পরিষ্কার করেন, মাটী সমস্ত অপবিত্র পদার্থ ধারণ করে, অতএব এই তিন জন পিশাচ"। এই উত্তর চণ্ডালের "দেলে লাগিয়াছিল" অর্থাৎ মনোমত হইয়াছিল। একবার একজন পাটনী আমাকে জিজ্ঞাসা করে, কয় "থোতে" কায়স্থ হয়। আমি ইহার উত্তর দিতে পারি নাই। সে বলিল, তিন থোতে কায়স্থ হয়। খাজানা আদায় করিতে যাইয়া বলে, খাজানা থো, সঙ্গের পাইককে বলে, এই টাকা থলিয়াতে থো, কাছারীতে আসিয়া বলে, ইহা সিন্দুকে থো, এই তিন থোতে কায়স্থ হয়।

পূর্ব্বে লোকে যত ব্রতোপবাস করিত এখন তত করে না। লোকের ক্ষুধা তৃষ্ণা সহ্য করাব ক্ষমতা কমিয়া গিয়াছে। মুসলমানদেব ধর্ম্মবিশ্বাস প্রায় অটুট রহিয়াছে। জোর করিলে এতদঞ্চলের দুর্ব্বল বিশ্বাসী হিন্দুদের

অনেককে ধর্ম্মান্তরে আনা যায়। ইংরেজী শিক্ষিত মুসলমানও অন্তরের সহিত রোজা নামাজে যোগ দেয় না। ইংরেজী শিক্ষার দূষিতাংশ হিন্দুদের হাড়ে হাড়ে প্রবেশ করিয়াছে। হিন্দু জাতির অন্য বল অনেকদিন হইল চলিয়া গিয়াছে। এক মাত্র ধর্ম্মবলে তাঁহারা বলীয়ান্ ছিলেন, সে বলও যখন যাইতে বসিয়াছে তখন হিন্দু কিরূপে বর্ত্তমান সময়ে আত্মরক্ষা করিবেন? যে কোন ধর্ম্মে গভীর বিশ্বাসী ব্যক্তিগণ অসাধারণ মানসিক বলে বলীয়ান্ হয়। নাস্তিক কি দেশের জন্য প্রাণত্যাগ করিতে পারে? শিখ হাসিতে হাসিতে প্রাণ দিয়াছে, খৃষ্টান, সিংহ ব্যাঘ্র ও অনলমুখে আত্ম বিসর্জ্জন করিয়াছে। ইতিহাসে লিখিত না হউক, হিন্দুও ধর্ম্মের জন্য প্রাণত্যাগে কুণ্ঠিত হয় নাই। মুসলমানদের চেষ্টার বিরাম ছিল না, কিন্তু ভারতবর্ষ মুসলমানদের দেশ হইয়া যায় নাই। দুঃখের বিষয় এই যে হিন্দুর আর সে গভীর ধর্ম্মবিশ্বাস নাই। আমি বাঙ্গালার হিন্দুদের কথাই বলিতেছি।

আমরা কোমলতার দিকে অগ্রসর হইতেছি এবং দৃঢ়তা হারাইতেছি। আমরা পুত্রের নাম সজনীকান্ত, রমণীরঞ্জন, কামিনীকুমার, ননীগোপাল ও মাখনলাল রাখিয়া থাকি। এই সকল সজনী, রমণী, কামিনী, ননী, মাখন রবির অল্প উত্তাপে গলিয়া যায়। ইহাদের একখানা মোটা লাঠি বহন করার ক্ষমতাও নাই। মুসলমানদের এতদূর অধঃপতন হয় নাই, কিন্তু দক্ষিণ বাঙ্গালার মুসলমানদের নৈতিক দুর্ব্বলতা অধিক। পূর্ব্ব ও দক্ষিণ বাঙ্গালায় যত রমণী হরণ হয় তাহার প্রধান নায়ক প্রায় মুসলমান। ঈশ্বর না করুন, আজি যদি কোন রাজবিপ্লব উপস্থিত হয়, তাহা হইলে দক্ষিণ বাঙ্গালার হিন্দুদিগের জাতি, ধর্ম্ম ও কুলকামিনী রক্ষা করা কঠিন হইয়া উঠে। রাজা রক্ষা না করিলে, একজন সশস্ত্র সৈনিক পুরুষ এই অঞ্চলের হাত-কাটাপিরাণ ও টেরিকাটা-মাথাওয়ালা সহস্রাধিক অপদার্থকে তরবারি মুখে অর্পণ করিতে পারে। কথাগুলির মধ্যে একটুকুও অতিরঞ্জন নাই। গুণে না হউক, জাতিতে বড় হওয়ার চেষ্টা সকলেরই দেখা যাইতেছে। ব্রাহ্মণের প্রভুত্ব স্বীকারে শৈথিল্য দৃষ্ট হইতেছে। বৈদ্য, ব্রাহ্মণ সদৃশ হওয়ার চেষ্টা করিতেছেন, কায়স্থ ক্ষত্রিয় হইতে চাহেন, বারুই পর্ণবৈশ্য হইতেছেন। যাহাদের পৈতা ছিল, তাহারা ফেলাইতে চাহে, যাহাদের পৈতা ছিল না, তাহারা পৈতা লইতে ব্যস্ত। চণ্ডাল ভাবিয়া বসিয়াছে, তাহারা নমঃশূদ্রনামক জাতি। দেবতা, ব্রাহ্মণ ও মুনিগণ তাহাদের জাতি হইতেই উৎপন্ন। আমরা দেবতাভ্যোনমঃ

ব্রাহ্মণেভ্যোনমঃ ঋষিভ্যোনমঃ বলিয়া থাকি। চণ্ডালেরা বলে, দেবতা ব্রাহ্মণ ও ঋষিগণ যে নমঃ নামক জাতি উহাত তোমরা স্বীকারই করিলে। ইহারা আপনাদের স্ত্রীলোকদিগকে ক্রমশঃ অন্তঃপুর বদ্ধ করিতেছে। এখন উহারা পূর্ব্বের ন্যায় বৈদ্য কায়স্থাদি জাতির অন্ন গ্রহণ করে না। এই শ্রমশীল জাতি, আপনাদের মৌলিকত্ব হারাইতেছে। হিন্দু সমাজে চণ্ডাল জাতির কার্য্যকারিতা অসামান্য। ইহারা উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদিগকে নিম্ন শ্রেণীর মুসলমানদের অত্যাচার হইতে রক্ষা করিয়া থাকে। এক চণ্ডাল ভিন্ন, দক্ষিণ বঙ্গের কোন জাতি মুসলমানদের প্রতিযোগিতা করিতে সমর্থ নহে। বাঙ্গালার ভদ্রলোক আত্মরক্ষণে অসমর্থ। ইহারা পূর্ব্বে চণ্ডাল, মুচি ও মুসলমানদিগকে যেরূপ ঘৃণা করিত, এখন সেরূপ করে না, বরং ইহাদিগকে হাতে রাখিতে চেষ্টা করে। কাহারও কতকগুলি চণ্ডাল, কাহারও কতকগুলি মুচি, কাহারও কতকগুলি মুসলমান বশীভূত থাকে। ইহাদের দ্বারা সুকার্য্য ও দুষ্কার্য্য সংসাধিত হইয়া থাকে।

ব্রাহ্মণ কায়স্থের সংখ্যা কমিয়া গিয়াছে। মুসলমান বাড়িয়াছে। নিকা প্রথা প্রচলিত থাকায় ইহাদের মধ্যে সুস্থকায় সন্তান জন্মিতেছে। ধোপা, নাপিত, কাহার ও পাটনীর সংখ্যা কমিয়াছে। ইতর হিন্দুদিগের মধ্যে পূর্ব্বে নিকার চলন ছিল, এখন তাহা উঠিয়া যাইতেছে। এ দেশ যে, দুই তিন শত বৎসরের মধ্যে হিন্দুশূন্য হইবে, তাহার লক্ষণ দেখা যাইতেছে।

বিবাহ করিতে না পারায় অনেক শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণের বংশ লোপ পাইতেছে। কন্যাপণ কমিয়া গিয়াছে, কিন্তু বরপণ বাড়িয়াছে। কুলীনের আদর কমিয়া গিয়াছে। মধ্যে পাশ্‌ করা ছেলের আদর বড়ই বাড়িয়াছিল, এখন লোকে দেখিতেছে, পাশ্‌ করা ছেলের অনেকে ত্রিশ চল্লিশ টাকা বেতনে বিদেশে পড়িয়া থাকে। পরিবার ঘাড়ে করিয়া বেদে জাতির ন্যায় নানা স্থানে বেড়ায়। এখন লোকে বরও দেখে, বরের ঘরে খাওয়ার সংস্থান আছে কিনা তাহাও দেখে।

ইংরাজী শিক্ষা প্রথমে যেমন চমক লাগাইয়াছিল, এখন সেরূপ পারিতেছে না, তথাপি ইংরাজী শিক্ষার প্রসার বাড়িয়াছে। ইংরাজী শিক্ষা যে আবশ্যক, তাহা সকলেই বুঝিয়াছে। ইংরাজী শিক্ষিতদিগকে একটা উৎকৃষ্ট জীব বলিয়া আর কেহ বিশ্বাস করে না। এমনটী হইয়াছিল, অমুক দোকানদার ভাল লোক এ কথার পর অমনি প্রশ্ন হইল, সে ইংরাজী জানে কিনা? ইংরাজী জানিলে

যেন তাহার দোকানের জিনিস মিঠা হইবে। এখন সে ভাবটী নাই। চাকরীর প্রতি শ্রদ্ধা কমিতেছে। যাহাদের কিছু জমি জমা আছে, তাহারা যদি পরিশ্রমী হয় তবে চাকরিয়াদের অপেক্ষা সুখে কাল কাটাইয়া থাকে।

ব্যভিচার বাড়িয়াছে। লেখক ব্রহ্মচারিণী বিধবাকে অন্তরের সহ গভীর শ্রদ্ধা করেন, কিন্তু বালবিধবাগণের পুনর্বিবাহের বিশেষ পক্ষপাতী। বিধবা-বিবাহের, সুসংযত প্রচলন না হইলে হিন্দুসমাজ ছারে খারে যাইবে। পূর্ব্বের ন্যায় বধূর প্রতি শাশুড়ীর সর্ব্বতোমুখী প্রভুতা নাই। পূর্ব্বে শাশুড়ী ননদ, বধূর প্রতি অকারণ কর্কশ ব্যবহার করিতেন। এখন প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছে, কিন্তু প্রতিক্রিয়ার বেগ যেন কিছু প্রখর হইয়াছে। পূর্ব্বে ভ্রাতার সংসারে অনাথা বিধবা ভগিনীর পরম যত্ন ছিল, এখন ভ্রাতৃবধূর তাড়নায় তাহাদের কষ্টের সীমা নাই। এজন্যও বলি, বিধবা বিবাহ স্থল বিশেষে ও অবস্থা বিশেষে সমাজের কল্যাণকর।

পূর্ব্বের ন্যায় বধুগণের পাকের প্রতি অনুরাগ নাই। ক্রিয়াকর্ম্মের রন্ধন ও পরিবেশনের লোক পাওয়া কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ বাড়ী আহার করিয়া ব্রাহ্মণেতর জাতি উচ্ছিষ্ট মার্জ্জন করিত, এখন তাহা করিতে চায় না। একান্নবর্ত্তী পরিবার কলহের বসতি হইয়া উঠিয়াছে। স্বার্থপরতার বৃদ্ধি হওয়ায় ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই হইতেছে। বিষয় বিভক্ত হওয়ায়, কাহারও স্বচ্ছন্দতার সহ সংসার যাত্রা নির্ব্বাহিত হয় না, সকলেই দরিদ্র হইয়া পড়িতেছে। পূর্ব্ব-কালে বোধ হয় একান্নবর্ত্তী পরিবার ছিল না। বিবাহ করিয়া অগ্নি স্থাপন পূর্ব্বক প্রত্যেক গৃহস্থকে পঞ্চমহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে হইত। এমন অবস্থায় যৌথ পরিবারের সৃষ্টি হইতে পারে না। মামলা মোকদ্দমায় অনুরাগ বাড়িয়াছে। উকীলের বাক্‌সে টাকা জমিতেছে।

শ্রীরজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী।

দার্শনিক মতের সমন্বয়। (৩)।

বৌদ্ধদর্শন যে বাস্তবিক পক্ষে আত্মা ও ব্রহ্মের অস্তিত্ব স্বীকার না করিয়া পারেন না, তদ্বিষয়ে গত দুই সংখ্যায়, আমরা যে সমস্ত প্রমাণ উপস্থিত করিয়াছিলাম, তদপেক্ষাও আর একটী প্রমাণের উল্লেখ করিয়া আমরা অদ্য দেখাইব যে, মূলতঃ বেদান্ত, সাংখ্য ও বৌদ্ধদর্শনে কোনই বিরোধ নাই।

যে প্রমাণের কথা আমরা বলিতে যাইতেছি, সে প্রমাণটী বৌদ্ধদর্শনের "নির্ব্বাণাবস্থা"র বর্ণন হইতেই আমরা বুঝিতে পারি। এই নির্ব্বাণাবস্থার বর্ণন negative হইলেও, উহা যে Positive (সৎ) পদার্থ, তাহা বুঝিতে বাকী থাকে না। আমরা বৌদ্ধদর্শন ও বৌদ্ধ পুস্তকাদি হইতে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংখ্যায় কতকগুলি সূত্র ও বচন উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছিলাম, আজও আর কয়েকটী স্থান উদ্ধৃত করিব। পাঠক তাহাতেই দেখিবেন যে এ অবস্থা শূন্যা-বস্থা নহে, ইহা হিন্দুদর্শনের মুক্তাবস্থা মাত্র। ইহাকে যদি শূন্যাবস্থা বলিতে হয়, তবে শঙ্করের মুক্তির অবস্থাকেও শূন্যাবস্থা বলিব না কেন? নির্ব্বাণাবস্থায়, ঐন্দ্রিয়িক জ্ঞান বা সম্বন্ধজ্ঞান একেবারেই থাকে না, এই তত্ত্বটী বিশেষ করিয়া লোককে বুঝাইয়া দেওয়াই বুদ্ধের উদ্দেশ্য ছিল। সেই জন্যই, negative-side দিয়াই তিনি এই নির্ব্বাণাবস্থা বুঝাইয়া দিয়াছেন। যখন ইহজন্মেই নির্ব্বাণাবস্থা ঘটিতে পারে এবং জীব সেই অবস্থাতেই চিরবর্ত্তমান থাকিয়া যায়, তখন যদি নিত্য-আত্মা না থাকে, এবং সমস্তই কেবল সম্বন্ধমাত্রই হয় (দ্বিতীয় বর্ষের ৩য়, ৪র্থ সংখ্যা দেখুন), তবে সে অবস্থা হইবেই বা কাহার? এবং সে অবস্থায় থাকিবেই বা কে? সম্বন্ধব্যতীত, যখন আত্মার পৃথক্ অস্তিত্বই নাই, আত্মা যখন কেবলমাত্র কতকগুলি সম্বন্ধেরই সমষ্টি মাত্র, তখন—নির্ব্বাণা-বস্থায় যদি সেই সম্বন্ধ বিন্দুমাত্রও না থাকে, তখন ত সমস্তই নির্ব্বাপিত হইয়া যাইবে। সম্বন্ধজ্ঞানের ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গেই ত সমুদয়ই ধ্বংস হইয়া যাইবে। তখন আর তাহাকে অবস্থালাভ কেমন করিয়া বলিতে পারা যায়? অতএব ইহজন্মেই নির্ব্বাণাবস্থা লাভ হইতে পারে, ইহা বলাতেই নিত্য-আত্মাও স্বীকৃত হইয়া পড়িতেছে কি না পাঠক বলুন!

এই জন্যই বোধ হয় Rhys Davids বলিয়াছেন যে,—"What then is *Nirvana*, which means simply extinction; it being quite clear, from what has gone before, that this *Nirvana can not be the extinction of a soul*"? পণ্ডিত Max-Mullerও তাঁহার কৃত Hindu Philosophy নামক গ্রন্থেও এইরূপ কথাই বলিয়াছেন, যথা :—

"It is the same question which meets us with regard to the Budhist নির্ব্বাণ। This also was in the beginning, the result and reward of moral virtue, of the restraint of passions, and of perfect tranquility of soul, such as is described in

ধর্ম্মপদ, but it soon assumed a different character, as representing freedom from all bondage and illusion, *amounting* to a *denial of all reality* in the subjective and objective world."

এখন আমরা বৌদ্ধ গ্রন্থের নানা স্থান হইতে নির্ব্বাণাবস্থার কয়েকটী বর্ণন উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি আমাদের অনুমান ঠিক কি না :—

"চিত্তাবরণনাস্তিত্বাৎ অত্রস্তো বিপর্য্যাসাতিক্রান্তো নিষ্ঠনির্ব্বাণঃ (প্রজ্ঞাপারমিতা, হৃদয়সূত্র)"। চিত্তের যে সমস্ত আবরণ আছে, তাহার অপগমের নামই নির্ব্বাণ।

"প্রপঞ্চবিগমাৎ বিকল্পনিবৃত্তিঃ। বিকল্পনিবৃত্ত্যাচ অশেষকর্ম্মক্লেশনিবৃত্তিঃ। তস্মাৎ শূন্যৈব সর্ব্বপ্রপঞ্চনিবৃত্তলক্ষণত্বাৎ নির্ব্বাণমিত্যুচ্যতে" (মাধ্যমিক বৃত্তি)। সংসার বিগম হইলেই, কর্ম্ম ও ক্লেশাদি একেবারে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়; এই প্রপঞ্চবিলয়, অর্থাৎ শূন্যতা ইহাই নির্ব্বাণ। এই নির্ব্বাণকে অনেকস্থলে এইরূপেও বর্ণন করা হইয়াছে :—

"ইহা ভাব বা অভাব পদার্থ নহে, অথবা ভাব ও অভাব পদার্থও নহে।" ইহা হইতেই বুঝা যাইতেছে যে, ইহা একেবারে অভাবাত্মক শূন্য নহে।

"সিঞ্চ ভিক্ষু ইমং নাবং সিত্তা তে লহু মেস্সতি।
ছেত্বা রাগঞ্চ দোষঞ্চ ততো নিব্বাণ মেহিসি"। (ধর্ম্ম-পদ, ভিক্ষুবগ্গো)।

ইহার অনুবাদ Rhys Davids এইরূপে করিয়াছেন—"Bail out ? O ! mendicant, this boat ; when bailed out, it will go quickly ; when you have cut off lust and hatred, thou shall go to নির্ব্বাণ"। অর্থাৎ রাগ ও দ্বেষের ক্ষয়ের নামই নির্ব্বাণ।

পণ্ডিত Monier Williams এই সকল কারণেই বলিয়াছেন যে,—"All that can be affirmed about *Nirvana* is to be in a state of lazy, blissful repose—an emblem of perfection."

বোধ হয় আর প্রমাণ উদ্ধারের আবশ্যক নাই। ইহাতেই বুঝা গিয়াছে যে, এ নির্ব্বাণ, আত্মার ধ্বংস নহে। শঙ্করাচার্য্যের "মুক্তির" বর্ণনাও ঠিক এইরূপ।

ইহা যদি শূন্যাবস্থা হয় তবে সে মুক্তিও শূন্যাবস্থা মাত্র। শঙ্করের মতে নির্গুণ ব্রহ্মস্বরূপাবস্থাই মুক্তি। আত্মার আবরক অবিদ্যা (Conditions) ধ্বংস হইলেই, আত্মা ব্রহ্মস্বরূপ প্রাপ্ত হয়। শঙ্কর মতে ব্রহ্ম কি? "পরি-

মাণাদিদ্রব্যধর্ম্মঃ (quantity) প্রতিষিদ্ধঃ। অস্তু তর্হি লোহিতো গুণঃ (quality) ততোঽপি অন্যৎ। এবং অবস্থা-শক্তি (force or power) তাবল্লোপ পদ্যতে ব্রহ্মণঃ,—ক্রিয়াকারকাদি পরিশূন্যং (action)"—বৃহঃ উপঃ ভাষ্য ; ৫।৮।৮ ; ৫,৯।১। অর্থাৎ ব্রহ্মে quantity, quality, time, space, force, ক্রিয়া—কিছুই নাই। এরূপ ব্রহ্মপ্রাপ্তি এবং "নির্ব্বাণ" একই নহে কি? আমরা বারান্তরে শঙ্করাচার্য্যের নানাস্থানের ভাষ্য হইতে, তাঁহার উক্তি উদ্ধার করিয়া দেখাইব যে, বুদ্ধের "নির্ব্বাণ" ও তাঁহার "মুক্তির" বর্ণনা একইরূপ। শঙ্করের এই মুক্তি যদি সর্ব্বশূন্যবাদ না হয়, তবে বুদ্ধের নির্ব্বাণও কদাপি সর্ব্বশূন্যবাদ হইতে পারিবে না।

শ্রীকোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য, এম্. এ।

পূর্ণানন্দ পরমহংস।

পরমহংস পূর্ণানন্দ গিরির ঊর্দ্ধতন অষ্টম পুরুষ অনন্তাচার্য্য, খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে, রাঢ়দেশের দক্ষিণাংশে বসতি করিতেন। কিন্তু তাঁহার বাসস্থান কোন্ গ্রামে কিম্বা কোন্ উপবিভাগে ছিল কিম্বদন্তী তাহা নির্দ্দেশ করিতে অসমর্থ। তাঁহার আবাসস্থলের অনতিদূরে একজন প্রতাপশালী মুসলমান ভূম্যধিকারী বাস করিতেন। তাঁহার উৎপীড়নে অনন্তাচার্য্যের জনৈক শিষ্য, অযোধ্যানাথ, পৈত্রিক বাসভবন পরিত্যাগ পূর্ব্বক ময়মনসিংহ জিলার অন্তর্গত খাগুরিয়া নামক গ্রামে স্বীয় বাসস্থান মনোনীত করেন; এবং অল্পকাল মধ্যেই অসাধারণ বুদ্ধিবলে এতদ্দেশে একজন গণ্যমান্য লোক হইয়া উঠেন। তিনি এ অঞ্চলে 'হংসদাস' নামে খ্যাত হন। তান্ত্রিক বিধানানুসারে হংসদাস প্রতিবৎসরই একবার গুরুসন্দর্শনের জন্য, উক্ত ভূম্যধিকারীর ভয়ে ছদ্মবেশ ধারণপূর্ব্বক অনন্তাচার্য্যের গৃহে গমন করিতেন।

অনন্তাচার্য্যের একটী রূপবতী ভগ্নী ছিলেন। সেই মুসলমান ভূম্যধিকারী তাঁহার রূপলাবণ্যের প্রশংসা শ্রবণ করিয়া অনন্তাচার্য্যকে আপন সকাশে আনয়ন পূর্ব্বক তদীয় ভগ্নীর পাণিগ্রহণের অভিলাষ জ্ঞাপন করিলেন। অনন্তাচার্য্য চতুরতাসহকারে এই প্রস্তাবে সম্মতি দিলেন এবং কৃত্রিম আনন্দ ও সৌজন্য প্রদর্শন পূর্ব্বক বিদায় গ্রহণ করিলেন। অনন্তাচার্য্য গৃহে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক জননীর নিকট এই আকস্মিক বিপদের বৃত্তান্ত বিবৃত করিলেন। পরিবারস্থ

সকলেই নিতান্ত ক্ষুব্ধ, ভীত ও চিন্তিত হইলেন। ভাগ্যক্রমে সেই দিন হংসদাস গুরুসন্দর্শনার্থ অনন্তাচার্য্যের গৃহে উপনীত হইলেন এবং সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া উপস্থিত আপন্নিবারণের উপায় নির্দ্ধারণ করিলেন। হংসদাস কহিলেন —"তাঁহাকে স্থানান্তর করা ব্যতীত এই বিপদ হইতে রক্ষা পাইবার আর উপায়ান্তর নাই। অতএব আমি তাঁহাকে লইয়া পূর্ব্ববঙ্গে আমার বর্ত্তমান বাসস্থানে যাই। প্রয়োজন হইলে পরে আপনারাও তথায় যাইবেন।" অনন্তাচার্য্য এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। হংসদাসও কালবিলম্ব না করিয়া অনন্তাচার্য্যের ভগ্নীসহ পূর্ব্ববঙ্গে প্রস্থান করিলেন।

যাঘান গ্রামের একজন ভট্টাচার্য্য হংসদাসের পুরোহিত ছিলেন। অনন্তাচার্য্যের ভগ্নীর বিবাহের কাল অতীত হওয়ার আশঙ্কায় হংসদাস স্বীয় পুরোহিত পুত্রের সহিত তাঁহার বিবাহ দিলেন। কিয়ৎকাল পরে অনন্তাচার্য্যও সপরিবারে গোপনে স্বস্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক ময়মনসিংহ জিলায় আসিয়া আবাস বাটী নির্ম্মাণ করিলেন। নিম্নে অনন্তাচার্য্যের বংশাবলী প্রদত্ত হইল।

(১) অনন্তাচার্য্য
(২) বসিষ্ঠ
(৩) বনমালী
(৪) চক্রপাণি
(৫) শূলপাণি
(৬) রঘুনাথ বাচস্পতি
(৭) প্রধান পুত্র আচার্য্য পুরন্দর
(৮) জগদানন্দ (খ্যাতি পূর্ণানন্দ)
(৯) মথুরেশ শিরোমণি
(১০) দ্বিতীয় পুত্র রামেশ্বর সার্ব্বভৌম
(১১) প্রধান পুত্র হরিরাম সিদ্ধান্ত বাচস্পতি
(১২) তৃতীয় পুত্র যাদবেন্দ্র ভট্টবিশারদ
(১৩) দ্বিতীয় পুত্র নরেন্দ্র বিদ্যাভূষণ
(১৪) চতুর্থ পুত্র রামানন্দ ভট্টাচার্য্য
(১৫) রামগঙ্গা ভট্টাচার্য্য
(১৬) প্রধান পুত্র গৌরীনাথ ভট্টাচার্য্য
(১৭) প্রাণনাথ তর্কালঙ্কার
(১৮) রাজেন্দ্রকিশোর ভট্টাচার্য্য

খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে ময়মনসিংহ জিলার অন্তর্গত কাটিহালি গ্রামে পূর্ণানন্দ আবির্ভূত হন। তাঁহার প্রকৃত নাম জগদানন্দ।* 'পূর্ণানন্দ' তাঁহার

* জগদানন্দের স্বহস্তলিখিত এক খানা বিষ্ণুপুরাণ তাঁহার বংশধর শ্রীযুক্ত প্রাণনাথ তর্কালঙ্কার

গুরুদত্ত নাম। গিরি, যতি, পরিব্রাজক ও পরমহংস—তাঁহার এই সকল উপাধি তদীয় গ্রন্থাবলীতে দেখিতে পাওয়া যায়।

জগদানন্দ বাল্যকালে পিতৃহীন হন। মাতা ব্যতীত তাঁহার আর কেহই ছিলেন না। কথিত আছে তিনি বাল্যকালে অতিশয় দুর্দ্দান্ত ছিলেন। গ্রামস্থ দুর্বৃত্ত বালকগণের তিনিই দলপতি ছিলেন। লেখা পড়া করিতেন না। তাঁহার অমিত তেজ পক্ষিশাবক সংগ্রহে এবং প্রতিবেশীগণের উপর নানারূপ উপদ্রবেই বিকাশ পাইত। এই সকল কার্য্যেই তাঁহার বাল্যকাল এবং সম্ভবতঃ কৈশোরের অধিকাংশ অতিবাহিত হয়।

অবশেষে তাঁহার ভাবীগুরু ব্রহ্মানন্দ শাপগ্রস্ত অবস্থায় নানাস্থান ভ্রমণ করিতে করিতে কাটিহালি গ্রামে উপনীত হইলেন। ব্রহ্মানন্দ পণ্ডিত ছিলেন।* তিনি তাঁহার গুরু ত্রিপুরানন্দকে কিঞ্চিৎ তুচ্ছ করিতেন। তিনি মনে করিতেন

মহাশয়ের নিকটে আছে। তাহার শেষ পৃষ্ঠা হইতে জানা যায় যে ১৪৪৮ শকাব্দের (১৫২৭ খ্রীঃ অব্দের) চৈত্র মাসের কৃষ্ণা একাদশী তিথিতে মঙ্গলবারে সেই গ্রন্থের প্রতিলিপি শেষ হয়।

শুভমস্তু শকাব্দাঃ ১৪৪৮॥
শাকেনাগাব্ধি-বেদোষধিপতি-সহিতে বাসরে ভূসুতস্যৈ-
কাদশ্যাং কৃষ্ণপক্ষে সরসিজনয়নং বাসুদেবং প্রণম্য।
পুণ্যাং বিষ্ণোশ্চরিত্রে প্রথিত মধুপদং যত্নতোহত্যন্ত ধীমান্
শৈচত্রে শ্রীমান্ পুরাণস্থিদমিহ জগদানন্দশর্ম্মা লিলেখ॥

'লিলেখ' এই লিটের পদ দেখিয়া আমাদের মনে করা উচিত নয় যে এই শ্লোকটি জগদানন্দের স্বরচিত নহে, ইহা পরবর্ত্তী যোজনা মাত্র। গ্রন্থকারের নিজকার্য্য সম্বন্ধে এরূপ স্থলে লিটের ব্যবহার সংস্কৃত ভাষায় নিতান্ত বিরল নহে। কাতন্ত্র পরিশিষ্টের টীকাকার গোপীনাথ তাঁহার গ্রন্থপ্রারম্ভে লিখিয়াছেন,—

গোপীনাথ ইমঞ্চকার মধুর ব্যাহার বাগীশ্বরঃ।
তর্কাচার্য্যবরঃ সদর্থচতুরঃ সুশ্রীক বিদ্যাধরঃ॥

* ব্রহ্মানন্দ প্রণীত 'তারারহস্য' ও 'শাক্তানন্দ তরঙ্গিণী' নামক গ্রন্থদ্বয় তাঁহার পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদান করে। তিনি সমগ্র তন্ত্র শাস্ত্র আলোড়ন করিয়া এই গ্রন্থদ্বয় প্রণয়ন করিয়াছেন। শাক্তানন্দ তরঙ্গিণীতে তান্ত্রিক মতে সাধনার নিগূঢ় তত্ত্ব সমূহ সংগৃহীত ও লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ব্রহ্মানন্দ তাঁহার তারারহস্যের এক স্থানে নিজ গুরু ত্রিপুরানন্দের উল্লেখ করিয়াছেন।

নজলে পূজয়েচ্ছম্ভুং ভাগীরথী জলং বিনা।
ইতি যামলে। ত্রিপুরানন্দেন মদ্ গুরুণা ব্যাখ্যাতং।
পূজনে গঙ্গাজলে বিম্বপত্রাদিভির্ব্বিনাপি নচ সামান্য জলে॥

তারারহস্যম্—দ্বিতীয় পটলঃ।

যে তাঁহার গুরু তাহা অপেক্ষা অধিকতর সাধনা করিয়াছেন বটে, কিন্তু তিনি তাঁহার ন্যায় পণ্ডিত নহেন। কোন সময়ে ইহা প্রকাশ পাইলে ত্রিপুরানন্দ তাঁহাকে শাপ প্রদান করেন। "তোমার সিদ্ধি হইবে না" এই অভিশাপ শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মানন্দ আপন অপরাধ বুঝিতে পারিলেন এবং অনুতপ্ত হৃদয়ে গুরুর চরণে ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন। ত্রিপুরানন্দ কহিলেন 'যদি তুমি উপযুক্ত উত্তর-সাধক সংগ্রহ করিয়া কামাখ্যাপীঠের উদ্ধার পূর্ব্বক তথায় সাধনা করিতে পার, তবে তোমার সিদ্ধিলাভ হইবে।'

ব্রহ্মানন্দ নানাস্থানে অভিলষিত উত্তরসাধকের অনুসন্ধান করিয়া অবশেষে কাটিহালি গ্রামে উপস্থিত হইলেন। জগদানন্দ তদীয় দলবলসহ তাঁহার নিকট দিয়া যাইতেছিলেন। জগদানন্দের তেজঃপুঞ্জ মুখশ্রী দর্শনে ব্রহ্মানন্দ তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন, এবং জগদানন্দের অবস্থা অবগত হইয়া বলিলেন 'তুমি আমার নিকট লেখা পড়া কর, তোমার মঙ্গল হইবে।' জগদানন্দের মতি পরিবর্ত্তিত হইল। তিনি ব্রহ্মানন্দকে আপন বাটীতে আনয়ন করিলেন। এইরূপে জগদানন্দের শিক্ষা আরম্ভ হইল। কালক্রমে ব্রহ্মানন্দের যত্নে জগদানন্দ সংস্কৃত ভাষায় সম্যক্ ব্যুৎপত্তি লাভ করিলেন।

ব্রহ্মানন্দ জগদানন্দকে সংস্কৃত ভাষা সম্যক্‌রূপে শিক্ষা প্রদান পূর্ব্বক তান্ত্রিক মতে দীক্ষিত করেন। এবং জগদানন্দ সাধনমার্গে সবিশেষ অগ্রসর হইলে পর ব্রহ্মানন্দ তাঁহার নিকট আত্মকাহিনী প্রকাশ করেন। ব্রহ্মানন্দ জগদানন্দকে প্রথমতঃ সিদ্ধিলাভ করিতে অনুরোধ করেন এবং স্বয়ং তাঁহার উত্তরসাধক থাকিবেন বলিয়া প্রস্তাব করেন। জগদানন্দ সিদ্ধিলাভ করিলে পর ব্রহ্মানন্দের সাধনায় উত্তরসাধকের কার্য্য করিবেন, এইরূপ বন্দোবস্ত হয়। জগদানন্দ তান্ত্রিক নিয়মানুসারে শবসাধনায় কালীবিদ্যাবিষয়ে সিদ্ধি লাভ করেন এবং গুরুর নিকট "পূর্ণানন্দ" অভিধাপ্রাপ্ত হন। তৎপর ব্রহ্মানন্দ সাধনা আরম্ভ করেন এবং পূর্ণানন্দ তাঁহার উত্তরসাধকত্ব গ্রহণ করেন।

কথিত আছে ব্রহ্মানন্দ তান্ত্রিক পদ্ধতি অনুসারে শবসাধন করিবার জন্য শবোপরি আরোহণ করিলে, শবের (পাঠক ক্ষমা করিবেন) ঊর্দ্ধগতি হয়। ব্রহ্মানন্দ শবসহিত অন্তর্হিত হন। পূর্ণানন্দ মাতার নিকট আসিয়া গুরুদেবের এই আকস্মিক বিপদের বৃত্তান্ত বিবৃত করিলেন, এবং মাতার অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক দেশে দেশে তাঁহার অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। সুদীর্ঘকাল অনুসন্ধানের পর মণিপুরে যাইয়া জানিতে পারিলেন যে ঐ নির্দ্দিষ্ট আকৃতি বিশিষ্ট একজন

লোক তথায় আছেন। তিনি বিদেশ হইতে আসিয়া তথায় এক চণ্ডালিনীর পাণিগ্রহণ পূর্ব্বক সচ্ছন্দে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন। পূর্ণানন্দ গিয়া দেখিলেন যে সেই চণ্ডাল ক্ষেত্র হইতে আসিয়া আহারের পর বাহিরের এক ঘরে নিদ্রাভিভূত হইয়াছেন। নিদ্রিতাবস্থায় পূর্ব্ব অভ্যাস বশতঃ হস্তের পর্ব্ব সমূহে জপ করিতেছেন। পূর্ণানন্দ তাঁহাকে জাগাইলেন না। মনে করিলেন লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়াতে তাঁহার আত্মবিস্মৃতি জন্মিয়াছে এবং পূর্ব্বস্মৃতির বিলোপ হইয়াছে। পূর্ণানন্দ বটপত্রে গুরুর অভীষ্ট দেবতা তারা বিদ্যার মন্ত্র লিখিয়া ব্রহ্মানন্দ দেখিতে পান এমন এক স্থানে রাখিয়া সেই বাটী হইতে চলিয়া আসিলেন। ব্রহ্মানন্দ নিদ্রাভঙ্গের পর গাত্রোত্থান করিয়া বটপত্রে লিখিত ইষ্টমন্ত্র দেখিতে পাইলেন। তাঁহার পূর্ব্ব স্মৃতি জাগিয়া উঠিল। বুঝিতে পারিলেন যে তাঁহার সুযোগ্য শিষ্য পূর্ণানন্দ আসিয়াছেন। আবেগপূর্ণ হৃদয়ে অনুসন্ধান করিয়া তাঁহার সাক্ষাৎ পাইলেন। ব্রহ্মানন্দ আপন অধঃপতনের জন্য আক্ষেপ ও অনুতাপ করিলেন। পূর্ণানন্দ কামাখ্যাপীঠ উদ্ধার করতঃ গুরুদেবের অভীষ্ট সাধনে সহায়তা করিবেন বলিয়া তাঁহাকে আশ্বস্ত করিলেন।

পূর্ণানন্দ ব্রহ্মানন্দের সহিত মণিপুর পরিত্যাগ করিলেন, এবং তন্ত্রশাস্ত্র আলোচনা করিয়া কামাখ্যাপীঠের উদ্ধার সাধন করিলেন। কামাখ্যাপীঠ লুপ্ত হইয়াছিল। স্থানীয় লোকে একটা বিস্তৃত স্থান নির্দ্দেশ করিত বটে, কিন্তু তাহার ঠিক কোন্ অংশে কামাখ্যাপীঠ অবস্থিত ছিল, তাহা বলিতে পারিত না। পূর্ণানন্দই সেই পীঠস্থান নির্দ্দেশ করিয়া শাক্ত জগতের ধন্যবাদভাজন হন। পূর্ণানন্দের সাহায্যে ব্রহ্মানন্দ তথায় তারাবিদ্যা বিষয়ে সিদ্ধিলাভ করেন।

পূর্ণানন্দ ব্রহ্মানন্দের শিষ্য হইলেও বিস্মৃত মন্ত্র স্মরণ করাইয়া তাঁহার গুরু-স্থানীয় হইয়াছিলেন। এইজন্য ব্রহ্মানন্দ ও পূর্ণানন্দের বংশধরগণের মধ্যে গুরুকরণ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বিশেষত্ব প্রবর্ত্তিত হয়। পূর্ণানন্দ বংশীয় একজন ব্রহ্মানন্দ বংশীয় একজনের নিকট মন্ত্র গ্রহণ করেন এবং ব্রহ্মানন্দ বংশীয় গুরুর ভ্রাতা পূর্ণানন্দবংশীয় শিষ্যের পিতা অথবা ভ্রাতার নিকট মন্ত্র গ্রহণ করেন। এইরূপ গুরুক্রম পুরুষপরম্পরায় চলিতে থাকে। কালক্রমে নানাকারণে ব্রহ্মানন্দ ও পূর্ণানন্দের বংশধরগণের মধ্যে পরস্পরের আলয়ে যাতায়াত বন্ধ হইয়া গেলে পূর্ণানন্দ বংশীয়েরা স্বেচ্ছানুযায়ী বিভিন্ন বংশীয় গুরু হইতে মন্ত্র গ্রহণ করিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু ইহাতেও গুরুকরণ সম্বন্ধীয় উক্ত বিশেষত্ব (সর্ব্বত্র না হউক,

অনেক স্থলেই) রহিয়া গেল। উদাহরণ স্বরূপ এ স্থলে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে পূর্ণানন্দবংশীয় কাটিহালিনিবাসী শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রকিশোর ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের গুরু আমোদপুরনিবাসী শ্রীযুক্ত মুকুন্দচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কনিষ্ঠ সহোদর এবং মুকুন্দ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃজায়া শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র কিশোর ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পিতা শ্রীযুক্ত প্রাণনাথ তর্কালঙ্কার মহাশয়ের নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছেন।

পূর্ণানন্দের বংশধরগণ এক্ষণে ময়মনসিংহ জিলার অন্তর্গত কাটিহালি, ডৌহাখলা, নহাটা, দিয়াড়া ও আস্মুজিয়া গ্রামে বাস করিতেছেন। কেহ কেহ ময়মনসিংহ জিলা পরিত্যাগ করিয়া অপরাপর স্থানে গিয়াও বসতি করিয়াছিলেন।

পূর্ণানন্দ ১৪৯৩ শকাব্দে (খ্রীঃ ১৫৭১) আশ্বিন মাসে 'শাক্তক্রম' নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। উহার প্রারম্ভ এইরূপ :—

নত্বা শ্রীপরদেবতাঙ্ঘ্রি যুগলং শাক্তক্রমং কামদং।
পূর্ণানন্দযতিস্তনোতি শিবয়োস্তন্ত্রানুসার ক্রমাৎ॥
শ্রীদীক্ষাগুরু পাদপদ্মযুগল ধ্যানাম্বনো নির্ম্মলো
দ্বৈতজ্ঞান বিনাশনায় বিদুষামামোদ সংবৃদ্ধয়ে॥

পূর্ণানন্দ নিম্নলিখিত রূপে তাঁহার শাক্তক্রম শেষ করিয়াছেন

ভাবচূড়ামণিং বীক্ষ্য কুলচূড়ামণিং তথা।
তন্ত্রচূড়ামণিং বীক্ষ্য বীরতন্ত্রকমামলং॥
কুলার্ণবং প্রক্রমঞ্চ বামকেশ্বর সংহিতাং।
সমায়ান মাতৃকাঞ্চ উত্তরতন্ত্রমেবচ॥
গুরূণাঞ্চ মতং জ্ঞাত্বা কালীতন্ত্রং কুলার্ণবং।
পূর্ণানন্দেন গিরিণা কৃতং শ্রীপতিবাসরে॥
ইষে কালাঙ্ক বেদেন্দুশাকে মঙ্গলবাসরে।
নিত্যভুক্ত স্বভাবার্থং শাক্তক্রম মনুত্তমং॥

ইতি শ্রীপূর্ণানন্দ পরমহংসবিরচিতে শাক্তক্রমে সপ্তমোংহংশ।

১৪৯৯ শকাব্দে (খ্রীঃ ১৫৭৭) পূর্ণানন্দ "শ্রীতত্ত্বচিন্তামণি" রচনা করেন। এই গ্রন্থে তিনি সবিশেষ পাণ্ডিত্য প্রদর্শন করিয়াছেন। সুপ্রসিদ্ধ "ষট্‌চক্র নিরূপণ নামক গ্রন্থ শ্রীতত্ত্বচিন্তামণির একটি অধ্যায়মাত্র। ষট্‌চক্র নিরূপণের মধুর শ্লোকাবলী অনেকেরই সুপরিচিত।

শ্রীতত্ত্বচিন্তামণির প্রারম্ভ এইরূপ,—

.. ...তত্রচ নিরন্তর ভাবনাহুবরগাহ্য বিবিধ তন্ত্র স্বতন্ত্র সিদ্ধান্ত শুদ্ধিবোধ বিধুর মহানস ব্রজোদ্বেগ সমুদ্বিগ্ন মনাঃ শ্রীমৎপরমহংস পরিব্রাজক গুরু শ্রীব্রহ্মানন্দ মুখারবিন্দনিঃস্যন্দমান পরমরহস্যাতিরহস্য নিগমমকরন্দসন্দোহ তুন্দিলানন্দ শ্রীপূর্ণানন্দ পরমহংসঃ শ্রীতত্ত্বচিন্তামণিং চতুর্দ্দশশতাধিক নবনবতি শকাব্দে বিতনোতি।

পূর্ণানন্দ কালীপূজা বিধায়ক 'শ্যামারহস্য' নামক গ্রন্থ শ্রীতত্ত্বচিন্তামণির পরে রচনা করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয়। শ্যামারহস্যের একস্থানে শ্রীতত্ত্বচিন্তামণির উল্লেখ দৃষ্ট হয়। তাহা এইরূপ—

আবাত্রিকবিধানন্ত শ্রীতত্ত্বচিন্তামণাবনুসন্ধেয়ং।

শ্যামারহস্যম্—তৃতীয় পরিচ্ছেদঃ।

শ্যামারহস্যের প্রারম্ভ এইরূপ—

দেবীং দানবদৈত্যদর্পনিবহান্নির্মূলয়ন্তীং শিবাং
ব্রহ্মানন্দমহেশ মৌলিমনিভিঃ সংসেবিতাঙ্ঘ্রি দ্বয়াম্।
নত্বা শ্রীগুরুপাদপদ্ম পরমামোদামৃত প্লাবিতঃ
পূর্ণানন্দ গিরিস্তনোতি বিরলাং শ্যামারহস্যাভিধাম্॥

পণ্ডিত প্রবর স্বর্গীয় রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহোদয় কর্তৃক সম্পাদিত "হস্ত লিখিত সংস্কৃত গ্রন্থাবলীর বিজ্ঞাপনী" নামক সুবৃহৎ গ্রন্থে পূর্ণানন্দ বিরচিত "তত্ত্বানন্দ তরঙ্গিণী" নাম্নী একখানা পুস্তিকার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। তাহার প্রারম্ভ এইরূপ—

তন্ত্রাণাং সঙ্গতিং বক্ষ্যে তত্ত্বানন্দতরঙ্গিণীং।
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং আদ্যসাধন পদ্ধতিং॥

Notices of the Sanskrit MSS- vol- I- (207)

আমরা আদর্শশিষ্য, সাধকচূড়ামণি, কামাখ্যাপীঠোদ্ধারকারী পরমহংস পূর্ণানন্দ গিরি সম্বন্ধে যথাশক্তি আলোচনা করিলাম। তিনি ময়মনসিংহ বাসী এবং সমগ্র বাঙ্গালী জাতির গৌরব। শক্তি উপাসকগণের মুক্তিমার্গ প্রদর্শক। তৎসম্বন্ধীয় আলোচনায় কোন যোগ্যতর ব্যক্তির লেখনী সঞ্চালন একান্ত বাঞ্ছনীয়।

শ্রীকরুণানাথ ভট্টাচার্য্য।

মাসিক সাহিত্য।

অতিথি—ঢাকা, ৭৭নং দিগবাজার হইতে শ্রীপ্রমথনাথ রায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত; বালক বালিকাদের উপযুক্ত সচিত্র মাসিক পত্র। আমরা ক্রমান্বয়ে ইহার ৪র্থ সংখ্যা পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হইয়াছি। বাঙ্গালায় শিশুরঞ্জন মাসিক পত্রের একান্ত অভাব। কোমলমতি বালক বালিকা-দিগের সরল প্রাণে পাঠের প্রতি আগ্রহ ও ভালবাসা জন্মাইবার জন্যই এইরূপ মাসিক পত্র পত্রিকার প্রয়োজন। মুখে মুখে আবৃত্তি করিবার উপযোগী সরস মধুর কবিতা, আমোদজনক ও উপদেশপ্রদ গল্প, আদর্শ ও শিক্ষণীয় চরিতাবলী বালক বালিকাদিগকে অসৎ কার্য্য ও কুচিন্তা হইতে বহু পরিমাণে রক্ষা করিতে সমর্থ হয়, এবং উত্তর উত্তর পাঠের প্রতি প্রীতি ও ভালবাসা, আবেগ ও আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়া তোলে। সুতরাং এই শ্রেণীর মাসিক পত্র পত্রিকার দ্বারা যে সমাজের বহু কল্যাণ সাধিত হয় তাহা বলা বাহুল্য। অতিথি সেইরূপ উদ্দেশ্য লইয়া পরিচালিত হইতেছে। শ্রাবণ সংখ্যা পর্য্যন্ত যে সকল প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে তাহার অধিকাংশ প্রবন্ধই শিক্ষণীয় বিষয়ের সমাবেশে উজ্জ্বল হইয়াছে। "অদ্ভুত ডাকাত" একটী সুন্দর গল্প, "কুম্ভীর" 'বেঙ্গ' "আমার বিড়ালী" প্রভৃতি ও সুলিখিত এবং জ্ঞাতব্য বিষয়ে পরিপূর্ণ। 'আমার বিড়ালী' উপদেশপূর্ণ তত্ত্বের সমাবেশে উপসংহার ভাগ একটু কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। 'পৃথিবীর কথা সহজ ও সুখপাঠ্য এখন কোমল মস্তিষ্ক "ইচড়ে না পাকিলে" ভাল। আমরা সহযোগীর দীর্ঘ জীবন কামনা করি।

প্রবাসী—শ্রাবণ। 'সূর্য্যসম্ভব' সূর্য্যের উৎপত্তি ও লয় বিষয়ে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বালোচনা 'ধর্ম্মের রূপ ও স্বরূপ' একটী উৎকৃষ্ট তত্ত্বজ্ঞানপূর্ণ প্রবন্ধ। নবমীতে বিসর্জ্জন একটী অসার গল্প। এরূপ গল্প লিখিয়া প্রবাসীর সুদীর্ঘ ১৪ কলম পূরণ না করিলেও বোধ হয় ক্ষতি হইত না। গল্পাংশ এইরূপ—বিজয়ী গ্রামের রায় ও চৌধুরী পরিবার বিশেষ প্রতিপত্তিশালী ও পরস্পরে প্রতিদ্বন্দ্বী। রায় পরিবারের পুত্রটী বিশেষ যোগ্য সুতরাং নামটীও বেশ মোলায়েম রমেশচন্দ্র। চৌধুরী পুত্র মূর্খ নামটিও সুতরাং গদাধরচন্দ্র। গদা তৃতীয় গৃহের কুমারী কন্যা মানসীকে পাইবার জন্য ব্যস্ত। কিন্তু পাইবার উপায় নাই। অগত্যা গদাধর একদিন (মহানবমীর দিনে) পুকুরে ডুব দিয়া রহিল। আর যেই মানসী স্নান করিতে আসিয়া জলে পা দোলাইয়া সোপানোপরি উপবেশন করিল অমনি কুমীর রূপে জলে টানিয়া লইয়া গেল। বালিকা চীৎকার করিতে লাগিল। পশ্চাৎ হইতে রমেশচন্দ্র আসিয়া বালিকাকে উদ্ধার করিলেন কিন্তু নিজে বিপন্ন হইলেন। মানসী দৌড়াইয়া গিয়া রমেশের পিতাকে খবর দিল। রায় মহাশয় লোকজন লইয়া আসিয়া পুত্রকে জল হইতে তুলিয়া ঝাড়া ফোঁকা করিয়া সুস্থ করিলেন। রমেশ সুস্থ হইয়া বলিল "আর একজন জলে ডুবিয়াছে তাহাকে তোলা হইয়াছে কি? আমার বোধ হয় সে গদাধর।" তখন গদাধরের মৃত দেহও তোলা হইল। ঘটনাস্থলে রমেশ ও মানসী দুইটী বক্তৃতা দ্বারা ঘটনাটা লোককে বুঝাইয়া দিলেন। গদার মৃত্যুতে চৌধুরী মহাশয় গৃহে গিয়া নবমীতেই প্রতিমা বিসর্জ্জন করিলেন। গদা মরিল প্রতিমা বিসর্জ্জন হইল, গল্প কিন্তু ফুরাইল না। ফুরাইবেই বা কেমন করিয়া; গল্পের যে গল্পত্বই রহিয়া গিয়াছে।

এইবার গল্পের সার অংশ। পূর্ব্বরাগ ব্যতীত যে ভাল গল্প উপন্যাস হয় না। সুতরাং গল্প লিখিতে হইলেই পূর্ব্বরাগের আভাস সূচিত হওয়া প্রয়োজন। এই গল্পেও তাহার কামাই হয় নাই। মানসীর সহিত রমেশের অনুরাগ জন্মিয়াছে। রমেশ বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪র্থ বার্ষিক শ্রেণীতে পড়েন। ডাক্তারিও করেন। অনুরাগের পূর্ব্বইতিহাস অপরিজ্ঞাত রমেশ কলিকাতা হইতে আসিয়া শুনিলেন মানসীর মার জ্বর। রমেশ চিকিৎসা করিতে লাগিলেন। এমন সুযোগে অনুরাগ যায় কোথায়। এই অনুরাগের খর প্রবাহের ভিতরই গদাধরের মৃত্যুর ঘটনাটা বিষম বিপত্তি বাধাইয়া দিল। সেইদিন রমেশের পিতা রমেশকে মানসীদের বাড়ীতে যাইতে নিষেধ করিলেন। রমেশ অনেক রকম উজর আপত্য দেখাইল। পিতা সকলই খণ্ডন করিলেন। এইবার রমেশ শেষবার মানসীর মাকে দেখিতে গেল। গিয়া দেখিল মানসীরও জ্বর। রমেশ মানসীকে ছল করিয়া সরাইয়া আনিয়া অতি চুপি চুপি পিতার কঠোর ব্যবস্থা শুনাইলেন। মানসী দর দর ধারে " প্রেমের অস্ফুট ভাষায় " অশ্রু বিসর্জ্জন করিল। * * * গভীর নিশীথে শুশ্রূষা-কারিণী আসিয়া নিদ্রাহীন রমেশকে জানাইল মানসীকে গৃহে পাওয়া যাইতেছে না। রমেশ উঠিয়া অমনি সেই পুকুরে গেল। গিয়া কি দেখিল ? পুকুর গর্ভ হইতে শুক্লবসনা গৌরাঙ্গী মূর্ত্তি উত্থিত হইয়া জলের উপর দাঁড়াইয়াছে। রমেশ ভয়ে মূর্চ্ছিত হইল। ডাকিনী আসিয়া রমেশকে তুলিল। ডাকিনী আর কেহ নহে মানসী। পিতৃ আদেশে রমেশ তাহাদের বাড়ীতে আসিবে না তাই মানসী জলে ডুবিয়া মরিতে আসিয়াছিল। দুর্গা প্রতিমার কাঠামের উপর পতিত হওয়ায় আর মৃত্যু হইল না। এই খানে বহু প্রেমালাপের পর মানসী বলিলেন " রমেশ তুমি আমার জীবনসর্ব্বস্ব !" রমেশচন্দ্র, পুকুর ও প্রতিমা সাক্ষ্য করিয়া বলিলেন " তুমি চিরকাল আমার হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হইয়া থাকিবে।।!" * * * *

লেখক এইরূপ উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির যুবক যুবতীর চিত্র অঙ্কিত করিয়া সমাজের কি উপকার দর্শাইতে ইচ্ছুক, বলিয়া দিতে পারেন কি ? গৃহে মৃত্যুশয্যায় মাতাকে মৃতকল্পা রাখিয়া চতুর্দ্দশী কুমারী কন্যার গৃহের বাহিরে নিশীথে নির্জ্জনে পর পুরুষের সহিত প্রেমালাপ ভারতের বাহিরেই শোভা পায়।

এরূপ গল্প পাঠ করিয়া দু একটী যুবক রমেশ সাজিতে পারে বটে এবং দুই একটী কুমারী কন্যাও মানসীর চাল চালিতে পারে—তাহা হইলেই কি লেখক তাহার লেখনী ধারণের সার্থকতা অনুভব করিবেন ? আশা করি, লেখক তাহার লেখনীকে সংযত করিতে চেষ্টা করিবেন। এরূপ চিত্র অঙ্কিত করা ভ.দুরের কথ চিন্তা করাও পাপ।

'বিক্রমাদিত্য ও নবরত্ন' প্রবন্ধে কালিদাস, বরাহমিহির প্রভৃতিকে ৫৫০ খৃষ্টাব্দের লোক বলা হইয়াছে।

চিত্র সম্পদে প্রবাসী সম্পদশালী।

আরতি।

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

তৃতীয় বর্ষ।] ময়মনসিংহ, কার্ত্তিক, ১৩০৯। [৫ম সংখ্যা।

শারদীয় পূজা।

"পশ্যেম শরদঃ শতং, জীবেম শরদঃ শতং,
শৃণুযাম শরদঃ শতম্।"

ঋতুরাজ কুসুমাকর (বসন্ত) সকল বিষয়েই সর্ব্বশ্রেষ্ঠতম ঋতু বলিয়া পরিগণিত, কিন্তু শরতের শোভা বসন্তাপেক্ষা অল্পতর বলিয়া বোধ হয় না। শরতের সুবিমল শশধর, স্বচ্ছসলিলপরিপূর্ণ সুন্দর সরোবরের শুভ্র সরোজ, হরিৎবর্ণ শস্যক্ষেত্রের অতীব মনোমোহিনী শোভা, কিশলয়গুচ্ছমধ্যস্থিত বিবিধ বিচিত্র বিহঙ্গের সুমধুর কাকলী লহরী, নানা জাতীয় অপূর্ব্ব প্রসূন পুঞ্জের পরিস্ফুটন, প্রভৃতিতে মনোহর শরৎ বাস্তবিকই বসন্তের সমতুল্য। শরৎসমাগমে প্রকৃতি সুন্দরী মধুময়ী, হাস্যময়ী ও স্ফূর্ত্তিময়ী হইয়া জগতের জীবকুলকে আমোদিত করেন। মহাকবি কালিদাস ভাবে বিভোর হইয়া শরতের সৌন্দর্য্যসুধা পান করিতেন; তিনি বলিয়াছেন—

স্ফুটকুমুদচিতানাং রাজহংসস্থিতানাং
মরকতমণিভাসা বারিণা ভূষিতানাম্।
শ্রিয়মতিশয়রূপং ব্যোমতোযা শয়নং
বহতি বিগতমেঘং চন্দ্রতারাবকীর্ণম্।
শরদি কুসুমসঙ্গাদ্বায়বো বান্তি শীতা
বিগতজলদবৃন্দা দিগ্বিভাগা মনোজ্ঞাঃ।
বিগতকলুষমম্ভঃ শ্যানপঙ্কা ধরিত্রী
বিমলকিরণচন্দ্রং ব্যোমতারা বিচিত্রম্॥

নবীন জলধরের নীল-কৃষ্ণাভ ক্রোড়ে শরতের শুভ্র বিহঙ্গদিগের ক্রীড়া

অতীব নয়নানন্দদায়িনী। শরতের যাহা কিছু দেখ তাহাই যেন হাস্যময়, আনন্দময় ও প্রেমময় বলিয়া বোধ হয়। শরতের সকল দিবসই নবোৎসাহে অনুপ্রাণিত এবং নব নব সৌন্দর্য্যে প্রতিভাসিত।

এই মনোহর শরতের শুক্লপক্ষে বঙ্গদেশের হিন্দুসমাজে মহামায়ার মহাশক্তির সাকারোপাসনা হইয়া থাকে, এই উপাসনার নাম দুর্গাপূজা; শরৎ ঋতুতে ইহার উদ্বোধন হয় বলিয়া ইহা শারদীয় পূজা নামেও অভিহিত হইয়া থাকে। অতি সুন্দর ঋতুতে, অতি সুন্দর সময়ে, এই মহাসুন্দর পূজার অনুষ্ঠান হয়। সেই "অনাদি অনবদ্য সুন্দর" এই সুন্দর শরতে, মহাসুন্দরী বেশে বাঙ্গালী হিন্দুর গৃহে গৃহে বিরাজ করেন। ভক্তাধিক ভক্ত, প্রাণ মন খুলিয়া, ভক্তিভরে তাঁহাকে পত্র পুষ্প ফল মূল যাহা কিছু শাস্ত্রবিধিমত অর্পণ করেন। জগন্মাতা জগদম্বার কিছু অভাব না থাকিলেও, কেবল ভক্তের মনোবাঞ্ছা পরিপূরণ জন্য—কেবল পুত্রবৎসলতার পরিচয় দিবার জন্য—ভক্তবৎসলা মাতা, ভক্ত পুত্রের সভক্তি নিবেদন অতীব আনন্দ সহকারে গ্রহণ করতঃ আনন্দময়ীরূপে দর্শন দেন।

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ॥

শরতের এই মহাপূজা কেবল সৌন্দর্য্য ও ভক্তির পরিচয় নহে, ইহা সামাজিক, রাজনৈতিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষায় পরিপূর্ণ। পৃথিবীর আর কোনও দেশে এই মহাপূজার অনুষ্ঠান হয় না; যে দেশে হয় সে দেশ অতি পবিত্র, অতি ধার্ম্মিক, অতি উৎসাহী এবং অতীব আধ্যাত্মিক; কিন্তু কেবল মৃণ্ময় মূর্ত্তিতে পূজা বা উদ্দেশ্য নাই, এই মহাপূজার অর্থ কয় জন বুঝিয়াছে বা বুঝিতে পারে? কেবল বুঝিলেই যথেষ্ট নহে, কার্য্যকরী শক্তির অভাবে উদ্দেশ্যভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছে।

একবার ঐ দুর্গা মূর্ত্তির দিকে দৃষ্টিপাত কর; জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন করিয়া ঐ ত্রিতাপহারিণী মহিমময়ী মূর্ত্তির দিকে একবার মুখ ফিরাইয়া দেখ। Divinity and Humanity is perfected in the group ঐ মূর্ত্তি সমষ্টিতে নরত্ব ও অমরত্ব—মনুষ্যত্ব ও ব্রহ্মত্ব—একাধারে সম্মিলিত হইয়াছে। ইহকাল ও পরকাল এই উভয় কাল ও উভয় লোককে একত্রে মিলাইয়া দিয়া সন্ধিস্থলে ভক্তমনবাঞ্ছাপূর্ণকারিণী জগন্মাতা জগদম্বা স্বয়ং দণ্ডায়মানা রহিয়াছেন। এই মূর্ত্তি কি সুন্দর! কি মনোহর। যাহারা সংসারে সুখী হইতে অভিলাষ করে, যাহারা ইহজীবনে

মানবজন্মের চরিতার্থতা সম্পাদন করিয়া, পরজন্মে অক্ষয় আনন্দ উপভোগ করিতে বাসনা করে; যাহারা মায়াময় কঠোর সংসারকে আনন্দময় দেখিতে ইচ্ছা করে, তাহাদের পক্ষে এই দুর্গামূর্ত্তির সমষ্টি শ্রেষ্ঠতম শিক্ষক ও সদুপদেশক। মাতা দুর্গা মহাশক্তির মূর্ত্তি—ইহা শক্তিরূপিণী। সংসারে বাস করিতে গেলে সর্ব্বপ্রথমে শক্তির আবশ্যক হয়; শক্তি বিনা অগ্নি জ্বলে না, বায়ু বহে না, জল চলে না, পৃথিবী তিষ্ঠিতে পারে না। এই সংসারে কোন্ কর্ম্মে শক্তির প্রয়োজন নাই? শক্তিহীন মানব আনন্দ, উৎসাহ, জয়, শ্রী, উন্নতি, জ্ঞান, ধন, মান, সকল বিষয়েই অসার। এই সংসারে বাস করিতে গেলে, সভ্য মানবসমাজে "মানুষ" বলিয়া পরিচয় দিতে হইলে, শক্তির নিতান্ত প্রয়োজন। দেশরক্ষায়, ধর্ম্মরক্ষায়, সমাজরক্ষায়, জাতিরক্ষায় নিজের ও পরের উন্নতিসাধনে এবং জগতের কল্যাণ সংকল্পে শক্তিরই সর্ব্বত্র প্রধানতা, এই জন্য মাতা স্বয়ং শক্তিরূপিণী। আইস আমরা এই মহাশক্তির আরাধনা করিয়া মহাবলী হই; মহাবলে অনুপ্রাণিত হইয়া ভারতীয় আর্য্য বলিয়া পরিচয় দিতে সক্ষম হই। কিন্তু কেবল অন্ধশক্তিই কি সংসারের সুখের কারণ? জ্ঞানবিহীন শক্তি কেবল অসৎ কার্য্যের উদ্দীপক ও সহায়ক মাত্র, শক্তির সঙ্গে জ্ঞানের—বিদ্যার—মানসিক উন্নতির পরাকাষ্ঠার প্রয়োজন; এই জন্য শক্তিরূপিণী মহামাতার পার্শ্বে জ্ঞানরূপিণী সরস্বতী বিদ্যমান। কিন্তু কেবল শক্তি ও জ্ঞানে সংসার চলে না; উদরের সংস্থান চাই, নতুবা জগৎ অন্ধকারময় বলিয়া বোধ হয়। উদরের পরিতৃপ্তির জন্য ধনের (অর্থের) প্রয়োজন, এই জন্য দুর্গার আর এক পার্শ্বে লক্ষ্মী দেবী বর্ত্তমান। সংসারে বীরত্ব, স্বাধীনমতিত্ব এবং সৌন্দর্য্যে অনেকে বশীভূত হয়; শক্তি, জ্ঞান ও ধনের সহিত এ গুলির প্রয়োজন, এই জন্য কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন (কার্ত্তিক) উপবিষ্ট হইয়া আমাদিগকে এই শিক্ষা দিতেছেন। এ সকল গুণ থাকিলেও উৎসাহ ও আত্মমর্য্যাদা-জ্ঞান ভিন্ন জগতে কেহ কি কখনও "মানুষ" বলিয়া পরিগণিত হইতে সমর্থ হইয়াছে? যেখানে উৎসাহ, সেইখানেই পরিশ্রমপরায়ণতা এবং যেখানে পরিশ্রমপরায়ণতা, সেই খানেই জয় এবং সিদ্ধি। ঐ দেখ সিদ্ধিদাতা গণেশ ইহার অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। কার্ত্তিকের বাহনের নাম ময়ূর; ময়ূর দেখিতে অতীব সুশ্রী, কিন্তু ইহার স্বর অতীব কর্কশ। এই সংসারে অনেকে সুন্দর বটেন, কিন্তু কথায় বড়ই কর্কশ; সুতরাং প্রিয়ভাষী হওয়া অত্যন্ত আবশ্যক। সদা "সত্যং ব্রূয়াৎ প্রিয়ং ব্রূয়াৎ, ন ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ং॥" ইহাই শাস্ত্রোক্তি। গণপতির বাহনের নাম মূষিক; গণপতি

উৎসাহী, পরিশ্রমপরায়ণ এবং সিদ্ধিশ্রীসম্পন্ন বটেন, কিন্তু ইহাঁর বাহন (মূষিক) অত্যন্ত খল।

"উই আর ইঁদুরের দেখ ব্যবহার।
যাহা পায় তাই কেটে করে ছারখার॥
কাট কাটে বস্ত্র কাটে কাটে সমুদয়।
সুচারু সোণার দ্রব্য কেটে করে ক্ষয়॥
বিনা দোষে নষ্ট করে দ্রব্য শত শত।
খল নর হয় ঠিক ইঁদুরের মত॥"

দেখিও ভাই, জয় লাভে উন্মত্ত হইয়া, অকারণে কাহারও অনিষ্ট করিতে না হয়। যেখানে সিদ্ধি সেইখানে অহঙ্কার, যেখানে অহঙ্কার সেইখানে তমঃ গুণ, যেখানে তমঃ সেইখানে পরের অনিষ্টেচ্ছা এবং খলতা স্বাভাবিক।

তাহার পরে দেখ, জগন্মাতা দুর্গা শক্তিরূপিণী হইয়া সাধুর অনিষ্ট করেন না, তিনি দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন জন্য শক্তিরূপ ধারণ করেন। শক্তির সদ্ব্যবহার হওয়া আবশ্যক, অসদ্ব্যবহারে শক্তির কুফল জন্মে। দেশবৈরী, আর্য্যবৈরী, ধর্ম্মবৈরী মহিষাসুরের মর্দ্দন জন্য তিনি সিংহপৃষ্ঠে শক্তিরূপ ধারণ করিয়া দণ্ডায়মানা হইয়াছেন। এই মূর্ত্তি দশভূজার মূর্ত্তি—কল্পনার অতীত, অতীন্দ্রিয় মহাশক্তির মূর্ত্তি। এই মূর্ত্তির আরাধনায় দুর্ব্বল দেহে বলের সঞ্চার হয়, নিরাশায় আশার আনন্দময় আলোক উপস্থিত হয়, ভীতের অভয় জন্মে, এবং পাপের রাজ্য পলায়ন করিয়া ধর্ম্মের রাজ্যকে স্থান দেয়। বুঝিলাম, এই সংসারে আদর্শ মানবের এই কয়েকটি মুখ্য দ্রব্যের প্রয়োজন—শক্তি, জ্ঞান, ধন, সরল স্বভাব, মিষ্টমুখ, উৎসাহ, পরিশ্রমপরায়ণতা এবং জয়। দুর্গামূর্ত্তি-সমষ্টি এই গুণগুলির জীবন্ত মূর্ত্তি। সংসারে যে সৌভাগ্যবান মহাপুরুষের এই গুণগুলি আছে, সংসার তাহার পক্ষে সুখকর স্বর্গধাম না হইবে কেন?

নবমী তিথিতে মায়ের শেষ পূজা হয়, দশমী তিথির জন্য অতি সামান্য মাত্র বাকি থাকে। এই মহাপবিত্রা দশমী তিথি বঙ্গের ঘরে ঘরে "বিজয়া দশমী" নামে প্রখ্যাতা এবং ভারতের অন্যান্য অংশে দশহরা নামে প্রসিদ্ধ। এই দিনে রঘুপতি শ্রীরামচন্দ্রের বহুকালের মনোবাঞ্ছা পরিপূরণ হইয়াছিল, এই দিনে তিনি "দানবাক্রান্ত সন্তানদিগকে" বিদেশী রাক্ষসহস্ত হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন। এই দিনে পতিতপাবন রঘুকুলমণি রামচন্দ্র দেব-দ্বিজের উদ্ধার, ধর্ম্মের রক্ষা, গঙ্গা, গাভী ও গায়ত্রীর মাহাত্ম্য বর্দ্ধন, সাক্ষাৎ

লক্ষ্মী নারায়ণীরূপিণী সীতা সতীর উদ্ধার, রাবণ বধ, এবং অধর্ম্মের পরাজয় দ্বারা জগৎকে শান্তিময় করিয়াছিলেন। এই পবিত্র দিনে তিনি হনুমানাদি ভক্ত, মিত্র, সেবক প্রভৃতির সহিত একত্র হইয়া মহানন্দে মহোৎসব করিয়াছিলেন, সেই মহোৎসবের নাম "বিজয়া দশমী"। এই দিন কি পবিত্র! কি মহান্! কি সুখকর!! এই দিনের মহামহোৎসব দর্শন করিয়া কবিবর ভর্ত্তৃহরির ন্যায় বলিতে ইচ্ছা হয়—

' প্রারভ্যতে ন খলু বিঘ্নভয়েন নীচৈঃ।
প্রারভ্য বিঘ্নবিহতা বিরমন্তি মধ্যাঃ॥
বিঘ্নৈ পুনঃপুনরপি প্রতিহন্যমানাঃ।
প্রারব্ধমুত্তমগুণাঃ ন পরিত্যজন্তি॥"

এই পবিত্র মহামহোৎসব দর্শন করিয়া ঋগ্বেদের ব্রহ্মর্ষিদিগের ভাষায় বলিতে ইচ্ছা হয়—

"সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং সংবো মনাংসি জানতাং।
দেবাভাগং যথা পূর্ব্বে সংজানানা উপাসতে॥
সমানীব আকুতিঃ সমানা হৃদয়াণি বঃ।
সমানমস্তু বো মনো যথা বঃ সুহাসতি॥" (ঋগ্বেদ)

অর্থাৎ "তোমরা সকলে একসঙ্গে মিলিত হও, একসঙ্গে কথা বল, একসঙ্গে সকলের মন সকলে জানো। পুরাতন দেবতারা যেমন একমত হইয়া হবির্ভাগ গ্রহণ করেন, তোমরাও সেইরূপ এক মত হও। তোমাদের সঙ্কল্প ও অধ্যবসায় সমান হউক, তোমাদের হৃদয় সমান হউক, তোমাদের মন সমান হউক, যাহাতে তোমাদের মধ্যে সুশোভন সম্মিলন প্রাদুর্ভূত হয়।" ইহাই কি প্রাচীন কালের কংগ্রেশ-লেক্চার নহে? বিজয়া দশমী আমাদের একতা শিক্ষার মহোৎসব। বিজয়া দশমার বীরেরা শিখাইতেছেন "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত" অর্থাৎ তোমরা উত্থান কর এবং জাগ্রত হও।

তাহার পরে আধ্যাত্মিক কথা। বঙ্গের দুর্গাপূজা এক্ষণে শরৎঋতুর একটা বড় তামাসা স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রকৃত পূজা কয় জন করে বা করিতে জানে? প্রকৃত পূজা কয় জন বুঝে বা বুঝাইতে পারে? পাঁঠা কাটা, মদ খাওয়া, নূতন কাপড় খরিদ করা, বিদেশ হইতে বাটীতে আগমন করা আর নৃত্য গীতের বন্দোবস্ত করা, এখন এইগুলিই পূজার অঙ্গ। প্রকৃত ভক্তের সংখ্যা অতি অল্প। পাঁঠা কাটা আর নৃত্য করা, শারদীয় পূজার এখন প্রধান

বন্দোবস্ত! তাহাতেই ভক্তাধিক ভক্ত কবি রামপ্রসাদ শক্তির মহোপাসক হইয়াও অতি দুঃখে গাহিয়াছেন—

মন! তোমার ভ্রম গেল না।
তুমি কালী কে তা চিন্‌লে না॥
মা আমার জগৎময়ী, জগতে তার্ নাই তুলনা।
তুমি মাটির মূর্ত্তি গড়ে কি চাও কর্ত্তে মায়ের উপাসনা॥
জীব মাত্র মায়ের ছেলে কেহ নয় তাঁর পর ভাবনা।
তুমি খুসী কর্ত্তে চাও কি মাকে কেটে একটা ছাগলছানা॥
প্রসাদ বলে রে মন ভক্তি মাত্র উপাসনা।
কল্লে লোকদেখান দুর্গাপূজা মা ত তোমার ঘুস খাবে না॥

শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

সখী-সমীপে।

পুরুষ কি অলি সই? কুসুম কি রমণী?
মঞ্জুতর মুঞ্জরিত
কুঞ্জ সম সুরঞ্জিত
তরুণ যৌবনে মধু চাহে সুধু স্বজনি?
উড়িতে কি চাহে সদা?
প্রেমে নাহি পড়ে বাঁধা?
পুরুষ কি অলি সই? কুসুম কি রমণী? ১।
পুরুষ কি খেলা চায়? খেলনা কি ললনা?
ভালবাসা দূরে ফেলি
সে কি খালি চাহে কেলি?
নিটোল যৌবনে সুধু কন্দুকের তুলনা?
কুন্তলের ছায়াতলে,
প্রফুল্ল প্রভাত কালে
পুরুষ কি খেলা চায়? খেলনা কি ললনা? ২।

পুরুষের শুধু হাসি ? কাঁদে একা অবলা ?
মিলনে বিরহজ্বালা—
বুকে গাঁথি অশ্রুমালা ;
সে চাহে তরল হাসি, আঁখিকোণে চপলা !
রোদন বেদনমাখা
চুম্বন চাহে না সখা ?
পুরুষের শুধু হাসি ? কাঁদে একা অবলা ? ৩।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

দিদি।

(১)

"দিদি ! দিদি !"

ক্ষীরোদা কাজে ব্যস্ত ছিল, ভ্রাতার ডাকে দিদি তাড়াতাড়ি ঘরের দাওয়ার উপর আসিল। সুকুমারের ঘর্ম্মসিক্ত আরক্ত কচি মুখখানি অঞ্চলে মুছাইয়া দিয়া দিদি তাকের উপর ভ্রাতার বই ও শ্লেটখানি তুলিয়া রাখিল।

ক্ষুধিত বালক চারিটী মুড়ি ও নারিকেল নাড়ু, যতক্ষণ পরম উপাদেয় খাদ্যের মত আহার করিতে লাগিল, দুঃখিনী বিধবার স্নেহশীতল দৃষ্টিতে ততক্ষণ পলক ছিল না। পিতা মাতার স্নেহস্মৃতি, সংসারের একমাত্র বন্ধন, ছোট ভাইটীর মুখে সে দু'টা ভাল জিনিসও তুলিয়া দিতে পারে না, ইহা অপেক্ষা মর্ম্মান্তিক বেদনা আর কি হইতে পারে ! দীর্ঘ নিশ্বাসের সহিত বিধবা, বেদনার স্মৃতি বসনাগ্রে মুছিয়া লইল।

সাত বৎসরের এই ক্ষুদ্র ভ্রাতাটী ছাড়া ক্ষীরোদার তিন কুলে আপনার বলিয়া সাড়া দিবার অবশিষ্ট কেহ ছিল না। তিন মাসের শিশুটীকে মাতা যখন তাহার হাতে সঁপিয়া দিয়া যান, তখনো ক্ষীরোদার সীমন্তের উজ্জ্বল মঙ্গল আশীর্ব্বাদ-রেখা ম্লান হয় নাই। সে তাহার নিঃসঙ্গ স্নেহের ক্রোড়ে পিতৃ-মাতৃহীন শিশুটীকে পরম আবেগে টানিয়া লইয়াছিল।

কিছু দিন ক্ষীরোদার বড় সুখে কাটিয়াছিল। মাতৃহীন ভ্রাতাটীকে মাতার অভাব সে এক দিনও জানিতে দেয় নাই। কিন্তু সুখ ও সৌভাগ্য

নামক পদার্থ দুটির আশ্রয়স্তম্ভ বড় পিচ্ছিল। এক দিন মধুর প্রভাতে, যখন জগতের আর আর সকলই পরম সুন্দর; তখন ক্ষীরোদা দেখিল, তাহার সমুদয় সুখ শান্তি ও সৌন্দর্য্যের সঙ্গে সুখদেবতাটী ভূমিতলে লুটাইয়া পড়িয়াছে। অশ্রুসজলা নববিধবা কেবল কচি ভাইটীর মুখ চাহিয়া ধূলি ও ছিন্ন-বসন ত্যাগ করিয়াছিল; রোরুদ্যমান শিশুর সান্ত্বনার জন্য প্রবাহিত অশ্রু-উৎস তাহাকে অকালে শুষ্ক করিতে হইয়াছিল।

প্রায়ই দেখা যায়, সচ্ছিদ্র কুটীর ও ছিন্ন বসনের মধ্য দিয়া, দারিদ্র্যের হাস্য-বিরল পাণ্ডুর মুখচ্ছবি ঘন ঘন কুটুম্বিতার তত্ত্ব লইয়া আসে। ক্ষীরোদার কুটীর-প্রাঙ্গণে এই অবাঞ্ছিত, অনাহূত আত্মীয়টীর শুভাগমন বড় বিরল ছিল না। ভিটার ঘর কয়খানি ও ছোট একটা বাগান ছাড়া ক্ষীরোদার স্বামী পত্নীর জন্য বিশেষ কিছু রাখিয়া যাইতে পারে নাই। তাহারই উপস্বত্বে, নিজে প্রায়ই একাদশী করিয়া বিধবা ভ্রাতাটীকে কোনরূপে লালন পালন করিতেছিল।

(২)

সন্ধ্যার তরল ছায়া কর্ম্মশ্রান্ত জগতের উপর শান্তির যবনিকা বিছাইয়া দিতেছিল। গ্রামের বিগ্রহ-মন্দিরে শঙ্খ ঘণ্টা বাজিয়া উঠিয়াছে। তুলসীতলে প্রদীপ রাখিয়া ক্ষীরোদা উঠিয়া দাঁড়াইল।

দূরে পদশব্দ শোনা গেল। ক্ষীরোদা বলিল—"কে?" "দিদি, আমি," বলিয়া সুকুমার প্রায় রুদ্ধ নিশ্বাসে সম্মুখে উপস্থিত হইল।

তাহার কথার ভঙ্গিতে একটা অসংযত আনন্দ-উচ্ছ্বাস অনুভূত হইতেছিল।

দিদি বলিল—"কি রে, সুকু?"

সুকুমার হর্ষকম্পিত কণ্ঠে বলিল—"দিদি, এখন খবর পেলুম, পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে আমি পাশ হয়েছি। আমাদের স্কুলের আর কেউ প্রথম বিভাগে হয় নাই।

ক্ষীরোদার বুকের মধ্যে এত আনন্দ, এত বিস্ময় নদীর বানের মত প্রবল বেগে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল যে সে কয়েক মুহূর্ত্ত নিশ্চল, স্তম্ভিত হইয়া রহিল।

আজ ষোল বৎসর, দারিদ্র্যের ক্ষুধিত, তৃষিত আক্রমণ হইতে প্রাণপণ যত্নে মাতৃহীন শাবকের মত যে ক্ষুদ্র শিশুটীকে সে রক্ষা করিয়া আসিয়াছে, হৃদয়ের প্রতি স্নেহকণায় অভিষিক্ত করিয়া বক্ষপঞ্জরের ছায়ায় ছায়ায় যাহাকে এত বড় করিয়া তুলিয়াছে, সত্যই কি সে এখন মানুষ হইতে চলিল? তাহার যেন সব মুহূর্ত্তের স্বপ্ন বলিয়া ভ্রম হইতেছিল। হায়! আজ এ আনন্দের দিনে তাহাদের

মাতা কোথায়? অভাগিনী বিধবার পরলোকপ্রবাসী আত্মার নিকট এই প্রীতি-উচ্ছ্বাস, সম্মানগৌরববর স্মৃতি পৌঁছিবে কি?

ভক্তি, হর্ষ, করুণা, ত্রিবেণী-সঙ্গমের পবিত্র জলধারার মত ক্ষীরোদার নয়ন প্লাবিত করিয়া দিল। উদ্দেশে, নতশিরে বিধবা, অজ্ঞাত, অদৃশ্য দেবতার আশীর্ব্বাদ আকাঙ্ক্ষায় তুলসীতলে লুটাইয়া পড়িল।

দিদির দেখাদেখি সুকুমারের মস্তকও ধীরে ধীরে অবনত হইয়া আসিল।

(৩)

দীর্ঘ অবকাশের পর স্কুল, কলেজ খুলিবার সময় হইয়া আসিয়াছে। বয়স অল্প হইলেও গরীবের ছেলের বুদ্ধি অল্পেই পরিপক্ক হয়। সুকুমার ঠিক করিয়া রাখিয়াছিল, তাহার জীবনের সাধনার পথে এইবারই পূর্ণচ্ছেদ। ব্যয়সাধ্য কলেজের পড়ার আশা ইহজন্মের মত তাহাকে ত্যাগ করিতেই হইবে। মাতার অধিক আদর, যত্নে ও স্বার্থত্যাগে যে দিদি তাহাকে এত দিন লালন পালন করিয়া আসিয়াছে, তাহাকে সুখী করা এখন তাহার সর্ব্বপ্রধান ও প্রথম কর্ত্তব্য। সে লক্ষ্য করিয়া আসিতেছে সংসারের প্রত্যেক অভাবের সহিত দিদি কি ভয়ানক যুদ্ধ করিয়া তাহাকে মূর্খতা ও বুভুক্ষার করাল আলিঙ্গন হইতে রক্ষা করিয়া আসিয়াছে। দিনান্তে একমুষ্টি অন্ন, অভাবে নিরম্বু উপবাস, এ সকল দৃশ্য তাহার কোমলহৃদয়ে চিরমুদ্রিত। এখন সে চেষ্টা করিলে পরিশ্রান্ত স্নেহময়ী দিদিকে কথঞ্চিৎ সুখী করিতে পারে।

দিদির অজ্ঞাতসারে অনেক চেষ্টা, সুপারিশ ও আবেদনের পর কলিকাতায় এক সদাগরী আপিসে পনর টাকা বেতনের চাকরী সুকুমার স্থির করিয়াছিল। জমীদার বাবুর ছেলেরা কা'ল কলিকাতায় পড়িতে যাইবে, সেই সঙ্গে তাহারও যাইবার কথা।

প্রদীপের সলিতা একটু বাড়াইয়া দিয়া, সুকুমার বলিল, "দিদি, কাল বাবুদের ছেলেরা কলিকাতায় পড়িতে যাবেন। সেই নৌকায় আমার যাবার কথা আছে।"

দিদি ভ্রাতার জন্য সুপারি কাটিতে কাটিতে বলিল, "তা, বেশ ত, আমি সব ঠিক করে রেখেছি, কা'লই যেও।"

সুকুমার অপেক্ষাকৃত নিম্ন, ম্লান স্বরে বলিল, "লেখা পড়া ত আর হবে না। কলিকাতায় একটা চাকরি হয়েছে। এখন পনর টাকা পাবো, তাতে তোমার ও আমার এক রকম চলে যাবে।"

ক্ষীরোদা যেন আকাশ হইতে পড়িল। সবিস্ময়ে বলিল, ‘তুই তাহার চাকুরি ঠিক করলি কবে স্কু?”

সুকুমার হাসিয়া বলিল, “ঠিক হয়েছে, তোমাকে এত দিন বলি নাই, পাছে তুমি রাগ কর বলিয়া। কিন্তু দিদি, তোমার কষ্ট আর আমি দেখিতে পারি না। এত দিন তুমি আমার ভার বহন করেছ, এখন আমাকে তোমার দুঃখ দূর করিবার চেষ্টা করিতে হইবে।”

ভ্রাতার সেই হাসি, সেই দৃঢ়তার মধ্যেও ক্ষীরোদা আশা-ভঙ্গের মৌন বেদনা দেখিতে পাইল। কলেজের পড়া পড়িয়া একটা ‘মানুষের মত’ হইবার কত খানি আগ্রহ সুকুমারের ছিল তাহা ত দিদির কাছে অজ্ঞাত নাই।

বিধবা দৃঢ়স্বরে বলিল, “সে হবে না দাদা, চাকুরি বি. এ. পাসের পর হবে। যত দিন আমি আছি তত দিন তোমার ভাবনা নাই। কা’ল কলিকাতায় যাওয়া ঠিক, পড়া এখন ছাড়্‌তে পার্‌বে না।”

সুকুমার অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া বলিল, “দিদি, তুমি পাগল হয়েছ দেখ্‌ছি। সে যে অনেক টাকা, এত টাকা তুমি কোথায় পাবে?”

দিদি বলিল, “দেখ্‌ স্কু, আমার কথার উপর কথা বলিস্‌ না। রাত হয়েছে এখন একটু ঘুমা। কা’ল সকালেই ত নৌকা ছাড়্‌বে?”

(৪)

মাঝি আসিয়া বলিল, “দাদাঠাকুর, বাবুরা তোমায় খুঁজ্‌তেছে। অনেক-ক্ষণ গোণ্‌ লেগেছে, তুমি ঝট্‌ করে এস।”

সুকুমার বলিল, “সনাতন, আমার মোটটা নিয়ে যা, আমি যাচ্ছি।”

মাঝি চলিয়া গেল।

সুকুমার রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, “দিদি! তবে আসি।”

ক্ষীরোদা এতক্ষণ চাপিয়া রাখিয়াছিল; কিন্তু উচ্ছ্বাস আর বাধা মানিল না। সে যে আজ ষোল বৎসর সুকুমারকে নয়নের আড়াল হইতে দেয় নাই।

সুকুমারও দুই হাতে চক্ষু ঢাকিয়া কাঁদিতে লাগিল। তাহার একমাত্র স্নেহ ভক্তি ভালবাসার স্বর্গ পশ্চাতে ফেলিয়া কোন্‌ অজানা দেশে অপরিচিত লোকের মধ্যে তাহাকে যাইতে হইতেছে। দিদি বই যে তাহার আর কেহ নাই।

ক্ষীরোদা একটা ছোট পুঁটুলি সুকুমারের হাতে দিয়া বলিল, “বই কিনিয়া এক বৎসর কলেজের মাহিনা ও কিছুদিন মেসের খরচ চলিবে। তার পর মাসে মাসে পাঁচ টাকা করিয়া পাঠাবো।”

সুকুমার গণিয়া দেখিল, আশি টাকা। জীবনে সুকুমার এতদূর বিস্মিত কখনো হয় নাই। সে ব্যগ্রভাবে বলিল, "এত টাকা তুমি কোথায় পেলে দিদি ?"

দিদি একটু ম্লানহাসি হাসিয়া সংক্ষেপে বলিল, "আমার টাকা ছিল।"

সুকুমার এ উত্তরে সন্তুষ্ট হইল না। কিন্তু দিদির স্বভাব সে জানিত। সুতরাং কেবল বলিল, "আর টাকা তোমায় পাঠাতে হবে না, আমি ছেলে-পড়ান যোগাড় করিয়া লইব।"

যতক্ষণ দেখা গেল, দিদি নিমেষশূন্যলোচনে সুকুমারের দিকে চাহিয়া রহিল। যখন আম্রবৃক্ষের অন্তরালে তাহার দেহ ঢাকিয়া গেল, তখন ক্ষীরোদা মাটিতে লুটাইয়া পড়িয়া ভ্রাতার মঙ্গলের জন্য ভগবান্‌কে যুক্তকরে ডাকিতে লাগিল।

গাছের পাতায় পাতায় রৌদ্র উজ্জ্বল হইয়া উঠিলে জগদ্বন্ধু পোদ্দার আসিয়া বলিল, "দিদিঠাক্‌রুণ, বাগানবিক্রী কোয়ালাটা রেজেষ্টারী ক'রে কবে দেবেন ?"

(৫)

প্রবাদ আছে মানুষ বহুযত্নে যাহা গড়িয়া তুলে, দেবতার অলক্ষ্য হস্তের এক আঘাতে তাহা নিমেষে চূর্ণ হইয়া যায়। ক্ষীরোদা সংসারটীকে নিজের মনের মত করিয়া গড়িয়া তুলিতেছিল ; কিন্তু একদিন দেখিল সে যেমন ভাবে গড়িতে গিয়াছিল জিনিসটী তার চেয়ে ভিন্ন আকার ধারণ করিয়াছে।

যথাসময়ে বি. এ. উপাধি লইয়া সুকুমার দিদির সেবার জন্য এক শিক্ষিতা, বয়স্থা বধূ আনিয়া দিয়াছিল। ভাগ্যবিধাতার মঙ্গল আশীর্ব্বাদে কোন সদাগরী আপিসে একটা মোটা বেতনের চাক্‌রীও হইয়াছিল। কিন্তু প্রবাদবচন ক্ষীরোদার অদৃষ্টে বড় ফলিয়া গেল।

ক্ষীরোদা ভ্রাতার সংসারে সর্ব্বময়ী কর্ত্রী। সে পূর্ব্বের অভ্যাসমত ভ্রাতা ও ভ্রাতৃবধূর উপর স্নেহের কর্ত্তৃত্ব চালাইত। গৃহলক্ষ্মীর কাছে ইহা কিন্তু নিতান্ত অনধিকারচর্চ্চা বলিয়া বোধ হইত।

ক্ষীরোদা ক্রমশঃ ইহা বুঝিতে পারিল। বুঝিয়াও প্রথম প্রথম মনকে প্রবোধ দিল, এখন ছেলেমানুষ, একটু বড় হলে সব সারিয়া যাইবে। কিন্তু যখন চারি বৎসর কেবল অসন্তোষের মাত্রা-বৃদ্ধি করিয়া, প্রকাশ্য বিদ্রোহের সূচনা দেখাইয়া চলিয়া গেল, তখন অদৃষ্ট ভাবিয়া বিধবা নীরবে সকল সহ করিতে আরম্ভ করিল।

সুকুমার সাতটার সময় আপিসে যায়, রাত আটটায় শ্রান্তভাবে ফিরিয়া আসে। দিদির মর্ম্মপীড়ার কথা জানিবার তাহার অবসর কোথায়? দিদিও ভ্রাতার নিকট যথাসাধ্য প্রফুল্লভাবে থাকিত। যে সংসার সে নিজ বক্ষ-শোণিতের প্রতিবিন্দুতে গড়িয়া তুলিয়াছে, তাহার উপর সে বিচ্ছেদ ও অশান্তির ছায়া কি ঘনাইয়া আনিতে পারে? তাহারই মর্ম্মশোণিত নীরবে বহিয়া যাক্, কিন্তু ভ্রাতার সুখের নীড়ে যেন কোনরূপ অভিশাপ না লাগে।

সংবৎসর এম্‌নি ভাবে চলিয়া গেল; কিন্তু অশান্তি ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিল। দিদির অজ্ঞাতসারে সুকুমারের কানে পরিবর্ত্তিত সংস্করণে কথা নূতনভাবে প্রবেশ করিল। সুকুমার প্রথমে হাসিয়া উড়াইয়া দিল। তাহার দিদি দেবী, বধূকে তিনি প্রাণের অধিক স্নেহ করেন। তাহার উপর স্নেহময়ী দিদির অত্যাচার, বিশ্বাসযোগ্য কথা নহে।

শাশুড়ীর মুখের কথা উড়াইয়া দিলেও যখন স্বয়ং সহধর্ম্মিণী কথাটা স্বামীর কানে তুলিলেন, তখন কাব্য আলোচনার ভাণে সুকুমার কথাটার গুরুত্ব লাঘব করিবার চেষ্টা করিল।

কিন্তু এমন করিয়া কয় দিন চলে? মেঘ ক্রমশঃ ঘনাইয়া আসিল। প্রতি-দিন আপিস হইতে আসিয়া অশ্রুম্লানগম্ভীর মুখের নীরব অভিমান সুকুমারের ধৈর্য্যের উপর আঘাত করিতে লাগিল। সারাদিন পরিশ্রমের পর শ্রান্তি-দূরের পরিবর্ত্তে যদি কেবল অশান্তির কাহিনী কানের কাছে ক্রন্দন করিতে থাকে, তবে মানুষ কত দিন তাহা উপেক্ষা করিতে পারে? উত্ত্যক্ত সুকুমার মনে মনে ক্রমশঃ বিরক্ত হইয়া উঠিল। কিন্তু প্রকাশ্যে কিছু ভাঙ্গিল না।

দিদি নিজের দুঃখের বোঝা নীরবে বহিয়া বেড়ায়। এক খাবার সময় ছাড়া তাহার সহিত ভ্রাতার দেখাশুনার অবসর প্রায়ই হয় না। সুতরাং সে ভ্রাতার মানসিক পরিবর্ত্তন ততটা লক্ষ্য করিতে পারে নাই। বিশেষতঃ ভ্রাতার স্নেহের উপর তাহার একটা প্রবল বিশ্বাস ছিল।

(৬)

শরতের অপরাহ্ণ। লঘু স্বর্ণময় মেঘে আকাশ আচ্ছন্ন। পূজার দিন নিকট। রাজপথে কর্ম্ম ও ব্যস্ততার অশ্রান্ত কলরব।

অন্য দিন অপেক্ষা আজ সুকুমার সকাল সকাল বাসায় আসিয়াছে। ক্ষীরোদা প্রচলিত প্রথামত ভ্রাতার জলখাবার আনিয়া সম্মুখে রাখিল। সুকুমার তাহা স্পর্শও করিল না।

ক্ষীরোদা চাহিয়া দেখিল—ভ্রাতার মুখখানা বৈশাখের মেঘভরা আকাশের মত গম্ভীর। অভ্যস্ত স্নেহের স্বরে দিদি বলিল, "কি রে সুকু, তোর অসুখ করেছে না কি?"

সুকুমার উত্তেজিতকণ্ঠে বলিল, "না, অসুখ হয় নি; কিন্তু আমি আর সহ্য করিতে পারি না।"

ব্যথিতচিত্তে ক্ষীরোদা করুণস্বরে বলিল, "কি হয়েছে বল্ না?"

সুকুমার বলিল, "হবে আর কি; তোমার সঙ্গে ওর একত্র থাকা দেখ্ছি চল্বে না। দিনরাত কান্না কি সহ্য হয়? তুমি দেশে গিয়ে থাক, আমি আলাদা খরচ দিব।"

কথাগুলি বলিয়া সুকুমার নিজেই চমকিয়া উঠিল। তাইত, সে কি বলিতে কি বলিয়া ফেলিয়াছে! ঠিক এমন কঠোরভাবে সে কিছুতেই বলিবে না স্থির করিয়াছিল; কিন্তু এ কি হইল! নিজের কাছে নিজেকে সে বড় ছোট মনে করিল; কিন্তু উপায় নাই, যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে।

দরজার পাশে স্ত্রী দাঁড়াইয়া সব দেখিতেছিল।

ক্ষীরোদা ভ্রাতার এই অপ্রত্যাশিত নির্ম্মম বজ্রবাণী শুনিয়া মুহূর্ত্ত স্তম্ভিত হইল। এই কি তাহার মর্ম্ম-শোণিত-পরিবর্দ্ধিত স্নেহের সুকুমার! তাহার চক্ষে, বিদীর্ণ বক্ষের শোণিতধারা যেন বাঁধভাঙ্গা নদীর মত ঠেলিয়া বাহির হইতে চাহিল; কিন্তু তাহার উপেক্ষিত ভ্রাতৃস্নেহ ও আত্মাভিমান এ দুর্ব্বলতার চিহ্ন প্রকাশ করিতে দিল না। তাহার চক্ষের এক ফোঁটা জল পড়িলে ভ্রাতার সুখনীড় মুহূর্ত্তে ভস্ম হইয়া যাইবে যে! অকম্পিত অভিমান, অব্যক্ত দৃঢ়তার সহিত ভগিনী ভ্রাতার আদেশ গ্রহণ করিল। দীর্ঘশ্বাস তাহার বুকের ভিতর চাপিয়া চাপিয়া গুমরিতেছিল। ক্ষীরোদা তাহাকে বাহির হইতে দিল না।

(৭)

সুকুমারের দিন বেশ কাটিয়া যাইতেছিল। সমস্ত দিন আপিসে থাকে, মাসকাবারে টাকাগুলি আনিয়া স্ত্রীর হাতে দেয়।

নিজের কর্ম্ম ও সুখস্রোতের মাঝে নির্ব্বাসিতা দিদির কথা সুকুমারের মনে পড়িবার অবসর বড় অল্পই ছিল। কেবল মাসকাবারে স্ত্রীর হাতে টাকা দিবার সময় বলিয়া দিত "আমার সময় অল্প, তুমি সরকারকে দিয়ে মাসে মাসে দিদির কাছে দশ টাকা মনিঅর্ডার করিয়া দিও।"

দিদি অভিমানবশতঃ সুকুমারকে পত্র লিখিত না। সুকুমারও উপযাচক

হইয়া প্রথমে পত্র লিখিতে লজ্জা বোধ করিত। সুতরাং ভ্রাতা ও ভগিনীর মধ্যে বিচ্ছেদের সমুদ্র ক্রমশঃ নীরব অভিমানেই বিস্তৃত হইতেছিল।

* * * * *

আজিকার দিনটা বড় মেঘলা করিয়াছিল। সুকুমার, শরীর নিতান্ত অসুস্থ বলিয়া আজ আপিসে যাইতে পারে নাই; বাহিরের ঘরে বসিয়া একখানা বই পড়িতেছিল। এমন সময় পিয়ন আসিয়া একখানা পত্র দিয়া গেল।

নিজের নামের পত্র দেখিয়া সুকুমার খুলিয়া ফেলিল। গ্রামের পুরোহিত-পুত্র, তাহার বাল্যসহপাঠী লিখিয়াছেন—

"ছি! সুকুমার! তুমি এমন অধঃপাতে গিয়াছ? তুমি না আমাদের গ্রামের সর্ব্ববিষয়ের আদর্শ ছেলে ছিলে? তোমাকে অনুকরণ করিতে পারিলে আমরা ধন্য মনে করিতাম; কিন্তু তোমার এ কি দারুণ পরিবর্ত্তন! যে দিদির বুকের রক্তে তুমি আজ এত বড় হইয়াছ, নিজে নিরম্বু উপবাস করিয়া তোমায় যে ভাল খাবার দিয়াছে, আজ তাহাকে একমুষ্টি অন্নের জন্য পরের কৃপা অন্বেষণ করিতে হয়? দুইটী করিয়া টাকা দিলেও একটী বিধবার একবেলা চলিয়া যাইত যে! তাহাতে তোমার স্ত্রীর গহনাগড়ানর বিশেষ কিছু হানি হইত না। এক বৎসর তোমার দিদিকে তাড়াইয়া দিয়াছ, বল দেখি এই এক বৎসর কি ভয়ঙ্কর অন্নবস্ত্রের অভাব সেই জীর্ণ দেহের উপর দিয়া চলিয়া গেছে! স্বামীর বাগানখানা পর্য্যন্ত তোমার পড়ার জন্য বিধবা বিক্রয় করিয়াছিলেন, সে সব মনে পড়ে কি? ভাবিয়াছিলাম তোমায় কিছুই লিখিব না, কারণ তোমার মত হৃদয়হীনের কাছে পত্র লেখা বৃথা; কিন্তু তবু কর্ত্তব্য অনুরোধে লিখিলাম। আমাদের দরিদ্র গ্রাম, প্রত্যহ কে সাহায্য করিতে পারে? আর বিধবা প্রাণ থাকিতেও পরের দ্বারস্থ হইবেন না। তাঁহার শরীর পীড়া ও অন্নবস্ত্রের অভাবে যেরূপ অবসন্ন তাহাতে তোমার কণ্টক উদ্ধার হইতে বেশী দিন লাগিবে না।"

মুহূর্ত্তে সমস্ত পূর্ব্বস্মৃতি সুকুমারের মনে অনুতাপের আগুন জ্বালাইয়া তুলিল। কিন্তু এ কি? সে প্রতিমাসে দিদির নামে দশ টাকা পাঠাইয়াছে অথচ এরূপ নিষ্ঠুর মিথ্যা অভিযোগ কেন?

সুকুমার সরকারকে বলিল, "রিসিট্ ফাইলটা নিয়ে এস ত।"

অনেক অনুসন্ধানেও দিদির নামের একখানা রসিদ বাহির হইল না; কিন্তু তাহার শাশুড়ীর নামের বিস্তর রসিদ দেখা গেল।

সুকুমার একেবারে শয়নগৃহে উপস্থিত হইল। আজ নিজের উপর, সংসারের উপর তাহার এমন ঘৃণা জন্মিয়াছিল যে সে কোন দিকে চাহিল না। কাপড় চোপড় বদলাইয়া যখন সুকুমার রকের উপর আসিয়াছে তখন স্ত্রী চারুবালা সবিস্ময়ে বলিল, "অসুখ শরীরে কোথায় যাইতেছ?"

দারুণ ঘৃণাভরে নীরবে সুকুমার শুধু পত্রখানা পত্নীর সম্মুখে ফেলিয়া দিল।

তখন পথে ফেরিওয়ালা ডাকিতেছিল—"চাই মেঠাই!"

(৮)

মেঘ ও বাতাসে প্রলয় কাণ্ড করিতেছিল। যেমন বৃষ্টির বেগ, তেমনি বাতাসের দমকা। মেঠো পথে কাদা হাঁটু পর্য্যন্ত। মাঠে জল থৈ থৈ করিতেছিল। সন্ধ্যার অন্ধকার মেঘের আবরণে অমাবস্যার রাত্রির অপেক্ষাও নিবিড় তমোময়। গৃহস্থের কুটীরদ্বার রুদ্ধ। কদাচিৎ ক্ষীণ আশার মত বাতায়নরন্ধ্রচ্যুত আলোকরশ্মি দেখা যাইতেছিল।

সিক্ত, কম্পিত দেহে সুকুমার আজন্মপরিচিত গ্রাম্যপথে ছুটিতেছিল। ছাতার কাপড় ছিঁড়িয়া গেছে, বাতাসে নিশ্বাস রুদ্ধপ্রায়।

শত বার হোঁচট্ খাইয়া পড়িতে পড়িতে সুকুমার অবশেষে গন্তব্যস্থলে পৌঁছিল। চারিদিকে সূচীভেদ্য অন্ধকার। মাথার উপর গাছের ডালে ডালে বাতাস বলপরীক্ষা করিতেছে। বজ্রবিদ্যুতের আলোকগর্জ্জনে সেই ভয়ানক অন্ধকার প্রতিমুহূর্ত্তে ভীষণতর হইয়া উঠিতেছিল।

বিদ্যুতালোকে সুকুমার দেখিল, বাড়ীর উঠানে বড় বড় জঙ্গল। রান্নাঘরখানি যেখানে ছিল, সেখানে কেবল মাটির স্তূপ, বন্যবৃক্ষের ঝোপ। বাহিরের ছোট চালাখানির কোন চিহ্ন নাই। দুই হাতে বুক চাপিয়া সুকুমার যন্ত্রণাটাকে যেন সরাইয়া দিতে চাহিল।

সম্মুখের বড় ঘরখানা দাঁড়াইয়া আছে বটে; কিন্তু বড় অন্ধকারাচ্ছন্ন। এই ভরাবর্ষায় দীপ নিভাইয়া গৃহস্থ কি নিদ্রাগত?

সন্তর্পণে সুকুমার দাওয়ার উপর উঠিল। অনুমান করিয়া দরজায় হাত দিল। দরজা খোলা কেন? ঘরের মধ্যে কি তবে মানুষ নাই?

সহসা সুকুমার অনুভব করিল যেন কাহার নিশ্বাসের শব্দ হইতেছে। তাহার সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল। কিন্তু বিবেচনা করিবার তাহার অবসর কোথায়? কোটের পকেটে হাত দিতে সিগার-কেসটা হাতে ঠেকিল। দিয়া

শলাকার বাক্‌সটা ভাল করিয়া ভিজিতে পারে নাই। কয়েকবার চেষ্টার পর একটা জ্বলিয়া উঠিল।

সুকুমার চকিতদৃষ্টিতে দেখিল, ভূমিশয্যায় কেহ শুইয়া রহিয়াছে। এতক্ষণে তাহার বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল। কম্পিতকণ্ঠে সুকুমার ডাকিল,—"দিদি!"

ততক্ষণে আলোক নিভিয়া গেছে। দরজা বন্ধ করিয়া অনেক কষ্টে সুকুমার আবার আলোক উৎপাদন করিল। একটা প্রদীপ পড়িয়াছিল, কিন্তু তৈলহীন। ঘরের এক কোণে কতকগুলি পাট পড়িয়াছিল, উপায়ান্তর না দেখিয়া সুকুমার সেইগুলি ধরাইয়া দিল।

আবেগে সুকুমারের কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিয়াছিল। ছুটিয়া আসিয়া সে রোগীর লুণ্ঠিতমস্তক কোলের উপর তুলিয়া মর্ম্মভেদী স্বরে ডাকিল, "দিদি!"

কেহ উত্তর দিল না। দমকা বাতাস চালের উপর দিয়া হু হু করিয়া বহিয়া গেল।

ঘরের সকল অন্ধকার পাটের আলোকে দূর হয় নাই। সুকুমার সর্ব্বাঙ্গ হস্ত দ্বারা পরীক্ষা করিল। এ কি মৃত্যুর পূর্ব্বলক্ষণ! রোগীর কণ্ঠে একটা অস্ফুট শব্দ হইতেছিল।

উন্মাদের মত সুকুমার ডাকিল, "দিদি! দিদি! একবার চাহিয়া দেখ, আমি আসিয়াছি।"

কেহ তাহার নিষ্ফল কাতরতায় স্নেহের উত্তর দিল না। এক বৎসরে দিদির শরীরের এত পরিবর্ত্তন! মানুষ চেনা যায় না! সামান্য এক মুষ্টি অন্নের অভাবে তাহার মাতৃসমা ভগিনী আজ মৃত্যুশয্যায়! তাহার এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই। এ যন্ত্রণা মৃত্যুর পরপারেও তাহাকে অভিশাপের মত অহর্নিশি অনুসরণ করিয়া বেড়াইবে। দুই হাতে মাথার চুল টানিতে টানিতে, তীব্র মর্ম্মান্তিক উচ্ছ্বাসে সুকুমার আবার ডাকিল, "দিদি! একবার কথা বল। হায়! একটা অন্তিম ক্ষমাও করিলে না!"

রোগীর সর্ব্বদেহে একটা আকুঞ্চন-প্রসারণ-বেগ অনুভূত হইল। সুকুমার হতাশায় চীৎকার করিয়া ডাকিল, "দিদি! দিদি!"

অট্টহাস্যে বজ্র আকাশে বিদ্রূপ করিয়া উঠিল। বৃষ্টিধারা, শীতল বাতাস দরজা ঠেলিয়া নির্ব্বাপিতপ্রায় পাটের ভস্মস্তূপ অন্ধকার করিয়া দিল।

সুকুমারের অবসন্নদেহ মরণক্লিষ্ট রোগীর পার্শ্বে ঢলিয়া পড়িল।

* * * * * * * * *

সুকুমার আবেগকম্পিতকণ্ঠে বন্ধু রসিকচন্দ্রের হস্ত চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "ভাই, এ জন্মে তোমার এ ঋণ শোধ করিতে পারিব না।"

তামাকু টানিতে টানিতে রসিক বলিল, "তোমার দিদিকে আমি মা বলিয়াছি। সুতরাং কর্ত্তব্য কার্য্যের অধিক কিছুই করি নাই।"

অবনতমুখে সুকুমার বলিল, "সত্যই লিখিয়াছিলে আমি হৃদয়হীন, নরাধম। এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত কিসে হইবে?"

রসিক বলিল, "তুমি যে সেই জলঝড়ের মধ্যে দিদিকে মনে করিয়া এত দূর আসিবে ইহা ভাবি নাই। সকালবেলা একটা কাজে গিয়েছিলুম। মনে হল একবার ঘরখানা দেখে যাই। তাইত তোমায় দেখ্‌তে পেলেম্।"

সুকুমার একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "কিন্তু সে রুগ্না স্ত্রীলোকটী কে?"

"ও একটা পাগলী গোছের। পথে মাঠে বেড়ায়। খালিঘর পেয়ে বাসা করেছিল বোধ হয়।"

জলখাবারের থালা লইয়া দিদি ডাকিল, "তোরা খাবি আয়।"

সুকুমার দেখিল, দিদির মুখে মৌন বেদনার স্মৃতি এখনো সম্পূর্ণ দূর হয় নাই।

সুকুমার বলিল, "দিদি, তোমার স্নেহের মূল্য জগতে দুর্লভ। কবে তুমি আবার আগের মত তোমার রাজত্বের শাসনদণ্ড হাতে লইবে?"

দিদি হাসিয়া বলিল, "সে কথা পরে হবে, তুই এখন খা। সমস্ত রাত না খেয়ে আছিস্।" সেই স্নেহ, সেই করুণা এখনো তেমনি। সুকুমার মনে মনে সহস্রবার আপনাকে ধিক্কার দিল।

তখন বহির্ব্বাটীতে খঞ্জনী বাজাইয়া বৈষ্ণব ভিখারী গাহিতেছিল—

"ওমা নন্দরাণী, তোর হারানিধি
আজ ফিরে এল।"

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ।

বৈজ্ঞানিকের কুটীর।

১। একটী নূতন জন্তু।

ক্রমবিকাশ-বাদের উদ্ভাবয়িতা মনীষী ডারউইন দেখাইয়াছেন যে, সুসভ্য সমুন্নত ককেশীয় জাতিকে সর্ব্বোচ্চে বসাইয়া এমন ভাবে মনুষ্যজাতিকে গুণানুসারে ক্রমশঃ নিম্নবর্ত্তী সোপানাবলীতে সজ্জিত করা যাইতে পারে যে, মনুষ্য জাতির নিম্নতম সোপানে অবস্থিত আফ্রিকার বুশ্ম্যানের পরবর্ত্তী সোপানেই আফ্রিকার শিম্পাঞ্জি এবং ভারত মহাসাগরের ওরাঙ্গ-ওটাঙ্গকে বসাইলে সেই গ্যালারীর অণুমাত্রও সৌন্দর্য্যহানি হয় না; এমন কি সেই বিরাট দৃশ্যকে একটী বিশাল মনুষ্য-সভা বলিয়াই ভ্রম জন্মে। উহাতে যে কয়েকটী ভদ্র-বেশধারী মর্কট উপবেশন করিয়া আছে, তাহা অনেকেই বোধ হয় অনুভব করিতে পারিবেন না। কিন্তু তথাপি অনেক প্রাণিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত আপত্তি করিতেন যে, শারীরিক আকার ও মানসিক শক্তি বিবেচনা করিতে গেলে মনুষ্যজাতির অব্যবহিত নিম্নবর্ত্তী সোপানেই উক্ত মর্কটদিগকে বসান ভাল হয় নাই; অন্ততঃ একটী সোপান খালি রাখিয়া উহাদিগকে বসিতে দেওয়া উচিত ছিল।

যাহা হউক, এত দিন পরে সেই খালি আসনের একজন উপযুক্ত অধিকারী পাওয়া গিয়াছে, ইনি রূপে গুণে নর ও বানরের ঠিক্ মধ্যস্থলে অবস্থিত।

এই মহাপুরুষ এত দিন যবদ্বীপে লুক্কায়িত ছিলেন। অধ্যাপক হেকেল্ ইহাঁকে পূর্ব্বোক্ত আন্তর্জাতিক সভায় আহ্বান করিয়া আনিয়াছেন।

যবদ্বীপের অধিবাসীরা, ইহাঁর কণ্ঠনিঃসৃত স্বরের মাধুর্য্যে মুগ্ধ হইয়া, ইহার নাম 'ওআ' রাখিয়াছে। দৈহিক উচ্চতায় ইনি ছয় বৎসরের একটী মানব শিশুর কাছেও শিশু; শরীরের পরিমাণে মস্তক কিছু ছোট; পদদ্বয়ও ছোট; কিন্তু বাহুদ্বয় সংস্কৃত কবির চোখে অতি সুন্দর অর্থাৎ আজানুলম্বিত, এবং কটিদেশও কেশরীর অনুকরণে ক্ষীণ। ওরাঙ্গ ওটাঙ্গ-এর অপেক্ষা ইহাঁর মুখমণ্ডল মনুষ্যমুখের বেশী সমীপবর্ত্তী।

উক্ত অধ্যাপক বলেন যে "এই প্রাণীকে উপবিষ্ট অবস্থায় দেখিয়া আমার মনে হইল যেন একজন ধনী পোদ্দার অল্প দিন হইল দেউলিয়া হইয়া কুঞ্চিত ললাটে স্বীয় অস্তমিত সৌভাগ্য-সূর্য্যের পানে তাকাইয়া আছে।" এই জন্তু শ্বেতকায় য়ুরোপীয়দিগকে বড়ই বিদ্বেষের চোখে দেখিয়া থাকে; কিন্তু

কপিশচর্ম্ম যবদ্বীপ-নিবাসীদের সহিত ইহার বেশ সখ্য আছে। সে কখনও অন্যান্য পশুর ন্যায় হামাগুড়ি দিয়া হাঁটে না; সুসভ্য মনুষ্যের ন্যায় দুই পায়ে ভর দিয়া চলে। যখন সে চলিতে চলিতে নিতান্ত পরিশ্রান্ত বোধ করে, তখন দুর্ব্বাক্ষেত্রের উপরে চিত্রপটাঙ্গ হইয়া শয়ন করে। অনেক সময়ে একটী বাহু মস্তকের নীচে উপাধান স্বরূপ রাখিয়া শয়ন করে।

ইহার অভিধানের শব্দসংখ্যা তিনটীর বেশী হইবে না; কিন্তু যেমন টেলিগ্রাফ আফিসের টেরে-টক্কা নামক মাত্র দুইটী শব্দের সাহায্যে মানুষের মনের যাবতীয় ভাবই ব্যক্ত হইতে পারে, সেইরূপ উহারা ঐ তিনটী শব্দের সম্মিলনে স্বর পরিবর্ত্তন ইত্যাদি দ্বারা অনেক কথাই জানাইতে পারে। এতদ্ব্যতীত অঙ্গভঙ্গী, ভ্রূকুটী প্রভৃতি দ্বারাও ইহারা এ বিষয়ে অনেক সাহায্য পায়।

দুই হাতে দুধের বাটী ধরিয়া অতি পরিষ্কার রূপে মানব-শিশুর মত দুধ খাইয়া থাকে। মনুষ্যেরই ন্যায় কদলী ও কমলালেবুর বহিরাবরণ ফেলিয়া দেয়।

যবদ্বীপের অধিবাসীরা ইহাকে পশুশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত মনে না করিয়া মনুষ্য বলিয়া মনে করে।

২। জাপানের বামন বৃক্ষ।

জাপান দেশে অনেক জাতীয় ক্ষুদ্রাকৃতি বৃক্ষ ও গুল্ম আছে। অথচ সেই সকল উদ্ভিদ্ই পৃথিবীর অন্যান্য যাবতীয় দেশে উচ্চতায় অনেক বড় দেখা যায়। এইজন্য এতকাল লোকে জাপানের এই বামনাকার বৃক্ষগুলিকে ঈর্ষার চক্ষে দেখিয়া আসিতেছিলেন; কিন্তু কিরূপে যে স্বদেশজাত বৃক্ষের উদরের পরিধি অক্ষুণ্ণ রাখিয়া মস্তকের উন্নতি স্থগিত রাখা যায়, তাহার কোন পথ পাইতেছিলেন না। সম্প্রতি জর্ম্মনিদেশীয় একজন রসায়নবিৎ এমন একটী তরল পদার্থের আবিষ্কার করিয়াছেন, যাহা বৃক্ষের মূলদেশের শিরায় প্রবিষ্ট করাইয়া দিলে উক্ত অভিলষিত ফল পাওয়া যায়। "ক্লরফর্ম্ম" প্রয়োগ করিলে মানব দেহের যেরূপ অবস্থা হয়—তখন উহার বোধশক্তি থাকে না—এই রস তরু-শরীরে প্রবিষ্ট করাইলেও না কি ঠিক্ সেইরূপ হয়। উহাতে বৃক্ষের জীবনী-শক্তি আপাততঃ স্তম্ভিত হয় মাত্র, কিন্তু সে একেবারে মরিয়া যায় না; সেইজন্য সে উচ্চতায় আর বর্দ্ধিত না হইয়া পরিসরে যথাসম্ভব বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ও পত্রপল্লব-শোভিত হইয়া থাকে। ঐ রসের উপাদান এখনও জানা যায় নাই।

শ্রীশ্রীনিবাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

বসন্তসেনা।

বসন্তসেনা সংসার কাননের সুরভিসুন্দর বিকচ কুসুম। এই বন্য প্রসূনে যেমন ভুবনমোহন সৌন্দর্য্য আছে, তেমন ইহাতে বিশ্বমনোমদ গুণসৌরভেরও অভাব নাই। কিন্তু সমাজের নিকট সে উপযুক্ত পুরস্কার লাভ করিতে পারে নাই। সংসারের লোক বড় নিষ্ঠুর, বড় একদেশ-দর্শী; উদ্যান-জাত সামান্য নির্গন্ধ কুসুমে তাহাদের যে প্রীতি সোহাগ লক্ষিত হয়, কয়টি বনভূষণ গন্ধমনোহর প্রসূন সেই আদর প্রীতির অধিকারী হইয়া থাকে? বসন্তসেনা যদি বারাঙ্গনার প্রাঙ্গণ-অরণ্যে না জন্মিয়া সমাজের পবিত্র উপবনে বিকশিত হইত, তবে নিশ্চয়ই ইহার মধুর সৌরভে, নন্দনের পারিজাতেও সামাজিকগণের ঘৃণা জন্মিত। এইরূপ মানসমোহন মধুময় কুসুমটী সমাজ-দেবতার আরাধনায় লাগিল না, ইহা সামান্য পরিতাপের বিষয় নহে।

কোন্ পাপে জানি না, এই গুণ-পক্ষ-পাতিনী প্রগাঢ়প্রণয়বতী বসন্তসেনা সমাজ-নিন্দিতা পণ্যীকৃতযৌবনা গণিকাগণের কুৎসিত শ্রেণীতে স্থানপ্রাপ্ত হইয়াছে। সহৃদয় কবি বিলাসবিভ্রমের পাপপঙ্কে নিঃস্বার্থ প্রেমের যে কমনীয় কমলটী বিকশিত করিয়াছেন, তাহা বস্তুতঃই অভূতপূর্ব্ব ও মনোহর।

বসন্তসেনা অতুল ঐশ্বর্য্য, অনুপম সৌন্দর্য্য ও যুবজনমানসোন্মাদক নব যৌবনের অধিকারিণী হইয়াও শুধু গুণের আকর্ষণে নির্ধন চারুদত্তের প্রণয় প্রার্থিনী। কবির প্রসাদে আমরা বসন্তসেনার ঐশ্বর্য্য, সৌন্দর্য্য ও চরিত্র-মাধুর্য্য প্রত্যক্ষ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছি। আরতির পাঠকগণও তাহা দেখিতে চাহেন কি?

চারুদত্তের বন্ধু মৈত্রেয়-ব্রাহ্মণ বসন্তসেনার বাড়ী ঘর ধন সম্পত্তি দেখিয়া একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল। সে চারুদত্তের নিকট সেই বিপুল বিভবের যে বিবরণ প্রকাশ করিয়াছে, তাহাতে বসন্তসেনাকে ছোট রকমের একটী রাণী বলিলেও সম্ভবতঃ অত্যুক্তি হয় না। আমরা মৈত্রেয়ের কথা অবিশ্বাস করিতে পারি না, কারণ কর্ণপূরক মাহুতও তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছে। বসন্তসেনা হাতী পালিত। কত বড় লোক হইলে যে হাতী পালিতে পারে তাহা কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। দ্বিতীয় অঙ্কে দেখা যায়, বসন্তসেনার খুণ্টমোড়ক নামক মদোন্মত্ত দুষ্ট হস্তী আলানস্তম্ভ ভগ্ন করিয়া রাজপথে আসিয়া বিষম বিভ্রাট বাঁধায়। কর্ণপূরক মাহুত অতিশয় সাহস ও নিপুণতার সহিত

হাতীটী ধরিয়া শৃঙ্খলাবদ্ধ করে। ইহা ছাড়া চারুদত্তের নিকট গচ্ছিত স্বর্ণভাণ্ড এবং বহু অলঙ্কারপত্রও দেখিয়াছি। বসন্তসেনার সৌন্দর্য্য ও চরিত্র সম্বন্ধেও এখন কিছু বলিতে হইতেছে। অন্যের কথায় আমরা বিশ্বাস স্থাপন না করিতে পারি, কিন্তু বিট নামক বেশ্যাসক্ত শিক্ষিত যুবকটীর কথায় বিশ্বাস না করার কোন কারণ দেখিতেছি না। সে সর্ব্বদাই রাজশ্যালকের পক্ষ হইয়া তাহাকে প্রলোভন দেখাইত। কিন্তু কোন দিনই কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। সে স্পষ্টভাষায় বলিয়াছে, বসন্তসেনা—"নগরস্ত বিভূষণঞ্চ, বেশ্যামবেশসদৃশপ্রণয়োপচারাম্" (সৌন্দর্য্য ও প্রণয়ে) নগরের অলঙ্কার স্বরূপ, পবিত্র প্রণয় ব্যবহারে (সে) অবেশ সদৃশ (অর্থাৎ বেশ্যার ন্যায় নহে) আর এক স্থলে বলিয়াছে—"অপতিতমপি তাবৎ সেবমানং ভবন্তং, পতিতমিব জনোঽয়ং মন্যতে মাং অনার্য্যম্।" অপতিতা তোমার সংস্পর্শে আমারও পতন হয় নাই, তথাপি লোকে আমাকে অন্যায়রূপে পতিত মনে করে। ইহা ভুক্তভোগীর কথা। বসন্তসেনার পক্ষে ইহা হইতে আর উচ্চ প্রশংসার বিষয় কি আছে? বিট অন্য এক স্থলে সুচরিত্রা বসন্তসেনার সুশীলতায় মুগ্ধ হইয়া সরলপ্রাণে আশীর্ব্বাদ করিয়াছে, "অনন্যামপি জাতো মা বেশ্যাভূস্ত্বং হি সুন্দরি, চারিত্র্যগুণসম্পন্নে, জায়েথা বিমলে কুলে॥" হে সুন্দরি, অন্য জন্মে আর বেশ্যার ঘরে জন্মিবে না; সুচরিত্রে, বিমলকুলে জন্মলাভ করিবে। বসন্তসেনা এই প্রকার বহু প্রশংসাপত্র (Certificate) পাইয়াছে। আমরা দেখিয়া সুখী হইয়াছি, বসন্তসেনা জন্মান্তর পরিগ্রহ না করিয়া চরিত্রমাহাত্ম্যে সেই জন্মেই বিমলকুলসম্ভবা কুলকামিনীর পবিত্র পদবী প্রাপ্ত হইয়াছে। আমরা যথাস্থানে তাহার উল্লেখ করিব। মানবসমাজে বেশ্যারা এত ঘৃণিত কেন? কবি তাহা বেশ সরল ভাষায় বুঝাইয়া দিয়াছেন;—

"বারাঙ্গনা হাসে কাঁদে ধনের কারণে,
বিশ্বাস জন্মায় সবে, না করে কাহারে,
তাই কুলবিভূষিত সুবোধ সুজনে
শ্মশান-কুসুম-বেশ্যা পরিহার করে।"

"স্বভাব-চাঞ্চল্যে বেশ্যা সাগরলহরী,
ভালবাসা ইহাদের সান্ধ্য-অল-রেখা,
ধনীকে ভুলায় ছল-প্রণয় বিতরি,
নিধনে বেশ্যার প্রেম কবে যায় দেখা?"

"একজন প্রণয়ীকে হৃদয়ে ধরিয়া,
ডাকে অন্যে প্রীতিস্নিগ্ধ কটাক্ষ নয়নে ;
হাব ভাবে একজনে গণিকা তুষিষা,
অপরে বিলায় প্রেম মধুর বচনে।"

এইরূপ মিথ্যা প্রবঞ্চনা ছলচাতুরীর আবাসভূমি বারবনিতা-গৃহে জন্মলাভ করিয়াও বসন্তসেনা যে স্বভাব-সৌন্দর্য্যে "সুবোধ সুজনের" প্রীতি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছে, আমরা তাহারই কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

বসন্তসেনা মদনিকা নাম্নী পরিচারিকার নিকট যখন চারুদত্তের পরিচয় প্রথম জিজ্ঞাসা করে, তখন অনেক কথার পর মদনিকা একটু বিস্মিত হইয়া বলিল, "ঠাকুরাণি, আপনি যাহার রূপে মুগ্ধ হইয়াছেন, আপনার প্রণয়প্রবণ হৃদয় যাহার ভালবাসা লাভের নিমিত্ত উন্মত্ত হইয়াছে, সেই চারুদত্ত "দরিদ্রঃ খলু সঃ শ্রূয়তে" (১) দরিদ্র বলিয়া শুনা যাইতেছে। আপনি সম্ভবতঃ তাহার দারিদ্র্য অবগত নহেন, কারণ আপনার ন্যায় রূপযৌবনবতী ধনিজনস্পৃহণীয়া কোন কামিনীই চারুদত্তের মত নির্ধনকে প্রণয়-সুধা বিতরণ করিতে পারে না।"

যথার্থ প্রণয়বতী বসন্তসেনা মদনিকার এই কথায় ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া কহিল, "অতএব কাম্যতে" অতএবই তাঁহাকে কামনা করিতেছি। যে প্রেম অর্থ-গৃহ্য অর্থাৎ পণ্য দ্রব্যের ন্যায় যে ভালবাসাকে ধন দ্বারা ক্রয় বিক্রয় করা যায়, তাহা আমি সর্ব্বান্তঃকরণে ঘৃণা করি ; আমরা প্রণয়-দেবতার পবিত্র অঙ্গে স্বার্থপরতার কুৎসিত কালী লেপন করি বলিয়াই ত লোকসমাজে এত ঘৃণিত ও লাঞ্ছিত হইয়া থাকি। যদি কোন বারবনিতা ভালবাসার উপাসিকা হইয়া প্রিয়তম দরিদ্রকে আত্মসমর্পণ করিতে পারে, তবে সে ঘৃণিত বেশ্যাগৃহে জন্ম-লাভ করিলেও পরম ভাগ্যবতী বলিয়া বিবেচিত হইবে, সন্দেহ নাই ; কারণ "দরিদ্রপুরুষসংক্রান্তমানসা খলু গণিকা লোকে অবচনীয়া ভবতি"—(দরিদ্র-পুরুষপ্রণয়িনী বেশ্যা সর্ব্বত্রই অনিন্দনীয়া)

বসন্তসেনার এই প্রণয়-বাক্যের অর্থ মদনিকা দাসী কি বুঝিবে ? তাই সে বিরক্তির সহিত কহিল, মধুকরী কখনও হীন-কুসুম সহকারের সেবা করে কি ? ইহার উত্তরেও আমরা বসন্তসেনার নিঃস্বার্থ প্রেমিকতার আভাস পাইতেছি ;—

(১) মূলের প্রাকৃত অংশ সংস্কৃত করিয়া দেওয়া গেল।

সে সগর্ব্বে বলিল,—"অতএব তাঃ মধুকর্য্যঃ উচ্যন্তে" এইজন্যই তাহাদিগকে মধুকরী বলে। নীচ মধুকরীর দল প্রণয়িকুলের সম্পদ্ বিপদ বোঝে না, প্রণয় সৌরভের গৌরব অগৌরব জানে না, তাহারা সংসারে শুধু স্বার্থপরতার মধুর আস্বাদই বুঝিয়াছে ও চিনিয়াছে, কাজেই যেখানে স্বার্থমধু, সেখানেই তাহারা;—অন্যত্র নহে। আমরা ভালবাসার মর্ম্ম বুঝিয়া গুণের আদর শিখিয়া, মানবকুলে জন্মলাভ করিয়া কিরূপে তাহাদের ন্যায় শুধু মধুরই অন্বেষণ করিয়া বেড়াইব?

যে বেশ্যার হৃদয়ের ভাব এত উচ্চ, যে বেশ্যার প্রণয়ের গভীরতা এই প্রকার অতলস্পর্শ,—তাহাকে আমরা কেন ঘৃণা করিব?

ভালবাসার চুম্বকস্পর্শে বেশ্যার হৃদয়-লৌহ কেমন স্বর্ণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে! সংবাহক দ্যূতকর নিজের পরিচয় দিতে গিয়া যখন বলিল,—"আমি চারুদত্তের পরিচারক ছিলাম।" কথাটা শুনিয়াই বসন্তসেনা আনন্দভরে আসন হইতে উঠিয়া স্নেহসিক্তকণ্ঠে বলিল, তবে ত দেখিতেছি, এই বাড়ী আপনার নিজেরই। (আর্য্যস্য আত্মীয়ং এতদ্ গেহম্) চারুদত্ত আমার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর বস্তু, আমার সমুদায় পদার্থেই প্রিয়তম চারুদত্তের অধিকার রহিয়াছে, সুতরাং যাহারা মুহূর্ত্তের জন্য চারুদত্তকে আপনার বলিয়া ভাবে, আমি বা আমার অধিকৃত পদার্থ মাত্রই তাহার;—অর্থাৎ চারুদত্ত ও আমি ভিন্ন নহি; ইহাই প্রেমিকার প্রণয়-বাক্যের গূঢ় অর্থ।

প্রণয়-মদিরা-পানে যে এইরূপ আত্মবিস্মৃত ভালবাসার তরল তরঙ্গে ভাসিয়া যে প্রণয়ীকে এইরূপে একাত্মভাবে হৃদয়ে গ্রহণ করিতে পারে, তাহাকেও কি বেশ্যা বলিয়া ঘৃণা করিব?

মানুষ যখন ভালবাসার কুহকে পড়ে, তখন তাহার এক আশ্চর্য্য অবস্থান্তর ঘটে, প্রণয়ীর সুধাসিক্ত নাম সর্ব্বদাই তাহার হৃদয়ে জাগে, প্রণয়ীর মধুময়ী মূর্ত্তি সর্ব্বদাই তাহার চিন্তাকুল প্রাণে পীযূষধারা বর্ষণ করে, প্রণয়ীর কার্য্যকলাপ কি দ্রব্যসামগ্রীতেও তাহার একটা বিস্ময়কর অনুরাগ জন্মিয়া থাকে। আমরা বসন্তসেনাকেও প্রণয়কুহকে পড়িয়া এইরূপ উদ্ভ্রান্ত হইতে দেখিয়াছি।

সহৃদয় চারুদত্ত দুষ্টহস্তী ধবার জন্য কর্ণপূরক মাহুতকে একখানি জাতী-কুসুম-বাসিত উত্তরীয় বস্ত্র পারিতোষিক স্বরূপ প্রদান করেন, কর্ণপূরক তাহা মনিব বসন্তসেনাকে দেখায়, বসন্তসেনাও উহা চারুদত্তের বস্ত্র চিনিতে পারিয়া —'আর্য্য চারুদত্তস্য ইতি বাচয়িত্বা সস্পৃহং গৃহীত্বা প্রাবৃণোতি" প্রণয়ীর বস্ত্র

জানিতে পারিয়া তাহাতে শরীর আবৃত করিয়া প্রেমিকা বেশ্যা বসন্তসেনা যে সুখশান্তি বা তৃপ্তি লাভ করিয়াছিল, কয়জন গৃহস্থ প্রেমিক প্রেমিকা নিজ জীবনে তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন ?

তার পর বসন্তসেনা মাহুতের নিকট শুনিল, প্রণয়ী চারুদত্ত তাহার বাড়ীর পাশ দিয়াই যাইতেছেন, শুনিয়াই প্রিয়তমের দর্শনলালসায় আকুল হইয়া উদ্ভ্রান্তার ন্যায় দাসী মদনিকাকে বলিল, "উপরিতলং অলিন্দকং আরুহ্য আর্য্য চারুদত্তং পশ্যামঃ" চল উপর বারান্দায় উঠিয়া প্রিয়তমকে দেখি গিয়া। ইহাতে বসন্তসেনার প্রিয়জন-দিদৃক্ষাও সূচিত হইতেছে।

ভালবাসার তীব্র আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া যখন প্রণয়ী প্রণয়িণীর সহিত মিলিত হইতে ব্যাকুল হয় ;—তখন পার্থিব শত সহস্র বিঘ্ন বিপদ্ তাহাকে বাধা দিতে পারে না। মৃচ্ছকটিকের পঞ্চম অঙ্কে দেখিয়াছি, বিরহবিধুরা বসন্তসেনা প্রণয়ী চারুদত্তের সহিত মিলন-আশায় যখন অভিসারে চলিয়াছিল, তখন ভয়ানক দুর্য্যোগ ; গুম্ গুম্ মেঘ ডাকিতেছে, কড়্ কড়্ বাজ পড়িতেছে, চিক্ মিক্ বিজলী ঝলসিতেছে, শন্ শন্ ঝঞ্ঝা বহিতেছে, ঝর ঝর জল পড়িতেছে, ইহার উপর ঘুটঘুটে অন্ধকার রাত্রি, এই প্রকার প্রকৃতির সংহারমূর্ত্তিকে তুচ্ছ করিয়া প্রিয়-মিলনোৎসুকা অভিসারে চলিয়াছে। ঝড়বৃষ্টিতে ভ্রূক্ষেপ নাই, অন্ধকারে বজ্র-পাতে ভয় নাই, সে দৃঢ়তার সহিত বলিতেছে,—

"ডাক মেঘ ভীমরবে হান রে অশনি,
আবরি আঁধারে তনু এস হে রজনি,
মেঘ জল, বর্ষ শত পড় অবিরল,
অভিসারিকা কি কভু গণে এ সকল ?"

বসন্তসেনার হৃদয়সরসী যেমন ভালবাসায় আতট উচ্ছ্বসিত, তেমন উহাতে স্নেহ মমতা ও সৌজন্যের মনোহর কমল কহ্লারও বিকশিত রহিয়াছে, দেখিতে পাই।

সংবাহক নামক দ্যূতকর দশ সুবর্ণ হারিয়া ক্রীড়কদিগের নিকট প্রহৃত হয়, পরে পলায়নপূর্ব্বক বসন্তসেনার নিকট গিয়া অভয় প্রার্থনা করে, দয়াবতী রমণী ভীতিবিহ্বল আগন্তুককে "অভয়ং শরণাগতস্য" বলিয়া আশ্বাস প্রদান করেন। তার পর নিজের আভরণ দিয়া তাহাকে ঋণমুক্ত করেন। এই প্রকার আর এক দিনের ঘটনায় বসন্তসেনার হৃদয়ের উচ্চভাব সম্পূর্ণ অভিব্যক্ত হইয়াছে। চারুদত্তের শিশুপুত্র রোহসেন প্রতিবেশী ধনিপুত্রের সোণার

গাড়ী দেখিয়া তাহার জন্য কাঁদিতেছিল। পরিচারিকা একখানি মাটির গাড়ী দিয়া তাহাকে ভুলাইতে চেষ্টা করিতেছিল, কিন্তু "ভবী ভুলিবার নয়" নাছোড়বান্দা বালক সোণার গাড়ীর জেদ ছাড়িল না। এই অবস্থাতেই বসন্তসেনার সহিত তাহাদের সাক্ষাৎ হয়। বসন্তসেনা স্নেহশীলা জননীর ন্যায় করুণকণ্ঠে বালকের রোদনের কারণ জিজ্ঞাসা করেন। পরিচারিকা অকপটে তাহার কাছে সকল কথাই বলিয়া ফেলিল। এই সময়ে বালক রোহসেন দাসীকে জিজ্ঞাসা করিল, "ইনি কে?" উত্তরে দাসী কহিল, "ইনি তোমার জননী।" এই কথায় বালক বিশ্বাস বা তৃপ্তিলাভ করিতে পারিল না। সে ক্ষুণ্ণ হইয়া দাসীকে পুনরপি কহিল, "ইনি যদি আমার জননী হইবেন, তবে 'কিমর্থং অলঙ্কৃতা'?" সরলতার প্রতিমূর্ত্তি রোহসেন জন্মাবধি তাহার জননী ধূতা দেবীকে দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে নিরাভরণাই দেখিতেছে, সুতরাং বিবিধ ভূষণে সুসজ্জিতা বসন্তসেনাকে জননী বলিয়া গ্রহণ করিতে তাহার হৃদয় প্রস্তুত হইল না। আমরা জানি, বালকের এই মর্ম্মচ্ছেদী সরল কথায় এই হৃদয়বতী বেশ্যা অশ্রুসম্বরণ করিতে পারে নাই। সে স্ত্রীজাতিসুলভ (বেশ্যাজনদুর্লভ) স্নেহ মমত্বে গলিয়া বলিল, "বালক, তুমি সরল প্রাণে অতি মর্ম্মান্তিক কথা কহিতেছ।" এই বলিয়া বসন্তসেনা শরীর হইতে সমস্ত অলঙ্কার পত্র উন্মোচন করিয়া বলিল, "বাছা, এই দেখ, এখন তোমার জননী হইয়াছি।" পরে ঐ সমুদায় স্বর্ণভূষণে মৃৎশকটিকাখানিকে পূর্ণ করিয়া কহিল, যাও বাছা, এই সোণার অলঙ্কার দিয়া সোণার গাড়ী প্রস্তুত করিয়া খেল গিয়া। এই খানেই নাটকের নায়কত্ব। বালকের মনস্তুষ্টির নিমিত্ত একজন বেশ্যা অনায়াসে বহুমূল্য অলঙ্কারে মৃৎশকটিকা বা মাটির গাড়ীখানিকে পূর্ণ করিয়া দিল, বালকের আবদার রাখিয়া বলিল, যাও বাছা, ইহা দ্বারা সোণার গাড়ী তৈয়ার করিয়া খেল। এই ত্যাগস্বীকারে কিও বসন্তসেনার কোন বিশেষত্ব নাই? অনেকে হয়ত বলিবেন, ইহাও ভালবাসারই রূপান্তর মাত্র। প্রণয়ী চারুদত্তের পুত্র বলিয়াই রোহসেন তাহার নিকট এই প্রকার পুরস্কৃত হইয়াছে। তর্ক স্থলে এই কথা স্বীকার করিয়াই জিজ্ঞাসা করি, কয় জন বিমাতা কুলবধূ সপত্নী-পুত্রের প্রতি এইরূপ স্নেহকোমল ব্যবহার করিয়া থাকেন?

তার পর "এষা তে জননী সংবৃত্তা" এই উক্তিতে নিরাভরণা অশ্রুসিক্ত-লোচনার যে মহত্ত্ব ও স্নেহশীলতা প্রকটিত হইয়াছে, তাহাও কি কাহাকে বলিয়া বুঝাইতে হইবে?

ইহা ছাড়া বসন্তসেনার সুশিক্ষা এবং উন্নত রুচিরও যথেষ্ট পরিচয় পাইয়াছি। চারুদত্তের বন্ধু মৈত্রেয় যখন বসন্তসেনার গৃহে প্রবেশ করে," তখন সে সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, আপনার কুশল ত ? এই আসনে উপবেশন করুন। এইটী সামান্য ঘটনা, আর একটী বিশেষ ঘটনায় বসন্তসেনার চারিত্রবল পরীক্ষিত হইয়াছে,—শর্ব্বিলক পরিচারিকা মদনিকার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী শিক্ষিত ব্রাহ্মণ-যুবক। সে এক দিন বসন্তসেনার বাড়ীর এক নির্জ্জন স্থানে প্রণয়িনী মদনিকার সহিত প্রেমের আলাপ করিতেছিল। এদিকে বসন্তসেনা, আদিষ্টা মদনিকা দীর্ঘসময়েও প্রত্যাবৃত্ত হইতেছে না দেখিয়া তাহার অনুসন্ধানে বাহির হয়; শেষে খুঁজিতে খুঁজিতে তাহাকে সেই স্থানে সেই অবস্থায় দেখিতে পায়, দেখিয়া মনে মনে ভাবিল, এই ত মদনিকা একটি পুরুষের সহিত প্রাণ খুলিয়া আলাপ করিতেছে। দেখিতেছি প্রেমিকা মধুর অপাঙ্গ দৃষ্টিতে ইহাকে জর্জ্জরিত করিতেছে, সম্ভবতঃ ইহারা প্রেমের ফাঁদে পড়িয়াছে। তা বেশ, মদনিকে, সুখস্বচ্ছন্দে অভিপ্রায় মত কাজ কর, আমি এখন তোমাকে ডাকিতেছি না। প্রেমতত্ত্ব জ্ঞাত ছিল বলিয়াই ত বসন্তসেনা আজ্ঞানুবর্ত্তিনী দাসীর কার্য্য-শিথিলতায় অসন্তুষ্ট হইল না, বরং প্রীতিপ্রফুল্লহৃদয়ে তাহাদের সাহায্য করিল। বসন্তসেনা যে স্থানে দাঁড়াইয়াছিল, সেখান হইতে ইহাদের কথাবার্ত্তা একটু একটু শুনা যাইতেছিল। শর্ব্বিলক মদনিকাকে জিজ্ঞাসা করিল, এই স্থান নির্জ্জন ত ? একটা বিশেষ রহস্য বলিব। শুনিয়া চরিত্রবতী বসন্তসেনা ভাবিল, "কথং পরমরহস্যং তন্ন শ্রোষ্যামি" অন্যের গোপনীয় কথা গোপনে শুনা যে নিতান্ত অন্যায়, তাহা কয় জনে জানেন ? জানিয়াই বা সেই মত কয় জনে কার্য্য করেন ? বিশেষতঃ পরের গোপনীয় কথা শুনিবার প্রলোভন স্ত্রী-লোকেরা কিছুতেই সম্বরণ করিতে পারেন না। এই ঘটনাটা বসন্তসেনার সুশিক্ষা ও মার্জ্জিতরুচির পরিচায়ক নয় কি ? এখন কেহ কেহ বলিতে পারেন, বসন্তসেনার সহস্র গুণ থাকিতে পারে, কিন্তু রমণীগণের অলঙ্কার, লজ্জাশীলতা ছিল না, কারণ সে বেশ্যা। আমরা এই ক্ষেত্রেও বসন্তসেনার পক্ষসমর্থন না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না। বেশ্যা বলিলে যে বিলাসবিভ্রমনিরতা ছলনাময়ী মূর্ত্তি আমাদের হৃদয়ে জাগরিত হয়, বসন্তসেনার ব্রীড়াবিনম্রা মূর্ত্তি তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। ইহার সলজ্জ ও সবিনয় ব্যবহার বহু কুলকামিনীরও শিক্ষণীয়। এই স্থলে তাহারও একটু উল্লেখ করা যাইতেছে।

ভীত ত্রস্ত সংবাহকের পরিচয় ও তাহার ভীতির কারণ জানিবার নিমিত্ত

বসন্তসেনার বড়ই ঔৎসুক্য জন্মে, কিন্তু লজ্জাশীলা বসন্তসেনা নিজে গলা বাড়াইয়া তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতে অত্যন্ত সঙ্কোচ বোধ করিল। কাজেই লজ্জাবনতমুখী মদনিকার সাহায্য গ্রহণ করিতে বাধ্য হইল। সে কুলবধুর ন্যায় "মদনিকায়াং সংজ্ঞাং দদাতি" অর্থাৎ মদনিকাকে পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতে সঙ্কেত করিল। বসন্তসেনা সুশিক্ষিতা ও লজ্জাশীলা না হইলে অপরিচিত পুরুষের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতে কুণ্ঠিত হইত না।

এই স্থলে প্রসঙ্গক্রমে আর একটি বিষয়ের উল্লেখ করা সম্ভবতঃ অসঙ্গত হইবে না। বসন্তসেনা বেশ্যা বলিয়া সাধারণ্যের পরিচিতা হইলেও সে নিজে বেশ্যাসমাজকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করিত। বসন্তসেনা একদিন নিভৃতে বসিয়া প্রিয়তম চারুদত্তের চিত্রফলক (Photo) অনিমিষনয়নে দেখিতেছিল। সেই সময়ে মদনিকা তথায় প্রবেশ করে। তাহাকে দেখিয়া বসন্তসেনা জিজ্ঞাসা করে,—"মদনিকা, এই চিত্রাকৃতি আর্য্য চারুদত্তের অনুরূপ হইয়াছে কি?" দাসী উত্তর দিল, "ঠিক হইয়াছে।" বসন্তসেনা পুনর্ব্বার প্রশ্ন করিল, "তুই কিরূপে জানিস্?" চতুরা দাসী অপ্রতিভ হওয়ার পাত্রী নহে, সে তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিল, "যেহেতু আপনার স্নেহস্নিগ্ধ আঁখি ইহাতে লাগিয়া রহিয়াছে।" এই উত্তরে বসন্তসেনা প্রীতি লাভ করিল না। সে ঘৃণাব্যঞ্জক স্বরে দাসীকে কহিল, "কিং বেশবাসদাক্ষিণ্যেন এবং ভণসি" অর্থাৎ বেশ্যাবাড়ীতে বাস জনিত চাতুরী দ্বারা এই প্রকার বলিতেছিস্ না কি? ইহাতে মদনিকা একটু লজ্জিত হইয়া বলিল, কেন, যাহারা বেশ্যা বাড়ীতে থাকে, তাহারা চাতুরী শিখে না কি? শুনিয়া বসন্তসেনার সুন্দর কপোলদেশ ঘৃণায় কালিমা প্রাপ্ত হইল, সে তীব্রভাবে বলিল, "নানাপুরুষসঙ্গেন বেশ্যাজনঃ অলীকদর্শনো ভবতি" অর্থাৎ নানা পুরুষসংসর্গে বেশ্যারা ছলনাময়ী হয়। এইরূপ এক দিন ঘটে নাই, বহুদিন বহুবার আমরা বসন্তসেনাকে বেশ্যাদিগের নিন্দা করিতে দেখিয়াছি। প্রেমিকা বসন্তসেনা মদনিকা দাসীকে শর্ব্বিলকের প্রতি অনুরক্ত দেখিয়া দাসত্ব মোচন করিয়া তাহাকে স্বাধীনা করিয়া দেয়। দাসত্বমুক্তা মদনিকার যখন শর্ব্বিলকের সহিত বধূবেশে প্রস্থান করিতে উদ্যত হয় তখন সেই বিশুদ্ধ-প্রেমিকা আনন্দগদগদকণ্ঠে কহিল, "মদনিকে ত্বমেব বন্দনীয়া সংবৃত্তা।"

তুমি অপবিত্র বেশ্যাবৃত্তি ছাড়িয়া আজ ভাগ্যগুণে কুলবধুত্ব লাভ করিতে চলিয়াছ কাজেই এখন ভাগ্যবতী তুমি আমাদের ন্যায় পতিতাগণের বন্দনীয়া। এই কথার প্রতি বর্ণ পতিতা রমণীর তীব্র অনুতাপের উষ্ণ অশ্রুতে বিধৌত।

এই অনুশোচনার মর্ম্মভেদী উচ্ছ্বাসের মধ্যে বসন্তসেনার কুলবধূত্বপ্রাপ্তির একটা আন্তরিক অভিলাষ প্রকাশ পাইতেছে না কি ?

আর এক দিনের ঘটনা এই, রাজশ্যালক শকার যখন বসন্তসেনাকে মৃতা মনে করিয়া ফেলিয়া যায়। অদৃষ্টগুণে বসন্তসেনার দেহপিঞ্জরকে তাহার প্রাণপাখী ছাড়িয়া যায় নাই। সেই মৃতবৎ পতিতা অসহায়া রমণী সংবাহক দ্যুতকরের সেবাশুশ্রূষায় পুনঃ চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়াছে, পরে স্তম্ভিত দ্যুতকর বিনীত ভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "আর্য্যে, আপনার এই দশা কেন ? এই কথায় দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বসন্তসেনা কহিল, "যৎসদৃশং বেশভাবস্য" যাহা বেশ্যা বৃত্তির সুসদৃশী পরিণতি।

বসন্তসেনা নামতঃ বেশ্যা ছিল তাহার কার্য্যকলাপ অন্তঃপুরমহিলাগণের নির্ম্মল আদর্শে অনুষ্ঠিত। ইহারও বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ পাইয়াছি। বসন্ত-সেনা প্রবহণ-বিপর্য্যাসে (গাড়ীর বদলে) শকারের প্রমোদ-উদ্যানে গিয়া উপস্থিত হয়। বিট তাহাকে দেখিয়া সকারকে বলিল, বসন্তসেনা তোমার কামনায় আসিয়াছে। ইহা শুনিয়া বসন্তসেনা "শান্তং পাপং শান্তং পাপং" বলিয়া ঘৃণা প্রকাশ করিয়াছিল।

তার পর রাজশ্যালক (শকার) সহর্ষে বসন্তসেনার নিকটে গিয়া "সুবর্ণকং দদামি প্রিয়ং বদামি" প্রভৃতি নানা প্রকার প্রলোভন দেখায় এবং বহু ভোগ-বিলাসের প্রস্তাব করে, তাহাতে বসন্তসেনা অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া "অপেহি অনার্য্যং ভণসি" দূর হ পাপ প্রস্তাব কহিতেছিস্, বলিয়া তাহাকে পাদপ্রহার করিতে ভীত হয় নাই। ইহা কম চরিত্রবলের কথা নহে, একজন নিঃসহায়া স্ত্রীলোক চরিত্ররক্ষার নিমিত্ত রাজশ্যালকের ন্যায় একজন ধনবান্ ব্যক্তিকে অনায়াসে পাদপ্রহার করিল। এই সাহসিক কর্ম্মের পরিণতি যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা মৃচ্ছ-কটিক পাঠকের জানা আছে।

বসন্তসেনা চরিত্ররক্ষার জন্য সর্ব্বদাই চেষ্টা করিত, তাহার মা ইহাতে প্রতিকূল ব্যবহার করিত।

দাসী ও বসন্তসেনার এক দিনের কথোপকথনে এই কথা প্রকাশ পাইয়াছে, নিম্নে তাহার কতটুকু অংশ উদ্ধৃত করিলাম।

দাসী। আর্য্যে, মাতা ঠাকুরাণী বলিয়া পাঠাইয়াছেন, দ্বারে গাড়ী সজ্জিত। আপনি শীঘ্র আসুন।

বসন্তসেনা। গাড়ী পাঠাইয়াছে কে, আর্য্য চারুদত্ত না কি ?

দাসী। গাড়ী যিনি পাঠাইয়াছেন, তিনি গাড়ীর সহিত দশ হাজার সুবর্ণ মুদ্রার অলঙ্কার পাঠাইয়াছেন।

বস। সে ব্যক্তি কে?

দাসী। রাজার শ্যালক—শকার।

শকারের নাম শুনিয়াই বসন্তসেনা হাড়েহাড়ে চটিয়া গেল, ক্রোধভরে বলিল, দূর হ, আর কখনও আমাকে এইরূপ কথা বলিস্ না। দাসী বসন্তসেনার ক্রোধ দেখিয়া ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে কহিল, ঠাকুরাণি, আমার দোষ নাই, আমি আজ্ঞানুবর্ত্তিনী দাসী মাত্র, মাতা ঠাকুরাণী যেরূপ বলিয়া পাঠাইয়াছেন, সেইরূপই বলিলাম, আমার অপরাধ লইবেন না।

"এই সব কথায় আমার বড় রাগ হয়" বলিয়া বসন্তসেনা নীরব হইল। দাসী একটু চিন্তা করিয়া ধীরে ধীরে বলিল, ঠাকুরাণি, মাতা ঠাকুরাণীকে কি বলিব?

"কি বলিবে?—তবে শোন" বলিয়া বসন্তসেনা সগর্ব্বে কহিল,—"যদি মাং জীবন্তীং ইচ্ছসি, তদা এবং ন পুনরহং মাত্রা আজ্ঞাপয়িতব্যা" "যদি আমাকে জীবিত দেখিতে চাও, তবে ভবিষ্যতে আর কখনও এই প্রকার অসঙ্গত আদেশ করিয়া পাঠাইও না।"

সুতরাং দেখা যাইতেছে, চরিত্রবলেও বসন্তসেনা সমাজে পূজাপ্রাপ্তির অধিকারিণী। উপসংহারে আমরা শার্ব্বিলক-কথিত রাজার আদেশ প্রীতির সহিত প্রকাশ করিতেছি,—"আর্য্যে বসন্তসেনে, পরিতুষ্টো রাজা ভবতীং বধূ-শব্দেন অনুগৃহ্লাতি।"

শ্রীঅনুকূলচন্দ্র গুপ্ত কাব্যতীর্থ।

মালঞ্চ।

রূপকথা।

বিজন প্রাসাদকক্ষ রূপে আলো করি'
রাজার কুমারী ছিল নিদ্রানিমগন;
রাজপুত্র আসি' সেথা বাহি' মায়াতরী
সোণার কাঠিতে তারে স্পর্শিল যেমন,—

অমনি নয়ন মেলি' চাহিল সুন্দরী,
দিকে দিকে বিকাশিল নব জাগরণ,
নীরব বিহঙ্গকুল উঠিল কুহরি,
ফুটিল কুসুমকলি, ছুটিল পবন।

একি শুধু রূপকথা—আর কিছু নয়—
শৈশবকল্পনাগড়া ছবি অসম্ভব?
না, না, এতো নহে শুধু কাহিনী নিশ্চয়,
যৌবন প্রভাতে আজি করি অনুভব—
রাজার কুমারী—সে তো আমারি হৃদয়,
সোণার কাটীর স্পর্শ—প্রেমদৃষ্টি তব!

শ্রীরমণীমোহন ঘোষ।

গ্রন্থ-সমালোচনা।

যুগল-প্রদীপ।*

ইতিহাস ও উপন্যাস একই শ্রেণীর ও তুল্যধর্ম্মাক্রান্ত বিষয়। উভয় বিষয়ক গ্রন্থ দ্বারাই মানব সমাজের পরম উপকার সাধিত হইয়া থাকে। উহারা প্রতিনিয়ত মানব-হৃদয়ের সজীবতা সম্পাদন করিতেছে, ও মানব সমাজকে কর্ত্তব্যমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া কঠোর জীবন-সংগ্রামে বিজয়লাভের কল কৌশল শিক্ষা দিতেছে। এক শ্রেণীর হইলেও মাধুর্য্যে বিচিত্রতায় উপন্যাস শ্রেষ্ঠ। অতীতের সীমাবদ্ধ কাহিনী লইয়া ইতিহাসের অভ্যুদয়। ভূত এবং বর্ত্তমানের সুশীতল ছায়াই উপন্যাস সৃষ্টির মূল উপাদান। ইতিহাস জ্বলন্ত সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। সম্ভবনীয় সত্য লইয়া উপন্যাসের কায়া গঠিত। কাল্পনিক হইলেও উপন্যাসের বিচিত্র চিত্রাবলী জ্বলন্ত সত্যের ন্যায় মানব-হৃদয়কে বিবিধ কার্য্যে উদ্বোধিত করে। উপন্যাসের বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে সর্ব্ববিধ সৌন্দর্য্য পূর্ণমাত্রায় প্রস্ফুটিত। সর্ব্বত্রগামী কবি ঔপন্যাসিক জগতের নানাবিধ সৌন্দর্য্যের সার সংগ্রহ করিয়া যে অপূর্ব্ব রসায়ন প্রস্তুত

*শ্রীননিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। ৪১ নং হুকিয়াস্ ষ্ট্রীট হইতে শ্রীরাজেন্দ্রলাল গঙ্গোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ১৲ টাকা।

করেন, মানব হৃদয়ের পক্ষে তাহা বড়ই স্বাস্থ্যকর ও পুষ্টিদায়ক মহৌষধ। ইতিহাস বিভিন্ন ব্যক্তির বিভিন্ন গুণগৌরবের পরিচয় দেয়। আর সুচতুর ঔপন্যাসিক সেই বিভিন্ন ব্যক্তিকে একত্র গালিয়া এক ছাঁচে ঢালিয়া এমনি এক সর্ব্বগুণান্বিত আদর্শ-মানবের অবতারণা করেন যে, মানুষ নতশিরে তাঁহার চরণপ্রান্তে বসিয়া সে আদর্শ-চরিত্রানুশীলনে আপনাকে নিয়োজিত করিতে সমধিক ব্যগ্র হইয়া উঠে সেই জন্যই ইতিহাস অপেক্ষা মানব সমাজে উপন্যাসের সম্মান একটু বেশী মাত্রায় প্রতিষ্ঠিত দেখা যায়।

আজকাল বাঙ্গালা সাহিত্যে দুইটী সম্প্রদায়ের দৌরাত্ম্য বিশেষ রূপ বিভাষিত। এক কবি, আর এক ঔপন্যাসিক। দৌরাত্ম্য বলিলাম এইজন্য যে, ইহাদের অধিকাংশের লিখিত গ্রন্থই অপাঠ্য এবং কাব্য ও উপন্যাস নামের কলঙ্ক স্বরূপ। এ দোষ কেবল লেখকের নয়, সমালোচকেরও বটে। আজ কাল বড় লোকের ছেলে কবিতা লিখিলেই হতভাগ্য অন্ধকবি হেমচন্দ্রের আসনটীর প্রয়োজন পড়ে। পত্র-সম্পাদকের বন্ধুবান্ধবে উপন্যাস লিখিলেই তাহা অতি উৎকৃষ্ট ও উপাদেয় জিনিষ হয়।

কাব্যের কথা আর একদিন বলিব। আজ উপন্যাসের কথা বলিতেছি;—উপন্যাসে উপন্যাসে বাঙ্গালা দেশ ছাইয়া গিয়াছে। কোন কোন সাপ্তাহিক কাগজ পর্য্যন্ত সাপ্তাহিকের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম পায়ে ঠেলিয়া উপন্যাসের অবিরামগতি ধারায় গা ঢালিয়া দিয়াছে। কিন্তু প্রকৃত উপন্যাস একখানিও পাওয়া যায় না। এ দুর্দ্দিনে শ্রীযুক্ত ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের "যুগল-প্রদীপ" নামক উপন্যাসখানা হাতে পাইয়া আমরা পরম প্রীত হইয়াছি। গ্রন্থখানা ক্রমান্বয়ে তিন বার পাঠ করিয়াছি, তথাপি পাঠের প্রবৃত্তি নিবৃত্তি পায় নাই। যে উপন্যাসে এমন আবেগ জন্মাইতে না পারে সে উপন্যাস, উপন্যাসই নয়। "যুগল-প্রদীপের" ন্যায় এমন রহস্যপূর্ণ উপন্যাস বাঙ্গালা ভাষায় আরও রচিত হইয়াছে কি না আমরা অবগত নহি। গ্রন্থকার একজন ক্ষমতাশালী লেখক তাহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই।

গ্রন্থোক্ত রামধন সরকার বস্তুতঃই পুরাকালের গুরুমহাশয় উপাধিধারী অদ্ভুত জীবের নিখুঁত প্রকৃতি। জমিদার হরমোহন দত্তের জীবন-নাটকের প্রাথমিক অভিনয় দেখিবার সুযোগ ঘটিয়া উঠে নাই; শেষাঙ্কে যাহা দেখিলাম তাহা তৃপ্তিপ্রদ বটে। শশিচরিত্র, বড় ঘরের সদা কৌতুকপরায় সুরসিকা পরিচারিকার কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। পণ্ডিতপ্রবর চন্দ্রচূড় তর্কর

শরফে কৃষ্ণানন্দস্বামীর তরঙ্গহীন সাগরসদৃশ প্রশান্ত মূর্ত্তি দর্শনে হৃদয়ে শ্রদ্ধা ভক্তির উদ্রেক হয় এবং সে যোগিবরের যোগাশ্রমের সুশীতল ছায়ায় বসিয়া তাঁহারি হৃদয়তৃপ্তিকর বচনসুধা পান করিবার বাসনা বলবতী হইয়া উঠে। তারানাথ তর্কবাগীশের ন্যায় সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ, ধর্ম্মভীরু, হৃদয়বান্ কুল পুরোহিত যত বেশী পরিমাণে অভ্যুদিত হইবে ততই হিন্দু বাঙ্গালীর মঙ্গল। গুরুচরণের মাধ্যাহ্নিক জীবনে স্বার্থত্যাগের একটা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত চঞ্চল তড়িল্লতা বিকাশের ন্যায় হঠাৎ ফুটিয়া উঠিয়াছে; কিন্তু ইহার পূর্ব্বে তাহাকে 'গোঁয়ার গোবিন্দ' গুরুচরণ বলিয়াই আমরা চিনিয়াছি। তাই বেচারাম বাচস্পতির ন্যায় আমরা তখন বুঝিতে পারি নাই যে, "সমস্ত পৃথিবী খুঁজিলে অমন ছেলে পাব না।" আর জন্মদুঃখিনী শারদা সুন্দরীর কথা ভাবিতে গেলে সমস্ত শরীর অবশ হইয়া আসে; তাহার আত্মকাহিনী পাঠ করিতে করিতে এ পাষাণ বক্ষও বিদীর্ণ হইয়া যায়; অশ্রুপ্রবাহে গণ্ডদ্বয় প্লাবিত হয়। চন্দ্রচূড়ের মত উপদেষ্টা ও আশ্রয়দাতা না পাইলে হতভাগিনী কোলের শিশু কন্যাটীকে লইয়া এ পাপ প্রলোভনময় সংসারের কোন্ অংশে যাইয়া দাঁড়াইত কে বলিতে পারে? "যুগল-প্রদীপের" সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ অন্নপূর্ণা চিত্র। এ চিত্র যত দেখি ততই দেখিতে ইচ্ছা হয়। করতলগত অতুল বৈভব, আশৈশববাঞ্ছিত কুমারপ্রতিম অনিন্দ্যকান্তি অতুল গুণগ্রামবিভূষিত সম্ভাবিত স্বামী অপরের অনুকূলে পরিত্যাগ করিয়া সপ্তদশী যুবতী অন্নপূর্ণা স্বার্থত্যাগের যে একটা অপূর্ব্ব অত্যুজ্জ্বল চিত্তবিস্ময়কর দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা চিরকাল লোকশিক্ষার বিষয়ীভূত হইয়া থাকিবে। পাঠক! একবার দত্তবাড়ীর অন্তঃপুরমধ্যে চল; ঐ দেখ গ্রামবাসিগণ অন্নপূর্ণার সঙ্গে অমরনাথের বিবাহ দেখিয়া বহুদিনের সাধ পূর্ণ করিবার জন্য বিবাহসভার পশ্চাদ্বর্ত্তী বৃহৎ প্রাঙ্গণে আসিয়া দাঁড়াইল; কিন্তু দেখিল কি? "বিস্মগ্রামবাসিগণ সবিস্ময়ে মুগ্ধহৃদয়ে দেখিল রত্নমণ্ডিত সুবর্ণ প্রদীপদ্বয়ের পার্শ্বে, প্রসন্নবদন প্রশান্তমূর্ত্তি কৈলাসপতির ন্যায় তারানাথের অঙ্কতলে রত্নালঙ্কারভূষিতা ভুবনমোহিনী বীণাপাণিমূর্ত্তি কন্যা; আর তাহার সম্মুখে অপর পার্শ্বে সস্মিতবদনা সশরীরে সুরলোক হইতে অবতীর্ণা জগৎ-জননী অম্বিকার ন্যায় অন্নপূর্ণার ক্রোড়সমীপে অনিন্দ্যকান্তি বর অমরনাথ।" অন্নপূর্ণা ছায়ার সম্পত্তি ছায়াকে ফিরাইয়া দিতে কৃতসংকল্পা; এবং তাঁহার হৃদয়-রাজ্যের যে দেবতাটীকে তিনি উন্মাদিনী-বেশে দেশে দেশে অনুসন্ধান করিয়া ফিরিয়াছেন, সেই অমরনাথের সঙ্গে ছায়াকে পরিণীত করিতেও যত্নপরায়ণা,

তথাপি যেন তাঁহার স্বার্থযজ্ঞ অসমাপ্ত রহিল, তাই স্বয়ং জননীর আসনে বসিয়া অমরনাথকে সম্প্রদান করিয়া সে মহাযজ্ঞে পূর্ণাহুতি প্রদান করিলেন। এ দৃশ্য দেখিতে দেখিতে মনে হয়, আমরা যেন পাপপ্রলোভনকলঙ্কিত, স্বার্থপরতাদুষ্ট কপটতাময় সংসার হইতে বহু ঊর্দ্ধে উত্থান করিয়াছি।

গ্রন্থকার হাস্যরসের অবতারণায়ও সবিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন; যোসেফ্ সাহেবের সহিত অর্দ্ধশিক্ষিত গুরুচরণের ইংরাজী বাক্যালাপ পাঠ করিয়া হাস্য সম্বরণ করা যায় না। রসিকতার চিত্র অঙ্কিত করিতেও গ্রন্থকার যথেষ্ট নিপুণতা দেখাইয়াছেন। গ্রন্থকারের ভাষা সর্ব্বত্রই মোলায়েম ও প্রাণস্পর্শী।

আমরা এতক্ষণ "যুগল প্রদীপের" কেবল গুণকীর্ত্তনই করিয়াছি। ইহাতে কেহ কেহ মনে করিতে পারেন উপন্যাসখানি একেবারে নির্দ্দোষ। বস্তুতঃ তা নয়, "যুগল প্রদীপে" দোষের ভাগও বিদ্যমান আছে। আমরা এক্ষণে তাহাই দেখাইতে চেষ্টা করিব।

প্রথম খণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদে, শিক্ষকের প্রতি ছাত্র সম্প্রদায়ের ব্যবহার স্বাভাবিকতার সীমা অতিক্রম করিয়া উঠিয়াছে। গ্রন্থকার যে সময়ের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তখন ছাত্রমণ্ডলী পাঠশালার গুরু মহাশয়েতে আর যমেতে বড় প্রভেদ বিবেচনা করিতে পারিত না। সুতরাং ছাত্রমণ্ডলীকর্ত্তৃক গুরু মহাশয়ের জীবদ্দশায় গঙ্গাযাত্রার উদ্যোগ পর্ব্বটা আমাদের নিকট নিতান্তই অস্বাভাবিক কার্য্য বলিয়া বিবেচিত হইল। প্রথম খণ্ডের চতুর্থ পরিচ্ছেদে আবার দেখিতে পাই, গুরু মহাশয়ের বেত্রদণ্ডচিহ্নিতপৃষ্ঠ বালকদল বাবলা-গাছতলায় গুরু মহাশয়কে "হুমড়ি খাইয়া" পতিত হইতে দেখিয়া, নির্ভীকহৃদয়ে উচ্চৈঃস্বরে "নেকড়ে খোঁড়া ফোগলা দাঁত, বাবলাতলায় কুঁপকাত" পাঠশালার সর্দ্দারপড়ো গুরুচরণের এই নবরচিত নামতা পাঠ করিতেছে। এ দৃশ্যটাও আমাদের চক্ষে কেমন কেমন ঠেকিল।

উক্ত খণ্ডের মাধুর্য্যপূর্ণ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদটীও অস্বাভাবিকতার সংমিশ্রণে নিতান্ত তিক্ত হইয়া উঠিয়াছে। গ্রন্থকার বালক বালিকাগণ দ্বারা যুবক যুবতীর রসাল অভিনয় দেখাইতে যাইয়া নিতান্ত অপকার্য্য করিয়াছেন। যে সময়ের কথা লিখিত হইয়াছে সে সময়ের কথা দূরে থাক্ বর্ত্তমান উন্নত শতাব্দীতেও এরূপ অল্প বয়সের বালক বালিকাগণ ওরূপ রসিকতার মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিয়া উঠিতে পা কি না সন্দেহের বিষয়। বস্তুতঃই গ্রন্থকার স্বয়ং বলিয়া না দিলে তাহার "শৈশব অভিনয়"কে আমরা যুবক যুবতীর যৌবন-অভিনয় বলিয়া মনে করিতাম।

গ্রন্থকার অন্নপূর্ণাকেও একটু নির্লজ্জা করিয়া ফেলিয়াছেন। সকলে জানিত অমরনাথের সঙ্গেই অন্নপূর্ণার বিবাহ হইবে; এবং ইহাই সকলের স্পৃহণীয় ছিল। কিন্তু সকলের আশা চূর্ণ করিয়া, হরমোহন দত্ত মহাশয়, কলিকাতা হইতে অন্য একটী বর আনিয়া বাগানবাটীতে স্থান দিয়াছেন। সে বর আবার কেমন? "ধেড়ে মিনসে! গাল চড়ান! লম্বা লম্বা কটা কটা গোঁপ! লাল লাল চোক্! যেন কামড়াতে আস্‌চে!" তাই শশী চাকরাণী বর দেখিয়া আসিয়া, অন্নপূর্ণার বাল্যসহচরীগণ ও অমরের পালনকর্ত্রী বামনপিসির নিকট বলিল "না বাপু, আমার কিছুতেই এ বরের উপর মন উঠ্‌চে না।" অন্নপূর্ণা তখন চোক্ রাঙ্গাইয়া শশীকে দুটা কড়া কথা শুনাইয়া দিল। এ দৃশ্যটা প্রত্যেক বাঙ্গালীর চক্ষে বিষশলাকাবৎ প্রতীয়মান হইবে। বামনপিসি অন্নপূর্ণার হৃদয়রাজ্যের দেবতা অমরনাথের মাতৃস্থানীয়া, সুতরাং অন্নপূর্ণারও বিশেষ সম্মানের পাত্রী। এ হেন পিসিমার সম্মুখে বিবাহ ও বর সম্বন্ধীয় কথোপকথনে অন্নপূর্ণার মুখ না ফুটিলেই ছিল ভাল। গ্রন্থের মধ্যে এইরূপ সামান্য সামান্য দোষ পরিলক্ষিত হয়। এই সকল দোষ সত্ত্বেও "যুগল প্রদীপ" একখানা উৎকৃষ্ট উপন্যাস হইয়াছে, ইহা মুক্তকণ্ঠে বলা যাইতে পারে। আমরা প্রত্যেক বাঙ্গালী পাঠককে "যুগল-প্রদীপ" পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র রায়।

নিত্য সহচর।—শ্রীদুর্গাদাস রায় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও প্রকাশিত।

তৈত্তিরীয় উপনিষদের অমূল্য উপদেশমালা এই গ্রন্থে সংগৃহীত ও সানুবাদিত হইয়াছে। বর্ত্তমান শিক্ষাবিভ্রাট-যুগে এরূপ উপদেশের নিতান্তই প্রয়োজন। আলোকপ্রাপ্ত নব্য সভ্য জাতীয় পরিচ্ছদের সহিত জাতীয় আচার ব্যবহার ও রীতি নীতি সমস্তই বিসর্জ্জন দিয়া পর-পদ-লেহন করাই পরম পুরুষার্থ জ্ঞান করিয়া থাকেন। এই গ্রন্থ তাঁহাদের পক্ষে কটু কষায় তিক্ত হইলেও উৎকৃষ্ট মহৌষধ। তবে বিকৃতমস্তিষ্কের পক্ষে ঔষধের ব্যবস্থা করিতে গেলে অনেক স্থলেই আশার সফলতা হয় না; তাই একটুকু আশঙ্কা। তথাপি সংগ্রহকারের অধ্যবসায় ও উদ্যম প্রশংসনীয় বলিতে হইবে।

উপসংহারে আমাদের এই মাত্র বক্তব্য যে, "অশ্বাদি দুষ্ট যানে আরোহণ অকর্ত্তব্য" ও "যাচকদিগকে বিমুখ করিবে না", এই সমস্ত উপদেশ বর্ত্তমান সময়ের উপযোগী কি না সন্দেহের বিষয়। এবং দিনচর্য্যার বিধি ও নৈতিক উপদেশনিচয় একত্র মিলাইয়া খিচুড়ী প্রস্তুত না করিলেই বোধ হয় ভাল ছিল।

ফুলের মালা।—শ্রীঅনাথবন্ধু সেন প্রণীত।

এ ফুলের মালা যিনি গাঁথিয়াছেন, তিনি সুনিপুণ ফুল-ব্যবসায়ী নহেন। কারণ, ফুল হইলেও এগুলি কাঠমল্লিকা;—না আছে ইহাতে সৌরভ,—না আছে সঞ্চিত মধু। তবে এ ফুলে মালা গাঁথিবার প্রয়াস কেন? গোলাপ, মল্লিকা, যাতি, যূথী, মালতী অথবা বেলফুল নহিলে কি সব ফুলেই মালা গাঁথা চলে?—না সে মালা কেহ আদর করিয়া গলায় পরে?

গ্রন্থকার বোধ হয় শিক্ষানবিশ,—নহিলে এ গ্রন্থে অর্থহীন বাক্য ও যতিভঙ্গ-রূপ অমার্জ্জনীয় দোষের এত বাহুল্য কেন? ছিন্নসূত্র মালার ন্যায় ছন্দভঙ্গ কবিতা সর্ব্বথা শোভা ও সৌন্দর্য্যবিহীন।

এই গ্রন্থে একটী কবিতার নাম "ভুলের শিশু"। আমরা সুযোগ্য গ্রন্থকারকে জিজ্ঞাসা করি, এ প্রহেলিকাময় সমস্যার অর্থ কি? এ স্থলে 'শিশুর স্মৃতি' নাম দিলে কি পরিস্ফুটতর অর্থ হইত না?

সমালোচ্য গ্রন্থের ভাষা কাব্যের অনুপযোগী নহে। অপিচ অযথা বিন্যস্ত কবিতা নিচয়ের মধ্যেও "উপহার", "আমারি কি ভুল" ও "এসেছে আহ্বান" প্রভৃতি কবিতা কয়টী নিতান্ত উপেক্ষার জিনিষ নহে। তবে অন্যান্য কবিতা সম্বন্ধে আমাদের কিছুমাত্র বক্তব্য নাই। শ্রীমহেশচন্দ্র সেন।

সহজ সাধন।

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের অনেক পূর্ব্ব হইতেই বঙ্গদেশে সহজিয়া মতের প্রচার হইয়াছিল। বৈষ্ণব কবি পদ্মাবতী-চরণ-চারণ-চক্রবর্ত্তী জয়দেব গোস্বামীর চরিত্রে ইহার আভাস পাওয়া যায়। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের চরিত্রেও সাধন প্রণালীতে ইহার পূর্ণ বিকাশ দৃষ্ট হয়। চণ্ডীদাসের

"নিত্যের আদেশে, বাশুলী চলিল
সহজ জানাইবার তরে।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে, নান্নুরের মাঠে
যাইয়া প্রবেশ করে।"

ইত্যাদি পদাবলী সহজসাধন তত্ত্বের বিবৃতি। যে প্রেম ভগবানে অর্পণ করিয়া আরাধিকা গোপিনীগণ সর্ব্বকামবিমুক্ত হইয়াছিল, সেই প্রেমানুরাগ মানবে অর্পণ করিয়া কামযজ্ঞ পূর্ণ হইতে চলিল। মানুষ পুরুষোত্তমের আসনে আপনাকে বসাইয়া "তুমি রাধা আমি শ্যাম" এই মন্ত্র গ্রহণ করিল।

চণ্ডীদাসের পদাবলী, তরণিরমণ ঠাকুরের পদাবলী, বিবর্ত্তবিলাস, মীরাবাইর কড়চা, হাড়মালা, প্রভৃতি বহু গ্রন্থে সহজসাধনতত্ত্ব লিখিত আছে। সহ-

জিয়ারা ভাগবত ও চৈতন্যচরিতামৃতের প্রমাণ দিয়া আপন মত সমর্থন করে। আনন্দই ইহাদের লক্ষ্য। দেহ সুস্থ ও সবল রাখিয়া সর্ব্বদা আনন্দভোগই ইহাদের সাধনা। দেহ সুস্থ ও সবল রাখিবার জন্য অনেক উপায় ইহারা অবগত আছে। সর্ব্বদা আপাদমস্তক তৈল লেপন তন্মধ্যে একটী। গৌরাঙ্গ অপেক্ষা নিত্যানন্দের প্রতি ইহারা অধিক অনুরক্ত। নিত্যানন্দের পুত্র বীরভদ্র গোস্বামীকেই বোধ হয় ইহারা স্বমতের প্রবর্ত্তক মনে করে। কেননা অনেক সময়েই ইহাদের মুখে "বীর অবধূত" শুনা যায়। সন্ন্যাসীদিগের মত ইহারাও লম্বা চিমটা সঙ্গে রাখে। সন্ধ্যা ও প্রভাতে ধূপ দীপাদি দ্বারা সেই চিমটার আরতি করে। দীর্ঘ চুল দাড়ি, স্থূল মসৃণ শরীর, ও দীর্ঘ চিমটা—এই সকল বাহ্য বেশ দ্বারাই গৌড়িয়া বৈষ্ণব হইতে ইহাদিগকে পৃথক্ করা যায়। দ্বিজ জাতির গায়ত্রীর ন্যায় ইহাদের মধ্যেও "ক্লীং কৃষ্ণায় ধীমহি, পুষ্পবাণায় বিদ্মহে" প্রভৃতি গায়ত্রী আছে। উহার নাম কাম গায়ত্রী। চারি চন্দ্র ভেদ ইহাদের এক প্রধান সাধন। চারি চন্দ্র ভেদ সম্বন্ধে ইহারা বলে :—

"চারি চন্দ্র ভেদের কথা যেহি লোকে জানে।
থাকুক মানুষের কথা, দেবে তারে মানে॥"

দেবের মান্য হইবার জন্য বা অলৌকিক ক্ষমতা লাভের জন্য ইহারা চারি চন্দ্র (বিষ্ঠা, মূত্র, শুক্র ও আর্ত্তব) শোধন করিয়া ভক্ষণ করে। একটী নারিকেলের মালা চন্দ্রভক্ষণের পাত্র রূপে ব্যবহৃত হয়। উহাকে করোয়া বলে। বিষ্ঠাদি ভক্ষণকে করোয়া সাধনও কহে।

মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের সাধন প্রণালীকে ইহারা শুষ্ক সাধন বা গৌড়িয়ার মত বলে। ইহাদের সাধন—রসের সাধন বা রাগানুগ সাধন। বর্ত্তমানে এদেশীয় বৈষ্ণবদিগের মধ্যে এই মতের লোকই অধিক। অনেক গৃহস্থও এই মতে সাধন করেন।

প্রভু চৈতন্যদেবের বিমল বৈষ্ণব ধর্ম্ম বঙ্গে স্থান পাইল না। অদ্বৈতাচার্য্য তাহাতেই বড় দুঃখে লিখিয়াছিলেন :—

"বাউলেরে কহিও দেশ হইল আউল।
বাউলেরে কহিও হাটে না বিকায় চাউল॥"

সেই প্রেম, সেই আর্ত্তি, বঙ্গের এ পঙ্কিল হাটে বিকাইল না। মৃদু হাসিয়া বিক্রেতা আপনার পসরা লইয়া পলায়ন করিলেন।

শ্রীরসিকচন্দ্র বসু।

স্বামী বিবেকানন্দ ও ঠাকুর রামকৃষ্ণ।

আজ ভারতবর্ষ স্বামী বিবেকানন্দ মর্ত্ত্যধাম ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন বলিয়া হাহাকার করিতেছে। ভারতবর্ষ-কেন সমগ্র পৃথিবী—যেখানে জ্ঞানপিপাসু

যেখানে ধর্ম্মপিপাসু—হাহাকার করিতেছে! কেন জগৎ এত শোকার্ত্ত? কেন ভারতবাসীদের নিকট এ সংবাদ অকস্মাৎ অশনিপাতের ন্যায় হইয়াছে?

ইহার উত্তর তাঁহার গুরুদেব ঠাকুর রামকৃষ্ণ দিবেন। আমাদের diaryতে এক দিনের কথা লিখা আছে। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে ঠাকুর নরেন্দ্র (বিবেকানন্দ) সম্বন্ধে বলিতেছেন—

"এই ছেলেটীকে দেখ্‌ছো এখানে এক রকম, কিন্তু খুব বোক্‌ওলা (তেজস্বী)। দুরন্ত ছেলে বাবার কাছে যখন বসে তখন যেন জুজুটী। আবার চাঁদনীতে যখন খেলে তখন আর এক মূর্ত্তি। এরা নিত্যসিদ্ধের থাক্; এরা সংসারে কখন বদ্ধ হয় না। একটু বয়স হলেই চৈতন্য হয় আর ভগবানের দিকে চলে যায়। এরা সংসারে আসে জীবশিক্ষার জন্য। এদের সংসারের বস্তু কিছু ভাল লাগে না। এরা কামিনী কাঞ্চনে কখনও আসক্ত হয় না।

"বেদে আছে হোমাপাখীর কথা। খুব উঁচু আকাশে সে পাখী থাকে। সেই আকাশেতেই ডিম পাড়ে। ডিম পাড়লেই ডিমটা পড়তে থাকে। ডিম পড়তে পড়তে ফুটে যায়। তখন ছানাটা পড়তে থাকে। পড়তে পড়তে তার চোখ ফুটে ও ডানা বেরোয়। চোখ ফুট্‌লেই দেখ্‌তে পায় যে, সে পড়ে যাচ্ছে, আর মাটিতে লাগ্‌লে একেবারে চুরমার হয়ে যাবে। তখন সে পাখী মার দিকে একেবারে চোঁচাঁ দৌড় দেয়, আর উঁচুতে উঠে যায়।"

বিবেকানন্দ এই বেদোক্ত 'হোমাপাখী', নিত্যসিদ্ধের থাক্। তিনি কখন সংসারী নন, সদাকাল সাধু,—তাঁহার জীবনের এক লক্ষ্য মার কাছে চোঁচাঁ দৌড় দিয়ে উঠে যাওয়া—অর্থাৎ ভগবান্ লাভ করা। তিনি সংসারের কঠিন মৃত্তিকায় ঠ্যাকো ঠ্যাকো হয়েছিলেন—গায়ে মৃত্তিকা ঠেকিলেই মৃত্যু হইত, কিন্তু বাল্য-কালেই সাবধান হয়ে গিয়েছিলেন—একেবারে ভগবানের পথ ধরিলেন। অথবা তিনি নিত্যসিদ্ধ—পূর্ব্বসংস্কারে ভগবানের পন্থা ধরিলেন।

গুরুদেব ঠাকুর রামকৃষ্ণ আর এক দিন নরেন্দ্রের কত গুণ বর্ণনা করিতে-ছিলেন*,—"নরেন্দ্র, ভবনাথ, রাখাল, এরা সব নিত্যসিদ্ধ। এদের শিক্ষা কেবল বাড়ার ভাগ। দেখ না নরেন্দ্র কাহাকেও গ্রাহ্য করে না। আমার সঙ্গে কাপ্তেনের গাড়ীতে যাচ্ছিল—কাপ্তেন ভাল জায়গায় বস্‌তে দিলে তা চেয়েও দেখ্‌লে না। আমারই অপেক্ষা রাখে না। আবার যা জানে তাও বলে না;—পাছে আমি লোকের কাছে বলে বেড়াই নরেন্দ্র এত বিদ্বান্। ওর মায়া মোহ নাই—কোন বন্ধন নাই। খুব ভাল আধার। একাধারে অনেক গুণ,—গাইতে, বাজাতে, লিখ্‌তে পড়্‌তে;—এদিকে জিতেন্দ্রিয়, বলেছে বিয়ে কর্‌বো না। নরেন্দ্র বেশী এখানে আসে না। সে ভাল। বেশী এলে আমি বিহ্বল হই।"

ঠাকুর রামকৃষ্ণ নরেন্দ্রকে প্রধান শিষ্যের আসন দিয়াছিলেন আর তাঁরই কথা নরেন্দ্র লোকশিক্ষা দিবে। আমরা একটু আলোচনা করিব ঠাকুর রামকৃষ্ণের কি কি শিক্ষা তিনি জগৎকে জানাইয়াছেন।

---

* ১৯শে আগষ্ট ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে।

তাঁহার শিক্ষা দিবার অধিকার সম্বন্ধে আমরা আগেই কিছু বলিয়াছি—ঠাকুর রামকৃষ্ণের আদেশ "নরেন্দ্র শিক্ষা দিবেক, নরেন্দ্র ,কামিনীকাঞ্চনত্যাগী, নিত্যসিদ্ধ, ঈশ্বরের অংশ, ঈশ্বরের বিশেষ শক্তিতে শক্তিমান্। তাই নরেন্দ্র শিক্ষা দিবে।" সামান্য লোকে—গৃহস্থই হউন বা সন্ন্যাসীই হউন—যদি লোক-শিক্ষা দিতে যান তা হলে কেউ শুনে না। এ সম্বন্ধে ঠাকুর রামকৃষ্ণ কি বলেন দেখা যাউক—

"শ্রীরামকৃষ্ণ (শশধরের প্রতি)। হেঁজিপেঁজি লোকে লেকচার দিলে কোন কাজ হয় না চাপরাস থাক্‌লে তবে লোকে মান্‌বে। ঈশ্বরের আদেশ না থাক্‌লে লোকশিক্ষা হয় না। যে লোক শিক্ষা দিবে তার খুব শক্তি চাই।

* * * * *

"তোমার যদি আদেশ হয়ে থাকে তা হলে লোকশিক্ষায় দোষ নাই।"

"আদেশ পেয়ে যদি কেউ লোকশিক্ষা দেয় তাকে কেউ হারাতে পারে না।"

"বাগ্বাদিনীর কাছ থেকে যদি একটী কিরণ আসে, তা হলে এমন শক্তি হয় যে, বড় বড় পণ্ডিত কেঁচোর মত হয়ে যায়।"

"প্রদীপ জাল্‌লে বাদ্‌লে পোকা ঝাঁকে ঝাঁকে আপনি আসে—ডাক্‌তে হয় না।"

"যিনি আদেশ পেয়েছেন তাঁরে লোক ডাক্‌তে হয় না,—অমুক সময়ে লেক্‌চার হবে বলে খবর পাঠাতে হয় না। তাঁর এমনি টান * যে লোক তাঁর কাছে আপনি ছুটে আসে।"

"তখন রাজা, বাবু, সকলে দলে দলে আসে। আর বল্‌তে থাকে, আপনি কি লবেন? আম, সন্দেশ, টাকা, কড়ি, সাল, এসব এনেছি আপনি কি লবেন?"

স্বামী বিবেকানন্দ এই থাকের লোক। তাঁহার 'চাপরাস' ছিল। তিনি ঈশ্বরপ্রেরিত ও প্রত্যাদিষ্ট—তাহা না হইলে এরূপ ব্যাপার কেমন করিয়া ঘটিল। ফল দেখিলেই বৃক্ষ বুঝা যায়। স্বামীর চরিত্র আলোচনা করিলে দেখা যায় যে তাঁহার গুরুদেবের কথা ছত্রে ছত্রে মিলিতেছে।

না হইলে কথার এত শক্তি কেন? চিকাগো ধর্ম্মমণ্ডপে যেন অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া বলিলেন, হে খৃষ্টানগণ,তোমরা'আমি পাপী''আমি পাপী' অহর্নিশ এই কথা বলিতেছ কেন? তোমরা ঈশ্বর সন্তান—তোমরা সিংহ, মেষের ন্যায় ব্যবহার করিতেছ কেন? পাপ কুহক ঝেড়ে ফেলে দাও।

"Ye, divinities on earth! Sinners? It is a sin to call a man so; it is a standing libel on human nature. Come up, O Lions! and shake off the delusion that you are sheep; you are souls, immortal spirits, free and blest and eternal; ye are not matter, ye are not bodies; matter is your servant, not you the servant of matter!"

---

* টান—স্বামীজী সম্বন্ধে আমেরিকাবাসীরা বলিতেন "Wonderful personal magnetism".

একজন ইংরাজ লিখিয়াছেন যে স্বামীজীর কার্য্যকলাপ দেখিতে বোধ হয় ইনি একজন ধর্ম্মযাজক নহেন, ইনি বুঝি একজন যোদ্ধা * ।

এ বিষয়ে স্বামী গুরুদেবের উপযুক্ত শিষ্য। তাঁহার উপদেশ যে তাঁহার অস্থি-মজ্জা শোণিতপ্রবাহ মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। অথবা তিনি উত্তম অধিকারী ঠাকুর রামকৃষ্ণ সিঁতি ব্রাহ্মসমাজের ভক্তদের বলিয়াছিলেন—

"ভক্তির তিন প্রকার—ভক্তির সত্ত্ব, ভক্তির রজঃ, ভক্তির তমঃ।

"ভক্তির সত্ত্ব,—সে ধ্যান করে গোপনে, মশারির ভিতর। খাওয়া পোষাকের আড়ম্বর নাই। বাড়ীর আসবাবের জাঁকজমক নাই। সে তোষামোদ করে ধন লয় না।

"ভক্তির রজঃ।—তার হয় তো তিলক মালা আছে—রুদ্রাক্ষের মালা তার ভিতর হয় তো এক একটী সোণার দানা। সে গরদের কাপড় পরে পূজা করে।

"ভক্তির তমঃ যার হয় তার বিশ্বাস জলন্ত—ঈশ্বরের কাছে সেরূপ ভক্ত জোর করে। যেন ডাকাতি করে ধন কেড়ে লওয়া। মারো, কাটো, বাঁধো, এইরূপ ডাকাতপড়া ভাব।

ঠাকুর গান গাইলেন—

আমি দুর্গা দুর্গা বলে মা যদি মরি।
মা হোয়ে এ দীনে, না তার কেমনে,
জানা যাবে গো শঙ্করী॥
নাশি গো ব্রাহ্মণ, হত্যা করি ভ্রূণ,
সুরাপান আদি বিনাশি নারী।
এ সব পাতক না ভাবি তিলেক
(ওমা) ব্রহ্মপদ নিতে পারি॥

কি! আমি তাঁর নাম করেছি—আমার আবার পাপ! আমি তাঁর ছেলে,—তাঁর ঐশ্বর্য্যের অধিকারী! এমন রোক হওয়া চাই।"

ঠাকুর রামকৃষ্ণের এই মহান্ উপদেশ স্বামীজি ধারণা করিয়াছিলেন। "আমি অধম", "আমি অধম" অথবা খৃষ্টানদের ন্যায় 'আমি পাপী', 'আমি পাপী' বলিবার প্রয়োজন নাই। হে জীব! স্মরণ কর তুমি কে! তুমি যে অমৃতের অধিকারী; অতএব উঠ, জাগো, আপনার স্ব স্বরূপ হরিকে জানো।" এই বেদান্ত গুরু ও শিষ্য উভয়েই উপদেশ দিয়াছেন। এই অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা। 'বিষ নাই' 'বিষ নাই' বলিলে বিষ পালিয়ে যায়।

শুধু ইংরাজ সম্পাদক স্বামীজীকে 'যোদ্ধা' বলিয়া আদর করেন নাই। ঠাকুর পরমহংসদেবও ঠিক এই কথা বলিতেন। বলিতেন, 'দেখ নরেন্দ্র যেন

---

* A very remarkable religious reformer passed away at Howrah on Friday evening He was not without his calumniators, but no man ever set a better example in the way of plain living and high thinking***. His movements and actions recalled rather the warrior than the priest.—*The Englishman (editorial) 7th July, 1902.*

খাপখোলা তবোয়াল্ নিয়ে বেড়াচ্ছে।' তিনি হৃদয়দৌর্ব্বল্য দেখিতে পারিতেন না, বলিতেন, শক্তি কর, অমন (মুখ চুণ করে, গালে হাত দিয়ে) রয়েছ কেন? হৃদয় দুর্ব্বল হলে কাম ক্রোধ জয় করা যায় না, কামিনী কাঞ্চনে আসক্তি ত্যাগ করা যায় না। দুর্ব্বল লোক মহৎ কার্য্য সাধন করিতে পারে না। বৈষ্ণবদের মধ্যে 'আমি অধম' 'আমি অধম' কেহ কেহ বলে। তিনি এ ভাবকে নিন্দা করিতেন, কেন না হরিনামের ভারি মাহাত্ম্য আছে। 'কি, আমি তার নাম করেছি, আমার মত ভাগ্যবান্ আর কে আছে? আমার জিহ্বা পবিত্র হয়েছে, আমিও পবিত্র হয়েছি, তাঁর যে কালে নাম করেছি।'

তাই স্বামীর গুরুদেব বলিতেন 'রোক্ কর, সব বিঘ্ন পালিয়ে যাবে, তাঁর নামে বিশ্বাস কর, তাঁর কৃপায় হৃদয়মধ্যে তাঁকে অবশ্য দেখ্‌তে পাবে। স্বামী এই 'রোক' করে সন্ন্যাসে ঝাঁপ দিলেন, এই রোক করে হৃদয়ের অন্ধকার দূর করে আত্মার সাক্ষাৎকার করিলেন, এই 'রোক' করে আমেরিকায় গিয়ে ওজস্বিনী ভাষায়, শক্তিমন্ত্রে অনুপ্রাণিত ভাষায়, অদ্ভুত ভাষায় কথা কহিতে লাগিলেন ও লোকের মন ও হৃদয় অধিকার করিতে লাগিলেন। স্বামী মাঝে মাঝে বলিতে লাগিলেন,—

"Be strong, free yourself from weakness."

আবার বিশ্বাস,—

'Faith, faith, faith in ourselves, faith, faith in God, this is the secret of greatness"

পরমহংসদেব একটী এই ভাবের গান সর্ব্বদা গাইতেন—

গয়া গঙ্গা প্রভাসাদি কাশী কাঞ্চী কেবা চায়।
কালী কালী কালী বলে আমার অজপা যদি ফুরায়॥
ত্রিসন্ধ্যা যে বলে কালী, পূজা সন্ধ্যা সে কি চায়।
সন্ধ্যা তার সন্ধানে ফিরে, কভু সন্ধি নাহি পায়॥

এর নাম 'ভক্তির তমঃ'—ডাকাতে ভক্তি। ঠাকুর ভক্তদের বলিতেন, 'ভক্তির রজঃ', 'ভক্তির সত্ত্ব', এদের দ্বারা তো ঈশ্বরকে পাওয়া যায়। কিন্তু ভক্তির তমঃ হলে শীঘ্র পাওয়া যায়। বাজে ঘণ্টা কতকের মধ্যে ধন সব লুটে লওয়া যায়।

স্বামী গুরুদেব ঠাকুর রামকৃষ্ণের অনেকগুলি ভাব জগৎকে প্রদান করিয়াছেন। ধর্ম্মের উদ্দেশ্য ঈশ্বর দর্শন, সকল ধর্ম্ম—হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈব—সকল ধর্ম্মই সত্য, পথ বিশেষ ঈশ্বরের কাছে লইয়া যায়, সাকার নিরাকার দুইই সত্য; জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, কর্ম্মযোগ, সব পথ দিয়াই ঈশ্বরের কাছে পঁহুছান যায়—তবে অধিকারিভেদ আছে; এ সকল বিষয় সম্বন্ধে স্বামী কি বলিয়াছেন ও তদ্দ্বারা জগতের কি মহৎ উপকার করিয়াছেন, আর বিশেষতঃ কামিনী কাঞ্চন ত্যাগ করিয়া শিক্ষা দেওয়াতে শিক্ষাকার্য্য কত দূর সহজ হইয়াছে ও গ্রহণযোগ্য হইয়াছে এ সব কথা পরে বলিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীম—

আরতি।

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনা।

তৃতীয় বর্ষ।] ময়মনসিংহ, অগ্রহায়ণ, ১৩০৯। [৬ষ্ঠ সংখ্যা।

কুহেলিকা।

উন্মুক্ত প্রকৃতির সলজ্জ শুভ্র অবগুণ্ঠনের ন্যায় প্রভাতী উষায় ও সন্ধ্যার ম্লান গোধূলি লগ্নে তোমার সহিত আমাদের শুভদৃষ্টি ঘটিয়া থাকে। তপনদেব সারারজনীর সুচির-বিরহে অধৈর্য্য হইয়া বারিধিবক্ষে স্নানান্তে পূর্ব্বগগনের কক্ষ-দ্বারে স্বীয় বদনমণ্ডল অনত্যুজ্জ্বল কিরণমালায় উদ্ভাসিত করিয়া যখন প্রকৃতি দেবীর মুখাবলোকনের নিমিত্ত প্রস্তুত হন, তখন তুমি তাঁহার এত সাধে বাদ সাধিয়া থাক। দেখিয়া দেব অংশুমালী ক্রমেই ক্রোধে রক্তবর্ণ হইতে থাকেন, তখন আর তাঁহার মুখের দিকে চাওয়া যায় না; ভয়ে তুমি জড়সড় হইয়া অশ্রুকণার ন্যায় ঝরিয়া ঝরিয়া শ্যাম দূর্ব্বাদল ও হরিৎ বৃক্ষরাজি আর্দ্র করিয়া দাও, তাহাতেও যেন সহস্রকিরণের আক্রোশ প্রশমিত হয় না, তিনি পত্রপুট-স্থিত সেই স্ফটিকোজ্জ্বল নীহারবিন্দুগুলিকে স্বীয় কিরণমালা দ্বারা অনেকক্ষণ দগ্ধ করিয়া অবশেষে একেবারে বিশুষ্ক করিয়া ফেলেন। তখন নিরবগুণ্ঠন প্রকৃতির উন্মুক্ত বদন ও অতুল রূপ দর্শন করিয়া অরুণদেব হাস্যোৎফুল্ল হইয়া উঠেন। সূর্য্যদেব থিসিউসের ন্যায় অসহিষ্ণু ও পাশ্চাত্য প্রণয়ী, তাঁহার হিপলিটার সদৃশী তেজোদৃপ্তা তমোভাবপ্রবলা প্রণয়িনীর প্রয়োজন, কুসুমপেলব লজ্জাভারা-নতা প্রতীচ্য প্রেমিকা তাঁহার অসংখ্য ভালবাসার তীব্রতা ধারণে অক্ষম। কিন্তু ভোগেরও একটা সীমা, প্রবৃত্তির একটা নিবৃত্তি আছে,—প্রেমের তীব্র-তার সহিত তাহার স্থায়িত্বের বিপরীত অনুপাতই দৃষ্ট হয়—তাই সূর্য্যদেবও শীঘ্রই ক্লান্ত হইয়া পড়েন, তাঁহার সে তীব্রতা, তেজ ও স্মিতমুখ প্রেমের শোচ-নীয় অবসাদগ্রস্ত * হইয়া নিবিড় সান্ধ্যতিমিরে একেবারে মিলাইয়া যায়।

* 'Love's Sad Satiety'—*Shelly*.

এইরূপে যখন শ্যামায়মান তরুশ্রেণীর উপর সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসে, তখন পুনরায় তোমার শুভ্র পবিত্র বসনটি লইয়া প্রকৃতির নগ্ন বদনমণ্ডলে তুমি একটি নাতি স্বচ্ছ অবগুণ্ঠন টানিয়া দাও, তাহাতে প্রকৃতিদেবীকে আরও কত মনোহর দেখা যায়।

ভগবান্ মরীচিমালী তোমার প্রতি এবম্বিধ অপ্রসন্ন থাকিলেও শশধরের সহিত কিন্তু তোমার চিরসৌহার্দ্দ। কারণ তুমি ও শশাঙ্ক একই প্রকার সৌন্দর্য্য ভালবাস। তোমরা উভয়েই নগ্নসৌন্দর্য্যের বৈরী। স্বল্প আবরণের অন্তরাল হইতে যে সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠে, পূর্ণবিকসিত-সৌন্দর্য্য-অপেক্ষা তাহাই যেন তোমাদের উভয়ের অধিকতর প্রিয়। সেই হিসাবে ফুলে ফুলে ভরা ঢলঢলদেহা যুবতী অপেক্ষা সলজ্জা অর্দ্ধপ্রস্ফুটিতা কিশোরী তোমাদের প্রিয়, প্রেমরহস্যা-ভিজ্ঞা গৃহিণী অপেক্ষা অজ্ঞাতপ্রণয়া নববধূ প্রিয়, বিকশিত পত্র পুষ্প অপেক্ষা অর্দ্ধমুকুলিত কোরক প্রিয়, উজ্জ্বল বর্ণসম্পাত অপেক্ষা কোমল রেখাপাত প্রিয়, তৈলচিত্র অপেক্ষা জলচিত্র প্রিয়, চিত্রের প্রোজ্জ্বল সম্মুখ ভাগ অপেক্ষা অস্পষ্টালোকিত পশ্চাদ্ভাগ প্রিয়। পূর্ণ আলোক তোমরা সহিতে পার না, সূর্য্যের প্রখর-আলোকে তুমি ও সুধাংশু উভয়েই অদৃশ্য হইয়া যাও, একটু অস্ফুটালোক, একটু আঁধার, একটু আব্ছায়া, একটু স্নিগ্ধ কোমলতা, ইহা আশ্রয় করিয়া থাকিতেই তোমরা ভালবাস। এ বিষয়ে তোমাদের সহিত আমার,—আমার কেন, সমগ্র ভারতীয় প্রকৃতিরই বেশ একটু সাদৃশ্য আছে। ভারতবাসীর স্বভাবটাই একটু কবিত্বময়, সে তোমারই মত পূর্ণালোক-সহনে অক্ষম, সে চিরকালই একটু ছায়া, একটুঅস্পষ্টালোক, একটু কোমলতা ভালবাসে,স্বপ্নরাজ্যে বিচরণে তাহার একটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি আছে,কল্পনা তাহার ভাবরাজ্যের উপর চিরাধিপত্য করিতেছে। এইজন্য ভারতীয় দর্শন কল্পনা ও ভাবরাজ্যের চরমসীমা স্পর্শ করিয়াছে। ভারতে কালিদাস ও বঙ্গে বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস জন্মিয়াছে, পারিবারিক স্নেহমমতায় ও বৈষ্ণব-কবির কুসুম কোমল ভক্তি-প্রেমে বঙ্গীয় গৃহরাজি নিরন্তর অভিসিঞ্চিত হইতেছে। কিন্তু হায়! এই কবিত্বময়ত্বই আবার আমাদের সর্ব্বনাশের হেতু হইয়াছে। উহা বর্ত্তমান যুগের তীব্র জীবনসংগ্রামের পক্ষে আমাদিগকে একান্ত অনুপযুক্ত করিয়া তুলিয়াছে। বৈজ্ঞানিক স্পষ্টালোক সহনাক্ষম আমাদের চক্ষু অজ্ঞানতিমিরে নিমজ্জিত রহিয়াছে, আমরা নিরুদ্যম ও নিশ্চেষ্ট হইয়া অলস অবসাদে কোন প্রকারে জড়-ভরতের ন্যায় দিনযাপন করিতেছি।

কিন্তু এখানে একটি কথা বলিয়া রাখি, বাস্তবিক যে উচ্চ ধারণা ও ভাব-সমূহের স্বরূপনির্ণয় জগতের সৃষ্টি হইতে অদ্য পর্য্যন্ত সভ্যজাতিসমূহের শ্রেষ্ঠ মনীষীদিগের ধ্যান ধারণা চিন্তা ও রচনার বিষয়ীভূত এবং মানবজীবনের চরম লক্ষ্যস্বরূপ পরিগণিত হইয়াছে, সেগুলি কুহেলিকা। তোমারই মত অস্পষ্ট ও রহস্যময়। বৈজ্ঞানিক পুঙ্খানুপুঙ্খতার সহিত এ পর্য্যন্ত কেহ ত হাদের মীমাংসা করে নাই বা করিতে পারে নাই, আবহমান কাল হইতেই তাহারা মানবজাতির পাণ্ডিত্য, গবেষণা, জ্ঞান, বিজ্ঞান, ধর্ম্মকে আকৃষ্ট ও মহাত্মাগণের চিত্তের উপর আধিপত্য করিয়া আসিতেছে, কিন্তু ধ্যানমগ্ন যোগী ও প্রতিভাসম্পন্ন কবি তাঁহাদের স্বাভাবিক অন্তর্দৃষ্টির আকস্মিক স্ফুরণে তৎসম্বন্ধে মানবজাতিকে যতটুকু জ্ঞানালোক প্রদান করিয়াছেন, পণ্ডিতদিগের কষ্টকল্পনায় আমাদের তদতিরিক্ত কিছু লাভ হইয়াছে কিনা সন্দেহ। বৈজ্ঞানিক পুঙ্খানুপুঙ্খতার অভাব সত্বেও ধ্যানপ্রসূত প্রতিভা-বলে জীবনের কুহেলিকাময় চরম লক্ষ্য সমূহের অস্পষ্টান্ধকার কিয়ৎ পরিমাণে ভেদ করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই ভারতের প্রাচীন মহর্ষিগণ জগতে এতদূর প্রাধান্যলাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, এবং তাহারই স্মৃতির উদ্রেক দ্বারা আজিও এহেন অধঃপতনের দিনে আমরা আমাদিগকে সভ্যজগতে গৌরবান্বিত বলিয়া পরিচিত করিতে সাহসী হইতেছি।

যাউক্, কি বলিতে কোথায় আসিয়া পড়িয়াছি। বাস্তবিক শরচ্চন্দ্র যখন আবিষ্কৃত চারুতার নীলাকাশ হইতে শ্যামধরণীর উপর তাঁহার স্নিগ্ধ রজত-কিরণ-জাল বর্ষণ করিতে থাকেন, তখন প্রকৃতি দেবী তোমার তরল আবরণ ভেদ করিয়া শুভ্র পুলকে স্মিতমুখ বিকশিত করিয়া যে মনোমোহন রূপ প্রকটিত করেন, তাহাতে মুগ্ধ হয় নাই এরূপ জীব নিতান্তই কৃপাপাত্র তখন তোমার সেই নাতিঘন শুভ্র আবরণ শশাঙ্কাবগুণ্ঠন শ্বেতাভ্রের সহিতই তুলনীয় এবং তাদৃশ মনোভিরাম। আবার প্রকৃতি যখন শীতে কম্পান্বিতকলেবর হইয়া বিগলিতপত্র শীর্ণদেহ লইয়া আড়ষ্টবৎ থাকে, তখন তুমি তোমার স্বচ্ছ আবরণ পুরু করিয়া তাহার অঙ্গ উত্তমরূপে আবৃত করিয়া রাখ, সূর্য্যদেবও তখন তোমাকে পরাজিত করিতে পারেন না, কেবল তোমাকে বেশী করিয়া কাঁদাইতে পারেন মাত্র,—বহু সাধ্যসাধনা ব্যতীত তুমি তাঁহার নিকট প্রকৃতিদেবীর আবরণ উন্মোচন কর না। প্রকৃতির সহিত তোমার এতই সখ্য, এতই প্রণয়, এতই মাখামাখি।

কুহেলিকা, তোমার সহিত একটু বিষাদ, একটু গাম্ভীর্য্য, একটু পবিত্রতার

ভাবও বিজড়িত। বালার্ক-কিরণে তোমার অশ্রুবিন্দুসমূহ মুক্তাফলের ন্যায় তরুশিরে ঝলসিতে থাকে, ও প্রভাত-সমীর-সংস্পর্শে নিঃশব্দে ঝরিয়া পড়ে। অন্ধকার চিরকালই দুঃখের সহিত তুলনীয়, এবং বিষাদব্যঞ্জক। কিন্তু তোমার অন্ধকার ত সেরূপ গভীর, পঙ্কিল, নিবিড় অন্ধকার নহে। সে যে শুভ্র, স্বচ্ছ, তরল অন্ধকার। সুতরাং তোমার সহিত বিষাদের ভাব বিজড়িত থাকিলেও তুমি চিত্তে বিমল পবিত্রতা আনয়ন করিয়া থাক,—এজন্য তুমি ধন্য-বাদার্হ। তোমার এই বিষাদময় ভাবটির জন্যই আবার তুমি অধিকতর কবিত্ব-ময়ী। তোমাকে দেখিলে হৃদয়ের যত অর্দ্ধস্ফুট সৌন্দর্য্যরাশির বেদনাময়ী স্মৃতি জাগিয়া উঠে, কেমন একটি কোমল, শুভ্র, সংযত ভাবে হৃদয় আর্দ্র হইয়া যায়, সুতরাং প্রাণের অন্তর্নিহিত কবিতা ও ভাবের উৎস খুলিয়া যায়, অথচ অনুভূতির গভীরতা প্রযুক্ত ভাষা নীরব হইয়া পড়ে। তোমার বিষাদময় আব-রণের অন্তরালে আমরা যে স্মিত হাস্যটুকু দেখিতে পাই, তাহা কোমল প্রেমি-কাবদনে দূরাগত মিলনস্মৃতির ন্যায়, নীহারস্নাত ফুল্লযূথিকা কুসুমোপরি ভ্রমর-গুঞ্জনের ন্যায় সংযত অথচ মধুর, স্নিগ্ধ কিন্তু গম্ভীর। তোমার এই গাম্ভীর্য্যই তোমার পবিত্রতা সংযম ও কবিত্বময়ত্বকে আরও প্রস্ফুট করিয়া তোলে। তোমার ঘনশুভ্রকণারাশি দেখিলে স্বতঃই মনে হয় কত শত ভাবপ্রবাহ উহার মধ্যে ঘনীভূত হইয়া রহিয়াছে, তাহা এত সূক্ষ্ম, এত ক্ষণভঙ্গুর, এত Ethereal যে বালার্ক-কিরণ অথবা মৃদুসমীরণ স্পর্শেই ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে, সুতরাং তাহা কেবল হৃদয়ে অনুমেয়, বাক্যে প্রকাশ্য নহে।

কঠোরতা তোমার একেবারেই অসহ্য, এজন্যই বোধ হয় গ্রীষ্মের খর-করজালে তুমি অদৃশ্য হইয়া যাও। কোমলতায়ই তোমার প্রাণ, প্রভাত ও সন্ধ্যার অস্ফুট মৃদু আলোকে, শীতের ম্লান রশ্মিতে এজন্যই তোমার বিকাশ। আর গ্রীষ্মকালে ত আমাদের দেশে অবগুণ্ঠনও অসহনীয় হইয়া উঠে, তোমার সহিত প্রকৃতির বড়ই ভাব কি না, তাই তুমি তাহার কষ্ট দেখিয়া তখন দয়া করিয়া তাহার অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিয়া দাও। শীতপ্রধান দেশ সমূহে গ্রীষ্মের তেজ এত প্রখর নহে। সুতরাং তুমি তথায় একেবারে প্রকৃতিকে ছাড়িয়া প্রস্থান কর না।

অস্ফুট উষায় ও ধূসর সন্ধ্যায় যখন তুমি গগনপটে ঊর্দ্ধাধঃভাবে বিলম্বিত হইয়া নবনয়নগোচর হও, তখন কি তুমি কেবলই নিরর্থক তোমার রূপ দেখা-ইয়া থাক, জগতে কোন সুমহান্ কল্যাণকর নীতি প্রচার কি তোমার শুভ

উদ্দেশ্যনিহিত থাকে না? থাকে বই কি। আমি যেন উহাতে অনন্ত ও সান্তের, ইহকাল ও পরকালের, ভূমা ও অল্পের, স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের নিকটত্ব অভিব্যক্ত দেখিতে পাই। জীবাত্মার অনধিগম্য, অপ্রাপ্য, অদৃশ্য কিছুই নাই, জীব হতশ্বাস না হইয়া দৃঢ়তার সহিত সাধন করিলে বিশ্বজগতের অনন্ত, অজ্ঞাত রহস্যও যে অতি নিকটে টানিয়া আনিতে পারে, মধ্যে কুহেলিকার ন্যায় একটি স্বচ্ছ আবরণ ব্যবধান থাকে মাত্র,—ইহাই উহার প্রতিপাদ্য। পূজনীয় আর্য্য ঋষিগণের মতে এই আবরণ উন্মোচন করাও একেবারে অসম্ভব নহে, যদিও কোটি কোটি মানবে একজন তাদৃশ সিদ্ধিলাভে সক্ষম। ইহারই নাম মুক্তি। যখন জ্ঞান-সূর্য্যের প্রখর আলোকে মায়া-কুহেলিকা নিঃশেষে বিদূরিত হয়, মানব তখনই সেই পরমার্থ মুক্তি লাভ করিয়া অনন্তের সহিত এক হইয়া যায়। জীবের এই উচ্চ লক্ষ্য কল্পনা করিলেও মানবজীবনের দায়িত্ব ও মহত্ত্ব ভাবিয়া চিত্ত পুলকিত ও মন উন্নত হয়, আমরা আমাদের মহান্ পরিণতি স্মরণ করিয়া অধিক সৎকার্য্যক্ষম হইয়া উঠি। অতএব কুহেলিকা, তুমি যে শিক্ষা দাও তাহা অতি মহতী শিক্ষা, এই শিক্ষা আমাদের ক্ষমতার নীচতা ও লক্ষ্যের উচ্চ তার মধ্যে ব্যবধান ঘুচাইয়া দেয়, এই আশ্বাসবাণী দ্বারা অনুপ্রাণিত না হইলে যে মহান্ লক্ষ্য ধরিয়া মানব জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে তাহার দুরধিগম্যতা অবলোকন করিয়া পদে পদেই তাহাকে হতাশ্বাস হইয়া নিবৃত্ত হইতে হইত। ইহার বলেই সে পুনঃ পুনঃ স্খলিতপদ হইয়া পতন হইতে রক্ষিত হইতেছে।

একটি সুমধুর কবিতা, সুললিত সঙ্গীত, অথবা সুন্দর মুখ যেমন দৃষ্টতঃ আমাদের কোন ব্যবহারিক উপকার সাধন না করিলেও মানবজীবনের রমণীয়তা ও বিচিত্রতা বর্দ্ধনপূর্ব্বক উহাকে সর্ব্বাঙ্গমনোহর ও সুভোগ্য করিয়া তুলিয়া আমাদের কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন ও স্বীয় অস্তিত্বের সার্থকতা সম্পাদন করে, সেইরূপ প্রাতঃসন্ধ্যা তোমার ভাবময়ী মাধুরী অবলোকন করিয়া আমাদের মন অলক্ষ্যে সুখাদ্য সঞ্চয় করিতে থাকে, তাহার বলে আমাদের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যজ্ঞান, ভাবুকতা, ঈশপ্রীতি প্রভৃতি উন্নত ভাবরাশি বিকশিত হইয়া উঠে, আমরা সহজে আত্মোৎকর্ষের একস্তর উচ্চে আরোহণ করিতে সক্ষম হই।

তোমার নামটিও কি অতিশয় মধুর নহে? বাস্তবিক যে তোমার এরূপ ললিত মনোহর নামকরণ করিয়াছে সে নিশ্চয়ই কবি, এবং তাহার স্বাভাবিক সৌন্দর্যবোধ ও শব্দের সহিত ভাবের সমন্বয়-জ্ঞান বিচিত্র। এ বিষয় বিশদ ভাবে ব্যাখ্যা অসম্ভব, ভাবুক হৃদয়ের অনুভূতিই ইহার বিশিষ্ট প্রমাণ।

কুহেলিকা, তোমার একটি কঠোর ভাবও আছে, কিন্তু তোমাকে সে ভাবে পর্য্যালোচনা করিতে ভালবাসি না। জগতের সকল পদার্থই সুখ দুঃখ-বিমিশ্রিত, কোমলতা-কঠোরতা-বিজড়িত, সু কুভাবাপন্ন। নির্দ্দোষ মনুষ্য কে কবে দেখিয়াছে? একই মনুষ্যের অন্তঃকরণে সুমতি ও কুমতি কিরূপে পর্য্যায়ক্রমে আধিপত্য লাভ করে, তাহা ষ্টিভেনসন্ তাঁহার উপন্যাস Dr. Jeykill and Mr. Hydeএ বিশদরূপে দেখাইয়াছেন। যে অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান প্রভুদিগকে স্বজাতীয় মহিলাদিগের সম্পর্কে সৌজন্য ও কোমলতাপূর্ণ দেখিতে পাই, দেশীয় মহিলাগণ তাঁহাদের হস্তেই অনেক সময় অকথ্য গঞ্জনা সহ্য করেন। সত্য বটে, অনন্ত ভীষণ বারিধিবক্ষে যখন তুমি তোমার দুর্ভেদ্য আবরণ বিস্তৃত করিয়া থাক, তখন বিপন্ন নাবিক পোতমধ্য হইতে ঘন ঘন বিপদসূচক তোপধ্বনি করিতে থাকে, তোমার আবির্ভাবে তাহার প্রাণের শোণিত শীতল হইয়া যায়। সত্য বটে, তোমার সেই রুদ্র সংহারমূর্ত্তির মধ্যে আমরা যেন একটু কপটতা লুক্কায়িত দেখিতে পাই। মেঘমেদুর অম্বরের ঘন ঘন বিদ্যুচ্ছটা ও অশনিসম্পাত, ঝটিকাবিক্ষুব্ধ সাগরের বিপুল তরঙ্গগর্জ্জনে যে বিপদাশঙ্কা আছে, তাহা যদিও নাবিকচিত্তে তুল্যরূপই ভীতিসঞ্চার করে, তথাপি তাহা সুস্পষ্ট প্রকাশিত, বাহ্যচিহ্ন অবলোকন করিয়া আমরা সম্পূর্ণরূপে তাহার প্রকোপ অনুমান করিতে সক্ষম। কিন্তু তোমার ঘনাবরণ অম্বুনিধির স্বাভাবিক বিপদগুলিকে আরও ভীতিজনক করিয়া তোলে, একটি অনির্দ্দিষ্ট অজ্ঞাত অভূতপূর্ব্ব আশঙ্কায় যেন নাবিকের চিত্ত অতিমাত্র চঞ্চল হইয়া উঠে, যেহেতু পরমুহূর্ত্তেই তাহার ভাগ্যে কি ঘটিবে তাহা অনুমানে সে অক্ষম হইয়া পড়ে। কিন্তু তোমার সেই কুটিল ভ্রূভঙ্গি আলোচনায় প্রয়োজন নাই, আমরা তোমার অপর কবিত্বময়ী মূর্ত্তি কল্পনা করিতেই অধিকতর আনন্দ বোধ করি। 'সজ্জনাঃ গুণমিচ্ছন্তি দোষমিচ্ছন্তি পামরাঃ,' কুলোকেই দোষোদ্ঘাটনে পটু, সুলোক সে দিকে না গিয়া গুণের দ্বারাই আকৃষ্ট হন। আমরাও তাদৃশ সন্মার্গানুগামী হইয়া অদ্য তোমার প্রকৃতির অনুশীলন করিলাম, ভরসা করি এতদ্দ্বারা পাঠকবর্গ আমাদের ন্যায় ক্ষণকাল বিমল কাব্যামোদ উপভোগে সক্ষম হইবেন।

শ্রীজ্ঞানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

গর্ব্বিত প্রেমিক।

গর্ব্বিত প্রেমিক, করিয়াছ মনে,
আপনারে লয়ে থাকিবে একা,
কোথায় শিখিলি, হায় রে অবোধ,
বর্ণে বর্ণে যার অমৃত লেখা।
প্রেম, প্রেম, এই যুগল মন্ত্রেতে
সদা চিরদিন জগৎ সাধা,
প্রেম দুটী বর্ণ পুরুষ প্রকৃতি
একার্দ্ধে শঙ্কর পার্ব্বতী আধা।
তুমি কি তোমার, হায়রে অবোধ
আপনা কি তোর কোথায় আছে?
চির দীন হীন অনন্ত ভিক্ষুক,
চিরঋণী তুমি সবার কাছে।
প্রতি ঘরে ঘরে, ভিক্ষা ঝুলি করে,
বেড়ায় না ঘুরে কাহার নাচে—
তবে, কিসের গরবে, র'তে চাস্ দূরে—
তোর বিক্রীত আপনা পরের কাছে।

অগ্নিমন্থন।

একবার সেই দিন কল্পনা করুন, যে দিন আদিম মানব ভূগর্ভনিহিত অগ্নি উদ্গীর্ণ হইতে দেখিয়াছিল, যে দিন বজ্রনির্ঘোষের সঙ্গে সঙ্গে উচ্চ বৃক্ষচূড়া দগ্ধ হইতে দেখিয়াছিল, কিংবা পবনতাড়িত বৃক্ষশাখাদ্বয়ের পরস্পর ঘর্ষণে অগ্নি প্রজ্বলিত হইতে দেখিয়াছিল। আবার কল্পনা করুন, বন্য মানব অরণিমন্থনে অগ্নি উৎপাদন করিতেছে, কঠিন প্রস্তরের প্রবল আঘাতে স্ফুলিঙ্গ নির্গত করিতেছে।

ইহাদের সহিত চিন্তা করুন, শলাকার আকারে অগ্নি কাঠের বাক্সের মধ্যে লুক্কায়িত আছে, এবং তদবস্থায় হাতে হাতে, বস্ত্রের মধ্যে যেখানে সেখানে

নীত হইতেছে। কিংবা ইদানীন্তনের বোতলে আবদ্ধ বজ্রাগ্নি দাসের ন্যায় প্রভুর আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া সর্ব্বদা প্রস্তুত আছে।

প্রাচীন মানব হইতে বর্ত্তমান সভ্য মানবের কি আকাশ পাতাল অন্তর! কি উচ্চ উচ্চ সোপান আরোহণ করিয়া প্রাচীন মানব সভ্য মানবে পরিণত হইয়াছে। ভাবুন দেখি, সেই আদিম মানবের প্রথম অগ্নিদর্শন তাহার জীবনের কি এক স্মরণীয় ঘটনা হইয়াছিল, কত বিস্ময় কত ভয় তাহার হৃদয়কে আপ্লুত করিয়াছিল।

কোন্ বুদ্ধিমান্ বন্য মানব দুই বস্তুর ঘর্ষণে তাপ অনুভব করিয়াছিল, কোন্ কুতুহলী সেই তাপকে অগ্নিরূপে আবির্ভূত করিতে চেষ্টা করিযাছিল! এমন নির্জ্জীব অসাড় শীতলস্পর্শ কোমল পদার্থে, এ কি ভয়ঙ্কর শক্তি নিহিত রহিয়াছে সেই বৃক্ষ, যাহা চারি পাশে অগণ্য দাঁড়াইয়া আছে, যাহাকে লইয়া কত ক্রীড়া কৌতুক করা গিয়াছে, সেই বৃক্ষের অন্তরালে এ কিপদার্থ! ইহার প্রবল শক্তির নিকট মানব ত কিছুই নয়! অরণ্যের এক পার্শ্বে সেই শক্তি হঠাৎ আগমন করিয়া উন্নত মহীরুহ, বিশাল স্থুল লতা, তৃণ গুল্ম, পশু পক্ষী—সমুদয় অরণ্যানী ভস্মসাৎ করিযা ফেলে! বহুকালের অরণ্যের পরিবর্ত্তে শেষে কিঞ্চিৎ মৃত্তিকা ফেলিয়া যায়!

ইতর প্রাণী ও অসভ্য মানবের মধ্যে বহু বিষয়ে প্রভেদ আছে, সত্য; কিন্তু এ কি প্রভেদ যাহা অদ্যাপি কোন ইতর প্রাণী লোপ করিতে পারে নাই। চিরদিনই অগ্নি ইতর প্রাণীর নিকট আতঙ্কের কারণ; কিন্তু বন্য মানবও তাহাকে জন্মাইতে পারে, মারিতে পারে। ইচ্ছা করিলেই যাহাকে জন্মাইতে ও মারিতে পারা যায়, তাহা নিশ্চিত তুচ্ছ পদার্থ। মানবের এই ক্ষমতা তাহাকে অপর সকল জন্তু হইতে পৃথক্ করিয়াছে। জীববিজ্ঞানে মানবের লক্ষণ খুঁজিয়া পাই না; অগ্নিবিজ্ঞানে তাহার লক্ষণ দেখিতে পাই। মানব অগ্নি-উৎপাদনকারী জীব।

প্রকৃতির উপরে মানবের আধিপত্য, তাহার এই ক্ষমতার গুণে হইয়াছে। কোন্ প্রবীণ কৌতুকাবিষ্ট মানব দগ্ধ অরণ্যভূমিতে প্রস্তরের বিকার দেখিয়াছিল। এ কি পাথর, যাহা অগ্নিতে দ্রব হইয়া যায়; অগ্নির এ কি ক্ষমতা, যে কঠিন প্রস্তরও অন্যরূপ ধারণ করে। যাঁহারা নিবিষ্টচিত্তে নররূপী বানরের বা বনমানুষের কৌতুক দেখিয়াছেন, তাঁহারাই স্বীকার করিবেন তাঁহাদের কৌতুহল শীঘ্র নিবৃত্ত হয় না। বন্য মানবেরও কৌতুহলে প্রস্তর হইতে লৌহের উৎপত্তি

হইয়াছিল। কিন্তু সে কি দিন, যে দিন বন্য মানব লৌহের অস্ত্র নির্ম্মাণ করিল; যে দিন পাষাণের অস্ত্র লৌহাস্ত্র দ্বারা বিদীর্ণ হইতে লাগিল; যে দিন বন্য বৃক্ষ বন্য জন্তু সেই অস্ত্রের আঘাতে ধরাশায়ী হইতে লাগিল। সেই দিন সভ্য শিশুর জন্ম।

বৈদিক সাহিত্যে ও পুরাণে অগ্নির প্রতি যে সম্মান প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা হইতে দুইটি চিন্তা মনে আসে। বৈদিক ঋষিগণের নিকট অগ্নি এক গূঢ় রহস্যময় বস্তু ছিল, এবং তাঁহারা অগ্ন্যুৎপাদন অনায়াসসাধ্য বিবেচনা করিতেন না। এমন অগ্নি—যাহার বাস বিদ্যুতে, সূর্য্যের কিরণে, দীপের শিখায়; ইন্ধনে যাহার ক্ষয় না হইয়া বৃদ্ধি হয়—সে অগ্নি নিশ্চয়ই অজ্ঞেয় দুর্জ্ঞয় দেববিশেষ হইবেন। ইন্দ্র কোথায় কোন্ মেঘের অন্তরালে লুক্কায়িত থাকেন, কে জানে; কিন্তু তাঁহার অস্ত্র আমাদের বিনাশ সাধন করে! কোথায় কি সেই দুর্নিরীক্ষ্য গোল পিণ্ড; যাহার করস্পর্শে জলস্থল শুষ্ক হইয়া যায়, সূর্য্যকান্ত অগ্নি বমন করিতে থাকে! এ কি বস্তু যাহার লক্ লক্ সপ্তজিহ্বা স্পর্শে চরাচর দগ্ধ হইয়া যায়! এইরূপ চিন্তাতেও যদি সরলস্বভাব ঋষিগণ মুগ্ধ না হইবেন, তাহা হইলে তাঁহারা মনুষ্যপদবাচ্য ছিলেন না। এই জন্যই বোধ হয় তাঁহারা অগ্নিরক্ষায় এত মনোযোগী হইয়াছিলেন। এখানেই দেবগণ মানবের দৃশ্য হন; এইখানেই তাঁহাদিগের নিকট আশা আকাঙ্ক্ষা জানাইতে পারা যায়।

অগ্নিরক্ষার আরও এক কারণ ছিল। বৈদিক সাহিত্য আলোচনা করিলে স্পষ্ট প্রতীতি হয় যে, ঋষিগণ অত্যন্ত শীতল প্রদেশে বাস করিতেন। সে প্রদেশে শীতও যেমন, ঘোর বর্ষাও তেমন। সে বর্ষা এমন যে, তাহা বর্ষ গণিবার উপায়স্বরূপ হইয়াছিল। এমন শীত যে, অগ্নিহোত্রী হইতে হইয়াছিল। এই শীতাতিশয্য বশতঃ কাশ্মীরের শ্রমজীবীরা স্ব স্ব বক্ষঃস্থলে অগ্নিপাত্র ঝুলাইয়া রাখে। মনুর সময়েও শীত নিবারণার্থ কম্বলদানের ব্যবস্থা ছিল। যাঁহাদিগকে শীতের সহিত সংগ্রাম করিতে হয়, তাঁহারা দিবারাত্র অবশ্য অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া রাখেন। ইহার অন্যথা অস্বাভাবিক। দেশবিশেষের লোকেরা যদি অগ্নির উপাসক হইয়াছিল, তাহারা প্রকৃতির কঠোরতায় বাধ্য হইয়াই হইয়াছিল।

আধুনিক জড়বিজ্ঞানও অগ্নির ধ্যান করে, কিন্তু স্বরূপ জানিতে পারে নাই। ইহারও নিকট অগ্নি গূঢ় রহস্যপূর্ণ। সূর্য্য হইতে সেটা কি আসে, যেটা আমাদের ত্বকের মধ্যস্থিত বাত-নাড়ীতে বিপ্লব উপস্থিত করে, সেটা ঘর্ষণে

জাত হয়, বিদ্যুৎ হইতে বহির্গত হয়, দুই বস্তুর নৈকট্যে প্রকাশিত হয়। নিরর্থক শব্দের আড়ম্বরে বিড়ম্বিত না হইলে অগ্নি অদ্যাপি অজ্ঞাত; বোধ করি, অজ্ঞেয়ই থাকিবে।

কখন কখন ঋষিদিগের অগ্নি হারাইয়া যাইত। তখন তাঁহাদের মনে কত ভাবনা, কত আশঙ্কা উদিত হইত। তখন আবার অগ্নির সন্ধান করিতে হইত। গ্রীক পুরাণে আছে, প্রথম মানব সুখে শান্তিতে জীবন অতিবাহিত করিতেছিল। তখন বসন্তকাল চিরকাল বিরাজ করিত; শীত ছিল না, অগ্নি আবশ্যক হইত না। কুক্ষণে প্রমন্থ (Promethens) অগ্নি আবিষ্কার করেন। তদবধি মানবের অধঃপাতন ও চিন্তার কারণ হইয়াছে। কোন গ্রীক পুরাণে, তিনি স্বর্গ হইতে অগ্নি অপহরণ করিয়া মর্ত্ত্যগণকে দান করিয়াছিলেন। তদবধি মানবগণ শিল্পকার্য্য করিতে শিখিয়াছে।

আমাদের পুরাণেও অগ্নির অন্তর্ধানের কথা আছে। বায়ু পুরাণে* এ বিষয়ের একটি সুন্দর আখ্যান আছে। উর্বশী ও পুরুরবার প্রণয়-কাহিনী চিরপ্রসিদ্ধ। উর্বশীলাভে বঞ্চিত হইয়া পুরুরবা কাতরোক্তি করিলে উর্বশী তাঁহাকে গন্ধর্বগণের নিকট বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন। তদনুসারে রাজা গন্ধর্বদিগের নিত্য সালোক্য প্রার্থনা করিলেন। উদ্দেশ্য এই যে, গন্ধর্বলোকে থাকিতে পারিলে উর্বশীসঙ্গ লাভ ঘটিতে পারিবে। গন্ধর্বেরা রাজাকে অগ্নি-পূর্ণ এক স্থালী দিয়া সেই অগ্নি দ্বারা যজ্ঞ করিতে বলিলেন। রাজা সেই অগ্নি অরণিতে নিক্ষেপ করিয়া গৃহে প্রত্যাগত হইলেন। কিন্তু কিছুদিন পরে দেখিলেন, অরণিতে অগ্নি নাই, তৎস্থানে এক অশ্বত্থ বৃক্ষ জন্মিয়াছে। ইহাতে তিনি বিস্মিত হইয়া গন্ধর্বদিগকে জানাইলেন। তাঁহারা সমুদয় বার্ত্তা শুনিয়া বলিলেন, অশ্বত্থের অরণি করিয়া যথাবিধি অগ্নিমন্থন কর।

এই আখ্যান হইতে বোধ হয় গন্ধর্বেরা অগ্নি উৎপাদন করিতে জানিতেন, এবং তাঁহারাই মর্ত্ত্যজনকে অগ্নি ও অগ্ন্যুৎপাদন বিদ্যা দান করিয়াছিলেন। পুরুরবা অরণিতে অগ্নি নিক্ষেপ করিয়া ভাবিয়াছিলেন, সে অগ্নি চিরকাল থাকিবে, নির্বাণ হইবে না। কোন অনুকূল কারণে অরণিটি ভূমিতে মূল বিস্তার করিয়া বৃক্ষে পরিণত হইয়াছিল। বোধ করি, অশ্বত্থ বৃক্ষের অরণি দ্বারা অগ্নিমন্থন তৎকালে জানা ছিল না।

---

* ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র সংশোধিত বায়ু পুরাণ, উত্তর ভাগ, ২৯ অঃ।

রঘুবংশে কালিদাস লিখিয়াছেন যে, রাজা সসত্ত্বা মহিষী সুদক্ষিণাকে দেখিয়া মনে করিলেন—

শমীমিবাভ্যন্তরলীনপাবকাম্।

যেন শমীগর্ভে অগ্নি লীন হইয়া আছে। ইহার ব্যাখ্যায় তারাকুমার কবিরত্ন মহাশয় মহাভারত (অনুঃ পঃ) হইতে লিখিয়াছেন, পূর্ব্বকালে অগ্নি শৈব তেজঃ পাইয়া অসহ্য জালা হইতে শান্তিলাভ নিমিত্ত প্রথমে রসাতলে, পরে অশ্বত্থগর্ভে, তদনন্তর শমীগর্ভে আশ্রয় লইলেন। দেবতারা তারকবধের নিমিত্ত সেনানী সৃষ্টি করিবার সময় ইতস্ততঃ অগ্নি অন্বেষণ করিলেন, কিন্তু পাইলেন না। শেষে শমীগর্ভে অগ্নি দেখিলেন এবং দেবকার্য্যে নিয়োগ করিলেন। তদবধি শমীগর্ভেই অগ্নি দৃশ্য হয়, এবং মানবগণ অগ্নি উৎপাদন করিতে জানিলেন।

এই আখ্যানের ভিতরে মানবগণের অগ্নি উৎপাদন চেষ্টা লুক্কায়িত আছে। রসাতলের অগ্নি আধুনিক নামের আগ্নেয়গিরি। বোধ করি, এই অগ্নিই আদিম মানব জানিতে পারিয়াছিল। অশ্বত্থ-গর্ভের অগ্নি বিদ্যুতাগ্নি হইতে পারে, এবং অশ্বত্থ ও শমীগর্ভে শেষে অরণিতে অগ্নির জন্ম হইয়াছিল।

বস্তুতঃ ওড়িশার পার্ব্বত্য জাতিরা অশ্বত্থকাষ্ঠের অরণি দ্বারা অদ্যাপি অগ্নি উৎপাদন করিয়া থাকে। শমীবৃক্ষের অরণি করি নাই; তদ্দ্বারা অগ্নি উৎপাদন করিতে কত পরিশ্রম হয়, জানি না। কিন্তু অশ্বত্থবৃক্ষ অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট এক বৃক্ষ আছে। বাঙ্গালায় তাহাকে গণিয়ারী বলে, এবং তাহার সংস্কৃত নামই অগ্নিমন্থ। দুই অরণি করা কঠিন নহে। অগ্নিমন্থের একখান চেপ্‌টা কাঠে একটু গর্ত্ত করিয়া এবং সেই গর্ত্তে প্রবেশ করিতে পারে এমন গোল মুখ করিয়া ১০।১২ আঙ্গুল কাঠি দুই হাতে ৪।৫ মিনিট ঘুরাইলে গর্ত্তে অগ্নি উৎপন্ন হয়। মধ্যে মধ্যে কাঠিটির উপর হইতে নীচের দিকে এবং নীচ হইতে উপর দিকে হাত সরাইয়া লইলে জোর পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য চেপ্‌টা কাঠখানি পা দিয়া ধরিয়া রাখিতে হয়

যাঁহারা অসভ্য মানব জাতির অগ্নি উৎপাদন ক্রিয়া দেখিয়াছেন, তাঁহারা বলেন অরণি ব্যবহারের ত্রিবিধ রীতি আছে। কোন কোন জাতি হাত দিয়া না ঘুরাইয়া অরণিটি দড়ি দিয়া দধিমন্থনের ন্যায় এদিক্ ওদিক্ ঘুরাইয়া অগ্নি উৎপাদন করে। হাতে ঘুরান অপেক্ষা ইহাতে শীঘ্র আগ পাইবার কথা। কোন কোন জাতি লম্বা চেপ্‌টা কাঠে লম্বা নালী করিয়া তন্মধ্যে অরণি লম্বালম্বি এক দিক্ হইতে অন্য দিক্ পর্য্যন্ত বেগে চালনা করিয়া থাকে। অপর কোন জাতি

দুই খণ্ড শুষ্ক কাষ্ঠ-শলাকা আড়াআড়ি ভাবে ঘষিয়া অগ্নি করে। বাঁশের কঞ্চি দুই খণ্ডে চিরিয়া পরস্পর ঘষিলে অগ্নি জন্মে। প্রকৃতি যেন এই উদ্দেশ্যের সাহায্য নিমিত্ত বাঁশে বালুকাকণা মাখাইয়া রাখিয়াছে।

সে যাহা হউক, অরণির পর ইস্পাত ও অগ্নিপ্রস্তরের (চকমকির পাথরের) ব্যবহার আরম্ভ হইয়াছিল। এ দেশে কত কাল পর্য্যন্ত অরণির ব্যবহার ছিল, তাহা বলিতে পারা যায় না। বোধ করি, পুরাণ-রচনার সময়েও অরণি চলিত ছিল। দ্বাদশ শতাব্দীতে অগ্নিচূর্ণ (বারুদ), নালিকা অস্ত্র (বন্দুক) এবং তৎসঙ্গে অগ্নিপ্রস্তর ব্যবহারের প্রমাণ আছে। সূর্য্যকান্তমণি তদপেক্ষা বহু প্রাচীনকাল হইতে এ দেশের লোকেরা অবগত ছিল। তৎকালে উহা মণি-স্বরূপ ব্যবহারের উপযুক্ত ছিল। এই সস্তা বিলাতী দিয়াশলাইর দিনেও উহার উপযোগিতা আছে। তবে, একালে উহা কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত হইয়াছে, সে কালে উহা কদাচিৎ পাওয়া যাইত। যখন এ দেশে পূর্ব্বকাল হইতে কাচ প্রস্তুত করণ কলা ছিল, তখন কৃত্রিম সূর্য্যকান্ত তত দুষ্প্রাপ্য না হইবার সম্ভাবনা ছিল। অগ্নিপ্রস্তর ও ইস্পাতও ছিল; তথাপি এখনও যাগ করিবার সময়ে পুরোহিত মহাশয় অরণির অগ্নি অন্বেষণ করেন। ভাবিয়া দেখুন, সেই প্রাচীন-কালের অরণি, আর আজকালকার তাড়িতাগ্নির মধ্যে কত অন্তর।

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়।

দার্শনিক মতের সমন্বয়। (৪)

পূর্ব্ব প্রবন্ধে আমরা বৌদ্ধদর্শনের "নির্ব্বাণ" শব্দ কোন্ অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে তাহা দেখিয়াছি। শঙ্করাচার্য্যের "মুক্তি" শব্দও কি ভাবে তিনি ব্যবহার করিয়াছেন, তাহাও আমরা এস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি। পাঠক বিবেচনা করিয়া দেখুন, উভয়ের কোন পার্থক্য আছে কি না।

"স চ মোক্ষঃ প্রদীপনির্ব্বাণবৎ" (বৃহঃ ভাষ্য, ৪।২।১২)।

"বন্ধন-নাশো মুক্তস্য ন ক্বচিদ্‌গমনং" (৪।২।১১)।

অর্থাৎ মুক্তে সমস্ত বন্ধন নাশ হইয়া যায়। প্রদীপনির্ব্বাণের ন্যায়, কর্ম্ম ক্লেশ, অবিদ্যানাশের নামই মোক্ষাবস্থা।

"তদিদং অমৃতত্বং (*i. e.* মোক্ষঃ) কেবলয়া আত্মবিদ্যয়া কর্ম্মনিরপেক্ষয়া প্রাপ্যতে" (৪।৫।১৫)।

"নতু অকার্য্যো নিত্যো নামরূপাত্মকে ক্রিয়াকারকফলস্বভাববর্জ্জিতে (*i. e.* মোক্ষে) কর্ম্মণোব্যাপারোঽস্তি" (৫।৩।১)।

অর্থাৎ নামরূপ কর্ম্মসম্বন্ধাদি মোক্ষাবস্থায় সমস্তই ধ্বংশ হইয়া যায়।

"যস্মাৎ সর্ব্বৈষণাবিনিবৃত্তঃ স এষ নেতি নেতি আত্মানমাত্মত্বেন উপগম্য তদ্রূপে নৈব বর্ত্ততে" (৬৪।২২)।

"উপাধিকৃতাজ্ঞানব্যবধানাপনয়নেন মুক্তিঃ" (৬।২)।

অতএব বৌদ্ধদর্শনের এবং শঙ্করভাষ্যের নানাস্থল হইতে আমরা "নির্ব্বাণ" ও "মুক্তির" যে সকল বর্ণনা উদ্ধৃত করিয়া দেখাইলাম, তাহাই বোধ হয় যথেষ্ট। শঙ্করের মুক্তি যেমন সর্ব্বশূন্যবাদ নহে, বৌদ্ধেরও নির্ব্বাণ তেমনি সর্ব্বশূন্যবাদ নহে।

এত দূরে আমরা বোধ হয় প্রমাণ করিতে পারিয়াছি যে, স্পষ্টতঃ না বলিলেও বুদ্ধ আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। ইন্দ্রিয়ের অন্তরালে, এবং শব্দস্পর্শাদির অন্তরালে যে একটী চির-নিত্য পদার্থ আছে, ইহা বুদ্ধেরও অভিপ্রায়। তবে যে তিনি স্পষ্টতঃ তাহার উল্লেখ করেন নাই এবং জিজ্ঞাসা করিলে মৌনভাব ধারণ করিতেন, তাহার অর্থ এই যে, মানুষ ইন্দ্রিয় ও ঐন্দ্রিয়িক জ্ঞানেরই সম্পূর্ণ অধীন; সে গণ্ডি ভেদ করিয়া মনুষ্যের পদার্থের স্বরূপ বুঝিবার শক্তি নাই। মানুষের জ্ঞান কেবলমাত্র সম্বন্ধাবগাহী; ইহা relationএর জ্ঞানমাত্র বা Conditioned জ্ঞান। মনুষ্যের জ্ঞান absoluteএর ধারেও যাইতে পারে না। যখন সে অবস্থা আসিবে, যখন আধ্যাত্মিক পরিণতিতে সে অবস্থা-লাভ ঘটিবে, তখন মানুষ তাহা স্বয়ংই অনুভব করিতে পারিবে। বুদ্ধের ইহাই প্রকৃত অভিপ্রায়। নতুবা, তাঁহার সেই সুপ্রসিদ্ধ নৈতিক জীবনলাভের জন্য যে, পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপদেশাবলী আছে, তাহার আচরণ বৃথা হইয়া পড়ে। তবে একটী কথা আছে। জাগতিক প্রত্যেক জ্ঞানকে, কেবলমাত্র সম্বন্ধ-জ্ঞানে পরিণত করিয়া, বুদ্ধ ইহাই দেখাইয়াছেন যে, Subjective এবং Objective এ উভয়েরই আশ্রয় কেবল একমাত্র শূন্যতা বা আত্মা বা ব্রহ্ম। ইন্দ্রিয়াদির অন্তরালে এক পদার্থ, আবার শব্দাদির অন্তরালে ভিন্ন এক পদার্থ,—এরূপ নহে। উভয়েরই অন্তরালবর্ত্তী পদার্থটী একই। Subjective substratum এবং objective substratum বস্তুগত্যা একই। এ অংশে বৈদান্তিক মত

ও বৌদ্ধমত একরূপ। তবে সাংখ্য যে প্রকৃতিকে, পুরুষ হইতে পৃথক্ পদার্থরূপে ধরিয়া লইয়াছেন, তাহাও একটা কথার কথা মাত্র; কেননা, সাংখ্যমতে পুরুষ ভিন্ন প্রকৃতির কোন কার্য্যই সংঘটিত হইতে পারে না,—সাংখ্য এই একটী অত্যাবশ্যকীয় নিয়ম বলিয়া দিয়াছেন। এই নিয়ম হইতেই, সাংখ্যদর্শনের মূলভিত্তি কোথায়, তাহা বুঝিতে পারা গিয়াছে। সাংখ্যের বিবরণ হইতেও আমরা জ্ঞানের subjectivityই বুঝিতে পারি। আকাশকে আমরা সৃষ্টি করিতে পারি না সত্য, কিন্তু আকাশের রূপ বা বর্ণ আমাদের বুদ্ধি বা মনই উহাতে প্রদান করে। এইজন্যই অন্তঃকরণকে মধ্যস্থ রাখিয়া জ্ঞান উৎপন্ন হয়,—সাংখ্য এইরূপ বলিয়াছেন। এই কারণেই সাংখ্যদর্শনে অন্তঃকরণকে অচেতন বলা হইয়াছে। একজন সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিকও এ বিষয়ে আমাদের সহিত একমত হইয়া বলিতেছেন যে,——

"We are conscious, no doubt, that we are not ourselves the *cause* of our sensations, that we do not *make* the sky, but that it is *given* us. But beyond that, our world is only an inductive world,—it is, so to say, our creation. We make the sky concave or blue, and all that remains, after deducting both the primary and secondary qualities, is *Prakriti* as looked at by *Purus*, or we should say,—*das Ding an Sich*, which we can never know directly. It is *within us* or under our sway that this *Prakriti* has grown to all that it is, not excluding our own bodies, our senses, our *manes*, our tanmatras, our Budhi." জগতের প্রকৃত স্বরূপ কি? তাহা কে জানে? ইন্দ্রিয় যেমন দেখায়, মানুষ তেমনি দেখে। আর দুইটী অতিরিক্ত ইন্দ্রিয় থাকিলে, জগতের আরো অন্য দুই প্রকারের মূর্ত্তি দেখা যাইত। কমিলে, জগতের মূর্ত্তিও কমিয়া যাইত। এই জন্যই ত সাংখ্য, পুরুষের দর্শন ব্যতীত প্রকৃতির ক্রিয়া স্বীকার করেন নাই। এই জন্যই ত প্রকৃতির নিজের কোন চেতনা নাই বলা হইয়াছে। এই জন্যই পুরুষকে দ্রষ্টা (conscious) বলা হইয়াছে "Human beings cannot have anything but their *own* knowledge,"—এই তত্ত্বই সমস্ত দর্শনের মূলে অবস্থিত। যত দিন ইন্দ্রিয় আছে, তত দিন জগতের এই বর্ত্তমান রূপ থাকিবেই। এই ইন্দ্রিয় বিলুপ্ত

হইলে অর্থাৎ মুক্তির বা নির্ব্বাণের অবস্থায়, এ জগতের এরূপ থাকিবে না, সমস্তই তখন ব্রহ্ম হইয়া যাইবে। তখন Subjective ও Objective সত্ত্বাদ্বয়ের আর পার্থক্য অনুভূত হইবে না। কিন্তু সে অবস্থা ঐন্দ্রিয়িক জ্ঞানের অতীত।

অতএব, সাংখ্য, বেদান্ত এবং বৌদ্ধ—এই তিন দর্শনই বিজ্ঞানবাদী (Subjectivity of knowledge) এবং তিন দর্শনই এই বিজ্ঞানের মূলে এক নিত্য সত্ত্বাও স্বীকার করিয়াছেন। শঙ্করের মায়াবাদকে যেমন লোকে ভুল বুঝিয়াছে, বৌদ্ধের এই শূন্যতাবাদকেও লোকে তেম্‌নি ভুল বুঝিয়াছে। এ বিষয়টী বড়ই গুরুতর, এইরূপ ভুল বুঝাতেই, বুদ্ধের মত এদেশে বর্ত্তমানকালে যথোপযুক্তরূপে গৃহীত হয় নাই।

শ্রীকোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য।

কোথায়।

১

একটী ছোট নদী—এ পারে আমি,
ওপারে ব’সেছিলে একেলা তুমি।
প্রভাতে রাঙ্গা ছবি ওপারে উঠে রবি,
এপারে ডুবে যায় আঁধারে চুমি’,
একাকী ব’সে আমি, একাকী তুমি।

২

ওপারে পাখীগুলি মধুরে ডাকে,
এপারে তারা শুধু চাহিয়ে থাকে।
মৃদুল মলয়ায় সৌরভ মেখে গায়
ওপারে ফোটে ফুল তরুর শাখে ;
এপারে ভ্রমরেরা চাহিয়ে থাকে।

৩

ওপারে স্রোত চলে আলোকমাখা,
এপারে নদী-জল ছায়ায় ঢাকা।
দু’পারে দু’জনায় আশা ও নিরাশায়

চাবিটী আঁখি-কোণে বিষাদ-রেখা,
এরূপে নদীকূলে দু'জনে দেখা।

৪

একদা কোথা হ'তে নাবিক এসে
তরণী বেঁধে দিল আলোর দেশে।
সে এসে উঠে নায়, তরীটী ভেসে যায়,
উছলে নদী তায় আকুল-বেগে,
তরণী ভেসে যায় অজানা দেশে।

৫

সুদূরে ধূ ধূ ধূ ধূ রজত-রেখা
নদীর কালো জলে রয়েছে আঁকা,
চঞ্চল স্রোত তায় ক্রমেই মিশে যায়,
আঁখির সীমানায় আকাশ-লেখা
আঁখি ফিরে আসে না যায় দেখা।

৬

দিবস চলে যায়, রজনী আসে,
একাকী বসে আছি নদীর পাশে।
হায় সে আরোহিটী কোথায় গেল ছুটি
কোথায় শতকোটী কুসুম হাসে,
তাহার সুধামাখা সুরভি শ্বাসে!

ময়মনসিংহের প্রাচীন কবি।

৺রাজা রাজসিংহ।

আমার বৃদ্ধ প্রপিতামহ ৺রাজা রাজসিংহ বাহাদুর এক জন পরম ধার্ম্মিক প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষ ছিলেন। সুসঙ্গ রাজ্যে যে সকল ব্রহ্মত্র প্রভৃতি বিদ্যমান আছে তাহার অধিকাংশই তাঁহা কর্ত্তৃক প্রদত্ত। তাঁহার দানশীলতায় উপকৃত হয় নাই, সুসঙ্গ রাজ্যে এমন প্রায় কেহই নাই; কেবল তাহাই নহে তিনি একজন সুকবিও ছিলেন, তাঁহার রচিত একখানা হস্ত-লিখিত কাব্য ও দুই তিন খানা খণ্ড কাব্য অদ্যাপি আমাদের পুস্তকালয়ে বর্ত্তমান আছে। সুখের

বিষয় এই যে, বিগত ১৩০৪ বঙ্গাব্দের প্রলয়ঙ্কর ভীষণ ভূকম্পনে আমাদের অনেক বহুমূল্য ধনপ্রাণ নষ্ট হইলেও কবির, বহু-আয়াস-রচিত কাব্যগুলি বিলুপ্ত হয় নাই; কিন্তু সে গুলি লিপিকর-প্রমাদে এত দূষিত যে একপ্রকার অপাঠ্য বলিলেও হয়। কবির রচিত 'রাজ-মালা" ও "মনসা-পাঁচালী" নামক খণ্ড-কাব্যদ্বয়, আমার পিতৃব্য শ্রীযুক্ত রাজা কমলকৃষ্ণ সিংহ বাহাদুরের যত্নে মুদ্রিত হইয়া, জন-সমাজে প্রচারিত হইয়াছে। অধুনা আমি"ভারতীমঙ্গল" কাব্য-খানা প্রচারিত করিতে ইচ্ছা করিয়া, বহুচেষ্টাতে পাঠোদ্ধার করিয়াছি। পূর্ব্ব-পুরুষের কীর্ত্তি-রক্ষা-দ্বারা পুণ্যলাভ এবং কর্ত্তব্যপালন এই উভয় কার্য্যই সম্পন্ন হয়, এতদভিপ্রায়েই গ্রন্থ-প্রচারের ইচ্ছা, যশ অথবা ধন-লাভের আশায় নহে।

এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে কেবল "ভারতী মঙ্গল" সম্বন্ধেই আলোচনা করিব। "ভারতী মঙ্গল" কালিদাসের সরস্বতী কুণ্ডে স্নানান্তে ভারতীদেবীর বরলাভ বিষয়ক প্রচলিত-প্রস্তাব অবলম্বনে রচিত। যদিও এই কাব্যে কবির চরিত্রাঙ্কনী-প্রতিভা ততদূর পরিস্ফুট হয় নাই, তথাপি রচনা-মাধুর্য্যে, রস-বৈচিত্র্যে এবং ভাষার পারিপাট্যে ইহা বঙ্গসাহিত্য-ভাণ্ডারে কেবল নগণ্য স্থান অধিকার করিবে, এমন বোধ হয় না। কবির ভাষা যে প্রকার সংস্কৃত আভিধানিক শব্দে পরিপূর্ণ, তাহাতে অনুমান হয় তিনি একজন সংস্কৃত-ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন।

গ্রন্থের বর্ণণীয় বিষয় এই যে,—মিথিলা-নগরীতে শক্রজিত নামে এক রাজা ছিলেন, তাঁহার দুই পুত্র ও এক কন্যা হয়। পুত্রদ্বয় ও রাজকন্যা যথাশাস্ত্র সুশিক্ষালাভ করিলেন, অতঃপর কন্যাটী বাল্যাবসানে যৌবনে পদার্পণ করিলেন; কবির ভাষায় বলিতে গেলে,—

"বাল্যাবস্থা হৈল শেষ, যৌবনেতে পরবেশ,
ভূপাত্মজা বাড়ে দিনে দিনে।
দেখি তার মুখচন্দ্র, চকোরদ্বিরেফে দ্বন্দ্ব,
সোম পদ্ম-ভ্রম ভাবি মনে॥"

তখন কন্যাকে রাজা—"সমর্পিব তারে যেবা জিনিবে বিচারে" এই বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন। কন্যালাভার্থী বহুপণ্ডিত বিচারে পরাভূত হইয়া লজ্জিত হইলে, তাঁহারা কালিদাস নামক এক মূর্খ ব্রাহ্মণকে পণ্ডিত কল্পনা করিয়া, সকলে তাঁহার শিষ্যরূপে কন্যার সহিত বিচারে উপস্থিত হইলেন, তখন কালিদাস,—

"মধ্যে অধ্যাপক আছে পরম-কৌতুকে।
মস্তক দুলায় মাত্র বাক্য নাহি মুখে॥"

এই ভাবে রহিলেন,—বিচারের ফল হইল যে,—

"না পায় পণ্ডিতে যাকে বিস্তর পড়িয়া।
কালিদাস লভে তাকে মস্তক ঢুলায়া॥"

কন্যা-লাভান্তে কালিদাস স্বকীয় জ্ঞানগরিমা প্রকাশিত হওয়ার আশঙ্কায়, মৌনাবলম্বনই কর্ত্তব্য মনে করিলেন,—কিন্তু দৈবাৎ অসাবধানতাবশতঃ একদিন তাঁহার মুখে অত্যন্ত প্রাকৃত-ভাষা ব্যক্ত হইয়া পড়িল; ইহাতে রাজকুমারী তাঁহাকে যৎপরোনাস্তি অপমানিত ও লাঞ্ছিত করিলেন অত্যাস্থায় কালিদাস নিতান্ত মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া, নৈমিষারণ্যে প্রবেশ করিলেন। তথায় কিছুকাল অবস্থানের পর শনক-মুনি তাঁহার প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া, সরস্বতী-সরিতে অবগাহন করিতে উপদেশ দিয়া, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণের বিবরণ শ্রবণ করাইলেন, এতদুপলক্ষে কবি, উক্ত পুরাণের কাহিনী সংক্ষেপে এবং সুকৌশলে ভারতীমঙ্গল কাব্যে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। অতঃপর কালিদাসের অনুরোধে শনক-মুনি, সরস্বতীদেবীর উৎপত্তি, দেবগণ কর্ত্তৃক তাঁহার অর্চ্চনা এবং মুনিগণকর্ত্তৃক জগতে দেবীর পূজা-প্রচারের বিষয় আনুপূর্ব্বিক বিবৃত করিলেন। তদনন্তর শনকমুনি, কালিদাসকে কিছুকাল সংযমী অবস্থায় রাখিয়া, সরস্বতীমন্ত্রে দীক্ষিত করিলেন। অভীষ্টমন্ত্র লাভ করিয়া কালিদাস,—

"শরৎ-শশাঙ্ক-সম নির্ম্মল-শরীর।
চপলতা খণ্ডি দ্বিজ হইল সুস্থির॥"

অতঃপর কালিদাস মুনির উপদেশানুযায়ী,—

"জপে দিবা রাতি, ভাবিয়া ভারতী,
মনে নাহি কিছু আর।
শিশির-সময় যথা বারিচয়,
তাহে তনু মজাইয়া।
সকল যামিনী, দ্বিজ জপে বাণী
অত্যন্ত আরদ্র হ'য়া॥

কঠোর তপস্যান্তে ভারতীদেবী, কালিদাসের সমক্ষে প্রত্যক্ষরূপে আবির্ভূতা হইয়া, বর প্রদান করিলেন; তখন কালিদাসের :—

"সর্ব্বশাস্ত্র অধিষ্ঠান কণ্ঠে কৈল আসি।
রাহু-গ্রাস হৈতে যেন মুক্ত হৈলা শশী॥
কৃশানু মুচ্ছিত যেন থাকে ভস্ম মেলে।
ইন্ধন-সংযোগ হৈলে প্রজ্জ্বলিতে জলে॥"

কিন্তু ভ্রান্তি বিমূঢ়-চিত্তে কালিদাস সর্ব্বাদৌ বাগ্বাণীর রূপ-বর্ণনা আরম্ভ করিলে, দেবী কুপিতা হইয়া তাঁহাকে অভিশপ্ত করিলেন। ইহাতে তিনি প্রখ্যাত-নামা রাজা বিক্রমাদিত্যের সভাসদ্ হইয়া, অখণ্ডনীয় শাপ-প্রভাবে বারবণিতা-গৃহে নির্ব্বাণ লাভ করিলেন। জগদ্বিখ্যাত কবিকুল-চূড়ামণি মহাকবি কালিদাসের এই শোচনীয় পরিণাম পরিতাপের বিষয় বটে। এই প্রবাদ বাক্য কতদূর সত্য, আমি তাহা বলিতে পারি না।

কবির জন্মকাল ও গ্রন্থরচনার সময় নির্দেশ করিবার চেষ্টা করিয়া, এই প্রস্তাবের উপসংহার করিব। দুর্ভাগ্যের বিষয়, "ভারতীমঙ্গল কাব্যে" রচনার সময় নির্দিষ্ট হয় নাই; গ্রন্থপাঠে বোধ হয়, কবির অগ্রজ ৺রাজা কিশোর সিংহের জীবিতকালেই ইহা রচিত হইয়াছিল; প্রায় প্রত্যেক কবিতার শেষভাগে কবি অগ্রজের প্রতি অসীম শ্রদ্ধা ও ভক্তির পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহাদের সৌভ্রাত্র আদর্শস্থানীয় ছিল। রাজা কিশোর সিংহ ৩৬ বৎসরমাত্র বয়সে ১১৯২ বঙ্গাব্দে পরলোক গমন করেন, অতএব তাহার জন্মকাল ১১৫৬ সন; কবি তাঁহা হইতে প্রায় দুই বৎসরের কনিষ্ঠ, ইহাতে তাঁহার জন্মকাল ১১৫৭।৫৮ বঙ্গাব্দ হইতেছে; রাজা রাজসিংহ প্রায় ৭২ বৎসর বয়সে ১২২৮ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন মাসে স্বর্গারোহণ করেন; ইহাতে অনুমিত হয় যে, কবি ৩০।৩২ বৎসর বয়সে "ভারতী মঙ্গল" রচনা করিয়াছিলেন; অতএব গ্রন্থখানা প্রায় ১২০।১২২ বৎসর পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল, একথা নিশ্চিত।

আমাদের বংশে দত্তকপুত্রগ্রহণের পদ্ধতি বর্ত্তমান নাই। রাজা কিশোর সিংহ অপুত্রক ছিলেন, তিনি মৃত্যুকালে তাঁহার অনুজ রাজা রাজসিংহকে স্বসঙ্গ রাজ্যের অধীশ্বর করিয়া যান; ইহার সহিতই ব্রিটিস্ গবর্ণমেণ্ট চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত স্থিরীকৃত করেন। আমাদের বংশে ইতঃপূর্ব্বে জ্যেষ্ঠপুত্রই রাজ্যাধিকারী হইতেন; অধুনা বহুকারণাধীনে সম্পত্তি, দায়ভাগানুসারে বিভাজ্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে, অতএব জ্যেষ্ঠাধিকারিত্বের নিয়ম রহিত হইয়া গিয়াছে। প্রসঙ্গাধীনে আমি মূল বিষয় হইতে দূরে আসিয়া পড়িয়াছি, এখন প্রকৃতানুসরণ করা যাউক।

কবির জন্মকাল যাহা স্থিরীকৃত হইয়াছে, তাহাতে তাঁহাকে রায় গুণাকর ভারতচন্দ্রের সমসাময়িক লোক বলিয়া স্থির করা যাইতে পারে; কিন্তু তিনি ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলী পাঠ করিয়াছিলেন কি না বলিতে পারি না। যাহা হউক, এত প্রাচীনকালেও কবি যে এত মার্জ্জিত বঙ্গভাষায় গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন,

ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়। আমরা আশা করি, প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যামোদী সুধীগণ "ভারতীমঙ্গল" পাঠে অপরিসীম আনন্দানুভব করিবেন এবং কবির শ্রমও সফল হইবে এবং তাঁহার বংশধর বলিয়া আমরাও কথঞ্চিৎ গৌরবান্বিত হইব।

অতঃপর রাজা রাজসিংহ হইতে আমাদের বংশাবলী নিম্নে প্রদান করিয়া, এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি।

বংশপ্রবর্ত্তক ৺সোমেশ্বর পাঠক (ইনি কান্যকুব্জ হইতে পরিব্রাজকবেশে বঙ্গদেশে আসিয়া, সুসঙ্গে রাজ্য স্থাপিত করেন, ইঁহার বিস্তৃত বিবরণ সুসঙ্গের ইতিহাসে বিবৃত করার ইচ্ছা আছে।

রাজা রাজসিংহ (সোমেশ্বর পাঠক হইতে দ্বাদশ পুরুষ)।

- (১) বৈদ্যনাথ সিংহ শর্ম্মা (পিতা বর্ত্তমানে অপুত্রক মৃত)
- (২) রাজা বিশ্বনাথ সিংহ শর্ম্মা।
- (৩) রাজা গোপীনাথ সিংহ শর্ম্মা।
- (৪) রাজা জগন্নাথ সিংহ শর্ম্মা। ইনিও একজন সুকবি। ইনি জগদ্ধাত্রী গীতাবলী-নামক কাব্য রচনা করিয়াছেন। তাহার বিষয় ক্রমে প্রকাশিত হইবে।
- (৫) কৃষ্ণনাথ সিংহ শর্ম্মা। (অপুত্রক মৃত)

(২) রাজা বিশ্বনাথ সিংহ শর্ম্মার পুত্র: ৺ রাজা প্রাণকৃষ্ণ সিংহ শর্ম্মা বাহাদুর।

- (১) মহারাজ রাজকৃষ্ণ সিংহ শর্ম্মা বাহাদুর।
- (২) রাজা কমলকৃষ্ণ সিংহ শর্ম্মা।
- (৩) রাজা জগৎকৃষ্ণ সিংহ শর্ম্মা।
- (৪) রাজা শিবকৃষ্ণ সিংহ শর্ম্মা।

(১) মহারাজ রাজকৃষ্ণ সিংহ শর্ম্মা বাহাদুরের পুত্র:

- (১) মহারাজ কুমুদ-চন্দ্র সিংহ শর্ম্মা। (বর্ত্তমান প্রবন্ধলেখক) আঃ সঃ।
- (২) রাজা নীরদচন্দ্র সিংহ শর্ম্মা।
- (৩) রাজা নগেন্দ্রচন্দ্র সিংহ শর্ম্মা।
- (৪) রাজা দ্বিজেন্দ্র-চন্দ্র সিংহ শর্ম্মা।

সুসঙ্গ দুর্গাপুর রাজবাটী। } শ্রীকুমুদচন্দ্র সিংহ শর্ম্মণঃ।

নদীর গতি-পরিবর্ত্তন।

সমতলক্ষেত্রে নদী চিরকাল একই পথে ধাবিত হয় না। সময়ে সময়ে উহার গতি পরিবর্ত্তিত হয়। বঙ্গদেশে এইরূপ ব্যাপার প্রায়ই ঘটিয়া থাকে। কিরূপে

নদী সমূহ সময়ে সময়ে পুরাতন গর্ভ পরিত্যাগপূর্ব্বক নূতনপথে বহিতে আরম্ভ করে, আমরা এস্থলে তৎসম্বন্ধে আলোচনা করিব।

নদী যখন পার্ব্বত্যপ্রদেশ ও পর্ব্বত-সন্নিহিত ভূভাগ অতিক্রমপূর্ব্বক অপেক্ষাকৃত সমতলক্ষেত্রে প্রবেশ করে, তখন তাহার বেগের সবিশেষ হ্রাস ঘটে। এইস্থানে নদীসমানীত পলিরাশ, তদীয় গর্ভে পতিত ও সঞ্চিত হইতে থাকে। ব-প্রদেশে নদীর বেগের সম্যক্ হ্রাস হয় বলিয়া, তথায় অধিক পরিমাণে পলি নিপতিত হয়। জলপ্লাবনের সময় নদীর তীর-ভূমির উপরেও পলি সঞ্চিত হয়। এইরূপে ক্রমে ক্রমে নদীগর্ভ ও নদীতীর উচ্চ হইয়া উঠে, এবং নদীতীর হইতে পার্শ্ববর্ত্তী ভূভাগ ক্রমনিম্ন হইয়া পড়ে। অবশেষে নদী পার্শ্ববর্ত্তী ভূভাগ অপেক্ষা উচ্চতর ভূমির উপর দিয়া প্রবাহিত হয়। নদী যে সকল শাখানদীতে বিভক্ত হয়, তাহাদের প্রত্যেকটী এইরূপে প্রবাহিত হইয়া থাকে। কলিকাতার পার্শ্ববর্ত্তী ভাগীরথীর তীরও এইরূপ। তথায় বৃষ্টির জল নদীর দিকে ধাবিত না হইয়া, ভূপৃষ্ঠের ক্রমনিম্নতাবশতঃ লবণাক্ত হ্রদের দিকেই প্রবাহিত হইয়া থাকে। পূর্ব্ববঙ্গে যখন নদী পরিপূর্ণ হইয়া পার্শ্ববর্ত্তী ক্ষেত্র ও জনপদ সকল প্লাবিত করে, তখনও নদীর তটদেশ প্রায়ই জলসীমার উপরে লক্ষিত হয়।

কখনও কখনও জলপ্লাবনের সময় নদী এইরূপ সমুন্নত তীরভূমির কোন অংশ ভগ্ন করিয়া, নিম্নতম ভূভাগ দিয়া প্রবাহিত হয়। এইরূপে নদীর গতি-পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়া থাকে। সমতল ভূভাগের যে সকল স্থানের মৃত্তিকা কেবলমাত্র বালুকায় গঠিত, অথবা যে সকল স্থানের মৃত্তিকা বালুকার ন্যায় অতি সহজেই বিচ্ছিন্ন ও স্থানান্তরে নীত হইতে পারে, সেই সকল স্থানে সহজেই নদীর গতি পরিবর্ত্তিত হয়। যদি নদীর মধ্যে বৃক্ষ বা বৃহৎ নৌকা প্রভৃতি নিমজ্জিত হয়, তবে তথায় বৃক্ষাদিতে বালুকা আবদ্ধ হইয়া, নদীর গতি কিয়ৎপরিমাণে রোধ করিতে সমর্থ হইয়া থাকে। এমত অবস্থায় নদীর জলরাশি অন্যপথে ধাবিত হয়। গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের ব-প্রদেশে এরূপ ব্যাপার প্রায়ই ঘটিয়া থাকে।

তিস্তা (ত্রিস্রোতা) নদী ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে রঙ্গপুরের সুপ্রসিদ্ধ জলপ্লাবনের সময় গতি পরিবর্ত্তন করিয়াছে। পূর্ব্বে উহা নাটোরের নিকট আত্রেয়ী নদীর সহিত মিলিত হইয়া, দক্ষিণাভিমুখে প্রবাহিত হইত, এবং সেই সম্মিলিত-প্রবাহ গোয়ালন্দের নিকট পদ্মায় পতিত হইত। উক্ত বন্যার সময় তিস্তা, পার্ব্বত্য প্রদেশ হইতে প্রভূত পরিমাণে কাষ্ঠ ও প্রস্তরাদি বহন করিয়া, আত্রেয়ীর সহিত

সম্মিলনস্থান প্রায় বন্ধ করিয়া ফেলে; এবং পূর্ব্ব-পরিত্যক্ত এক সঙ্কীর্ণপথে দক্ষিণ-পূর্ব্বদিকে প্রবাহিত হইয়া, চিলমারীর নিকট ব্রহ্মপুত্রের সহিত মিলিত হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে তিস্তা, পশ্চিমাভিমুখে প্রায় ৪০ মাইল দীর্ঘ একটি বক্রাংশ পরিত্যাগ করিয়া, পূর্ব্বাভিমুখে অপেক্ষাকৃত অল্পবক্রপথে প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে।

নদীর পরিত্যক্ত গর্ভ ক্রমে ক্রমে শুষ্ক হইয়া যায়। কালক্রমে আবার পূর্ব্বোক্তরূপে নূতন গর্ভদেশ ও তীরভূমি উন্নত হইয়া উঠিলে, তাহার গতি-পরিবর্ত্তন ঘটে। দীর্ঘকাল পরে সময়ে সময়ে নদী নূতন-গর্ভ পরিত্যাগ করিয়া, পুনরায় ইহার কোন পুরাতন-গর্ভ দিয়াও প্রবাহিত হইয়া থাকে। ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে তিস্তা, অনেকবার গতি-পরিবর্ত্তন করিয়াছে। ছোটতিস্তা, বুড়াতিস্তা, মরাতিস্তা প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদীগুলি অদ্যাপি ইহার পরিত্যক্ত-পথ নির্দ্দেশ করিতেছে। পাবনা, রঙ্গপুর, ঢাকা, মালদহ, কুচবিহার ও ত্রিহুত জিলায় বহুসংখ্যক পরিত্যক্ত নদীগর্ভ দৃষ্ট হইয়া থাকে।

নদীর গতি-পরিবর্ত্তনের অপর প্রধান কারণ নদীবিগ্রহ। একটি নদী পার্ব্বত্যপ্রদেশ হইতে সমতলভূমিতে অবতরণ করিয়া, আর একটি জলপূর্ণ বৃহৎ নদীর সহিত মিলিত হইলে, প্রথমোক্ত নদীর বেগের হ্রাস ঘটে। সম্মিলনস্থান হইতে আরম্ভ করিয়া, বহুদূর পর্য্যন্ত প্রথমোক্ত নদীতে বেগের হ্রাস অনুভূত হইয়া থাকে। এতদ্দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যায় যে, প্রথমোক্ত নদীর গর্ভ পলিপতন-সহকারে কালক্রমে উচ্চ হইয়া উঠে, এবং পরিশেষে ইহা সুবিধামতে অন্যপথে ধাবিত হইয়া থাকে।

ব্রহ্মপুত্র ঘুরিয়া ফিরিয়া আসাম হইতে বাঙ্গালার সমতল-ভূমিতে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বেই, পশ্চিমদিকে বহুশাখা-সমন্বিত গঙ্গানদী এবং পূর্ব্বদিকে কতিপয় শাখা-সম্বলিত সুর্ম্মানদী প্রায় জলপূর্ণ হইয়া থাকে। পুরাকালে সুর্ম্মা ও পূর্ব্বদিকস্থ অপরাপর নদীগুলি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র বলিয়া, প্রথমতঃ গতি-পরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইয়াছিল। ব্রহ্মপুত্রের সহিত মিলনে বেগের হ্রাস হওয়াতে, সুর্ম্মা ও মণিপুর হইতে সমাগত অপরাপর নদীগুলির গর্ভ ক্রমে ক্রমে পলিপতন-সহকারে সমুন্নত হয়, এবং উহারা দক্ষিণাভিমুখে প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করে। যে পর্য্যন্ত উহারা একটি একটি করিয়া ব্রহ্মপুত্রের সহিত মিলিত হইয়াছিল, সে পর্য্যন্ত ব্রহ্মপুত্রের প্রাবল্যবশতঃ অতি সহজেই উহাদের গতি-পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছিল। পরিশেষে ত্রিপুরার পাহাড়শ্রেণীর প্রতিবন্ধকতা-নিবন্ধন

উহারা আরও সরিয়া যাইতে না পারিয়া, সকলে সম্মিলিত হইয়া মেঘনারূপে প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করিল। (এদিকে ব্রহ্মপুত্রও কিয়দ্দূর সরিয়া গিয়া, ভৈরববাজারের নিকট মেঘনার সহিত মিলিত হইলে, উভয়ের বিগ্রহ আরম্ভ হইল।*)

ব্রহ্মপুত্র অপেক্ষা মেঘনা ক্ষুদ্র হইলেও ইহার কয়েকটি বিশেষ সুবিধা থাকাতে, অবশেষে ব্রহ্মপুত্রের গতি-পরিবর্ত্তন সঙ্ঘটন করিতে সমর্থ হইয়াছে। প্রথমতঃ—শ্রীহট্টের নদীগুলির জলের পরিমাণ সম্পূর্ণরূপে বৃষ্টির উপর নির্ভর করে। নৈঋতিক মৌসুমী বায়ুদ্বারা সমানীত জলীয়বাষ্প, সর্ব্বাগ্রে খাসিয়া পাহাড়ে প্রতিহত হইয়া, প্রভূতপরিমাণে বৃষ্টিবর্ষণ করে। এই জল শ্রীহট্টের নদীদ্বারা প্রবাহিত হইয়া থাকে। দ্বিতীয়তঃ—ঐ পাহাড় এরূপ উপাদানে গঠিত যে, বৃষ্টির জলদ্বারা তাহা অতি অল্পপরিমাণেই ক্ষয় প্রাপ্ত হয়; সুতরাং এই সকল নদীর জলে আলম্বমান পলির পরিমাণ অত্যন্ত অল্প।

এদিকে ব্রহ্মপুত্র, হিমালয়ের দ্রবমাণ-তুষার হইতে ইহার অধিকাংশ জল প্রাপ্ত হয়। অবশিষ্ট জল আসামের বৃষ্টির উপর নির্ভর করে। এই বৃষ্টিপাত, খাসিয়া পাহাড়ের বৃষ্টিপাতের পরে ঘটে। খাসিয়া পাহাড়ের বৃষ্টির সহিত তুলনায়, আসামের বৃষ্টির জলের পরিমাণও অল্প। দ্রবমাণ তুষারদ্বারা পর্ব্বতের সবিশেষ ক্ষয় সাধিত হয়। এইজন্য ব্রহ্মপুত্রের জলে আলম্বমান পলিরাশির পরিমাণ অত্যন্ত অধিক। ব্রহ্মপুত্রের জল সুদীর্ঘ-পথ অতিক্রম করে, সুতরাং বিলম্বে বাঙ্গালার সমতল-ভূমিতে সমুপস্থিত হয়। ব্রহ্মপুত্রের জল তথায় উপনীত হইবার পূর্ব্বেই, মেঘনা জলপূর্ণ হইয়া থাকে। এইজন্য বর্ষার প্রথম মাসে ব্রহ্মপুত্রের জলরাশি, মেঘের জলে বিশেষ বাধা প্রাপ্ত হয়; সুতরাং বেগের হ্রাসবশতঃ ইহার পলিরাশি নদীগর্ভে সঞ্চিত হইয়া থাকে।

এইরূপে ক্রমে ক্রমে ব্রহ্মপুত্রের গর্ভ উন্নত হইতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে উহার জল-প্লাবনে পার্শ্ববর্ত্তী বিল-পরিপূর্ণ নিম্নভূভাগে পলিরাশি সঞ্চিত হইতে লাগিল। ধীরে ধীরে ব্রহ্মপুত্রের তীরভূমিও সবিশেষ উন্নত হইয়া উঠিল। পার্শ্ববর্ত্তী সমগ্র নিম্নভূভাগ ব্রহ্মপুত্রের পলিদ্বারা পরিপূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত, মেঘনা ইহার বিশেষ

(* ব্রহ্মপুত্রের পুরাতনগর্ভ অল্পপরিসর মরা-নদী-আকারে এখনও বর্ত্তমান আছে। ইহা কলাগাছিয়ার নিকট ধলেশ্বরীর সহিত মিলিত রহিয়াছে। শীতকালে এই মরানদী অনেক স্থানেই সম্পূর্ণরূপে শুষ্ক হইয়া যায়। ইহার পঞ্চমীঘাট ও লাঙ্গলবন্ধ নামক মহাতীর্থদ্বয়ে চৈত্র মাসের অশোক-অষ্টমীতে বহুদূর হইতে সহস্র সহস্র হিন্দু-যাত্রী সমবেত হইয়া স্নান করিয়া থাকে।)

অনিষ্ট করিতে সমর্থ হয় নাই। কিন্তু অবশেষে ব্রহ্মপুত্রের গতি-পরিবর্ত্তন ব্যতীত আর উপায় রহিল না। পশ্চিমদিকে মধুপুর জঙ্গলের সমুন্নত-ভূমি ব্রহ্মপুত্রের সহজে সরিয়া যাওয়ার অন্তরায় হইল; সুতরাং ব্রহ্মপুত্র, সঙ্গম-স্থল হইতে প্রায় ৭০ মাইল পশ্চাতে দেওয়ানগঞ্জের কিয়দ্দূর উত্তরে জনায়ী (যমুনা) নাম্নী ক্ষুদ্র নদী দিয়া প্রবাহিত হইয়া, গোয়ালন্দের নিকটে পদ্মার সহিত মিলিত হইল। এই পরিবর্ত্তন ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে সঙ্ঘটিত হয়। ব্রহ্মপুত্রের পরিত্যক্ত অংশ এখন ক্রমেই শুষ্ক হইয়া পড়িতেছে। ইহা ময়মনসিংহের পার্শ্ব দিয়া প্রবাহিত।

উল্লিখিত পরিবর্ত্তনে গঙ্গার কতকগুলি শাখা স্থানচ্যুত হইয়াছে। ১৭৮০।৯০ খ্রীষ্টাব্দে রেণেল সাহেব বঙ্গদেশের যে মানচিত্র অঙ্কিত করিয়াছিলেন, তাহার সহিত ইদানীন্তন মানচিত্রের তুলনা করিলে, ইহা স্পষ্টই উপলব্ধি হয়। প্রথমতঃ ব্রহ্মপুত্রের প্রাবল্যবশতঃ গর্ভদেশে পলিপতনসহকারে গঙ্গার প্রধান স্রোতঃ বন্ধ হওয়ার উপক্রম হইয়া উঠে। ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে অনেক স্থানে গঙ্গা পদব্রজে পার হওয়া যাইত। কিন্তু এখন গঙ্গা নাটোর-প্রবাহিনী নদীগুলির সাহায্যে, ব্রহ্মপুত্রকে সরাইয়া দেওয়ার চেষ্টা করিতেছে। ব্রহ্মপুত্রও বিগ্রহ পরিত্যাগ করিয়া, এলামজানী নদী দিয়া ধলেশ্বরীর সহিত মিলিত হইবার উদ্যোগ করিতেছে।

বিহার ও বাঙ্গালার প্রায় সকল জিলাতেই নদীর গতি পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। নিম্নে কয়েকটী উদাহরণ প্রদত্ত হইল।

হিউয়েন্থসাঙের ভারত-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, পুরাকালে সাহাবাদের অন্তর্গত মসার নগরের অতি সন্নিকট দিয়া গঙ্গা প্রবাহিত হইত। এখন তাহা উক্তনগর হইতে ৯ মাইল দূরবর্ত্তী।

বঙ্গদেশের হিন্দুরাজগণের রাজধানী প্রাচীন গৌড় নগরের পশ্চিম পার্শ্ব দিয়া গঙ্গার প্রধান স্রোতঃ প্রবাহিত হইত। এখন উক্তনগরের ধ্বংসাবশেষ গঙ্গার প্রধান স্রোতঃ হইতে প্রায় ১০ মাইল দূরে অবস্থিত। মালদহ জিলাতে ভাগীরথী ও ছোট ভাগীরথী নামে ক্ষুদ্র নদীদ্বয়কে গঙ্গার বিভিন্নসময়ে পরিত্যক্ত অংশ নির্দ্দেশ করিয়া থাকে।

২৪ পরগণায় ভাগীরথী এখন প্রাচীনপথে প্রবাহিত হয় না। ইহা কলিকাতার প্রায় ৮ মাইল দক্ষিণ পর্য্যন্ত ইদানীন্তন "টলির খালের" সহিত এক ছিল। তথা হইতে দক্ষিণ-পূর্ব্বদিকে ধাবমান হইয়া সমুদ্রে পতিত হইত। এই প্রাচীন

পথ এখনও হাতিয়াগড় থানা পর্য্যন্ত সুস্পষ্ট লক্ষিত হয়। এই পথ বহুকাল যাবৎ বিশুষ্ক, কেবল ইহার গর্ভে কতকগুলি জলাশয়মাত্র বর্ত্তমান রহিয়াছে।

অতি প্রাচীনকালে এই ভাগীরথীই গঙ্গার প্রধান স্রোত ছিল। যদিও এখন গঙ্গার অধিকাংশ জল পদ্মা দিয়া প্রবাহিত হয়, তথাপি ভাগীরথীই পুণ্য-সলিলা গঙ্গানামে হিন্দুগণের সুপরিচিত।

যে স্থানে যমুনা ও সরস্বতী নামে ভাগীরথী হইতে দুইটি প্রধান শাখা নির্গত হইয়াছিল, তাহা ত্রিবেণী বলিয়া প্রসিদ্ধ। উভয় শাখাই এখন প্রায় শুষ্ক হইয়া পড়িয়াছে। সরস্বতীই প্রাচীনকালে ভাগীরথীর (সুতরাং গঙ্গানদীর) অধিকাংশ জল বহন করিত. খ্রীষ্টীয় ষোড়শ-শতাব্দীতে সরস্বতীতীরস্থ সপ্তগ্রাম, বঙ্গদেশের সর্ব্ব-প্রধান বন্দর ছিল। সরস্বতী এখন একটি সামান্য খালে পরিণত হইয়াছে। আর সুপ্রসিদ্ধ সপ্তগ্রাম আজকাল একটি ক্ষুদ্র গ্রাম মাত্র। সরস্বতীর এক শাখা আমতার নিকট দামোদরের সহিত এবং প্রধান প্রবাহ কলিকাতার উদ্ভিদ-উদ্যানের কিঞ্চিৎ দক্ষিণে ভাগীরথীর সহিত মিলিত হইয়াছে। সরস্বতী বদ্ধ হইয়া যাওয়াতেই পর্টুগীজগণ ১৫৩৭ খৃষ্টাব্দে হুগলীনামক বন্দর সংস্থাপন করেন। যে মৃত্তিকারাশি সরস্বতীর সুবিস্তীর্ণ গর্ভ আচ্ছাদিত করিয়াছে, তাহার নিম্নে সময়ে সময়ে বৃহৎ বৃহৎ জাহাজের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গিয়া থাকে।

বহুশতাব্দী যাবৎ শোণনদীর গতি পরিবর্ত্তিত হইতেছে। গ্রীকদূত মিগাস্থিনিসের ভারত-বিবরণপাঠে অবগত হওয়া যায় যে, সেই সময়ে পাটনানগরী (পাটলিপুত্র) গঙ্গা ও শোণের সঙ্গম-স্থলে অবস্থিত ছিল। চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষভাগে শোণ, পূর্ব্ব পথ পরিত্যাগ করিয়া, পাটনা হইতে ২৭ মাইল পশ্চিমে মুনিয়ারের নিকট গঙ্গার সহিত মিলিত হয়। ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে রেনেল সাহেব কৃত বঙ্গদেশের মানচিত্রেও এই নদীদ্বয়ের সঙ্গমস্থল মুনিয়ারের নিকটই দৃষ্ট হয়। ১৮১২ খৃষ্টাব্দে ডাক্তার বুকানন হামিলটন এই সঙ্গমস্থল মুনিয়ার হইতে অন্যূন তিন মাইল দূরে সেরপুরের নিকট বলিয়া বর্ণনা করেন। এপর্য্যন্ত শোণ, মুনিয়ারের পার্শ্ব দিয়াই প্রবাহিত হইত; কিন্তু অধুনা কিয়দ্দূর পশ্চিমে সরিয়া গিয়াছে।

নদী পুরাতন পথ পরিত্যাগ করিয়া, নূতন পথে প্রবাহিত হইলে, নূতন পথের অন্তর্গত মৃত্তিকা স্থানান্তরিত হয়। পুরাতন পথ মরানদী, জলাভূমি অথবা সঙ্কীর্ণ-হ্রদ বা বিলের আকারে বিদ্যমান থাকিয়া, প্রায়শঃ লোকের স্বাস্থ্যের

বিঘ্ন ঘটায়। নূতন পথের উভয় পার্শ্ববর্ত্তী স্থান বৎসর বৎসর জলে প্লাবিত হয়। পুরাতন পথের পার্শ্ববর্ত্তী স্থানের উর্ব্বরতার হ্রাস ঘটে। নৌকাযোগে গমনাগমনের বিশেষ অসুবিধাবশতঃ পুরাতন প্রবাহের পার্শ্ববর্ত্তী নগরগুলি শ্রীভ্রষ্ট ও কালক্রমে লয়প্রাপ্ত হয়।

শ্রীকরুণানাথ ভট্টাচার্য্য।

সরযূ।

(১)

সরযূর বিবাহ হইয়া গেল। তখন মাথার উপর বাসন্তীপূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্র হাসিতেছিল; বেদগ্রামের হরিহর মুখোপাধ্যায়ের বাটী পৌরজনকোলাহলে, সুমঙ্গল হুলুধ্বনি ও উচ্ছসিত হাস্যতরঙ্গে মুখরিত হইয়া উঠিল। অল্প দূরে শানাইয়ের করুণ-রাগিণীতে বাজিয়া উঠিল—"সৈঁইয়া কাঁহা সে শ্যাম হামারি।—" ভৈরবীর সেই মর্ম্মস্পর্শী বেদনাপ্লুত কোমলরাগিণী শ্রীরাধিকার উদ্দেশে গীত, উছলিত যমুনাকূলে কেলিকদম্বমূলোপবিষ্ট, বিরহ-বিকল শ্যামের সেই সব আকুল গীতের কথা হৃদয়ে জাগাইয়া তুলিতে লাগিল।

ঠিক সেই সময়, সেই সুপ্তবাসরে, নীরব নিশীথে, নিদ্রালসা ব্রীড়াবিকম্পিতা বস্ত্রমণ্ডিতা সরযূর মুখাবরণ উন্মোচন করিয়া, কানের কাছে মুখ আনিয়া, নিবারণ ধীরে ধীরে ডাকিল, "সরযূ—"

সরযূ চক্ষু মেলিয়া চাহিতে পারিল না,—বড় লজ্জা করে। নিবারণ আবার ডাকিল, "সরযূ—"

সরযূ কিছুতেই কথা কহিতে পারিল না। কথা ফোটে ফোটে, ফোটে না,—অর্দ্ধস্ফুট কুসুমকলিকাবৎ সরযূর কথা ফোটে ফোটে, ফোটে না।

নিবারণ ছাড়িল না,—সরযূর কর্ণে, মুখে, চক্ষে, নাসায় ফুৎকার দিতে লাগিল। অবশেষে বড় বিরক্ত হইয়া সরযূ কহিল,—

"যাও, ওকি—!"

এইবার বালির বাঁধ ভাঙ্গিল।

* * * * * *

(২)

নিবারণ ঘরজামাই হইয়াছিল। সে গ্রামেই থাকিত। বাড়ীতে কেবল তাহার এক বৃদ্ধা বিধবা মাতা ছিলেন। নিবারণ মধ্যে মধ্যে নিজেই যাইয়া তাঁহাকে দেখিয়া আসিত।

নিবারণের আর্থিক অবস্থা বড় শোচনীয় ছিল। কিন্তু তাই বলিয়া শ্বশুরগৃহে অন্নদাস হইয়া থাকাটা তাহার বড় ভাল লাগিত না।

বিবাহের পর প্রথম দুই তিন বৎসর, নবদম্পতীর নিকট যেমন মধুময় এমন

আর কিছুই নহে। সরযূর সুন্দর সুকোমল সরল মুখের দিকে চাহিলেই, নিবারণের মনে হইত, সে যেন নন্দনের পারিজাত, স্বর্গের মন্দাকিনী, মন্মথের লীলা-ভূমি,—সরযূ যেন স্বপনের ফুলরাণী।

নিবারণ তাহার হৃদয়ান্তরালে যে সুখময় সুশোভন আতটপূর্ণ প্রেমসরোবর সৃজিয়াছিল, সরযূ সেই সরোবরের মরাল।

কিন্তু এত হাসি, এত প্রেম, এত ভালবাসা—এ সবের মধ্যেও নিবারণের হৃদয়মধ্যে একখানি কৃষ্ণ মেঘ ধীরে ধীরে সঞ্চিত হইতেছিল।

(৩)

একদিন রাত্রে নিবারণের আসিতে বিলম্ব দেখিয়া সরযূ তাহার অলস-শয্যায় নিদ্রা যাইতেছিল।

নিবারণ বহির্ব্বাটীতে শ্বশুরের সহিত কথা কহিতেছিল। উঠিয়া আসিবার সময় বলিল,—

"তবে তাহাই হউক; আজ রাত্রিতে না যাইয়া, কাল খুব সকালে রওনা হইব।" মুখোপাধ্যায় মহাশয় কোন কথা কহিলেন না। নিবারণ ধীরে ধীরে সে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

আপন শয়নকক্ষে যাইয়া চিন্তিত নিবারণ ধীরে ধীরে শয্যাপার্শ্বে উপবেশন করিল। তখন সরযূর ঘুম ভাঙ্গিয়াছে।

সে তাহার নিদ্রালসশ্রান্ত নয়ন দুইটী নিবারণের মুখের উপর স্থাপন করিয়া কহিল—

"আজ যে এত দেরি?"

"দেরি আর কি, এখনও বেশী রাত হয় নি।"

"এতক্ষণ কি বাহিরে ছিলে?"

নিবারণ কি যেন ভাবিতেছিল। সরযূর কথার উত্তর দিল না। সরযূ আবার কহিল—

"এতক্ষণ কি বাহিরে ছিলে?"

"হাঁ বাহিরেই ছিলাম। আমার কাল যাওয়াই স্থির—মার অসুখ বড় বেশী হইয়াছে।"

"বাবা কি বলিলেন? আমার কথা কি বলেছিলে? আমিও তোমার সঙ্গে যাব।"

"তোমার বাবা কি গরীবের বাড়ীতে তোমাকে যাইতে দিবেন?"

"কেন দিবেন না?—আমি ত আর এখন তাঁর সেই 'সরযূ' নেই।"

নিবারণ কোন কথা কহিল না, কেবল সরযূকে আপনার বক্ষমধ্যে টানিয়া লইয়া, তাহার মুখচুম্বন করিল।

(৪)

রামনগর বেদগ্রামের ৮ ক্রোশ দক্ষিণে। সেই রামনগরেই নিবারণের বাড়ী।

বাটী পৌঁছিয়াই নিবারণ তাহার মাতার রোগ-শয্যাপার্শ্বে যাইয়া উপস্থিত হইল। বৃদ্ধা যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইল। পুত্রকে আশীর্ব্বাদ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—

"বৌমা কেমন আছে ?"

নিবারণ মাথা নাড়িয়া জানাইল 'সমস্তই কুশল।'

বৃদ্ধা উদ্দেশে সরযূকে শত সহস্র আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে বলিল, "আমার লক্ষ্মী বৌ, সোণা বৌ বেঁচে থাক্। বাবা, তাকে এখন একবার দেখ্‌তে বড় সাধ হয়।"

নিবারণ এ কথার উত্তর দিতে পারিল না।

দিন দিন বৃদ্ধার রোগ বৃদ্ধি হইতে লাগিল। নিবারণ প্রাণপণ করিয়া মাতার শুশ্রূষা করিতেছিল। সরযূর সই কমলের শ্বশুর ও শ্বশ্রূ উভয়েই নিবারণকে যথাসাধ্য সাহায্য করিতেছিল। একদিন জ্বরের যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতে করিতে বৃদ্ধা ডাকিলেন,—

"গোপাল—!"

নিবারণ শিহরিয়া উঠিবা অতিমাত্র ব্যস্ত হইয়া বলিল,—

"কি মা—"

'বাবা, বৌমাকে একবার নিয়ে আয়। আমিও আর বেশী দিন বাঁচিব না।"

"তারা কি মা আনতে দেবে ?"

বৃদ্ধার রোগ-যাতনা-ক্লিষ্ট বদনে কালিমাচিহ্ন দেখা দিল। তিনি বলিলেন,—"আমি ত দুই এক দিনের মধ্যেই মরিব। এ সময়েও কি তারা ছাড়িয়া দিবে না ?"

"না মা, তুমি মরিবে কেন ?" নিবারণ আর কথা কহিতে পারিল না,—বালকের মত কাঁদিতে লাগিল। বৃদ্ধা, তাহার ক্ষীণ বিকম্পিত হস্তখানি পুত্রের হস্তের উপর রাখিয়া বলিল,—

"গোপাল, কাঁদিও না। আমার ত এখন মরিতে পারিলেই সুখ। যেমন করিয়াই হউক, একবার বৌমাকে আনাও। আজ না হয় বেদগ্রামে একজন লোক পাঠাও।"

নিবারণ তৎক্ষণাৎ বেদগ্রামে লোক পাঠাইল।

পরদিন বিকালবেলা বেদগ্রাম হইতে সংবাদ আসিল। হরিহর মুখোপাধ্যায়ের একজন গোমস্তা লিখিয়াছে,—

'শ্রীচরণেষু—

কর্ত্তামহাশয় বলিলেন যে, শ্রীমতীকে এখন পাঠাইবার সুবিধা নাই। আপনি যে,কোন প্রকারে হউক,আপনার মাতা ঠাকুরাণীকে সঙ্গে লইয়া এখানে আসিবেন। আমরা অন্যান্য বন্দোবস্ত স্থির রাখিব। শ্রীচরণে নিবেদন ইতি।

সেবক—

শ্রীবামনচন্দ্র পাল

যখন এই পত্রখানি রামনগরে আসিল, তখন বৃদ্ধার বিকার হইয়াছে। নিবারণ পত্রখানি দুই তিন বার পাঠ করিল, তার পর উহা সহস্র খণ্ড করিয়া অগ্নিমধ্যে নিক্ষেপ করিল। যাঁহারা তথায় উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা নিবারণকে কিছু জিজ্ঞাসা করিতে সাহস পাইলেন না।

রজনী তখন দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইয়াছে। বৃদ্ধার একটু জ্ঞানসঞ্চার হইতেছিল। তিনি বিজড়িত ক্ষীণকণ্ঠে ডাকিলেন,—

"গো-পা-ল—বৌ—"

"কি মা—" বলিয়া নিবারণ নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। বৃদ্ধা যেন কি বলিতে চাহিল।—তাহার মুখের মাংস-পেশীগুলি এক একবার কুঞ্চিত ও বিস্ফারিত হইতে লাগিল। কিন্তু সেই প্রাণপণ-চেষ্টা ব্যর্থ হইল—কথা ফুটিল না। চক্ষু কপালে উঠিল—হস্ত মুষ্টিবদ্ধ হইল—মুহূর্ত্তমধ্যে সব ফুরাইল। বৃদ্ধার ব্যথিত-প্রাণ ব্যথা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিল।

* * * *

এতদিনের প্রাণপণ পরিশ্রম, অনিয়ম ও অনিদ্রায় নিবারণ অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। সেই রাত্রিতেই তাহার বড় জ্বর হইল। সরযূর স্নেহের নিবারণ, বৃদ্ধার বড় আদরের গোপাল—সেই অন্ধকার নির্জ্জন গৃহে, জননীর সেই মৃত্যু-শয্যার উপর একটা ব্যথিত বেদনা, মর্ম্মাহত স্মৃতি, হতাশ আকাঙ্ক্ষা বুকে করিয়া—অবসন্ন বিগতচেতন হইয়া পড়িয়া রহিল।

এখন কোথায় তুমি সরযূ!

(৫)

কোথায়—কোথায়? সে আছে কোথায়? প্রাণের প্রাণ, হৃদয়ের হৃদয়, নয়নের মণি, জীবনের সুখ, সুখের শান্তি—সে আছে কোথায়! সেই ত সকলি আছে। সেই চাঁদ, চাঁদের সেই হাসি—সেই কুঞ্জবন, কুঞ্জবনে সেই গন্ধভরা অন্ধকার—সকলই ত আছে; কিন্তু সে আছে কোথায়? মাথার উপর ঐ ত সেই সুনীল-সাগর-চুম্বী সুন্দর নিরভ্র গগন, ঐ ত সেই অসংখ্যতারকা-হারাবলী-শোভিত গগনতল—সেই চন্দ্রকরোজ্জ্বল ধরণী—ঐ ত সেই মৃদুমন্দবাহিনী মধুর-কলনিনাদিনী কল্লোলিনী। সে দিনও যেমন ছিল, আজিও ঠিক তেমনি আছে। তবে সে আছে কোথায়!

সব আছে—কেবল সে-ই নাই। সে দিন যে গিয়াছে আর সে আসিল না,—বুঝি আর ফিরিবে না। আমি কি করিয়াছিলাম?—কেন এমন হইল?—কেন আমি সব হারাইলাম? কেন এই অকূল-সাগরে ভাসিলাম?

হৃদয়ের অন্তস্থল হইতে একটী কাতর-নিশ্বাসকে টানিয়া আনিয়া আপন মনে রুগ্না সরযূ বলিল,—"কি জানি কেন?"

আজ দীর্ঘ ছয়টী বৎসর নিবারণ যেন কোথায় চলিয়া গিয়াছে। কেহ জানে না, কেহ বলিতে পারে না। সরযূ কত আকুলভাবে রজনী একাকিনী জাগিয়া কাটাইয়াছে,—কাঁদিয়া কাঁদিয়া জাগিয়াছে। কে তাহা বুঝিবে?

কে তাহা শুনিবে! কে সে চিতার অনল নির্ব্বাপিত করিবে? এ যাতনা যে বলিয়া বুঝাইবার নহে।

সরযূ কাঁদিয়া ফেলিল,—অমন কত সময় কাঁদিত। একটী আকুল রুদ্ধ মর্ম্মবেদনার কাতর উচ্ছ্বাস নিশিদিন সরযূর হৃদয়মধ্যে কাঁদিয়া কাঁদিয়া উছলিয়া উঠিত।

এখন কোথায় তুমি নিবারণ।

(৬)

ভারতের উত্তরসীমান্ত সমর শেষ হইয়াছে। দুরন্ত আফ্রিদি, ব্রিটিশ সিংহের পরাক্রম সহিতে পারিল না,—গৃহবিতাড়িত হইয়া পর্ব্বত হইতে পর্ব্বতান্তরে লুক্কায়িত হইল। জেনেরাল লকহার্ট্ দেখিলেন, আর অধিক সৈন্য সীমান্তে রাখিবার প্রয়োজন নাই। তখন আবশ্যকমত কয়েক রেজিমেণ্ট মাত্র রাখিয়া, তিনি অবশিষ্ট সৈন্যদিগকে ফিরিয়া যাইতে আদেশ করিলেন।

ব্রিটিশবাহিনী "হিপ্ হিপ্ হুর্‌রে" করিয়া "Rule Britania" গাহিতে গাহিতে, হিমালয়ের তুষার-ধবল শৃঙ্গ হইতে শৃঙ্গান্তর পর্য্যন্ত কম্পিত করিয়া, পর্ব্বতের বুকে বুকে কামান দাগিতে দাগিতে, বিজয়নিশান উড়াইয়া, প্রত্যাবর্ত্তন করিতে লাগিল।

কেনী সাহেব আফ্রিদিযুদ্ধে একজন প্রধান রিপোর্টার হইয়া গিয়াছিলেন। কেনী ইংরাজ-সৈন্যের সহিত ফিরিলেন না। হিমালয়ের সেই মহান্ বিপুল নগ্ন সৌন্দর্য্য দর্শন করিবার জন্য, সামান্য কয়েকজন অনুচরমাত্র লইয়া, তিনি ভিন্ন-পথে কলিকাতা যাত্রা করিলেন।

একদিন হিমালয়ের একটী শ্যামল সমতলক্ষেত্রে কেনী সাহেবের তাম্বু পড়িয়াছে। তাম্বুর দশহস্তমাত্র দক্ষিণেই পর্ব্বতের লৌহকঠিন হৃদয়াভ্যন্তরাল-নিঃসৃতা স্বর্গের অমৃত ধারা, কুলু কুলু কল-নাদে, একটীর পর আর একটী করিয়া, বিক্ষিপ্ত উপলখণ্ড অতিক্রম করিয়া, লাফাইতে লাফাইতে চলিয়া যাইতেছে। আর সেই চন্দ্রকরোদ্ভাসিত হিমালয়ের উন্মুক্ত বক্ষ, হিমতুষারাচ্ছাদিত উজ্জ্বল শৃঙ্গ, সেই সহস্রভুজ প্রসারী অনন্ত পাদপ শ্রেণী—সেই স্তব্ধ, মৌন, শান্ত, পার্ব্বত্য-প্রদেশ সকলের মনে বিশ্বনিয়ন্তার উদার বিপুল-হৃদয়ের একটী মহান্ ভাব জাগাইয়া দিতেছে। কেনী সাহেব সংসার ভুলিয়া, প্রকৃতির এই বিচিত্র চিত্র দেখিতেছিলেন, এমন সময়ে সেই নিস্তব্ধ পর্ব্বত, অন্ধকার বনশ্রেণী, রজত-রশ্মি-বিধৌত মুক্ত আকাশ বিকম্পিত করিয়া শব্দ হইল—"গুড়্ গুড়্ গুড়ুম্ গুম্!" পর্ব্বতের বক্ষে বক্ষে, শৃঙ্গে শৃঙ্গে, অধিত্যকায় উপত্যকায় সেই শব্দ ধ্বনিত হইয়া উঠিল। পরমুহূর্ত্তেই আহত কেনী সাহেব মূর্চ্ছিত হইয়া, সেই শ্যামল-তৃণের কোমল-শয্যায় আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

মিঃ কেনী যে স্থানে আহত হইয়াছিলেন, তথা হইতে ১০ ক্রোশ দক্ষিণে স্বয়ং লক্‌হার্ট অবস্থান করিতেছিলেন। তাঁহাকে সংবাদ দেওয়া হইল। সেই গুপ্তশত্রু সঙ্কুল দুর্গম পর্ব্বতের কঠিন বুকের ভিতর যতদূর সুচিকিৎসা হওয়া

সম্ভব, তাহার ত্রুটি হইতেছিল না। কিন্তু কোন ফলই হইল না;—আঘাত বড় গুরুতর লাগিয়াছিল।

সাহেব ডাকিলেন—"বাবু, মিঃ লক্‌হার্টকে সংবাদ দাও।" 'বাবু' তাহাই করিল।

জেনেরাল নিকটে আসিলে কেনী সাহেব বলিলেন—

"মিঃ লক্‌হার্ট, আমি বোধ হয় আর বাঁচিব না। এ সংসারে আমার আপনার বলিতে কেহই নাই। আমার এই বাবুকে আমি একদিন কলিকাতার রাস্তায় কুড়াইয়া পাইয়াছিলাম,—সে আজ ৫।৬ বৎসরের কথা। আমার মৃত্যুশয্যাতেও বাবুর ভ্রাতৃতুল্য শুশ্রূষা আমাকে অনেকখানি শান্ত রাখিয়াছে। স যাহা হউক, আপনি সাক্ষী রহিলেন, London Bankএ আমার ১০০০০ দশ সহস্র মুদ্রা আছে। আমি তাহা আমার বাবুকে দিলাম। বাবুর ঋণ কখনও পরিশোধ করিতে পারিব না। আপনি নিবারণকে দেখিবেন। আমার বড় দুঃখ রহিল যে, যুদ্ধক্ষেত্রে আমার মৃত্যু হইল না।"

মিঃ কেনী আর অধিকক্ষণ জীবিত ছিলেন না। জেনেরাল লক্‌হার্ট যথাযোগ্য সম্মানের সহিত তাঁহার অন্তিমকার্য্য সম্পন্ন করিয়া, কেনী সাহেবের কাগজপত্র ও লোকজনসমেত কলিকাতায় ফিরিলেন।

(৭)

"সই। আর বুঝি দেখা হইল না। তুমিত রোজই বল তিনি আসিবেন। কই সই, আর আসিলেন না?"

সরযূ, কমলার ক্রোড়ে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিল। কমলের চক্ষুও জলে ভরিয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু নয়নের বারি নয়নে নিবারণ করিয়া কমলা কহিল—

"আমার মনে হয় সকালেই আসবেন। তুমি হতাশ হইও না।"

রামনগরের একটী নিভৃত নির্জ্জন অর্দ্ধভগ্ন কক্ষমধ্যে কমলা ও সরযূ কথোপকথন করিতেছিল। কক্ষটী একটী মৃণ্ময় প্রদীপে ক্ষীণ আলোকে আলোকিত। ঘরের মেজেতে একটী ছিন্ন মলিনশয্যার উপর রুগ্না দুর্ব্বলা ব্যথিতা সরযূ শুইয়াছিল। শয্যা-পরিবর্ত্তনের কথা কহিলেই সরযূ কহিত, 'আমি দরিদ্রের পত্নী, দরিদ্রের পুত্র-বধূ, আমার এই ভাল।'

অনেকক্ষণ পর কমলা কহিল, "সই, আর কতদিন এ ভাবে চলিবে। তোমার মার কাছে বেদগ্রামে একটা সংবাদ দি। যে গহনা ছিল, তাহা ত প্রায় ফুরাইয়া আসিয়াছে।"

কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া সরযূ কহিল,—"না সই, খবর দেওয়া হইবে না। তোমরাই ত আমায় যথেষ্ট স্নেহ করিতেছ। বেদগ্রামে আর সংবাদ দিয়া কাজ নাই। আজ তিন বৎসর ধরিয়া আমরা রামনগরে আসিয়াছি, সুযোগ পাইলেই মা আমার খবর লইতেন। কিন্তু বাবা সে জন্য তাঁকে কত কষ্ট দিয়া থাকেন। আর খবর দিয়া কাজ নাই। আমি ত দরিদ্র—অনাহার বলিয়া এত ভয় কিসের?"

একটী অব্যক্ত মর্ম্ম-বেদনার কাতর-নিশ্বাস এক এক বার সরযূর শতক্ষত-পরিপূর্ণ বেদনামথিত হৃদয়খানি চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া বাহির হইতে চাহিতেছিল। সরযূ কহিল—

"সই, আমার বুকটা একটু চাপিয়া ধর। হঠাৎ বড় ব্যথা বোধ হইতেছে।"

সরযূ চক্ষু মুদ্রিত করিল।

বেদনা একটু কমিলে পর ক্ষীণকণ্ঠে সরযূ ডাকিল—"সই—!"

"কি সই—!"

"একটী কথা তোমাকে বলিয়া রাখি। আর ত দেখা হইল না। বলিও তাঁহার গৃহেই আমি মরিলাম। বলিও সই—বলিও—আমি প্রথমে বুঝিতে পারি নাই, তাই আমার অদৃষ্ট এমন করিয়া ভাঙ্গিল। আমি তাঁহার জন্যই পিতৃ-গৃহ হইতে পলাইয়া এখানে—"

"সরযূ—"

ও কে? ও কার কণ্ঠ? সরযূ উন্মাদিনীর মত চাহিতে লাগিল। আবার সেই কম্পিতকণ্ঠ ডাকিল,—

"সরযূ—"

আপন ব্যথিতবক্ষ দুই হস্তে চাপিয়া ধরিয়া সরযূ কাতরকণ্ঠে ডাকিল, "সই—!"

আবার! আবার সেই কণ্ঠ!—

"সরযূ—!"

বিরহ-বিধুরা শ্রীরাধিকার কর্ণমূলে শ্যামের সেই লুকানো বাঁশীর চেনা সুর যেন বাজিয়া উঠিল!

* * * *

পরমুহূর্ত্তেই ঘর্ম্মাক্তকলেবর নগ্নদেহ নিবারণ কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল; তাহার আর দ্বিতীয় পরিধেয় বস্ত্র পর্য্যন্তও সঙ্গে ছিল না। সে সমস্তই তখন বেদ-গ্রামে পড়িয়া রহিল।

* * * *

শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য, বি., এ.।

আরতি।

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনা।

তৃতীয় বর্ষ।] ময়মনসিংহ, পৌষ ও মাঘ, ১৩০৯। [৭ম ও ৮ম সংখ্যা।

ফটিক জল।

"যখন যে দিকে চাই, কেবলি দেখিতে পাই
'পিপাসা' 'পিপাসা' লেখা জলন্ত ভাষায়।
শ্রবণে কে যেন ঐ পিপাসা বাজায়"

নিরদয় নিদাঘের মারাত্মক মধ্যাহ্নে প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডময়ূখমালায় বিদগ্ধ হইয়া এক অভ্রভেদী অত্যুচ্চ অশ্বত্থ মহীরুহ-মূলে উৎকণ্ঠায় উপবেশন পূর্ব্বক শ্রান্তিতে শান্তি অনুভব করিলাম। অনন্ত আকাশের দিকে নয়নদ্বয় নিপতিত করিয়া দেখিলাম, অষ্টমাসকালব্যাপী অনাবৃষ্টি-নিবন্ধন আকাশে যেন আগুন জলিতেছে এবং পঞ্চভূতময়ী পৃথিবী যেন লৌহবৎ নীরস, বিরস ও কঠিন হইয়া গিয়াছে। দেখিতে দেখিতে আকাশের কোণে এক ক্ষুদ্র মেঘের উদয় হইল; মেঘের ছায়ায় দিনমণি লুপ্ত হইয়া গেল। ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় মেঘাবৃত সূর্য্য হীনতেজ হইল বটে, কিন্তু তাহাতে উষ্ণতা অনুভূত হইল না। মেঘের অভ্যন্তর হইতে দিবাকর আবার দেখা দিল, আবার আবৃত হইয়া গেল। দেখিতে দেখিতে কাল মেঘের কোলে সৌদামিনী সতী আসিয়া হাসিলেন, সেই কৃষ্ণত্বের কোলে হিরণ্ময়ত্ব বড়ই শোভাকর! মৃত্যুদশাগ্রস্ত রোগীর ক্ষীণ-হাস্যের ন্যায় মেঘের মৃদুমধুর হাসির আলোকে দেখিলাম, সেই কাল-মেঘের কোলে একটি শুভ্রকায় ক্ষুদ্র পক্ষী উড়িয়া উড়িয়া, ঘুরিয়া ঘুরিয়া, দৌড়িয়া দৌড়িয়া তানলয় সহকারে সুস্বরে স্বর্গীয় গীত গাহিতে গাহিতে দিকদিকন্ত প্রতিধ্বনিত করিতেছে। নিরাশার তামসে আশার আনন্দময় আলোক আসিলে, মনে যেমন আহ্লাদ হয় অথবা তামসী রজনীতে তরুশাখায় তমোমণির (খদ্যোতের) দীপ্তি যেমন আনন্দের কারণ হয়, আকাশের কোণে

মেঘের উদয় দেখিয়া উৎকণ্ঠা পরিত্যাগ পূর্ব্বক এই বিমানবিহারী বিহঙ্গ উৎফুল্লতায় উৎফাল দিতে প্রবৃত্ত হইল। মেঘের পাদদেশে মস্তক রাখিয়া বিহঙ্গরাজ বলিল, 'ফটিক জল' 'ফটিক জল'। মেঘের মধ্যে বিজলী সুন্দরী আবার হাসিল, সেই হাসিতে ক্ষুদ্র মেঘ বিহঙ্গের প্রার্থনাকে তামাসায় উড়াইয়া দিল। "জলং দেহি" "জলং দেহি" বলিয়া বিহঙ্গবর বারবার ডাকিতে লাগিল, মেঘের পদপ্রান্তে মাথা রাখিয়া কত কি অনুনয় বিনয় করিল, কিন্তু নিদাঘের নির্দ্দয় মেঘ সে কথায় কর্ণপাত করিল না; দৃঢ়প্রতিজ্ঞ পাখী আবার বলিল, 'ফটিক জল' 'ফটিক জল'। এই ক্ষুদ্র পাখির নাম চাতক। 'ফটিক জল' 'ফটিক জল' রবে অনন্ত আকাশ প্রতিধ্বনিত হইল, চাতকের তানলয়সমন্বিত সুস্বরে দেবলোক পর্য্যন্ত মধুময় হইয়া উঠিল, কিন্তু নিদাঘের নির্দ্দয় মেঘ তাহাতে বিগলিত হইল না; কাতরকণ্ঠ পাখির করুণস্বরে মেঘের প্রাণ গলিবে কেন? নির্দ্দয়ের নীরস হৃদয় কভু কি কাতরের কাতরোক্তিতে গলিয়া থাকে? অনন্ত আকাশের কোলে ঘনকে প্রেমিক ভাবিয়া চাতকিনী কুহকিনী হয় বটে, কিন্তু স্ত্রীলোকের সরলতা অপেক্ষা পুরুষের কঠোরতা কঠিনতর।

পাখী আবার ডাকিল, 'ফটিক জল' 'ফটিক জল'। পাখির পুনঃ পুনঃ চীৎকারে প্রতিধ্বনিত হইয়া নভোমণ্ডল মুখব্যাদন পূর্ব্বক কহিল, "রে নির্ব্বোধ বিহঙ্গ! অনাবৃষ্টি বশতঃ আমি নীরস ও বিরস হইয়া আছি, আমার নিকটে জল প্রার্থনা করা মূর্খতার পরিচায়ক মাত্র।" চাতক কহিল, 'ফটিক জল' 'ফটিক জল'। ক্ষুদ্র বিহঙ্গের অমিত অধ্যবসায়, সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞা এবং অসাধারণ কষ্টসহিষ্ণুতা দেখিয়া ভয়প্রদর্শন পূর্ব্বক বিমানদেব বলিল, প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডের ময়ূখমালায় তুমি বিদগ্ধ হইয়া যাইবে; ক্ষুদ্র বিহঙ্গ! আকাশে জল নাই, মর্ত্ত্যে জল থাকে"। 'ফটিক জল' 'ফটিক জল' রবে পাখী কহিল, "মর্ত্ত্যের জল অপবিত্র এবং অস্পৃশ্য, আমি স্বর্গের নিষ্কলঙ্ক ফটিক জলের প্রত্যাশী," কলঙ্কিত মর্ত্ত্যসলিলে আমার প্রয়োজন নাই।" পাখী আবার ডাকিল 'ফটিক জল' 'ফটিক জল'। পিপাসিত পাখির মধুর ফটিক জলরবে জলদ হইতে জল পতিত হইল না বটে, কিন্তু স্বর্গ হইতে দেবতারা পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন, দেবলোকের সতীদেবিগণ ধন্য ধন্য বলিয়া আশীর্ব্বচন প্রয়োগ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। আকাশকে সম্বোধন করিয়া চাতক বলিল,—

"পল্বলেষু সরসীষু অম্বুধৌ
জীবনং ন চ শিরোনতিং বিনা।
ইত্থমেব জলদং প্রতীক্ষতে
মানবজীবন ধনোহি চাতকঃ॥"

ক্রোধে তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া সিংহনাদে—বজ্রগম্ভীর স্বরে—মেঘ বলিল, রে নির্ব্বোধ বিহঙ্গ! সাগরে, সরোবরে, নদে, নদীতে, তড়াগে, দীর্ঘিকায়, খালে, ঝিলে নির্ম্মল জলের অভাব নাই, তুমি মর্ত্ত্যধাম পরিত্যাগ করিয়া এই প্রচণ্ড নিদাঘের রৌদ্রে দগ্ধ হইয়া বিমানপথে কেন কষ্ট পাইতেছ? আমার ভাণ্ডারে জল নাই, মর্ত্ত্যে গিয়া সুশীতল ও সুনির্ম্মল সলিলপানে পিপাসা দূর করা তোমার পক্ষে সহজ। 'ফটিক জল' 'ফটিক জল' রবে চাতক উত্তর দিল—

"কি সাগর কি পল্বল কিবা সরোবর।
রহে সুপ্রচুর জল তাহে নিরন্তর॥
চাতক তথায় যদি করে জলপান।
মাথা হেঁট হবে তায়, হয় অপমান॥
তাই সে মেঘের পানে তাকাইয়া রয়।
মান চাতকের প্রাণ, জানহ নিশ্চয়॥"

ক্রমে পশ্চিম দিক হইতে প্রবল বাত্যা উত্থিত হইল, বায়ুর আন্দোলনে ক্ষুদ্র মেঘ ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। জলদ হইতে জলের আশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক পিপাসিত পাখী (চাতক) মর্ত্ত্যধামে নামিয়া আসিল, মর্ত্ত্যের জল সে স্পর্শও করিল না। পাখির পিপাসা মিটিল না; পিপাসিত চাতক প্রবল পিপাসায় প্রাণ পরিত্যাগ করিল। কাতরকণ্ঠ চাতকের প্রবল পিপাসা স্বর্গধামে পরিতৃপ্ত হয়, মর্ত্ত্যে হয় না। মহতের—ধার্ম্মিকের—মহাবীরের প্রতিজ্ঞা ও অধ্যবসায় ঠিক চাতকের মত। ক্ষুদ্র চাতকের 'ফটিক জল' তানে মহতের মহান্ প্রাণকে শীতল করে। হায়! যে দেশে চাতক নাই, সে দেশ কি হতভাগা! হায়! যে আকাশে চাতক উড়ে না, সে আকাশ কি অপবিত্র!! ঐ দেখ, ঐ দেখ মর্ত্ত্যের মৃত চাতক দেবলোকে গিয়া পিপাসিত মানবের দিকে তাকাইয়া শিখাইয়া দিতেছে, "মর্ত্ত্যের জল মলিন, মর্ত্ত্যের জল মলিন; যদি পিপাসা পরিতৃপ্ত করিতে চাও, তবে এক মাত্র ভরসা—স্বর্গের স্ফটিক জল, স্ফটিক জল, স্ফটিক জল।"

আকাশের চাতক আকারে ক্ষুদ্র হইলেও চরিত্রে মহান। চাতকের

চরিত্র অনুকরণ করিবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত। ক্ষুদ্র চাতকের অধ্যবসায়, পরিশ্রম-পরায়ণতা, দৃঢ়প্রতিজ্ঞা, কষ্টসহিষ্ণুতা, আত্মমর্য্যাদা জ্ঞান প্রভৃতি অনুকরণের বিষয়। চাতকচরিত্র অতি চমৎকার! চাতকচরিত্র শিক্ষার ভাণ্ডার!! হিন্দুর সতী সাধ্বী গৃহলক্ষ্মী ঐ চাতকিনীর অনুরূপা। হিন্দুর পতিপ্রাণা সতীলক্ষ্মী সুখে দুঃখে, সম্পদে বিপদে, আশায় নিরাশায়, ইহলোকে পরলোকে "পতিকুলে ধ্রুব" থাকিয়া সতী জীবনের সার্থকতা সম্পাদন করেন। পিপাসিত চাতকের মেঘের ফটিক জল বিনা পিপাসার শান্তি হয় না, হিন্দু-রমণীর ধর্ম্মসঙ্গত এক পতি ভিন্ন অন্য পতিতে প্রবৃত্তি বা পরিতৃপ্তি নাই, হিন্দুরমণী যাঁহাকে একবার দেহ, মন ও আত্মা সমর্পণ করিয়াছেন, তাঁহাকে প্রাণের প্রাণ, আত্মার আত্মা ভাবে নিজের সর্ব্বস্ব করিয়া রাখিয়াছেন, এই জন্য কৃতান্তদূত সম্মুখেও সতি সাবিত্রী মৃত পতি সত্যবানের পবিত্র শরীর স্বকীয় ক্রোড়ে লইয়া উপবিষ্ট! হিন্দু সতী মৃত পতির জ্বলন্ত চিতায় জীবন্ত দশায় পুড়িয়া মরিতে পারে, কিন্তু চাতক-চরিত্র ছাড়িতে পারে না; যবন শাসনকালে অসংখ্যাসংখ্য চিতায় অসংখ্যাসংখ্য রাজপুত ও ক্ষত্রিয়-রমণী পুড়িয়া মরিয়া পবিত্র স্বর্গলোকে সৌরভ বিস্তার করিয়াছিল, কিন্তু তথাচ চাতকচরিত্র ছাড়ে নাই। হিন্দুর নগরে নগরে, গ্রামে, গ্রামে, গৃহে গৃহে চাতক চরিত্রের সহধর্ম্মিণী ছিল বলিয়া হিন্দুসমাজ এত প্রাচীন, এত পবিত্র এবং এত সুদৃঢ়। হিন্দুগৃহে এখনও কোটি কোটি চাতকিনী আছে বলিয়া হিন্দুর হিন্দুত্ব এখনও লুপ্ত হয় নাই। পবিত্র হিন্দু গৃহ হইতে যে ব্যক্তি চাতকিনীর বৃত্তি ও প্রবৃত্তি নাশ করিতে চায়, সে ব্যক্তি হিন্দুর পরম শত্রু, সে ব্যক্তি সতী স্ত্রী-সমাজের পরম বৈরী এবং ভারতের মহা অনিষ্টকর দুষ্মণ। স্বামীর দিকে চাহিয়া হিন্দুর গৃহগগনে সতী চাতকিনীর 'ফটিক জল' 'ফটিক জল' তান রব বড়ই মধুর, বড়ই পবিত্র, বড়ই শ্রুতিসুখকর! হিন্দুস্ত্রী, সধবা বিধবা এই উভয় অবস্থাতেই চাতকিনীর অনুরূপা। ত্রিদিবসঞ্জাত ফটিকজল ভিন্ন মর্ত্ত্যের মলিন সলিলে তাঁহার তৃপ্তি হয় না। হিন্দুরমণী অরুন্ধতীর ন্যায় প্রেমিকা, ধ্রুব নক্ষত্রের ন্যায় নিশ্চলা। হিন্দুর ইতিহাস, সমাজ, ধর্ম্ম, রাজনীতি, আচার ব্যবহার, যে দিক দিয়াই দৃষ্টিপাত করি, চাতক চরিত্রের মহাপুরুষের মহিমান্বিত মূর্ত্তি দেখিয়া মোহিত হই। সংসারে বৈরাগ্যে, জীবনেমরণে, হিন্দুর "ফটিক জল," "ফটিক জল" রব লোপ পায় না। হিন্দুর ধর্ম্মপিপাসা বড়ই প্রবলা। হিন্দুধর্ম্মের উপরেই

হিন্দুর সমগ্র জীবন এবং জীবনান্তে সমগ্র পরলোক প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু হিন্দুর পিপাসা কখন মর্ত্ত্যের মলিন জলে পরিতৃপ্ত হয় নাই। সাংসারিক অথবা ঔদাসিক যে ভাবেই হিন্দুর জীবন আলোচনা করিয়া দেখ, হিন্দু চিরকালই চাতক চরিত্রের অনুকরণ করে। প্রাচীন ভারতাকাশে অসংখ্য চাতক ছিল এবং বর্ত্তমান ভারতগগনে এখনও অনেক চাতক ও চাতকিনী আছে বলিয়া, ভারতভূমির নাম পৃথিবীর মানচিত্র হইতে লোপ পায় নাই, ভারতভূমি ভারত মহাসাগরের অতলগর্ভে নিমগ্ন হয় নাই এবং এক সহস্র বর্ষাধিক বিদেশীয় শাসনেও হীনবীর্য্য হিন্দু "গজভুক্ত কপিথ"বৎ অসার হইয়া যায় নাই।

দানশক্তিতে দয়াময় দাতাকর্ণের আশ্চর্য্য চাতক-চরিত্র অবলোকন কর, ইনি স্বহস্তে স্বপুত্রের মস্তকচ্ছেদন করিয়া অতিথির সৎকার এবং ক্ষুধিতের ক্ষুধা নিবারণ করেন। ইনি নিজের অটল প্রতিজ্ঞা হইতে স্খলিতপদ হয়েন নাই। ভক্তাধিক ভক্ত প্রহ্লাদের অধ্যবসায় ও প্রতিজ্ঞা আরও চমৎকার; অনলে অনিলে, সলিলে বৃহিলে, সিংহমুখে, হস্তীপদতলে, অমর প্রহ্লাদ স্বীয় প্রতিজ্ঞা পরিত্যাগ করে নাই। বালক ধ্রুবের চাতক-চরিত্র ভূতলে অতুল। ভ্রাতৃভক্ত ভরতের রামভক্তি, ঠাকুর লক্ষ্মণের অগ্রজসেবা এবং অশোক-কাননে অবরুদ্ধা মা জানকীর রামপদে আত্মোৎসর্গ, চাতক ও চাতকী-চরিত্রের অনুরূপ। রাজীবলোচন রামপ্রাণা সীতা সতীর উদ্ধারার্থে সাগর-বন্ধন, অমিত কষ্ট স্বীকার, অসাধারণ অধ্যবসায়, অটল প্রতিজ্ঞা প্রভৃতির হনুমানই অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত, কারণ গুরুপদভক্ত আত্মোৎসর্গ হনুমান সেকালের ভারত-গগনে চাতকরূপে বর্ত্তমান ছিলেন। নানক, শিবজি, গুরুগোবিন্দ প্রভৃতি ভারত-চাতক ছিলেন না কি? "ফটিক জল, ফটিক জল" এই তানে ইঁহারা "স্বধর্ম্মে মরণং শ্রেয়স্কর তথাপি ভয়াবহ পরধর্ম্মের অবলম্বন অশ্রেয়ঃ" এই মহামন্ত্রে অনুপ্রাণিত হইয়া গো, ব্রাহ্মণ, গঙ্গা, গায়িত্রী, বেদ, স্বধর্ম্ম ইত্যাদির মর্য্যাদা রক্ষণ জন্য আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন। চাতকের চরিত্র কি সুন্দর, কি পবিত্র !!

বীরপ্রসূতি রাজপুতনার প্রতাপসিংহ ভারতগগনের অতি সুন্দর চাতক। হিন্দুর রাজনৈতিক-গগনে এমন কয়টি চাতক দেখা যায়? দেবাসুর যুদ্ধে দধীচি মুনি দেবতাদিগের ধর্ম্মরক্ষা দ্বারা ন্যায়ের রাজ্য স্থাপন, অত্যাচারের দমন এবং নিরপরাধীকে অভয়দান করিবার জন্য, হাসিতে হাসিতে স্বকীয়

পৃষ্ঠদেশস্থ অস্থি উঠাইয়া বজ্র নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন, আর প্রতাপসিংহ যথাসর্ব্বস্ব উৎসর্গ করিয়া অনাহারে, অপমানে, পিপাসায়, কষ্টে, কাতরতায় দারিদ্র্যদুঃখে বনে বনে কাঙ্গাল বেশে পরিভ্রমণ করিয়া স্বদেশোদ্ধারে প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়াছিলেন, তথাপি মুসলমানের প্রলোভনে বশীভূত হইয়া স্বদেশ, স্বজাতি ও স্বধর্ম্মকে জলাঞ্জলি দেন নাই। বনের ফল, ঝরণার জল, এবং ভীলের লবণ ইহার গ্রহণীয় ছিল; মুসলমানের প্রদত্ত ধন-ধান্য ও মান-সম্মান ইনি তুচ্ছ করিয়াছিলেন। পরাধীনতার প্রচুর জলে ইহাঁর পিপাসা পরিতৃপ্ত হইবে কেন? ইনি স্বাধীনতার এক বিন্দু ফটিকজলে পিপাসার পরিতৃপ্তি করিতে পারিতেন। দেশোদ্ধারে চাতকের চরিত্র কি সুন্দর, চাতকের প্রতিজ্ঞা কত মধুর এবং চাতকের কষ্টসহিষ্ণুতা ও অধ্যবসায় কেমন শিক্ষার উপযুক্ত!! স্বদেশের, স্বজাতির সমগ্র জগতের কল্যাণার্থে চাতকচরিত্রের অনুকরণ একান্ত আবশ্যক।

আকাশস্থ মেঘের ফটিক জলে পিপাসিত চাতকের পিপাসা মিটিয়া যায় বটে, কিন্তু সমগ্র সংসারের পিপাসা কভু মিটিয়াছে বা মিটিতে পারে কি? দেখিতেছ না, সমস্ত বিশ্বসংসার কেমন আশ্চর্য্যরূপে পিপাসু! পিপাসাই সমগ্র জগতের পালনের উপায়, পিপাসা না থাকিলে জগতের গতি বন্ধ হইয়া যাইত। কেবল কি চাতকই পিপাসু? পিপাসা কাহার নাই? দেখিতেছ না, এই জগত পিপাসাময়, দেখিতেছ না, এই জগত পিপাসা ও পিপাসার ধ্বনিতে প্রতি পদে পদে প্রতিধ্বনিত। পিপাসা কাহার নাই? ধনীর ধন-পিপাসা, মানীর মান-পিপাসা, বিদ্বানের জ্ঞান-পিপাসা,—সকলই পিপাসা, সকলই পিপাসাময়!!

"যখন যেদিকে চাই, কেবলি দেখিতে পাই,
পিপাসা পিপাসা লেখা জলন্ত ভাষায়।
শ্রবণে কে যেন ঐ পিপাসা বাজায়॥"

"নিশীথ সময়ে গৃহছাদে উঠিলাম। আকাশমণ্ডল পরিষ্কার ছিল, কোটি কোটি চন্দ্র তারকা হীরকপ্রভায় জ্বলিতেছিল। আমার পোড়া চক্ষে দেখিলাম—ঐ তারকা-অক্ষরে লেখা—"পিপাসা, পিপাসা।" * * দেখিলাম, এই বিশ্বজগত সত্যই পিপাসু।'

"কুসুমকাননে আমি কি দেখিতে পাই? কুসুম হেলিয়া দুলিয়া বলে, "পিপাসা, পিপাসা।"' লতায় পাতায় লেখা "পিপাসা।" কুসুমের

মনোমোহিনী মৃদু হাসি, আমি দেখি না। আমি দেখি, কুমুদের সুধাংশু-পিপাসা।"

বিহগ-কূজনে আমি কি শুনিতে পাই? ঐ পিপাসা আর পিপাসা!! ঐ একই শব্দ নানা স্বরে নানা রাগে শুনি;—প্রভাতে ভৈরবী, নিশীথে বেহাগ, কিন্তু কথা একই। কোকিল যে ডাকিয়া উঠে "কুহু"—ঐ কুহুস্বরে শত প্রাণের বেদনা হৃদয়ের পিপাসা ঝরে!"

"চল হৃদয়, তবে নদীতীরে যাই,—সেই খানে হয়ত পিপাসা নাই। কিন্তু ঐ শুন! স্নিগ্ধ সলিলা গঙ্গা কুল কুলস্বরে গাহিতেছে—পিপাসা, পিপাসা! আপন মনে গাহিয়া বহিয়া যাইতেছে। এ কি! তুমি স্বয়ং জল, তোমার আবার পিপাসা কেমন? উত্তর পাইলাম, 'সাগর-পিপাসা'। আহা! তাই ত সংসারে তবে সকলেই পিপাসু? হইতে পারে, সাগরের—যাহার চরণে জাহ্নবী! তুমি আপনাকে ঢালিয়াছ, তাহার পিপাসা নাই। তবে দেখা যাউক।"

"একদিন সিন্ধুতটে সিক্ত বালুকার উপর বসিয়া সাগরের ঢেউ গণনা করিতেছিলাম। তরঙ্গমালা কি যেন যাতনায়, কি যেন বেদনায় ছটফট করে—গড়াইয়া গড়াইয়া আছাড় খাইয়া পড়ে। তাহাদের এই অস্থিরতা, আকুলতা, কিসের জন্য? সবিস্ময়ে সাগরকে জিজ্ঞাসা করিলাম—

"তব ওই সচঞ্চল লহরীমালায়
কিসের বেদনা লেখা?—পিপাসা জানায়!
পিপাসা নিবৃত্ত হয় সলিল-কৃপায়
বলহে জলধি! তব পিপাসা কোথায়?"

"আবার তাহার গভীর গর্জ্জনে শুনিলাম, পিপাসা! পিপাসা। তোমাকে কে বলিয়াছে আমার পিপাসা নাই? এই হৃদয়ের দুর্দ্দান্ত পিপাসা কেমন করিয়া দেখাইব? আমার হৃদয় যত গভীর, পিপাসাও তত প্রবল। এ সংসারে কাহার পিপাসা নাই? অনলেরও তীব্র পিপাসা আছে! পিপাসা, পিপাসা, এইটুকু বুঝিতে পার না? ধনীর ধন-পিপাসা, মানীর মান-পিপাসা, সংসারীর সংসার-পিপাসা। নলিনীর তপন-পিপাসা, চকোরীর চন্দ্রিকা-পিপাসা!! পিপাসা না থাকিলে ব্রহ্মাণ্ড ঘুরিত কি লক্ষ্য করিয়া? আমার হৃদয়ে অনন্ত প্রণয় পিপাসা,—যত দিন আছি, পিপাসাও ততদিন থাকিবে! প্রেমিকের প্রেম-পিপাসা,—প্রকৃতির ঈশ্বর একমাত্র বাঞ্ছনীয়, ঐ বাঞ্ছনীয়

প্রেমময়ের সকলেই প্রেমপিপাসী। ঈশ্বরপ্রেম, এ বিশ্বজগত প্রেম-পিপাসু।"*

হিন্দুর ধর্ম্ম-পিপাসা বড়ই প্রবলা। ধর্ম্মের নামে হিন্দু সকল প্রকার কর্ত্তব্যকর্ম্ম সম্পাদন জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া থাকে। হিন্দুজাতি ধর্ম্মের সাক্ষাৎ অবতার স্বরূপ। হিন্দু ধর্ম্মে খায়, ধর্ম্মে পরে, ধর্ম্মে শোয়, ধর্ম্মে বাঁচে এবং ধর্ম্মে মরে। ধর্ম্মপিপাসায় হিন্দু প্রাণ দেয়। চাতক-চরিত্র হিন্দুর কাছে বড় পবিত্র চরিত্র। সেই জন্য আজ বৈশাখ মাসের এই অক্ষয় তৃতীয়া তিথিতে অধঃপতিত হিন্দু জাতিকে সম্বোধন করিয়া এই গৈরিক বসনধারী জীর্ণ শীর্ণ দেহী বৃদ্ধ সন্ন্যাসী ভ্রাতৃভাবে বলিতেছে, "আইস ভাই, হিন্দু, আইস, যদি প্রাণের মায়া পরিত্যাগ করিতে পার, যদি হাসিতে হাসিতে প্রাণ দিতে পার, তবে আমার সঙ্গে আইস, আমি এই বৈশাখ মাসের অক্ষয় তৃতীয়া তিথিতে তোমাকে চাতক পুরাণের ফটিকজল-মাহাত্ম্য শুনাইতে ইচ্ছা করি।" হে ভগবন! হে পরমারাধ্য পরমেশ্বর! এই দীন হীন অধম সন্ন্যাসীর বিনীত প্রার্থনা এই যে, স্বদেশের নামে, স্বজাতির নামে, স্বধর্ম্মের নামে এবং বিশ্বপ্রেমের নামে, আমরা যেন আজীবন তোমার পবিত্র পদ-মেঘের সম্মুখে দাঁড়াইয়া কর্ত্তব্য-পিপাসায় পিপাসু অন্তঃকরণে আত্মার কল্যাণার্থ, ভক্তিকণ্ঠে, বলিতে পারি—"ফটিক জল, ফটিক জল, ফটিক জল।"

শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

---

* আমি ইচ্ছাপূর্ব্বক এই কয়েকটি মধুময়ী পংক্তি এক জন ধর্ম্মপরায়ণা ও সুশিক্ষিত বঙ্গবাসিনী মুসলমানী রমণীর "মহরম" নামক রচনা হইতে উদ্ধৃত করিয়াছি। ঐ রচনা "নবপ্রভা" নাম্নী মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। নবপ্রভার শ্রদ্ধেয় সম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছিলেন, "এই মুসলমান রমণী একজন বিলাত-প্রত্যাগত মুসলমান রাজ-কর্ম্মচারীর পত্নী। লেখিকা ইংরাজি, আরব্য ও পারস্য ভাষায় ব্যুৎপন্না। এইটি তাঁহার প্রথম বাঙ্গালা রচনা।" এই অসামান্যা মুসলমান রমণীর এই মধুময়ী রচনায় অনেকে মোহিত হইয়া গিয়াছেন।——লেখক।

তুলনা।

তুমি   সুখদ যেমন,   স্বপন মোহন,
স্মৃতির মৃদুল ছায়া।
তুমি   মধুর যেমন,   হৃদয় মগন,
সলাজ সরস মায়া!
তুমি   বাঞ্ছিত যেমন,   লাঞ্ছিত জীবনে
সোহাগ শীতল ভাষা।
তুমি   স্নিগ্ধ যেমন,   নিরাশা নিলীন,
হৃদের গোপন আশা!
তুমি   অমল যেমন   সজল নয়নে
চাহনি করুণা আঁকা।
তুমি   কোমল যেমন   ক্লান্তি অবসানে
তৃপ্তি আবেশ মাখা।
তুমি   অতুল যেমন   মায়ের হৃদের,
স্নেহের রজতধারা
তুমি   কি জানি কেমন   সুখের মতন
অলস লালস ভরা!
তুমি   হৃদি নভে যেন   ফুটিয়া উঠেছ
জ্যোছনা বিমল শোভা!
তুমি   ভাষার আড়ালে,   হৃদয়ের কোণে,
উজল মধুর কিবা!

শ্রীসুরেশচন্দ্র সিংহ শর্ম্মা।

মোহাম্মদ।

পয়গম্বর নোয়া সুবিশাল ভূখণ্ডের অধীশ্বর ছিলেন। তদীয় অন্যতম পুত্র শ্যাম (নোয়ার তিন পুত্র ছিল) তাঁহার পরলোক গমনের পর সেই সুবিশাল সাম্রাজ্যের একাংশে আধিপত্য স্থাপন করেন। শ্যামের অধস্তন পঞ্চম পুরুষের নাম যারব বা আরব। আরব পিতার কনিষ্ঠ পুত্র ছিলেন,

একারণ পিতৃরাজ্য পরিত্যাগ করিয়া এক স্বতন্ত্র রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার শাসাধীন দেশ তাঁহার নামানুসারে আরব নামে প্রসিদ্ধ হয়। আরব দেশ অনুর্ব্বর ও বালুকাময় মরুস্থলীতে পরিপূর্ণ। পুরাকালে এই ভীষণদৃশ্য দেশের অধিবাসিগণ একান্ত স্বাতন্ত্র্যপ্রিয় ও পরজাতিদ্বেষী ছিল। এ জন্য পার্শ্ববর্ত্তী দেশ সমূহের সঙ্গে আরবদেশের ঘনিষ্ঠ যোগ সংসাধিত হইয়াছিল না। ইহার ফলে আরব দেশ সুপ্রাচীন হইয়াও সভ্যতা আলোক লাভ করিতে পারিয়াছিল না; বহুকাল পর্য্যন্ত অজ্ঞান তিমিরা-সমাচ্ছন্ন ছিল।

খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমভাগেও আরবজাতি সভ্যতার অতি নিম্ন স্তরে অবস্থিত ছিল। এই সময় আরবজাতি বহু সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিল। এই সকল সম্প্রদায় স্ব স্ব প্রধান ছিল, একে অন্যের আধিপত্য স্বীকার করিত না। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য স্বতন্ত্র অধিপতি ছিল। তাঁহার বংশানুক্রমে শাসন কার্য্য পরিচালনা করিতেন। কিন্তু উৎপীড়ক অধিপতিকে সিংহাসনচ্যুত করিবার অধিকার ও সামর্থ্য প্রকৃতিপুঞ্জের ছিল। ফলতঃ প্রজারঞ্জনই অধিপতিগণের প্রভুত্বের মূল ভিত্তি ছিল। শাসন কার্য্যেও তাঁহাদিগকে প্রজার পরামর্শ গ্রহণ করিতে হইত। কোন বিজাতীয় শত্রু আরবদেশের দ্বারদেশে উপনীত হইলে অধিপতিগণ সম্মিলিত হইয়া তাহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতেন। কিন্তু দেশমধ্যে এক দণ্ডের জন্য আত্মকলহের বিরাম ছিল না। এক সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়ের ধ্বংসের জন্য সর্ব্বদাই সচেষ্ট থাকিত। আরব দেশীয় লোকের বীরত্বের অভাব ছিল না। ব্যাঘ্রের বলের সঙ্গে তাহাদের বীরত্বের তুলনা করা যাইতে পারে। বিভিন্ন সম্প্রদায় মধ্যে কলহসৃজন, নররক্তে পৃথিবীরঞ্জন এবং দুর্ব্বলের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠনই তাহাদের বীরত্বের স্বার্থকতা ছিল। এই সময় আরবদেশ অজ্ঞানতিমিরে সমাচ্ছন্ন ছিল। দাম্পত্য-বন্ধন একান্ত শিথিল এবং নৈতিকজীবন ঘোর দুর্দ্দশাগ্রস্ত ছিল। নরনারী সুরাপানে উন্মত্ত হইয়া কাবা মন্দিরের (১) চতুর্দ্দিকে উলঙ্গভাবে

(১) আরবদেশের সর্ব্ব প্রধান ভজনালয়। একেশ্বরবাদের আদি প্রবর্ত্তক এব্রাহিম এই মন্দির স্থাপিত করেন, এক এবং অদ্বিতীয় নিরাকার পরমেশ্বরের উপাসনার জন্যই এই মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। কিন্তু কালক্রমে আরববাসীরা পৌত্তলিক ধর্ম্মাবলম্বী হইয়া উঠে এবং কাবা মন্দিরে বহুসংখ্যক দেব-দেবীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁহাদের পূজা করিতে আরম্ভ করে।

নৃত্য করিত। পুরুষসমাজের পশুবৎ আচরণে নারীজাতির দুর্দ্দশার সীমা ছিল না। বহুবিবাহ, দাসীসংসর্গ এবং যথেচ্ছা স্ত্রী পরিত্যাগের কোন বাধাই ছিল না। কি পুরুষ, কি স্ত্রীলোক, সকলেই দাস-দাসিগণের সঙ্গে নিষ্ঠুরাচরণের একশেষ করিত। তৎকালের আরবসমাজের ধর্ম্ম-জীবন নৈতিকজীবন অপেক্ষাও অধিক শোচনীয় ছিল। কাষ্ঠ এবং লোষ্ট্রও দেবতা বলিয়া পূজিত হইত। এক কোরেশ সম্প্রদায়েরই দেবতার সংখ্যা সপ্ত শতের ন্যূন ছিল না। এ ধর্ম্ম কুসংস্কারবিদ্ধ ও আত্মার অবনতিকর হইলেও আরবগণের ধর্ম্মবিশ্বাস সুগভীর ছিল। তাহাদের প্রকৃতি সাতিশয় তেজস্বিনী ছিল। তেজস্বিনী প্রকৃতির সঙ্গে সুগভীর ধর্ম্মবিশ্বাস সম্মিলিত ছিল বলিয়া আরবগণ ধর্ম্মের নামে অনেক সময় উন্মত্ত হইয়া উঠিত।

আরবদেশের ঈদৃশ দুরবস্থার সময়—৫৭০ খ্রীষ্টাব্দে মহাপুরুষ মোহাম্মদ জন্মপরিগ্রহণ করেন। মোহাম্মদের জন্মপরিগ্রহের পূর্ব্বেই তদীয় পিতার দেহান্তর হইয়াছিল। মোহাম্মদ কোরেশ সম্প্রদায়ের হাশিমবংশ সম্ভূত ছিলেন। তাঁহার মাতার নাম আমিনা। আমিনা রূপবতি, গুণবতি, ও বুদ্ধিমতি রমণী ছিলেন। তিনিও মোহম্মদের অতি শৈশবকালেই পর-লোকগমন করেন। পিতৃমাতৃহীন মোহম্মদের লালন-পালনের ভার তদীয় বৃদ্ধ পিতামহ আব্দুল মুত্তালেবের উপর পতিত হইয়াছিল। বৃদ্ধ আব্দুল মুত্তা-লিবের হৃদয় বড় স্নেহপ্রবণ ছিল। মোহম্মদের পিতার নাম আবদুল্যা; আব-দুল্যা অতি সজ্জন ছিলেন। তিনি পিতার কনিষ্ঠ পুত্র এবং তাঁহার শেষ বয়সের স্নেহপুত্তলি ছিলেন। তাঁহার অকালমৃত্যুতে বৃদ্ধ পিতার হৃদয় শোকে ভাঙ্গিয়া পড়ে। তাঁহার তাদৃশ মর্ম্মভেদী শোকের সময়ও মোহাম্মদের সুন্দর সহাস্য মুখ শান্তি আনয়ন করিয়াছিল। শিশুর ভাবভঙ্গী, আকার প্রকার বৃদ্ধের স্মৃতিতে বালক আব্দুল্যাকে জাগাইয়া দিত। তিনি শিশুর মুখে চোখে আবদুল্যার প্রতিচ্ছায়া দেখিয়া নয়নের বারি নয়নেই নিবারণ করিতেন। তিনি পরিজনদিগকে উদ্দেশ করিয়া বলিতেন, তোমরা মোহাম্মদকে সযত্নে প্রতিপালন করিও। এই সুন্দর শিশুই আমার বংশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ। দুর্ভাগ্যক্রমে মোহাম্মদ বাল্যকালেই স্নেহশীল প্রতিপালক পিতামহকেও হারাইয়াছিলেন। বৃদ্ধ মৃত্যুকালে পৌত্রকে স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র আবু তালেবের হস্তে সমর্পণ করিয়া যান। আবু তালেব ন্যায়বাদী এবং

ধীমান ছিলেন। তিনি পিতৃমাতৃহীন ভ্রাতষ্পুত্রের প্রতিপালন জন্য আরব দেশের তৎকালোচিত কোন বন্দোবস্তেরই ত্রুটী করিয়াছিলেন না। তিনি তাঁহাকে অপত্য-নির্ব্বিশেষে স্নেহ করিতেন।

আবুতালেবের আশ্রয়ে মোহাম্মদের বাল্য অতিবাহিত হয়; কৈশোর আগমন করে। তিনি কৈশোরে পদার্পণ করিয়াই বাণিজ্যোপলক্ষে সিরিয়া রাজ্যে গমন করেন। সিরিয়া গমনকালে তাঁহার বয়ঃক্রম চতুর্দ্দশ বৎসরের অধিক ছিল না। বিজাতীয় ভাষার বিন্দু বিসর্গও তাঁহার বোধগম্য ছিল না। একারণ সিরিয়ার সমস্তই তাঁহার নিকট দুর্ব্বোধ্য বলিয়া প্রতীয়মান হইত। তথাপি এখানেই খৃষ্টবিশ্বাসীদের সংসর্গে তাঁহার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইয়াছিল। এখানে তাঁহার তরল হৃদয়ে যে ভাববীজ উপ্ত হয়, তাহাই কালক্রমে ক্রমবিকাশের নিয়মে পরিবর্দ্ধিত হইয়া সংসার-তাপক্লিষ্ট অসংখ্য নরনারীর আশ্রয়স্থল ছায়া শীতল মহামহীরুহে পরিণত হইয়াছিল।

কোন বিদ্যালয়ে মোহাম্মদের শিক্ষালাভ হইয়াছিল না। তাঁহার আবির্ভাবকালে আরবদেশে লিখন-প্রণালী প্রবর্ত্তিত ছিল। কিন্তু উহার শৈশবাবস্থা তখনও অতিক্রান্ত হইয়াছিল না। মোহাম্মদ লিখিতে পারিতেন না। প্রকৃতির গ্রন্থপাঠেই তাঁহার শিক্ষালাভ হইয়াছিল। কিন্তু এই অনন্ত বিশ্বের যে কণা মাত্র প্রত্যক্ষভাবে তদীয় দৃষ্টির গোচরীভূত হইত, প্রকৃতির রহস্য নির্ণয় জন্য তাহাই তাঁহার আয়ত্ত ছিল; তদতিরিক্ত ক্ষেত্রে তাঁহার প্রবেশপথ রুদ্ধ ছিল। মানব-মস্তিষ্ক উদ্ভাবিত গ্রন্থরাজি তাঁহার জ্ঞান-সম্পদ পরিবর্দ্ধিত করিতে পারিয়াছিল না। পূর্ব্বগামী আচার্য্যগণের সঞ্চিত জ্ঞানভাণ্ডার তাঁহার নিকট অর্গলবদ্ধ ছিল। নিঃসঙ্গ মোহাম্মদ মরুস্থলীপূর্ণ আরবদেশের ক্রোড়ে নিজের চিন্তা ও চতুর্দ্দিকস্থ প্রাকৃতিক দৃশ্য লইয়াই আবিষ্ট থাকিতেন এবং এই তন্ময়তাই তাঁহার মনোবিকাশের হেতু স্বরূপ হইয়াছিল।

মোহাম্মদ বাল্যকাল হইতেই চিন্তাশীল, সত্যনিষ্ঠ ও কর্ত্তব্যপরায়ণ বলিয়া পরিচিত ছিলেন। তাঁহার কার্য্য, বাক্য ও চিন্তা সকলি সত্যানুপ্রাণিত ছিল। তিনি কখনও নিরর্থক বাক্যব্যয় করিতেন না। তিনি যাহা কিছু বলিতেন, তাহাই কার্য্যোপযুক্ত, জ্ঞানগর্ভ সারল্যপূর্ণ বলিয়া প্রতীয়মান হইত। অকাপট্য, গাম্ভীর্য্য ও আন্তরিকতা তাঁহার চরিত্রের বিশেষত্ব ছিল, কিন্তু তাঁহার প্রকৃতিতে অমায়িকতা, বন্ধুবাৎসল্য এবং

রঙ্গরসেরও অভাব ছিল না। আদ্যকালের মোহাম্মদকে স্মরণ করিলে আমাদের মানসপটে একটী সুন্দর নবীন যুবকের চিত্র অঙ্কিত হইয়া থাকে; এ যুবকের সর্ব্বাঙ্গ জীবিকা অর্জ্জনের পরিশ্রমে স্বেদসিক্ত, চিত্ত নবাগত ভাবের আবেশে অশান্ত, পূর্ণাঙ্গ শিক্ষার অভাবে হৃদয় অমার্জ্জিত; কিন্তু তাঁহার বদনমণ্ডল জ্যোতির্ম্ময় এবং তেজোদীপ্ত।

এই সময় মোহাম্মদ খাদিজা নাম্নী ধনবতী বিধবা রমণীর কার্য্যাধ্যক্ষের পদে নিয়োজিত ছিলেন। তিনি তাঁহার কার্য্যে পুনর্ব্বার সিরিয়া রাজ্যে গমন করেন। সেখানে তিনি আপন কর্ত্তব্য কর্ম্ম বিশ্বস্তভাবে যোগ্যতা সহকারে সম্পাদন করিয়াছিলেন। তাঁহার নির্ম্মল চরিত্র ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠা খাদিজার হৃদয়ে শ্রদ্ধার সঞ্চার করিয়াছিল, এই শ্রদ্ধা ক্রমে অনুরাগে পরিণত হয়। খাদিজা অতি গুণবতী রমণী ছিলেন। তাঁহার অঙ্গুলীস্পর্শে মোহাম্মদের হৃদয় তন্ত্রীতে অপূর্ব্ব রাগিণী বাজিয়া উঠে। তৎকালে তিনি পঞ্চবিংশ বর্ষের যুবক; খাদিজার বয়ক্রম চত্বারিংশ বর্ষ অতিক্রম করিয়াছিল। কিন্তু গুণমুগ্ধ মোহাম্মদ বয়সের ব্যবধান বিস্মৃত হইয়া খাদিজার করধৃত প্রেমসুধা আকণ্ঠপূর্ণ করিয়া পান করিয়াছিলেন। মোহাম্মদ সিরিয়ারাজ্য প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তাঁহাকে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করেন। এই যে প্রেমের অভিসিঞ্চনে মোহাম্মদের হৃদয় ফুলের মত প্রস্ফুটিত হইয়া উঠে, তাহা যত দিন খাদিজা জীবিতা ছিলেন, ততদিন একদিনের জন্যও মলিন হইয়াছিল না; তাঁহাদের প্রেমসিক্ত হৃদয়ে সদ্যোবিকশিত পুষ্পমঞ্জরীর ন্যায় সর্ব্বক্ষণই সৌরভপূর্ণ থাকিত। সেই শিথিলবন্ধন দাম্পত্য-প্রেমের যুগে মোহাম্মদের একনিষ্ঠ প্রেম বিস্ময়ের বিষয় ছিল। (১)

(১) খাদিজা মোহাম্মদের সহিত পরিণীতা হইবার পর ২৫ বৎসর জীবিতা ছিলেন, তাঁহাদের দাম্পত্য-জীবন বড় মধুর ছিল। সেই বহু বিবাহের যুগেও মোহাম্মদ তাঁহার জীবদ্দশায় দ্বিতীয় দারপরিগ্রহ করিয়াছিলেন না। খাদিজা সর্ব্বগুণালঙ্কৃতা সাধ্বী রমণী ছিলেন। তাঁহার পরলোক গমনের পর মোহাম্মদ আয়েসাকে বিবাহ করেন। আয়েসাও পতিপরায়ণা গুণবতী পত্নী ছিলেন। তিনি এক দিন কথা প্রসঙ্গে মোহাম্মদকে বলেন, "আমি কি খাদিজা অপেক্ষা ভাল নহি, তিনি বৃদ্ধা ও বিধবা ছিলেন। আমি কি খাদিজা অপেক্ষা আপনার অধিক প্রিয় নহি।" মোহাম্মদ প্রত্যুত্তরে বলেন, "ঈশ্বর সাক্ষী, ইহা তোমার ভুল, যখন কেহ আমার বাক্যে বিশ্বাস করিয়াছিল না, তখনও খাদিজা আমার অনুগামিনী ছিলেন, সেই দুঃসময়ে সমগ্র পৃথিবীতে খাদিজা আমার এক মাত্র সঙ্গিনী ও হিতাকাঙ্ক্ষিণী ছিলেন।' ফলতঃ "Khadija was ever his angel of hope and consolation."

ধনবতী খাদিজার সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হওয়ায় মোহাম্মদের অর্থের অভাব বিদূরিত হইয়াছিল। তিনি বিষয়কর্ম্ম করিয়া আধ্যাত্মিক উন্নতিসাধন জন্য কায়মনোবাক্যে প্রবৃত্ত হন। সৃষ্টিরহস্যের অন্তস্থলে কোন মহাশক্তি বিরাজিত রহিয়াছেন। তাঁহার স্বরূপ কি, মানবের সুখ দুঃখ, বিপদ সম্পদের আবর্ত্তন কোন্ কারণে হইয়া থাকে, বিপুল বিশ্বের নানা বৈপরীত্য ও বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যসূত্র কোথায় নিহিত আছে, এই সব তত্ত্বানুসন্ধানেই তিনি ধ্যানরত তাপসের ন্যায় সমাহিত হইতে আরম্ভ করেন। তিনি এরূপ এক সৌন্দর্য্যালোকের আভাষ পাইয়াছিলেন, যেখানে সমস্ত বিশ্বের অসংখ্যধ্বন্যাত্মক সঙ্গীত এক মহাশক্তির পদতলে লয় প্রাপ্ত হইয়া শ্রোতামাত্রেরই হৃদয় পুলকাবিষ্ট করিতেছে। এই অপরূপ সৌন্দর্য্যালোকে উত্তীর্ণ হইবার জন্যই তিনি অহোরাত্র ধ্যানমগ্ন থাকিতেন। এইভাবে পঞ্চদশ বর্ষ অতিবাহিত হয়। মোহাম্মদ ৬০৯ খৃষ্টাব্দের রমজান মাসে নির্জ্জন গিরিকন্দরে আত্মচিন্তা করিতে মক্কার নিকটবর্ত্তী হরপর্ব্বতে গমন করেন। খাদিজা তাঁহার সঙ্গিনী ছিলেন। তাঁহারা হরপর্ব্বতে একমাস অবস্থান করেন। এই সময় মোহাম্মদ একদা খাদিজাকে আনন্দবিহ্বল হইয়া বলেন, "আমি পরমেশ্বরের অনির্ব্বচনীয় কৃপালাভ করিয়াছি, আমার সমস্ত সংশয় ও অন্ধকার বিদূরিত হইয়াছে, আমার মানসনয়নে এক অপরূপ আলোক উদ্ভাসিত হইয়াছে। কাবামন্দিরের দেবমূর্ত্তি সকল নির্জ্জীব পদার্থমাত্র। পরমেশ্বরই মনুষ্যের একমাত্র উপাস্য। তিনি মহান্, জীবন্ত ও সত্যস্বরূপ। পরমেশ্বরই সমস্ত বিশ্বের একমাত্র নিয়ন্তা।" মোহাম্মদের ধ্যাননিরত অনন্যনাবরণ হৃদয়ে এক মহাসত্য প্রকটিত হইয়া তাঁহাকে বিমল আনন্দরসে পরিপ্লুত করিল; তিনি মনুষ্য মাত্রকেই এই আনন্দের অংশীদার করিতে ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। তিনি একেশ্বরবাদ ও বিশুদ্ধ নীতি প্রচার করিতে উত্থিত হইলেন। এই নব ধর্ম্মের নাম এসলাম, (১) প্রথমে এসলাম অতি মন্দগতিতে আরবসমাজে প্রবিষ্ট হইয়াছিল।

---

(১) এসলাম শব্দের অর্থ ঈশ্বরনির্ভর। কাহার কাহার মতে এসলাম শব্দের অর্থ পরিত্রাণ। "পরমেশ্বর ব্যতীত কোন উপাস্য নাই এবং মোহাম্মদ তাঁহার প্রেরিত ও ভৃত্য", ইহাই এসলাম ধর্ম্মের মূল সূত্র। 'সাধু ভজনা, মূর্ত্তি নির্ম্মাণ, চিত্র অঙ্কন এসলাম ধর্ম্মবিরুদ্ধ।' পরমেশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়, তিনি শক্তিমান, দয়ালু ও পরম প্রেমিক, মনুষ্য মাত্রেই সমান এবং দয়ার পাত্র, প্রবৃত্তি সংযম করা আবশ্যক, ঈশ্বরকে কৃতজ্ঞ অন্তরে স্মরণ করা কর্ত্তব্য, মনুষ্য মাত্রেই স্বীয় দুষ্কর্ম্মের জন্য পরলোকে দায়ী" ইত্যাদি বিশ্বাসই এসলাম ধর্ম্মের ভিত্তি

মোহম্মদ লোকলোচনের অন্তরালে নির্জ্জনে কতিপয় অন্তরঙ্গ নবীন যুবককে ধর্ম্মোপদেশ দিতেন। একাদিক্রমে তিন বৎসর কাল ধর্ম্ম প্রচারের পর তাঁহার শিষ্যসংখ্যা চল্লিশের অধিক হইয়াছিল না।

ভূমি। উপাসনা, উপবাস, দান ও তীর্থপর্য্যটন এসলাম ধর্ম্মচর্য্যার উপায় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এতন্মধ্যে উপাসনাই এসলামধর্ম্মাবলম্বীর সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম। মোসলমান সমাজে দৈনিক পাঁচ বার ঈশ্বরোপাসনার নিয়ম প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য মোহাম্মদ ঈশ্বরের আদেশবাণী লাভ করিয়াছিলেন। তিনি উপাসনার উপকারিতা সম্বন্ধে পুনঃ পুনঃ উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। তিনি এক স্থানে বলিয়াছেন, "দেবদূতগণ দিবারাত্রি তোমাদের নিকট আবির্ভূত হইয়া থাকেন। দিবাচর দেবদূতগণ রাত্রিকালে স্বর্গে প্রত্যাবৃত্ত হইলে পরমেশ্বর জিজ্ঞাসা করেন, জীব সকলকে কি অবস্থায় দেখিয়া আসিয়াছ? তাঁহারা উত্তর করেন, আমরা মর্ত্ত্যে গমন করিয়া জীব সকলকে উপাসনারত দেখিয়াছিলাম, ফিরিয়া আসিবার সময় তাহাদিগকে উপাসনা-রত দেখিয়া আসিয়াছি।" তিনি আর এক স্থানে বলিয়াছেন, "সর্ব্বদা উপাসনা করিও, উপাসনা আমাদিগকে পাপ ও দুষ্কার্য্য হইতে রক্ষা করে। ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ পরম পবিত্র কর্ম্ম।" এক জন পাশ্চাত্য লেখক বলিয়াছেন, "মোসলমানের প্রার্থনা-মন্দির মানবহস্ত নির্ম্মিত নহে। 'ঈশ্বর সৃষ্ট পৃথিবীর সর্ব্ব স্থানে অথবা তাঁহার আকাশ-তলে মোসলমানের উপাসনা মন্দির। ইহা এসলাম ধর্ম্মের গৌরবের বিষয় সন্দেহ নাই। বস্তুতঃ মোসলমানের নিকট স্থানাস্থানভেদ নাই; উপাসনার সময় সমাগত হইলে' সর্ব্বত্র ব্যাকুল হৃদয়ে ঈশ্বরের গুণানুবাদ কীর্ত্তন করা যাইতে পারে। ইহা এসলাম ধর্ম্মের একটী বিশেষত্ব।" এসলাম ধর্ম্মানুমোদিত ঈশ্বর স্তুতি অতিশয় মনোহর, আমরা উহার শেষাংশ হইতে কিঞ্চিত উদ্ধৃত করিতেছি। "পরমেশ্বর ব্যতীত আর কোন উপাস্য নাই। তিনি জীবন্ত,—চিরকাল জীবন্ত। তাঁহার নিদ্রা নাই, তন্দ্রাও নাই। স্বর্গ মর্ত্ত্য এবং স্বর্গ মর্ত্ত্যের যাবতীয় পদার্থ তাঁহার। তাঁহার অনুমতি ব্যতীত কে তাঁহার মহিমা ঘোষণা করিতে পারে। ভূত ভবিষ্যৎ সমস্তই তাঁহার নখদর্পণে; কিন্তু তিনি আত্মস্বরূপ সম্বন্ধে যাহা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা ব্যতীত তাঁহার অন্য কোন তত্ত্বই মানবের জ্ঞানায়ত্ত নহে। স্বর্গে মর্ত্ত্যে তাঁহার প্রভুত্ব, এ প্রভুত্ব রক্ষার জন্য তাঁহাকে কষ্ট স্বীকার করিতে হয় না। তিনি মহান্, শক্তিমান্।" আমরা আর এক স্থান হইতে উদ্ধৃত করিতেছি। "হে পরমেশ্বর, আমাকে তোমার প্রেম বিতরণ কর, যেন আমি তোমাকে ভক্তি করিতে পারি; যেন তোমার প্রিয় কার্য্য সাধন করিতে পারি। আমার নিকট তোমার প্রেমকে আত্মপ্রেম অপেক্ষা গরীয়ান কর। দেবদূতগণ মানবের নিকট ঈশ্বরের বার্ত্তা বহন করিয়া আনেন, ধর্ম্ম প্রচার জন্য সময় সময় "প্রফেট"গণ জন্মগ্রহণ করেন, পরলোকে পাপ পুণ্যের তিরস্কার ও পুরস্কার হইয়া থাকে, মোহাম্মদ এসকল মতও প্রচার করিয়াছিলেন। অদৃষ্টবাদ, পুনরুত্থান (Resurrection of the body) এবং শেষ বিচার দিন ইত্যাদি তত্ত্বও এসলাম ধর্ম্মের অঙ্গীভূত। মোহাম্মদের প্রচারিত একেশ্বরবাদ তাঁহার নিজের উদ্ভাবিত নূতন তত্ত্ব নহে। এ সম্বন্ধে আমরা কোরা-

মোহাম্মদের অন্যতম শিষ্যের নাম আবুবেকর ছিল। আবুবেকরের ধর্ম্মোৎসাহ একান্ত প্রবল ছিল। তিন বৎসর পর এসলাম ধর্ম্ম বিশ্বাসীর সংখ্যা চল্লিশ পূর্ণ হইলে তিনি প্রকাশ্য ভাবে ধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্য

ণের উক্তি উদ্ধৃত করিতেছি। "এব্রাহিমের ধর্ম্ম সত্য, এব্রাহিম অনেকেশ্বরবাদী ছিল না। ১৩২। বল, আমরা ঈশ্বরের বিশ্বাস স্থাপন করিলাম। এবং যাহা এব্রাহিমের প্রতি ও যাহা এসমাইল, এসহাক, ইয়াকুব এবং তাহাদের সন্তানগণের প্রতি অবতীর্ণ হইয়াছে এবং যাহা অপর তত্ত্ববাহকগণের প্রতি তাহাদের ঈশ্বর কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইয়াছে, তৎসমুদয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিলাম। তাহাদের কাহাকেও প্রভেদ করিতেছি না এবং সেই ঈশ্বরের অনুগত। ১৩৩। মুসায়ী ও ঈসায়ী লোকেরা বিশ্বাস করিলে আলোক পাইতে পারে। * * *" ১৩৪। (গিরিশ বাবুর কোরাণের বঙ্গানুবাদ, ২য় অধ্যায়।) এসলাম ধর্ম্মের নীতিও অতি বিশুদ্ধ। 'অন্যের নিকট তুমি যেরূপ ব্যবহার পাইতে ইচ্ছা কর, তুমিও অন্যের প্রতি সেইরূপ ব্যবহার করিও।" এসলাম ধর্ম্মাবলম্বীকে এই মহৎ বাক্যেই সংসার-সমুদ্রে দিগ্‌নির্ণয় যন্ত্ররূপে ব্যবহার করিতে মোহাম্মদ উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। "কাহার সঙ্গে ব্যবহারকালে ন্যায়পথভ্রষ্ট হইও না।" এই মহদ্বাক্যও মোহাম্মদের উপদেশ। দানধর্ম্ম আচরণ জন্য মোহাম্মদ মোসলমানদিগকে পুনঃ পুনঃ উত্তেজিত করিয়াছেন এবং মনুষ্য মাত্রকেই তাহার আয়ের এক নির্দ্দিষ্ট অংশ পরোপকারার্থে প্রদান করিতে অনুশাসন করিয়াছেন।" ঈশ্বরসৃষ্ট জীবের প্রতি দয়া প্রদর্শন না করিলে কেহ তাঁহার প্রেম লাভ করিতে পারে না, ইহাই মোহাম্মদ কথিত দান-মাহাত্ম্য। মোহাম্মদ এক দিন উপদেশদান কালে বলিয়াছিলেন, "সৃষ্টিকালে পৃথিবী কম্পিত হইতেছিল। এ কারণ ঈশ্বর পৃথিবীর গুরু ভার স্থাপন করিয়া উহাকে সুদৃঢ় করিয়াছিলেন। পর্ব্বত অপেক্ষা লৌহ অধিক শক্তিশালী, কারণ লৌহের আঘাতে পর্ব্বত ভগ্ন হইয়া পড়ে। লৌহ অপেক্ষা অগ্নি অধিক শক্তিশালী, কারণ অগ্নি লৌহকে দ্রব করে। অগ্নি অপেক্ষা জল অধিক শক্তিশালী, কারণ জল অগ্নিকে নির্ব্বাপিত করে। বায়ু জল অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী, কারণ বায়ু জলকে সঞ্চালিত করে। কিন্তু যদি কোন সজ্জন দক্ষিণ হস্তে দান করিয়া বাম হস্তকে তাহা জানিতে না দেন, তবে তিনিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, কারণ তাঁহার নিকট সকলেই পরাজিত হয়।" এসলাম ধর্ম্মের উপদেশ সর্ব্বব্যাপী। প্রতিবেশীর সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করা আবশ্যক, কোরাণে তৎসম্বন্ধেও উপদেশ লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। আমরা কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি। "বিশ্বাসীগণ, তোমরা আপন গৃহ ব্যতীত (অন্য) গৃহে যে পর্য্যন্ত তাহার স্বামীর অনুমতি প্রার্থনা ও সালাম না কর, প্রবেশ করিও না। ২৭। (গিরিশ বাবুর কোরাণের বঙ্গানুবাদ, ১১শ অধ্যায়।) মহাম্মদের আবির্ভাব কালে আরব রমণীর অবস্থা অতি শোচনীয় ছিল। আরব সমাজে ব্যভিচার, দাসী-সংসর্গ, সাময়িক বিবাহ ও বহুবিবাহ দোষে কলঙ্কিত ছিল। পিতামাতা আবশ্যক মত কন্যাসন্তানকে গৃহপালিত পশুবৎ বিক্রয় করিতে কুণ্ঠিত হইত না। আরবরমণী পিতা বা স্বামীর সম্পত্তি স্বরূপ ছিল। তাহারা স্বামীর মৃত্যুর

মোহাম্মদকে অনুরোধ করিলেন। প্রিয়তম শিষ্যের ঐকান্তিক অনুরোধ উপেক্ষা করিতে না পারিয়া মোহাম্মদ সর্ব্বজন সমক্ষে স্বীয় ধর্ম্মমত ঘোষণা করিবার জন্য আরব দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভজনালয় কাবামন্দিরে গমন করিলেন। আবুবেকর প্রথমতঃ একেশ্বরবাদের মহিমা বর্ণনা করিয়া তারপর পৌত্তলিক-

---

পর অন্যান্য ত্যক্ত সম্পত্তির ন্যায় উত্তরাধিকারীর হস্তগত হইত। এ জন্য সৎপুত্রের সঙ্গে বিমাতার বিবাহের ন্যায় বীভৎস প্রথা আরবসমাজে দেখা যাইত। আরব পিতা মাতা অনেক সময় কন্যাসন্তানকে মৃত্তিকাগর্ভে প্রোথিত করিয়া বধ করিত। আরব সমাজে নারীজাতির কোন অধিকারই ছিল না। ফলতঃ তাহাদের দুর্দ্দশার সীমা ছিল না। মোহাম্মদ নারীজাতির উন্নতি বিধানকল্পে বহু ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। মোহাম্মদের সমস্ত ব্যবস্থার মূলে নারীজাতির প্রতি সম্মানের ভাব অন্তর্নিহিত রহিয়াছে। ব্যভিচার নিবারণ কল্পে অবরোধ প্রথা প্রবর্ত্তিত করা হইয়াছিল। মোহাম্মদ দাসী সংসর্গ নিষেধ করিয়াছিলেন। 'বিশ্বাসী শুদ্ধাচারিণী রমণীকেও তোমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থাধিকারীদিগের শুদ্ধাচারিণী কন্যাকে *বিবাহ করিবার জন্য তোমাদিগকে অনুমতি দেওয়া হইতেছে। তোমরা গুপ্ত প্রণয় লোলুপ* ব্যভিচারী না হইয়া এবং উপপত্নী গ্রহণ না করিয়া শুদ্ধাচারে কাবোপাসন পূর্ব্বক তাহাদিগকে তাহাদের যৌতুক দান করিলেই এরূপ করিতে পার।" ৭। (কোরাণ, ৫ম অধ্যায়, দাসী সংসর্গ নিষিদ্ধ হইয়াছিল। এই নিষেধ বিধি কার্য্যকারী করিবার জন্য দাসী বিবাহ বৈধ বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছিল। (কোরাণ ৪র্থ অধ্যায় ২৫শ আয়ত) মোহাম্মদ সাময়িক বিবাহের প্রথা তুলিয়া দিয়াছিলেন। পুরুষের বিবাহের সংখ্যা সীমাবদ্ধ করা হইয়াছিল। "তোমাদের যেরূপ অভিরুচি তদনুসারে দুই, তিন ও চারি নারীর পাণিগ্রহণ করিতে পার, পরন্তু যদি আশঙ্কা কর ন্যায় ব্যবহার করিতে পারিবে না, তবে এক নারীকে বিবাহ করিবে। অথবা তোমাদের দক্ষিণ হস্ত যাহার উপর অধিকার লাভ করিয়াছে, তাহাকে (পত্নী স্বরূপে) গ্রহণ করিবে।) ইহা অন্যায় না করার নিকটবর্ত্তী।" ৩। (গিরিশ বাবুর কোরাণের বঙ্গানুবাদ ৪র্থ অধ্যায়) নারী জাতির প্রতি অসদাচরণ নিবারণ জন্য মোহাম্মদ উপদেশ প্রদান করিয়া গিয়াছেন'। বৈধরূপে তাহাদের সঙ্গ করিবে, পরন্তু যদি তোমরা তাহাদিগকে অবজ্ঞা কর, তবে হয়ত এমন এক বস্তুকে অবজ্ঞা করিবে যে তাহাতে ঈশ্বর প্রচুর কল্যাণ করিয়া থাকেন। "(গিরিশ বাবুর কোরাণের বঙ্গানুবাদ ৪র্থ অধ্যায় ২৪শ আয়ত) মোহাম্মদের ব্যবস্থায় সৎপুত্রের সঙ্গে বিমাতার বিবাহের প্রথা বিলুপ্ত হইয়াছিল। মোহাম্মদ নারী জাতিকে বিবিধ অধিকারে স্বত্ববতী করিয়াছেন। 'যাহা পিতা মাতা ও স্বগণ পরিত্যাগ করে, তাহা হইতে পুরুষের অংশ এবং যাহা পিতা ও স্বগণ পরিত্যাগ করে, তাহা অল্প বা অধিক হউক, তাহা হইতে নারীর অংশ, অংশ নির্দ্ধারিত।" ৮- ৭। "বিশ্বাসিগণ বলপূর্ব্বক স্ত্রীগণের স্বত্ব গ্রহণ করা তোমাদের জন্য অবৈধ। স্পষ্ট দুষ্ক্রিয়ায় তাহাদের যোগ দেওয়া ব্যতীত তোমরা তাহাদিগকে যে কোন দ্রব্য দান করিয়াছ, তাহা গ্রহণে নিষেধ করিও না।" (গিরিশ

ধর্ম্মের দোষপ্রদর্শন করিলেন। উগ্রস্বভাব আরবগণ স্বধর্ম্মের নিন্দা শ্রবণে ক্রোধান্ধ হইয়া বিধর্ম্মীদিগকে ধরাপৃষ্ঠ হইতে অপসৃত করিবার উদ্দেশ্যে তাহাদিগকে নিষ্ঠুরভাবে প্রহার করিতে আরম্ভ করিল। কাবামন্দিরে কোলাহল উত্থিত হইল। দয়ার্দ্রচিত্ত তমিম পরিবারের লোকেরা দৌড়িয়া আসিয়া তাহাদিগকে শত্রুর কবল হইতে রক্ষা করিল। তাহাদের তাদৃশ সাহায্য প্রাপ্ত না হইলে মোহাম্মদ ও তদীয় অনুচরবর্গের প্রাণনাশ ঘটিত। (১)

মোহাম্মদের প্রকাশ্যভাবে ধর্ম্মপ্রচারে প্রথম উদ্যম এইরূপ শোচনীয় হইয়াছিল। কিন্তু মোহাম্মদ ও তাহার শিষ্যবৃন্দ ভগ্নোৎসাহ হইয়াছিলেন না। এই ঘটনার কতিপয় দিবস অতিবাহিত হইলেই তাঁহারা পুনর্ব্বার নবোৎসাহে ধর্ম্মপ্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন। একে একে শিষ্য সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

মোহাম্মদ কোরেশ সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। কোরেশগণ আরবদেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভজনালয় কাবামন্দিরের পুরোহিত ছিল। সুতরাং অন্যান্য সম্প্রদায় ধর্ম্মবিষয়ে তাহাদের প্রভুত্বাধীন ছিল। একারণ মোহাম্মদের নবধর্ম্মপ্রচারে কোরেশগণই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভীত হইল। মোহাম্মদ সফলকাম হইলে আপামর সাধারণ সর্ব্ব শ্রেণীর ধর্ম্মবিশ্বাসের আমূল পরিবর্ত্তন ঘটিবে এবং তাহাতে তাহাদের প্রভুত্ব ও প্রতিপত্তি সাংঘাতিকরূপে আঘাত প্রাপ্ত হইবে, তাহারা ইহা দিব্য চক্ষে দেখিতে পাইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইল। মোহাম্মদ সাম্যবার্ত্তা ঘোষণা করিয়াছিলেন। জলদগম্ভীরস্বরে প্রচার

নাবুর কোরাণের বঙ্গানুবাদ, ৪র্থ অধ্যায়) এসকল সুব্যবস্থা সত্ত্বেও মোসলমান সমাজে নারী জাতির অবস্থা নানা কারণে সবিশেষ উন্নত হইতে পারিয়াছিল না। কিন্তু কিয়ৎ পরিমাণে যে উন্নতি লাভ করিয়াছিল, তাহা অবশ্য স্বীকার্য্য।

(১) এই ব্যাপারে আবুবেকরই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রহৃত হইয়াছিলেন। তিনি ২৪ ঘণ্টা অজ্ঞানাবস্থায় ছিলেন। আবুবেকর মোহাম্মদের একান্ত অনুরক্ত ছিলেন। তিনি দিবারাত্রি সংজ্ঞাহীন থাকিয়া যখন প্রথম চক্ষুরুন্মীলন করিলেন, তখনই মোহাম্মদ কেমন আছেন তাহা জানিতে সমুৎসুক হইলেন। একজন অনুচর তাঁহার সংবাদ লইয়া আসিয়া বলিল, তিনি কুশলে আছেন। আবুবেকর এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া বলিলেন, আমি মোহাম্মদকে না দেখিয়া অন্ন জল কিছুই গ্রহণ করিব না। তিনি সমস্ত দিন অনাহারে রহিলেন; তারপর রাত্রিকালে রাজপথ নির্জ্জন হইলে মোহাম্মদের বাসভবনে গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে দর্শন করিয়া উপবাস ভঙ্গ করিলেন।

করিয়াছিলেন, জগদীশ্বরের দৃষ্টিতে মনুষ্য মাত্রেই সমান, এ মতের প্রবর্ত্তনে কোরেশগণের প্রভুত্ব ও প্রতিপত্তির বিলোপ অবশ্যম্ভাবী বলিয়া তাহারা অঙ্কুরেই মোহাম্মদকে বিনষ্ট করিতে কৃতসঙ্কল্প হইল।

কোরেশগণ একযোগে মোহাম্মদ ও তদীয় শিষ্যবৃন্দকে উৎপীড়ন করিবার জন্য নানা উপায় অবলম্বন করিতে প্রতিজ্ঞা করিলেন। প্রত্যেক গৃহস্বামী আপন অধিকারে নবধর্ম্মকে কণ্ঠাবরোধ করিয়া বিনাশ করিবার ভারগ্রহণ করিল। এসলামধর্ম্ম-বিশ্বাসিগণের অপমান ও লাঞ্ছনার সীমা রহিল না। তাহারা কারারুদ্ধ, অনাহারে ক্লিষ্ট এবং প্রহৃত হইতে লাগিল। রমধা পর্ব্বত এবং বথা এসলাম-ধর্ম্ম-বিশ্বাসীদের নির্য্যাতনের স্থান ছিল। কেহ পৌত্তলিকতায় আস্থাহীন বলিয়া প্রকাশ পাইলেই তাহাকে কোরেশগণ মরুভূমির উত্তপ্ত বালুকার উপর সূর্য্য কিরণে দগ্ধ করিত। যখন ঈদৃশ নিষ্ঠুর ব্যবহারে তাহাদের কণ্ঠ, তালু, শুষ্ক হইয়া পড়িত এবং মৃত্যু আসন্ন হইত, তখন তাহাদিগকে হয় নবধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে, না হয় মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে বলা হইত। কেহ কেহ পরিত্রাণ লাভজন্য নবধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া মুক্তি লাভের পরক্ষণেই পুনর্ব্বার মোহাম্মদের শরণাপন্ন হইত। কিন্তু অধিকাংশ ব্যক্তিই আপন ধর্ম্মমতে অটল থাকিত। (১)

এইরূপ কঠোর উৎপীড়নেও কোন ফলোদয় হইল না। এসলামধর্ম্ম-বিশ্বাসিগণ কিঞ্চিৎমাত্রও বিচলিত বা ধর্ম্ম প্রচারে বিরত হইলেন না, দিন দিন তাঁহাদের দল বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। কোরেশগণ পাশব বলে নবধর্ম্ম-বিশ্বাসীদিগকে বিনষ্ট করিতে না পারিয়া প্রলোভনে মোহাম্মদকে বশীভূত করিতে সঙ্কল্প করিল।

---

(১) বিলাল নামক একজন কাফ্রি ক্রীত দাস এসলামধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল। তদীয় প্রভু উম্মিয়া একারণ তাহাকে উৎপীড়নের একশেষ করিত। বিলালকে প্রত্যহ মধ্যাহ্নকালে বথার উত্তপ্ত বালুকার উপর ঊর্দ্ধমুখে শয়ান করাইয়া তাহার বুকে গুরুভার প্রস্তর স্থাপন করা হইত। উম্মিয়া কহিত, বিলাল, হয় তুমি নবধর্ম্ম পরিত্যাগ কর, না হয় এইরূপ দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইতে প্রস্তুত হও। কিন্তু বিলাল কিছুতেই স্বমত পরিত্যাগ করিতে স্বীকৃত হইত না এবং পিপাসায় মৃত্যু দশা উপস্থিত কালে অদ্বিতীয় পরমেশ্বরের নামোচ্চারণ করিত। প্রত্যহ এইরূপ অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতে করিতে তাহার প্রাণ-সংশয় অবস্থা উপস্থিত হইয়াছিল। বিলাল এই অবস্থায় একদিন আবুবেকরের দৃষ্টি পথে পতিত হওয়ায় তিনি তাহাকে ক্রয় করিয়া তাহার জীবন রক্ষা করেন।

একদিন মোহাম্মদ কাবা মন্দিরে উপবিষ্ট ছিলেন। সেই সময় মক্কার অন্যতম নেতা ওতবা তাঁহার নিকট গমন করিয়া বলিলেন, হে মোহাম্মদ, তুমি কোরেশ সম্প্রদায় মধ্যে ভেদ নীতি আনয়ন করিয়াছ, আমাদের ধর্ম্মের নিন্দা করিতেছ, পূর্ব্ব পুরুষদিগকে পাষণ্ড বলিয়া ঘোষণা করিতেছ। তোমার উদ্দেশ্য কি? ধন, মান, যশ, প্রভুত্ব, রাজত্ব, তুমি কোন্ আকাঙ্ক্ষায় আমাদের বিদ্রোহাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছ? তোমার যাহা কামনা, তাহাই তোমার পদতলে বিলুণ্ঠিত হইবে। এবিদ্রোহাচরণ পরিত্যাগ কর। ওতবার এই প্রলোভন বাক্যে মোহাম্মদ কিঞ্চিৎমাত্রও চাঞ্চল্য প্রকাশ করিলেন না। গম্ভীর ভাবে উত্তর করিলেন, আমি তোমাদের ন্যায়ই একজন মনুষ্য মাত্র। আমি প্রত্যাদেশ লাভ করিয়াছি যে, তোমাদের ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়। তোমরা কোন দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া তাঁহাকে ভজনা কর এবং যাহা গত হইয়াছে, তাহার নিমিত্ত অনুশোচনা কর। যাহারা পরলোকে বিশ্বাস করে না এবং শাস্ত্রের নির্দ্দেশ মত দান করে না, তাহারা দুঃখ পাইবে। কিন্তু যাহারা বিশ্বাসী ও সৎকর্ম্মান্বিত, তাহারা পুরস্কার লাভ করিবে। হে ওতবা, তোমার নিকট সমস্ত প্রকাশ করা হইল, এখন তুমি যে পথ শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচনা কর, তাহাই অবলম্বন কর।

কোরেশগণ মোহাম্মদকে প্রলোভনে বশীভূত করিতে অসমর্থ হইয়া পুনর্ব্বার নববিশ্বাসীদিগের প্রতি ঘোর উৎপীড়ন করিতে সঙ্কল্প করিল। তাহারা মোহাম্মদের পবিত্র অঙ্গে হস্তার্পণ করিল। তারপর নানা প্রকারে এসলামধর্ম্ম-বিশ্বাসীদিগকে উৎপীড়ন করিতে লাগিল। তাহাদের পাশব অত্যাচারে অনেকের জীবন সংশয়াপন্ন হইয়া উঠিল। মোহাম্মদ প্রাণাধিক শিষ্যবৃন্দকে তাদৃশ দুর্দ্দশাগ্রস্ত দেখিয়া একান্ত মর্ম্মাহত হইলেন। এবং তাহাদিগকে আবিসিনিয়া রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া কোরেশগণের পাশব অত্যাচারের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিতে আদেশ করিলেন। এই সময় যিনি আবিসিনিয়া রাজ্যের অধিপতি ছিলেন, তিনি খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী, উদারস্বভাব ও ধর্ম্মাত্মা ছিলেন। এজন্যই মোহাম্মদ শিষ্যবৃন্দকে তাঁহার রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিতে আদেশ করিয়াছিলেন। তাঁহার আদেশানুসারে এসলাম ধর্ম্ম ঘোষণার পঞ্চম বর্ষে বীরপুরুষ ওসমানইবন আফানের নেতৃত্বাধীনে কিঞ্চিদধিক অশীতি সংখ্যক নর নারী আবিসিনিয়া রাজ্যে গমন করিল। প্রতিহিংসাপরায়ণ কোরেশগণ ঈদৃশ বহু সংখ্যক নব বিশ্বাসীকে গ্রাসমুক্ত

দেখিয়া ক্রোধে গর্জ্জন করিতে লাগিল এবং তাহাদিগকে প্রত্যর্পণ করিতে অনুরোধ করিয়া আবিসিনিয়া রাজ দরবারে দূত প্রেরণ করিল। কোরেশ-দূত গৃহীত-আশ্রয় মোসলমানদিগকে রাজ দরবারে ধর্ম্মদ্রোহী বলিয়া অভিযুক্ত করিল। রাজা তাহাদিগকে সমবেত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কেন ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিয়াছ? আলীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা জাফর সমাগত মোসলমানদের মুখপাত্র স্বরূপ বলিতে লাগিলেন, "হে রাজন, আমরা অজ্ঞান তিমিরাচ্ছন্ন বর্ব্বর ছিলাম; আমরা দেব দেবীর পূজক ছিলাম, নিত্য ব্যভিচারে লিপ্ত হইতাম, মৃত দেহের মাংস ভক্ষণ করিতাম, জঘন্য অশ্লীল বাক্যে জিহ্বা কলুষিত করিতাম, মনুষ্যত্বে জলাঞ্জলি দিয়াছিলাম, আতিথ্য ধর্ম্ম পালন করিতাম না। আমাদের এইরূপ দুর্দ্দশার সময় পরমেশ্বর আমাদের সমাজে একজন মহাপুরুষকে প্রেরণ করিয়াছেন; এই মহাপুরুষের বংশ মর্য্যাদা, সত্যবাদিতা, সাধুতা এবং নির্ম্মল চরিত্রের বিষয় আমরা সম্যক পরিজ্ঞাত আছি। তিনি আমাদিগকে একেশ্বরবাদ গ্রহণ করিতে আহ্বান করিয়াছেন এবং পরমেশ্বরের সহিত অন্য কোন পদার্থের সংযোগ সঙ্গত নহে বলিয়া শিক্ষা দিয়াছেন। তিনি আমাদিগকে দেব দেবীর অর্চ্চনা করিতে নিষেধ করিয়াছেন এবং সত্য কথা কহিতে, ন্যস্ত ধনের সদ্ব্যবহার করিতে, দয়ার্দ্রচিত্ত হইতে এবং প্রতিবাসীর স্বত্ব রক্ষা করিতে উপদেশ দিয়াছেন। তিনি আমাদিগকে নারী জাতির কুৎসা করিতে এবং অনাথ বালক বালিকার অর্থ অপহরণ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। তিনি আমাদিগকে পাপ হইতে দূরে গমন করিতে, দুষ্কার্য্য পরিত্যাগ করিতে, ঈশ্বরোপাসনা করিতে, দরিদ্রের উপকার করিতে এবং পবিত্র দিনে উপবাস করিতে আদেশ করিয়াছেন।" আবিসিনিয়ার অধিপতি এই উত্তরে প্রীত হইয়া কোরেশ দূতকে দরবার হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন।

কিঞ্চিদধিক অশীতি সংখ্যক মোসলমান আত্ম রক্ষার জন্য আবিসিনিয়া রাজ্যে প্রস্থান করাতে মোহাম্মদের শিষ্য সংখ্যা খর্ব্ব হইয়া পড়িয়াছিল; কিন্তু ইহাতে তিনি কিঞ্চিৎ মাত্রও ভগ্নোদ্যম না হইয়া পূর্ব্ববৎ অটল ভাবেই ধর্ম্ম প্রচার করিতেছিলেন। নববিশ্বাসীদলের খর্ব্বতা নিবন্ধন এসলাম ধর্ম্ম প্রচারের বিঘ্ন উপস্থিত না হওয়ায় কোরেশগণ একান্ত ক্ষুব্ধ হইয়াছিল। একারণ তাহারা মস্তিষ্কের বহু আলোড়নে মোহাম্মদকে নিষ্প্রভ করিবার জন্য এক অভিনব পন্থা অবলম্বন করে। কোরেশগণ পূর্ব্বগামী প্রেরিত

মহাত্মাদের ন্যায় তাঁহাকেও অলৌকিক ক্ষমতা প্রদর্শন করিয়া নব ধর্ম্মের অপার্থিবতা প্রমাণিত করিতে বলিল। অলৌকিক ক্ষমতা প্রদর্শন মনুষ্যের সাধ্যায়ত্ত নহে। মোহাম্মদ কখনও ঐশী শক্তির ভান করিয়া আত্ম প্রতিষ্ঠা করেন নাই। সত্যনিষ্ঠা তাঁহার চরিত্রের মূলভিত্তি ছিল। তিনি কোরেশ-গণের বিদ্বেষ বুদ্ধির হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ কল্পে অলৌকিক ক্ষমতা প্রদর্শন করিতে স্বীকৃত হইয়া প্রবঞ্চনার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন না। মোহা-ম্মদ তাহাদিগকে মুক্তকণ্ঠে বলিলেন "পরমেশ্বর আমাকে অলৌকিক ক্ষমতা প্রদর্শন জন্য প্রেরণ করেন নাই। তিনি আমাকে তোমাদিগকে ধর্ম্মোপ-দেশ প্রদান করিতে প্রেরণ করিয়াছেন। প্রভু পরমেশ্বরের অপার মহিমা! আমি একজন ঈশ্বর প্রেরিত ধর্ম্মোপদেষ্টা ব্যতীত অন্য কেহ নহি। দেব দূতগণ সাধারণতঃ মর্ত্ত্যে আগমন করেন না, নতুবা পরমেশ্বর একজন দেব দূতকেই তোমাদের নিকট তাঁহার সত্য ধর্ম্ম প্রচার করিতে প্রেরণ করিতেন। আল্লার ভাণ্ডার আমার হস্তে ন্যস্ত, গুপ্ত তথ্য আমার জ্ঞানের বিষয়ীভূত, অথবা দেব দূতের আত্মা আমার দেহে সংযুক্ত, আমি এরূপ ঘোষণা কখনও করি নাই। ঐশ্বরিক কৃপা ব্যতীত আমি নিজেই আমার আত্ম শক্তিতে প্রত্যয় করিতে পারি না। পরম কারুণিক দয়ালু পরমেশ্বরের নামে বলিতেছি যে, স্বর্গমর্ত্ত্যস্থ প্রাণী মাত্রেই সর্ব্বজ্ঞানাধার, সর্ব্বশক্তিমান পরম পবিত্র প্রভুর মহিমা কীর্ত্তন করিয়া থাকে। প্রভু পরমেশ্বরই অজ্ঞান তিমিরাচ্ছন্ন আরব সমাজে আলোক প্রদান কল্পে তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ সংস্থাপন জন্য এবং কোরাণ ও পরমজ্ঞান প্রচার জন্য নিরক্ষর আরবগণের মধ্য হইতে আমাকে ধর্ম্ম সংস্থাপকের পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ইহা পরমেশ্বরের স্বেচ্ছাকৃত করুণা, তাঁহার ইচ্ছা হইলে সকলেই তাঁহার করুণা লাভ করিতে পারে। ঈশ্বর পরম দয়ালু।" ফলতঃ মহাপুরুষ মোহাম্মদ কখনও অলৌকিক শক্তির মাহাত্ম্যে এসলাম ধর্ম্মকে আরব সমাজে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন না। তিনি জ্ঞান ও বিবেকের বর্ত্তিকা হস্তে কুসংস্কারবিদ্ধ আরব সমাজের অন্ধকার-রাশি ধ্বংস করিতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন; আরবগণের কুসংস্কার পরিপুষ্ট করিয়া আত্ম প্রাধান্যের প্রতিষ্ঠা তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল না। প্রকৃতির রুদ্র গম্ভীর "স্নিগ্ধ মধুর মহোজ্জল সৌন্দর্য্য" পরিস্ফুট ভাবে প্রদর্শন করিয়া পরমেশ্বরের প্রতি মানব হৃদয়কে অনুরক্ত করিবার উদ্দেশ্যেই মোহাম্মদ মহাসাধনায় সমস্ত জীবন ক্ষেপণ করিয়া-

ছিলেন। একারণ তিনি কোরেশগণের কথামত অলৌকিক ক্ষমতার পরিচয় প্রদান করিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন না। কিন্তু তাহারা তাঁহার সরল বাক্যে সন্তুষ্ট না হইয়া তাঁহাকে বিবিধ প্রকারে বিদ্রূপ ও উৎপীড়ন করিতে আরম্ভ করে। তাহারা বলিয়াছিল, "হে মোহাম্মদ, নিশ্চয় জানিও যে, তোমার অথবা আমাদের বিনাশ না হইলে এ বিরুদ্ধাচরণ বিরাম লাভ করিবে না।"

কোরেশগণের অত্যাচারের মাত্রা—অতিশয় বৃদ্ধি পাইল। মোহাম্মদ নিজে অশেষ প্রকারে নিগৃহীত হইতে লাগিলেন, তাঁহার শিষ্যবৃন্দের লাঞ্ছনা ও অপমানের পরিসীমা রহিল না। পঞ্চবর্ষব্যাপী অশেষ অত্যাচারে উৎপীড়নেও মোহাম্মদের হৃদয় এক মুহূর্ত্তের জন্যও স্পৃষ্ট হইয়াছিল না; তিনি আপন ব্রতে সর্ব্বদা অটল ছিলেন। কিন্তু হিমালয় সদৃশ নিষ্কম্প মনুষ্য হৃদয়েও কোন না কোন এক সময় সংশয়-দোলায় আন্দোলিত হইয়া থাকে। ইহাই প্রকৃতির নিয়ম। যিনি পঞ্চবর্ষব্যাপী হৃদ্‌পঞ্জরভেদী পাশবউৎপীড়নেও অবিচলিত ছিলেন, তাঁহার চিত্তেও চাঞ্চল্য উপস্থিত হইল। একদিন প্রার্থনাকালে মোহাম্মদ তিন জন চান্দ্রদেবীর অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া কোরেশগণের সমস্ত বিরুদ্ধাচরণের মূলোৎপাটন করিতে ইচ্ছা করিলেন। তিনি সমভ্রমে তিন জন চান্দ্রদেবীর উল্লেখ করিয়া প্রচার করেন যে, ইহারা ঈশ্বরকৃপা লাভ জন্য মনুষ্যকে সাহায্য করিতে পারেন। অতএব প্রভু পরমেশ্বরের নিকট অবনত হও এবং তাঁহার সেবা কর। সমক্ষে শ্রোতৃবর্গ তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া অদ্বিতীয় ঈশ্বরের মহিমা কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু মহাপুরুষের মনুষ্যসুলভ দুর্ব্বলতা বিদ্যুচ্ছটার ন্যায় মুহূর্ত্ত মধ্যেই বিলীন হইল। তিনি পরমুহূর্ত্তেই বলিলেন, "তোমাদের দেব দেবী অন্তঃসারশূন্য নাম মাত্র। এই সকল দেব দেবী তোমাদের ও তোমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের মস্তিষ্কেই সৃষ্ট হইয়াছে।" মোহাম্মদ মুহূর্ত্তের জন্য প্রলোভনে পতিত হইয়াছিলেন, কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই আত্ম অপরাধ স্বীকার করিয়া পুনর্ব্বার কোরেশ জাতির সমস্ত উৎপীড়ন অম্লানবদনে সহ্য করিতে প্রস্তুত হইলেন। মোহাম্মদ আত্ম অপরাধ স্বীকার করিয়া মহত্ত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিলেন; কিন্তু কোরেশগণ তাঁহার ব্যবহারে একান্ত ক্ষুণ্ণ হইল; তাহাদের অত্যাচারস্রোত পুনর্ব্বার প্রবলবেগে প্রবাহিত হইল।

কোরেশসম্প্রদায়ের অন্যতম নেতা আবুজহল ধর্ম্মদ্রোহী মোহাম্মদকে

হত্যা করিবার জন্য অনুচরদিগকে আদেশ করিলেন। এবং আজ্ঞা-প্রতিপালনকারীকে একশত লোহিত উষ্ট্র ও সহস্র রৌপ্য মুদ্রা পারিতোষিক দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। ওমর নামক একজন অমিতবলশালী ধীসম্পন্ন কোরেশ মোহাম্মদের শিরশ্ছেদন করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়া উন্মুক্ত-কৃপাণ হস্তে ধাবিত হইলেন। তিনি কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়াই তাঁহার ভগিনী ও ভগিনীপতির এসলাম ধর্ম্ম গ্রহণের সংবাদ অবগত হইলেন। তিনি এই সংবাদে ক্রোধোন্মত্ত হইয়া ভগিনীর গৃহে গমন করিলেন এবং মূঢ়ের ন্যায় দিগ্বিদিকবোধ-শূন্য হইয়া ভগিনী ও ভগিনীপতিকে নির্দ্দয়ভাবে প্রহার করিতে লাগিলেন। তাঁহার দারুণ প্রহারে তাঁহারা ক্ষতবিক্ষত হইলেন;—ক্ষত স্থান হইতে রক্তধারা বহিল। কিন্তু তাঁহারা নবধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে সম্মত হইলেন না, বলিলেন, আমরা সাক্ষ্য দিতেছি যে, পরমেশ্বর ব্যতীত উপাস্য নাই এবং মোহাম্মদ তাঁহার প্রেরিত ও ভৃত্য। ওমর তাঁহাদের ধর্ম্মবিশ্বাসের দৃঢ়তা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। তিনি অপ্রতিভ হইয়া ভগিনীর বাটীতেই সে দিন যাপন করিতে মনন করিলেন। রাত্রিকালে তদীয় ভগিনীপতি কোরাণ পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন। ওমরের অশান্তচিত্ত তাঁহাদের মধুর আবৃত্তিতে আকৃষ্ট হইল; তিনি মনোযোগ সহকারে কোরাণ পাঠ শুনিতে লাগিলেন। কোরাণের চিত্তবিমোহিনী বাণী শুনিতে শুনিতে তাঁহার হৃদয় অভিভূত হইয়া পড়িল; তিনি এসলাম ধর্ম্মে বিশ্বাস স্থাপন করিলেন। মোহাম্মদকে দর্শন করিবার জন্য তাঁহার মনোপ্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিল। রাত্রি প্রভাত মাত্র তিনি কাবামন্দিরের অভিমুখে ছুটিয়া চলিলেন। মোহাম্মদ শিষ্যগণসহ কাবামন্দিরে অবস্থান করিতেছিলেন। তাঁহার শিরশ্ছেদন জন্য ওমরের ভীষণ প্রতিজ্ঞার সংবাদ ইতিপূর্ব্বেই মক্কার সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়াছিল। ওমর আসিয়া দ্বারে আঘাত করিলেন। শিষ্যগণ ওমরের আগমনে শঙ্কাকুল হইলেন। কিন্তু নির্ভীক মোহাম্মদ কাবামন্দির হইতে বহির্গত হইয়া ওমরের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। ওমর তাঁহাকে দেখিবামাত্র জলদগম্ভীরস্বরে বলিয়া উঠিলেন, আমি সাক্ষ্যদান করিতেছি, পরমেশ্বর ব্যতীত উপাস্য নাই, এবং মোহাম্মদ তাঁহার প্রেরিত ও ভৃত্য। অতঃপর তিনি বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে তাঁহার হৃদয়ে যে আগুন জ্বলিতেছিল, তাহার পরিচয় দিলেন। মোহাম্মদ ওমরকে সত্য ধর্ম্মানুরক্ত দেখিয়া একান্ত প্রীত হইলেন এবং তাঁহাকে দৃঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়া ঈশ্বরের নামে জয়োচ্চারণ করিলেন।

অমিত বলশালী ধীশক্তিসম্পন্ন ওমর বিশ্বাসী দল ভুক্ত হওয়ায় তাহাদের বল সঞ্চয় হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু কোরেশগণ ইহাতে একান্ত ক্ষুণ্ণ হইয়া তাহাদিগকে পূর্ব্বাপেক্ষা প্রবল ভাবে উৎপীড়ন করিতে আরম্ভ করে। কোরেশ দূত আবিসিনিয়া হইতে ফিরিয়া আসিল। এই সময় কোরেশগণ তাহার নিগ্রহের কথা শুনিয়া দাবানলের ন্যায় জ্বলিয়া উঠিল। এবং তাদৃশ অবমাননার প্রতিশোধ লইবার জন্য বিশ্বাসীদলের প্রতি অত্যাচারের মাত্রা দ্বিগুণ করিতে বদ্ধপরিকর হইল।

হাসিম ও মুতালিব বংশের অধিকাংশলোকই এসলামধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। ঐজন্য কোরেশগণ এই দুই বংশকে সমূলে বিনাশ করিতে সঙ্কল্প করিয়া তাহাদের সঙ্গে বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ না হইতে ও তাহাদের নিকট ক্রয় বিক্রয় না করিতে পরস্পরে শপথ গ্রহণ পূর্ব্বক অঙ্গীকারবদ্ধ হইল। মোহাম্মদ ঈদৃশ উৎপীড়ন হইতে পরিত্রাণ লাভ জন্য আত্মীয় স্বজন সহ মক্কার নিকটবর্ত্তী সিব নামক গিরি সঙ্কটে প্রস্থান করাই সঙ্গত বলিয়া অবধারণ করিলেন। তদনুসারে তাহারা স্ব স্ব গৃহ পরিত্যাগ করিয়া তথায় গমন করিলেন। এই স্থানে মোহাম্মদকে সশিষ্যে তিন বৎসর কাল অবরুদ্ধের ন্যায় থাকিতে হইয়াছিল। এই তিন বৎসর কাল তাহাদের কষ্টের পরিসীমা ছিল না। যে সকল খাদ্য সামগ্রী তাহাদের সঙ্গে ছিল, তাহা নিঃশেষিত হইলে তাহারা নূতন করিয়া খাদ্য সামগ্রী সংগ্রহ করিতে পারিতেছিল না। কারণ এসলামধর্ম্মবিরোধিগণ তাহাদের নিকট কোন দ্রব্য বিক্রয় না করিবার জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ ছিল। ক্ষুধার্ত্ত শিশুর ক্রন্দনে চতুর্দ্দিক মুখরিত হইয়া উঠে। শিশুর আর্ত্তনাদও বিশ্বাসীদলের হৃদয় চঞ্চল করিতে পারিয়াছিল না। কিন্তু মক্কার কতিপয় নেতা তাহাদের ঈদৃশ দুর্দ্দশা দর্শনে অনুতপ্ত হইয়া আপনাদের ধর্ম্মঘট শ্লথ করিতে যত্নশীল হইলেন। তাঁহাদের যত্নে এসলামধর্ম্ম-বিশ্বাসিগণ মক্কায় বাসোপযোগী কতিপয় অধিকার লাভ করিল।

তদনুসারে তাঁহারা মক্কায় ফিরিয়া আসিলেন; কিন্তু শান্তি সুখ তাঁহাদের অদৃষ্টে ছিল না। তাঁহাদের প্রত্যাবর্ত্তনের পর এসলামধর্ম্ম-বিরোধিগণ তাহাদের প্রতি পুনর্ব্বার পূর্ব্ববৎ উৎপীড়ন করিতে আরম্ভ করিল। মোহাম্মদ মক্কাবাসীদিগকে কোন ক্রমে নব ধর্ম্মের অনুরাগী করিতে না পারিয়া অভিনব ক্ষেত্রে প্রচার করিলে সমধিক ফল লাভ হইবে বলিয়া বিবেচনা করিলেন। এজন্য তিনি মক্কার সত্তর মাইল দূরবর্ত্তী তায়েফ নগরে গমন করিলেন।

এখানে তিনি প্রবলোৎসাহে ধর্ম্ম প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু তিনি এই স্থানে দীর্ঘকাল অবস্থান করিতে পারিয়াছিলেন না। তত্রত্য পৌত্তলিক অধিবাসীরা বিদ্বেষ বুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহাকে নানা প্রকারে উৎপীড়ন করিতে আরম্ভ করে এবং তাহাতে তিনি ক্ষুণ্ণ হইয়া মক্কায় প্রত্যা-বর্ত্তন করেন। (১)

এই সময় মোহাম্মদের যশোপ্রভা দেশ বিদেশে বিকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল। যে সকল বিদেশীয় লোক বাণিজ্য বা তীর্থ ভ্রমণ উপলক্ষে মক্কায় আসিত, তাহাদের অনেকে মোহাম্মদের প্রাণোন্মাদকর উপদেশে উদ্দীপিত হইয়া এসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করে। এইভাবে ইসলাম ধর্ম্মের বীজ দেশ বিদেশে সর্ব্বত্র উপ্ত হইয়াছিল। মোহাম্মদের তায়ফনগর হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের অত্যল্প পরেই মদিনার দ্বাদশজন ক্ষমতাশালী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তাঁহার মহিমা শ্রবণে আকৃষ্ট হইয়া মক্কায় আগমনপূর্ব্বক এসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। ইঁহারা প্রত্যাগমনকালে মদিনায় ধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্য একজন প্রচারক সঙ্গে লইয়া যান। ইঁহার চেষ্টায় মদিনায় এসলাম ধর্ম্মের জ্যোতিঃ বিকীর্ণ হইয়া পড়ে এবং আপামর সকলেই এসলাম ধর্ম্মের শরণাপন্ন হয়। এইভাবে মক্কার বহির্ভাগে এসলাম ধর্ম্মের প্রভাব ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

কিন্তু মক্কার অধিবাসীরা মোহাম্মদের সহস্র উপদেশেও এসলাম ধর্ম্মের মহিমা উপলব্ধি করিতে পারিল না। তাহাদের উৎপীড়নের মাত্রা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অবশেষে মোসলমানদের মক্কায় বাস করা দুষ্কর হইয়া উঠিল। মোহাম্মদ সশিষ্যে মদিনায় আশ্রয় লইতে ইচ্ছা করিলেন। মদিনার অধিবাসীরা মোহাম্মদ ও তাঁহার শিষ্যগণকে আনয়ন করিবার জন্য

(১) মোহাম্মদ তায়েফনগর হইতে প্রত্যাগমনকালে পথিমধ্যে ভগ্ন হৃদয়ে যে প্রার্থনা করিয়াছিলেন, আমরা তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি। "হে প্রভু, আমি দুর্ব্বলতা ও আত্মস্তরিতাবশতঃ তোমার নিকট আমার দুঃখকাহিনী নিবেদন করিয়া থাকি। মনুষ্যের নিকট আমি নগণ্য। হে দুর্ব্বলের পরম কারুনিক প্রভু, তুমি আমার নিয়ন্তা, তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিও না। অপরিচিত বা শত্রুসঙ্কুল স্থানে আমাকে পরিত্যাগ করিও না। তুমি রুষ্ট না হইলে আমার কোন বিপদ নাই। তোমার জ্যোতিই আমার আশ্রয়স্থল; তোমার জ্যোতিতে সমস্ত অন্ধকার দূরীভূত হয় এবং ইহকালে ও পরকালে শান্তিলাভ করা যায়। তুমি আমার প্রতি রুষ্ট হইও না। তোমার যেরূপ ইচ্ছা সেই ভাবে আমার বিপদ দূর কর। তোমার করুণা ব্যতীত শক্তি ও সাহায্য নাই।"

সত্তরজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে মক্কায় প্রেরণ করিল। মোহাম্মদ মোসলমানদিগকে ক্রমে ক্রমে মক্কা পরিত্যাগ করিয়া গুপ্তভাবে মদিনায় গমন করিতে আদেশ করিলেন। শত্রুসঙ্কুলস্থানে একজন মোসলমানকেও পরিত্যাগ করিয়া মোহাম্মদ নিজে নিরাপদ স্থানে গমন করিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। এজন্য তিনি সর্ব্বশেষে মক্কা হইতে প্রস্থান করিবার সঙ্কল্প প্রকাশ করিলেন। তদীয় প্রিয়তম ধর্ম্মবন্ধু আবুবেকরও আলী তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া মদিনায় গমন করিতে অনভিলাষী হইয়া মক্কায় বাস করিতে লাগিলেন। ইঁহারা ব্যতীত বিশ্বাসী দলভুক্ত সকলেই মদিনায় প্রস্থান করিতে লাগিলেন। এইরূপ ক্রমিক প্রস্থানে মক্কানগরী অচিরে মোসলমান শূন্য হইয়া পড়িল। অতঃপর মোহাম্মদবন্ধুদ্বয়সহ মদিনায় প্রস্থান জন্য উদ্যোগ করিলেন। ৬২২ খ্রীষ্টাব্দের রবিঅলআউল (জুলাই) মাসের পঞ্চম দিবস (সোমবার) সমাগত হইল। রাত্রি প্রভাতে তাঁহারা মদিনাভিমুখে প্রস্থান জন্য প্রস্তুত হইলেন। এদিকে বিরুদ্ধবাদিগণ সেই রাত্রিতেই মোহাম্মদকে হত্যা করিতে ষড়যন্ত্র করিল। তাহারা আপনাদের পাপ সংকল্প কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য মোহাম্মদের বাসগৃহ পরিবেষ্টন করিল। কিন্তু মোহাম্মদ তাহাদের ষড়যন্ত্রের বিষয় অবগত হইয়া আবুবেকরের গৃহে প্রস্থান করিয়াছিলেন।

মোহাম্মদ আবুবেকরের গৃহে উপনীত হইয়া তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া সেই অন্ধকার রজনীতেই মদিনাভিমুখে প্রস্থান করেন। আবুবেকর তাঁহাকে শত্রুর গুপ্ত আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য কখনও তাঁহার সম্মুখবর্ত্তী, কখনও তাঁহার পশ্চাদ্বর্ত্তী, কখনও বা তাঁহার পার্শ্ববর্ত্তী হইয়া পথ চলিতে লাগিলেন। শত্রুর প্রথম আক্রমণ নিজের উপর আনয়ন করিবার উদ্দেশ্যই তিনি এইরূপে পথ অতিবাহিত করিয়াছিলেন। মোহাম্মদের চরণে প্রস্তরের দারুণ আঘাত লাগিল, তিনি পদব্রজে চলিতে অক্ষম হইলেন। আবুবেকর তাঁহাকে স্কন্ধে লইয়া চলিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা গারসুরা নামক সঙ্কীর্ণ গিরিগুহার নিকট উপনীত হইয়া সেখানে রাত্রিযাপন করিতে ইচ্ছা করিলেন। তিনি তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া উহা কোন প্রকারে বিপদসঙ্কুল কি না, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন এবং সেখানে বহুসংখ্যক ছিদ্র প্রদর্শন করিয়া তৎসমুদায় পরিধেয় বস্ত্রদ্বারা বন্ধ করিয়া সর্পাদির আগমন পথ রুদ্ধ করিলেন। বস্ত্রখণ্ডের অল্পতানিবন্ধন একটী ছিদ্রপথ রুদ্ধ করিতে না পারিয়া তিনি সেখানে পদস্থাপন করিয়া বসিয়া রহিলেন। এইভাবে যথোচিত

সতর্কতা অবলম্বন করিয়া আবুবেকর মোহাম্মদকে আহ্বান করিলেন। মোহাম্মদ গুহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া নিদ্রাভিভূত হইলেন; আবুবেকর রাত্রি জাগরণ করিয়া প্রহরীর কার্য্যে নিযুক্ত রহিলেন। তিনি যে একটী ছিদ্রপথে পদস্থাপন করিয়া রাখিয়াছিলেন, সে পথে একটী বৃশ্চিক তাঁহাকে দারুণ দংশন করিল, তিনি যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া পড়িলেন; কিন্তু মোহাম্মদকে জাগরিত না করিয়া সমস্ত নীরবে সহ্য করেন।

এদিকে বিরুদ্ধবাদিগণ মোহাম্মদকে গ্রামমুক্ত দেখিয়া শোণিত লোলুপ ক্রুদ্ধ ব্যাঘ্রের ন্যায় তাঁহার অনুসন্ধানে ধাবিত হইল এবং তাঁহার পদাঙ্কের অনুসরণ করিয়া গারস্থুরা গুহার নিকট আসিয়া পৌঁছিল। মোহাম্মদ ও আবুবেকর তাহাদের পদ শব্দ শুনিতে পাইলেন। আবুবেকর শঙ্কাকুল হইয়া বলিলেন, "আমরা দুইজন, শত্রু সংখ্যা বহু, আর রক্ষা নাই।" মোহাম্মদ বলিলেন, "আমরা দুইজন নহি, তিনজন, ঈশ্বর আমাদের সঙ্গী, ঈশ্বর আমাদিগকে রক্ষা করিবেন।" আবুবেকর ও মোহাম্মদের গুহার ভিতরে প্রবেশ করিবার অব্যবহিত পরেই ঊর্ণনাভ উহার মুখে জাল পাতিয়াছিল, এবং বন্য কপোত দ্বারমূলে ডিম্ব প্রসব করিয়া রাখিয়াছিল। গুহার মুখে জাল ও দ্বারমূলে ডিম্ব দেখিয়া শত্রুগণ উহার অভ্যন্তরে প্রবেশ না করিয়াই অন্য দিকে চলিয়া গেল, মোহাম্মদ ও আবুবেকর রক্ষা পাইলেন। তাঁহারা তিন অহোরাত্রি এই গুহার অভ্যন্তরে লুক্কায়িত রহিলেন। প্রতি রজনীতে আবুবেকরের কন্যা দুগ্ধ আনয়ন করিতেন; তাঁহারা এই দুগ্ধ পান করিয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতেন। তাঁহারা চতুর্থ রজনীতে গারস্থুরা গুহা পরিত্যাগ করিয়া মদিনাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাহারা রাত্রিকালে পথ অতিবাহিত করিতেন, সূর্য্যোদয় হইবামাত্র লুক্কায়িত হইতেন। এইভাবে পথ অতিবাহিত করিয়া তাহারা চতুর্থ রজনীতে মদিনার নিকটবর্ত্তী কোবা নামক স্থানে উপনীত হইলেন। এখানে চারিদিন যাপন করিয়া মোহাম্মদ আবুবেকরকে সঙ্গে লইয়া রবি-অল-আউল মাসের ষোড়শ দিবসে (শুক্রবার) মদিনায় প্রবেশ করিলেন। (ক্রমশঃ)

হিন্দুর দেবতা।

আর্য্য শাস্ত্রকারগণের মতে অবাঙ্‌মনসোগোচর পরম ব্রহ্ম সাধক বৃন্দের হিতের নিমিত্ত মধ্যে মধ্যে রূপ ধারণ করিয়া মানবেন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত হইয়া থাকেন। নির্গুণ নিষ্ক্রিয় অতীন্দ্রিয় ব্রহ্মই গুণত্রয় যোগে (সত্ত্বরজঃতমঃ) সৃষ্টিস্থিতলয় রূপ ক্রিয়াত্রয় সম্পাদন করিতেছেন, ইহাই হইল প্রাচীন ঋষিগণের কথা। এই গুণত্রয় ভেদে মূর্ত্তিত্রয় প্রাপ্ত ব্রহ্মই ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর নামে অভিহিত। সাধুদিগের রক্ষা, পাপীদিগের পরিত্রাণ, এবং ধর্ম্ম সংস্থাপন উদ্দেশ্যে পরম কারুণিক পরমেশ্বর শরীরীরূপে ধরণী তলে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, রাম কৃষ্ণ বামন প্রভৃতির আবির্ভাব এই উদ্দেশ্যেই বিহিত হয়; ইহা আমাদের কথা নহে, ইহা স্বয়ং ভগবানের উক্তি বলিয়াই স্বীকৃত। এই প্রকারেই আর্য্য জাতির ইন্দ্র বরুণ প্রভৃতি দেব দেবীর উৎপত্তি। হিন্দু শাস্ত্রে ইহা বিস্তৃত ভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে; তাহা বিবৃত করা (অর্থাৎ ঈশ্বরের নিরাকারত্ব নিরাকরণ ও সাকারত্ব প্রতিপাদন করা) বর্ত্তমান প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য নহে। সুতরাং আমরা এই সম্বন্ধে অধিক কিছু বলিব না। আমরা শুধু দেখাইতে চেষ্টা করিব, হিন্দুর আরাধ্য দেব দেবী অদৃষ্ট দোষে এখন কিরূপ শোচনীয় অবস্থায় উপস্থিত হইয়াছেন। বৈদিক দেবতাই পুরাণের সময়ে কিছু রূপান্তর ধারণ করিতে বাধ্য হন। সেই রূপান্তরিত পৌরাণিক দেবতারা আবার কবি, চিত্রকর, কুম্ভকার প্রভৃতির অনুকম্পায় এখন আরও অপরূপ রূপ ধারণ করিয়া বসিয়াছেন।

প্রথমতঃ আমরা কবি মহাশয়দের দেবতাদিগকেই পাঠকগণের নিকট উপস্থিত করিব। কারণ, কবি-চিত্রিত দেব সমাজই ! এখন আমাদের দেশে পূজাদি গ্রহণ করিতে প্রায়শঃ নিমন্ত্রিত হইয়া থাকেন।

সর্ব্বত্রই প্রায় দেখা যায়, কবিগণ নিজেদের রুচি অনুসারে 'দেবতাদিগকে মানুষ ভাবে চিত্রিত করিতে প্রয়াস পাইয়া থাকেন। তাই দেবতারা ঘোরতর বিলাসী, তাই দেবভূমি স্বর্গ রাজ্যে তরুণ যৌবনবতী বারবনিতাগণের বিলাস বিভ্রম, তাই প্রমোদ-নিকেতন নন্দন কানন।

দেবতারাও মানুষের ন্যায় পরিণয় শৃঙ্খলে আবদ্ধ। কোন দেবতাই

একাকী নহেন। প্রায় সকলেই মানবের ন্যায় দাম্পত্য প্রণয়ের অমৃত-রস-পানে আত্ম-বিস্মৃত। আরও বিস্ময়ের বিষয় এই, স্বর্গীয় দাম্পত্য প্রণয়েও মর্ত্ত্যের বিরহ-বিচ্ছেদ, হা হুতাশ, হাসি-কান্না, মান-অভিমান, কিছুরই অভাব নাই। সবই আছে, এমন কি, পৃথিবীস্থ ভোগবিলাসী মানুষের ভালবাসার ন্যায় ইহাও কাম-গন্ধ পূর্ণ। মহাকবি কালিদাস কুমারসম্ভব কাব্যের ৮ম সর্গে জগদারাধ্য হরপার্ব্বতীর বিহার কাহিনী যে কুৎসিত ভাব ও ভাষায় বিবৃত করিয়াছেন, তাহা দেখিয়া সম্ভবতঃ কোন নীতি-প্রিয় ব্যক্তিই চক্ষুঃ মুদ্রিত না করিয়া থাকিতে পারেন না—(১)। যে দেবপূজ্য মহাদেব যোগিগণের অগ্রণী, যে জিতেন্দ্রীয় পরমেশ কামদেবকে ভস্মস্তূপে পরিণত করিয়াছিলেন, সেই পরম দেবতা ভারত চন্দ্রের অনুগ্রহে যে মানবীর বরসজ্জা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা বস্তুতঃই হাস্যজনক। এই মহাদেবের ন্যায় যিনি আদর্শ পুরুষ, যিনি পূর্ণাবতার রূপে স্বীকৃত, সেই কর্ম্মযোগী শ্রীকৃষ্ণের পুণ্যময়ী লীলা-মন্দাকিনীতে জয়দেবপ্রমুখ কবিগণ যে জঘন্য আদি রসের উন্মাদ-তরঙ্গ-বিক্ষোপ সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার প্রভাবে আজ পরম উপাস্য শ্রীকৃষ্ণ অভিসার-প্রিয়, পরদার-বহিস্করণ পটু, লম্পটরূপে সাধারণ্যে পরিচিত। যে বীরশ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ ভক্ত অর্জ্জুনের নিকট যোগিগণ দুর্জ্জেয় যোগ কাহিনী ব্যক্ত করিয়া মোহান্ধকারময় জগতের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছেন, যিনি শিষ্টের রক্ষণ, দুষ্টের দমন, ও ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠার জন্য জগতীতলে প্রাদুর্ভূত, তিনি কবিগণের অনুগ্রহে সামান্য গোপ বালকের ন্যায় চান্দ্রমসী মধু যামিনীতে জ্যোৎস্না-বিধৌত যমুনা-পুলিনে কিংবা তমালতালীর শ্যামল বনচ্ছায়ায় পর-কামিনীর মানস মোহনে ব্যতিব্যস্ত।

দেবারাধ্য মহাদেব ও পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণই যে শুধু কবিগণের এই প্রকার অযাচিত অনুগ্রহ লাভ করিয়াছিলেন, তাহা নহে। যে বীরেন্দ্র শ্রেষ্ঠ দানব দলনের জন্য জন্ম লাভ করিয়াছিলেন, যিনি সমর ক্ষেত্রে দেবরাজ ইন্দ্রের দক্ষিণ হস্তরূপে পরিগণিত ছিলেন এবং যিনি বীরত্ব-মণ্ডীত দেব সেনাপতি, সেই বীরকুলকেশরী কার্ত্তিকেয় এখন বিলাসপ্রিয় অকর্ম্মণ্য ধনিপুত্রের ন্যায় ঘোরতর বাবুরূপে চিত্রিত। এখন যে কোন দেবতার প্রতিই দৃষ্টিপাত করা যায়, পূর্ব্বের ন্যায় আর কোন দেবতারই ষড়ৈশ্বর্য্যশালিত্ব পরিলক্ষিত

(১) অনেকে বলেন, কুমারের অষ্টম সর্গ হইতে বাকী অংশ কালিদাসের রচিত নয়। ইহার কোন বিশিষ্ট প্রমাণ দেখিতেছি না।

হয় না। সকলেরই অবস্থা শোচনীয় বিকৃত। তেত্রিশ কোটি দেবতার বিকৃত চিত্র অঙ্কিত করিয়া প্রদর্শন করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। আমরা দিঙ্‌মাত্র নির্দ্দেশ করিয়াই ক্ষান্ত রহিব। বিশেষতঃ সকলের অবস্থা বলিবার কোন প্রয়োজনও নাই; কারণ দেব সমাজে যাঁহারা প্রসিদ্ধ ব্যক্তি, তাঁহাদেরই যখন এই দশা, অন্যে পরে কা: কথা। তবে যিনি দেবগণের রাজা পরম পবিত্র, সমগ্র স্বর্গ রাজ্যের যিনি অধীশ্বর, সেই দেবাধীশ ইন্দ্রের কথা এখনও কিছু বলা হয় নাই। তাঁহার কথা অবশ্য উল্লেখনীয়। এই উল্লেখযোগ্য চিত্রটী প্রচ্ছন্ন রাখা সঙ্গত নয়, কিন্তু ইহা সর্ব্ব সমক্ষে উপস্থাপিত করিতে নিতান্ত লজ্জা বোধ করিতেছি। যিনি দেবগণের রাজা, তাহার আলেখ্য এই প্রকার কুৎসিত বর্ণে অঙ্কিত করা কি উচিত ছিল। যে কোন ব্যক্তিই স্বীয় আত্মার উন্নতির কল্পে সাধনায় প্রবৃত্ত হইলেই কাপুরুষ ইন্দ্র নিজের ইন্দ্রত্বচ্যুতির ভয়ে নানারূপ কদর্য্য প্রলোভনে তাঁহাকে কর্ত্তব্য-পথ-ভ্রষ্ট করিতে চেষ্টা করিয়া থাকেন। কি জঘন্য ভীরুতা, দেবতা কেন, কোন সভ্যতাভিমানী মানুষেও সম্ভবতঃ এইরূপ অশিষ্ট ব্যবহারে প্রবৃত্ত হয় না, ইহার উপর মহা বাবু ইন্দ্র মহাশয়ের নন্দন রূপ বিনোদ বিলাসে নিত্যই নূতন মজ্‌লিস্, নূতন বৈঠক, আমোদ প্রমোদ নাচ গান খুবই চলিতেছে। নৃত্যের জন্য যেরূপ লাস্যবিলাসিনী উর্ব্বশীরম্ভা প্রভৃতি সুর-সুন্দরীগণ নিযুক্তা ছিল, সেইরূপ নানাবিধ ঐকতান বাদ্যের নিমিত্তও সুশিক্ষিত চিত্রসেন গন্ধর্ব্বের দল সৃষ্ট হইয়াছে। কবিরা এই এইটুকু করিয়াই নীরব হয়েন নাই। তাঁহারা এই ক্ষেত্রে আর একটী সুমহৎ অনুষ্ঠান সম্পাদন করিয়াছেন, এত বড় একটা উপভোগ্য জিনিস শুধু দেবরাজই ভোগ করিবেন, ইহা কবিগণ সহজে সহ্য করিতে পারিলেন না, কাজেই তাহারা মাঝে মাঝে কোন কোন ভাগ্যশালী রাজাকে ইন্দ্রের বন্ধুরূপে পরিচিত করাইয়া সশরীরে ইন্দ্রের প্রমোদ সভায় নিয়া গিয়াছেন। ঐ সকল মানব-ইন্দ্রের সহিত একাসনে বসিয়া মানব-জনদুর্লভ স্বর্গীয় আমোদ প্রমোদাদি উপভোগ করিতেছেন। এই স্থলে আর একটী কথা বলা আবশ্যক, এই দেব নিবাসের নর্ত্তকী-গণের সাধারণ আখ্যা অপ্সরা। ইহারা নিখুঁত সুন্দরী ও চির যৌবনবতী। কবিরা ইহাদের সৌন্দর্য্য রাশি ভাষায় ব্যক্ত করিতে না পারিয়া এক অদ্ভুত উপায় অবলম্বন করিতেও বাধ্য হইয়াছিলেন; ত্রিজগতে যত সুন্দরী আছেন, তাহাদের সৌন্দর্য্যের সারাংশটুকু তিল তিল করিয়া তিলোত্তমাকে সৃষ্টি করেন। এই

এই তিলোত্তমা প্রমুখ সুন্দরী কুল ললামভূতা দেব প্রণয়িনী হইয়াও মানুষের অচ্ছেদ্য প্রেম নিগড়ে আবদ্ধ হইয়াছেন, দেখিতে পাওয়া যায়। দেবসমাজেও ঈর্ষা আছে, দ্বেষ আছে, কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য্য সবই আছে। তাই কথায় কথায় রাগ, যখন তখন অভিসম্পাত, স্থানে অস্থানে মদন লীলাভিনয়।

তাই বলিতেছিলাম, কবি মহাশয়েরা দেব সমাজকে বড়ই লাঞ্ছিত করিয়াছেন। বাকীটুকু অশিক্ষিত কুম্ভকার সম্প্রদায় শেষ করিয়াছেন। যে দেবতা যেরূপ কল্পিত (ধ্যান মন্ত্রে যাহা জানিতে পারা যায়) কয়জন কুম্ভকার তাহা যথাযথ কল্পনা করিতে যত্ন করিয়াছে? এখন পঞ্চানন ষড়ানন প্রভৃতি দেবতারা অমর হইয়াও ভাগ্য দোষে বঙ্গীয় কুম্ভকারের হাতে পড়িয়া অকালে মারা পড়িয়াছেন। এখন ষড়ানন মূর্ত্তি কেহ দেখিতে পান কি? চিত্রকর-সম্প্রদায়ও কুম্ভকারদলের মাসতুত ভাই। চিত্রকর সম্প্রদায়ও কুম্ভকারগণের ন্যায় বর্ণ তুলিকার ভীষণ অস্ত্রাঘাতে নিখিল সৌন্দর্য্যের চরম উৎকর্ষ হিন্দু দেবদেবীগণকে বিকৃত করিয়া তুলিয়াছেন।

বস্তুতঃ ইহাদের নির্ম্মাণ-নৈপুণ্য বা বর্ণ-যোজনা কোথায়ও কল্পনার অনুরূপ অভিব্যক্ত হইতেছেনা। যাক্, এই অশিক্ষিত সম্প্রদায়ের বিবরণ বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করা নিষ্প্রয়োজন। এখন আমাদের সমাজের কথা সংক্ষেপে বলিয়াই প্রবন্ধ শেষ করিব। বহু সময়েই কঠোর শাসনে নৈতিক অবনতি বা অপ্রেয়সী অধোগতি দেশ হইতে দূরীকৃত হয়। সমাজই আমাদের প্রধানতম শিক্ষা স্থান। মানুষ অনেক সময় রাজ-শক্তিতেও উপেক্ষা করিতে প্রস্তুত হইতে পারে, কিন্তু সামাজিক শাসনের নিকট কাহার মস্তক অবনত হয় না? হিন্দু সমাজের নেতা বা অধিনায়ক নাই বলিয়াইত আমাদের এই অবস্থা। মুসলমান সমাজ এই বিষয়ে আমাদের আদর্শ স্থানীয়। আমরা এইস্থলে একটী ঘটনার উল্লেখ করিতেছি।

ঢাকা নগরীতে দুইটী নাট্য সম্প্রদায় রহিয়াছে—কিছু দিন অতীত হইল, নাটক দ্বয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ "আলী বাবা" নাটকের অভিনয় করিতে আরম্ভ করেন। ঢাকা নগরী মুসলমান প্রধান স্থান। ধর্ম্ম-নারায়ণ মুসলমানগণ ইহা দেখিয়া অধ্যক্ষদিগকে বলিলেন "আলী বাবা" তাহাদের অতিশয় শ্রদ্ধা ভাজন ব্যক্তি ছিলেন, তাহার নাম রঙ্গে কথনই উচ্চারিত হইতে পারিবে না, ইহাদের এই সগৌরব প্রার্থনায় অধ্যক্ষগণ উক্ত নাটক হইতে "আলী বাবা"

নাম উঠাইয়া ফেলিতে বাধ্য হইয়াছেন। এখন এক রঙ্গালয়ে "আলী বাবা" অভিনীত "আমি বাবা" নামে তাহা অভিনীত হইতেছে। ইহা বস্তুতই শ্রদ্ধেয় ব্যক্তির প্রতি ভক্তি বা সম্মান প্রদর্শনের প্রার্থনীয় নিদর্শন। কিন্তু হিন্দু সমাজে ইহার বৈপরীত্যই পরিদৃষ্ট হয়। হিন্দু সমাজ এই অনুচিত রীতি নিবারণ করিতে কখনও সচেষ্ট নহে, বরং সমাজ শক্তি সর্ব্বদাই ইহার আনুকূল্য করিতেছে। উল্লিখিত মুসলমান সমাজ কর্ত্তৃক আলীবাবার নামে যে সম্মান প্রদর্শিত হইয়াছে, হিন্দু সমাজে তদ্রূপ সাধু সজ্জন যোগী সন্ন্যাসীর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শিত হয় কি? মানুষের কথা দূরে থাকুক, ভাগবানের কল্পিত মূর্ত্তি গুলিও অহোরাত্র হিন্দু সমাজে বিড়ম্বিত হইতেছে! রঙ্গালয়ে ব্যঙ্গ করিবার জন্য হিন্দুর দেবতা, হাস্য পরিহাসের বৈঠকে বিদ্রূপের ছবি হিন্দুর দেবতা, কোথায়ই বা হিন্দুর দেবতা নাই? কুৎসিৎ গ্রাম্য "সং" এর মধ্যেও হিন্দু দেবতার অপূর্ব্ব আবির্ভাব নয়নগোচর হয়। সম্ভবতঃ অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন, ভক্তের প্রাণে দারুণ আঘাত করিতে মহাদেবে বীভৎস লম্বোদরী মূর্ত্তি অথবা গোপীগণ অঞ্চলধারী শ্রীকৃষ্ণের বিকৃত "সং" গ্রাম্য লোকের দ্বারা সর্ব্বদাই অনুষ্ঠিত হইতেছে। আমরা এই স্থলে ঢাকা নগরীর আর একটী ঘটনার উল্লেখ করিতে বাধ্য হইতেছি। পূর্ব্বে চৈত্র সংক্রান্তিতে চড়ক পূজায় বঙ্গদেশের বহু স্থলেই এক নৃশংস ব্যাপার অনুষ্ঠিত হইত, মানুষের পৃষ্ঠদেশ বড়শী দ্বারা বিদ্ধ করিয়া চড়ক গাছে ঘুরান হইত, এই বর্ব্বর ব্যাপারে অনেক সময় দুর্ঘটনা না ঘটিত, এমন নহে, এখন উহা গবর্ণমেণ্টের অনুকম্পায় নিবারিত হইয়াছে। এই বিষয় দেশবাসীর অজ্ঞাত নহে, ঢাকাতেও চড়ক পূজায় তাদৃশ নৃসংশ আমোদ অনুষ্ঠান নিরাকৃত হইয়াছে বটে, কিন্তু বর্ব্বরতা এখনও সম্যক্ তিরোহিত হয় নাই। চৈত্র সংক্রান্তির ৫।৬ দিন পূর্ব্ব হইতেই চড়ক পূজার উৎকট "সং" দুশ্রাব্য ঢক্কারবে ত্রিভুবন কম্পিত করিয়া সহরের সর্ব্বত্র বিচরণ করিতে থাকে, সংক্রান্তির পূর্ব্ব দিন পর্য্যন্ত "সং" শ্যামাঠাকুরাণীর সাজ সাজিয়া নাচিয়া বেড়ায়, সংক্রান্তির দিবস হর পার্ব্বতীও আসিয়া উহার সঙ্গে যোগদান করিয়া থাকে। সহরের যত অশিক্ষিত অসভ্যলোক শরীরে কালী মাখিয়া পরচুলা পরিয়া শক্তিরূপিণী কালীর বিকট্ সাজে সজ্জিত হয়। শুধু ইহাই নহে, ইহারা উৎকট্ কালী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া সর্ব্বত্র কুৎসিত খেম্‌টা তালে নাচিতে থাকে। আমরা অত্যন্ত লজ্জা দুঃখ ও ক্ষোভের সহিত জানাইতেছি যে, বহু শিক্ষিত

ভদ্র সামাজিক এই অপবিত্র অতি ঘৃণিত আমোদে যোগদান করিতে কুণ্ঠিত হয় না। ইহা দেখিবার জন্য সর্ব্বসাধারণের আন্তরিক ঔৎসুক্য ও সহানুভূতি দেখিলে বস্তুতঃই মর্ম্ম পীড়িত হইতে হয়। সংক্রান্তি দিবসের স্থূলোদর বর্ষীয়ান্ মহাদেব ও বাইজী-কন্যা দুগ্ধপায়িনী বালিকা গৌরী কালীরই অনুরূপ মূর্ত্তি, নৃত্য ভঙ্গিও তদ্রূপ, সুতরাং পুনরুল্লেখ অনাবশ্যক। ঢাকা সহরের এই ঘটনায় পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে, সামাজিক শাসনের অভাবেই এই দেব দেবীর কুৎসিত রূপ প্রচার সংঘটিত হইতেছে। হিন্দু সমাজের যদি জীবন থাকিত, যদি পবিত্রতা বোধ থাকিত, ঈশ্বরে বা দেবীতে অচলা ভক্তি ও অগাধ বিশ্বাস থাকিত, হিন্দু সমাজের যদি রুচি নীতির প্রতি দৃষ্টি থাকিত, তবে নিশ্চয়ই এই প্রকার কদর্য্য আমোদ অনুষ্ঠিত হইতে পারিত না। যে মহাশক্তির প্রভাবে অলীবাবার পবিত্র নাম রঙ্গভূমিতে উচ্চারিত হইতে পারিল না, হিন্দু সমাজের সেই শক্তি বা ধর্ম্মপরায়ণতা থাকিলে আরাধ্যা কালী বা উপাস্য মহাদেবের শরীরে কালী চুণ কখনই পড়িত না।

কবি কুম্ভকার চিত্রকরের ন্যায় সমাজও যে দেব দেবীর সর্ব্বনাশের মূল, তাহাতে সম্ভবতঃ কাহারও সন্দেহ নাই। সামাজিক বা পুনরুত্থানকারী দল এই বিষয়ে একটু মনোযোগী হইতে পারেন না কি? আজ আমরা সহস্র উন্নতির মধ্যেও এই আধ্যাত্মিক অবনতি দেখিয়া বস্তুতঃই মর্ম্মাহত হইতেছি।

বিশ্বনাথ কবিরাজ

বিশ্বনাথ কবিরাজ, সাহিত্যদর্পণ নামক অলঙ্কার গ্রন্থ রচনা করিয়া সাহিত্য জগতে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া গিয়াছেন। বিশ্বনাথ, কোন্ জাতীয় ছিলেন, কোন্ সময়ের লোক ছিলেন ও কোন্ দেশ অলঙ্কৃত করিয়া গিয়াছেন, সাহিত্য দর্পণ হইতে তাহার কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। গ্রন্থকর, রামায়ণ, মহাভারত, বিষ্ণুপুরাণ ও আগ্নেয়পুরাণ ব্যতীত অন্য পঁচিশজন গ্রন্থকারের গ্রন্থ হইতে উদাহরণ সংগ্রহ করিয়াছেন। ৮১ খান গ্রন্থের নাম করিয়াছেন। সেই সকল গ্রন্থ ও গ্রন্থকারদের মধ্যে গীতগোবিন্দ ও জয়দেবের নাম নাই। জয়দেব, সেনবংশীয় শেষ রাজা লক্ষ্মণসেনের সভাসদ্ ছিলেন। লক্ষ্মণসেনের সভায় শরণ, গোবর্দ্ধনাচার্য্য, ধোয়ীকবি, উমাপতিধর নামক আরও চারিজন কবি ছিলেন, তাঁহাদেরও কোন শ্লোক উদ্ধৃত হয় নাই। এইজন্য আমরা

অনুমান করি যে বিশ্বনাথ, তাঁহাদের পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। বিশ্বনাথের গ্রন্থে উদয়নাচার্য্যের নাম আছে। উদয়নাচার্য্য, ১০৮৮ খৃষ্টাব্দের পর প্রাদুর্ভূত হন। বিশ্বনাথ, অবশ্যই তাঁহার পরবর্ত্তী।

বিশ্বনাথ সরস্বতীর বন্দনা করিয়া গ্রন্থ আরম্ভ করিয়াছেন, যথা—

শরদিন্দুসুন্দররুচিশ্চেতসি সা মে গিরাং দেবী।
অপহৃত্য তমঃ সন্ততমর্থানখিলান্ প্রকাশয়তু॥

বিশ্বনাথ আপনাকে শ্রীমন্নারায়ণ-চরণারবিন্দ মধুব্রত বলিয়াছেন। এই পরিচয়ে তাঁহাকে বৈষ্ণব বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। ইনি কোন রাজার মহাপাত্র সান্ধিবিগ্রহিক ছিলেন। রাজার নাম পাই নাই। গ্রন্থকার সাহিত্যদর্পণের এক স্থানে লিখিয়াছেন, "গৌড়েন্দ্রঃকণ্টকং শোধয়তি।" ইহাতে তাঁহাকে গৌড়েন্দ্রের বিশেষ পরিচিত বলিয়া বিশ্বাস হয়। এই গৌড়েন্দ্র কোন্ সময়ের লোক, তাহার কোন পরিচয় পাওয়া যায় নাই গ্রন্থকারের পিতার নাম চন্দ্রশেখর। তিনিও সান্ধিবিগ্রহিক মহাপাত্র ছিলেন।

দুর্গালঙ্ঘিত বিগ্রহোমনসিজং সম্মীলয়ং স্তেজসা।
প্রোদ্যদ্রাজ কলোগৃহীত গরিমা বিষগ্বৃতো ভোগিভিঃ॥
নক্ষত্রেশকৃতেক্ষণো গিরিগুরৌগাঢ়াং রুচিং ধারয়ন্
গামাক্রম্য বিভূতিভূষিততনূ রাজত্যুমা-বল্লভঃ॥

গ্রন্থকারের পিতৃ রচিত উক্তশ্লোকটী অভিধামূলক-ব্যঞ্জনার উদাহরণ স্থলে গৃহীত হইয়াছে। এই শ্লোকে উমাদেবী ও তদ্বল্লভ ভানুদেব নৃপতির নাম, অভিধামূলা ব্যঞ্জনায় পাওয়া যাইতেছে। গ্রন্থকার নিজে একথা আমাদিগকে জানাইয়াছেন। পালবংশে ও সেনবংশে ভানুদেব নামক কোন রাজা জন্মেন নাই। প্রাগ্জ্যোতিষপুরের কোন রাজার ভানুদেব নাম ছিল কিনা, তাহা জানি না। বিশ্বনাথ ও তৎপিতা হয়ত প্রাগ্জ্যোতিষপুরেশ্বর বিশেষের মহাপাত্র সান্ধিবিগ্রহিক ছিলেন। হাতের কাছে বিশ্বকোষ থাকিলে, প্রাজ্জ্যোতিষপুরের নাম দেখিতে পাওয়া যাইত। বিশ্বনাথের বৃদ্ধপ্রপিতামহের নাম নারায়ণ। তিনি "সহৃদয় গোষ্ঠী-গরিষ্ঠ কবি পণ্ডিত মুখ্য'' ছিলেন। নারায়ণ, অদ্ভুতরসবর্ণনায় নিপুণ ছিলেন। বিশ্বনাথ, ধর্ম্মদত্ত নামক গ্রন্থকারের গ্রন্থ হইতে তাহার সংবাদ জানিয়াছিলেন। চণ্ডদাস নামক গ্রন্থকার, বিশ্বনাথের পিতামহের অনুজ ছিলেন। বিশ্বনাথ একস্থানে লিখিয়াছেন,

"তদুক্তং অস্মদ্ গোত্র কবি পণ্ডিতমুখ্য শ্রীচণ্ডীদাস পাদৈঃ" ; অন্যত্র লিখিয়াছেন, "অস্মৎ পিতামহানুজ- কবি-পণ্ডিতমুখ্য শ্রীচণ্ডীদাস পাদানান্ত"। কবির একটী উক্তিতে আছে "সদ্যোমুণ্ডিত-মত্তহূণ-চিবুক-প্রস্পর্দ্ধি-নারঙ্গকং''। বিশ্বনাথের সময় ত ভারতবর্ষে হূণের উপদ্রব ছিলনা, তখন মুসলমানেরা ভারতের পশ্চিম খণ্ডে আপতিত হইতেছিল। বিশ্বনাথের হূণ শব্দের লক্ষ্য কোন্ জাতি, তাহা জানা গেল না।

সাহিত্যদর্পণ ব্যতীত বিশ্বনাথ প্রভাবতী পরিণয়, চন্দ্রকলা-নাটিকা, রাঘব-বিলাস, কুবলায়শ্ব চরিত, প্রশস্তিরত্নাবলী প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। বিশ্বনাথের পিতাব পুষ্পমালা ও ভাষার্ণব নামক গ্রন্থ আছে। এই সকল গ্রন্থের কোন না কোন স্থলে বিশ্বনাথ ও তৎপূর্ব্ব পুরুষগণের কোন কোন পরিচয় থাকা সম্ভব। বিশ্বনাথ, আপনাকে অষ্টাদশ ভাষায় ও আপনার পিতৃদেবকে চতুর্দ্দশ ভাষায় অভিজ্ঞ বলিয়াছেন। সে সকল ভাষা সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষা হওয়ার সম্ভব। বিশ্বনাথ কাব্যশাস্ত্রে পরম পণ্ডিত ও সুকবি ছিলেন। তাঁহার ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থ হইতে কয়েকটী শ্লোক উদ্ধৃত হইতেছে, চন্দ্রকলার একটী শ্লোক—

তরুণস্য বিলাসঃ সমাধিক-লাবণ্য-সম্পদোহাসঃ।
ধরণীতলস্যাভরণং যুবজন-মনসোবশীকরণম্॥

কুবলয়াশ্বচরিত প্রাকৃত ভাষায় রচিত, তাহার একটী শ্লোক ;—

নবরিঅতং জুঅজুঅলং অণ্ণোণ্ণলিহিদসজলমন্থরদিট্টিং
আলক্ক ওণিআ বিঅথণমেত্তিং তথথিঅং সুহসঙ্গং॥

রাঘব বিলাসের একটী শ্লোক ;—

বিপিনে ক্কজটানিবন্ধনং তবচেদং ক্কমলোহরংবপুঃ।
অনয়োর্ঘটনাবিধেরস্ফুটং নন্থখড়্গেন শিরীষকর্ত্তনং॥

রাজপ্রশাস্তির একটী শ্লোক ;—

ত্বদ্‌রাজি-রাজি-নিধূ্ত-ধূলী-পটল-পঙ্কিলাং
ন ধত্তে শিরসাগঙ্গাং ভূরি-ভার-ভিয়াহরঃ॥

প্রশস্তিরত্নাবলী ষোড়শভাষাময়ী। উহা করম্ভক নামক নাটক শ্রেণীর অন্তর্গত। করম্ভকের লক্ষণ এই, "করম্ভকস্ত ভাষাভির্বিবিধাভির্বিনির্ম্মিতং"।

বিশ্বনাথ, বিলক্ষণ পরিহাসপটু ছিলেন। তাঁহার

গুরোর্গিরঃ পঞ্চদিনান্যধীত্য বেদান্তশাস্ত্রাণি দিনত্রয়ঞ্চ।
অমী সমাঘ্রায় চ তর্কবাদান্ সমাগতাঃ কুক্কুটমিশ্রপাদাঃ॥

এই শ্লোকে তাহার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।

প্রভাবতী পরিণয়ের একটী শ্লোক ;—

রাজানঃ সুতনির্বিশেষমধুনা পশ্যন্তুনিত্যং প্রজা।
জীয়াসুঃ সদসদ্‌বিবেকপটবঃ সন্তোগুণগ্রাহিণঃ॥
শস্যস্বর্ণ সমৃদ্ধয়ঃ * * * * সমস্তক্ষমামণ্ডলে।
ভূয়াদব্যাভচারিণী ত্রিজগতোভক্তিশ্চ নারায়ণে॥

সুমিষ্টরচনায় বিশ্বনাথ, বিলক্ষণ কৃতী ছিলেন। পরবর্ত্তী শ্লোকে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।

লতাকুঞ্জং গুঞ্জন্‌ মদবদলিপুঞ্জং চপলয়ন্‌।
সমালিঙ্গন্নঙ্গং দ্রুততরমনঙ্গং প্রবলয়ন্‌॥
মরুল্যান্দং মন্দং দলিতমরবিন্দং তরলয়ন্‌।
রজোবৃন্দং বিন্দন্‌ কিরতি মকরন্দং দিশি দিশি॥

বিশ্বনাথ, মঞ্জুতল মণিমঞ্জীরে কলগম্ভীরে বিহার সরসীতীরে।
বিরসাসি কেলি-কীরে কিমালি ধীরেচ গন্ধরাজ সমীরে॥

নিজেররচিত এই শ্লোক, ভাষাসম অলঙ্কারের উদাহরণে প্রয়োগ করিয়া বলিয়াছেন যে, "এষ শ্লোকঃ সংস্কৃত-প্রাকৃত-শৌরসেনী-প্রাচ্যাবন্তীনাগরাপভ্রংশেষেকবিধ এব"॥ জয়দেবের বিস্তর শ্লোকও ভাষাসম অলঙ্কারের উদাহরণ স্থলে উদ্ধৃত হইতে পারে। পরশ্লোক, সংস্কৃতও মহারাষ্ট্রীভাষা উভয় ভাষাতেই রচিত বলিয়াছেন। শ্লোকটী এই—

মহদে সুরসন্ধম্মে তমর সুরসঙ্গমাগমাহরণে
হরবহুশরণং তং চিত্তমোহ মবসর উমে সহসা

বিশ্বনাথের পিতৃরচিত পুষ্পমালার একটী শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া তাঁহার পাণ্ডিত্য ও কবিত্ব প্রদর্শিত হইতেছে, —

অথ চরণযুগানতে স্বকান্তেস্মিতসরসা ভবতোহস্তু ভূতিহেতুঃ॥

বিশ্বনাথ রাঘবানন্দ মহাপাত্রের নামোল্লেখ করিয়াছেন। বিশ্বনাথ, নারায়ণ, রাঘবানন্দ, ধর্ম্মদত্ত, ও চণ্ডীদাস, ইহাঁরা কোন্‌ সময়ে কোন্‌ দেশ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, কেবল সাহিত্যদর্পণ পাঠে তাহা জানা যায় না, কেবল এইমাত্র জানিতে পারা যায়, ইহাঁরা গৌড় অথবা তৎসন্নিহিত কোন দেশের লোক ছিলেন। ব্রাহ্মণের ব্যবহৃত কোন পদবী ও উপাধি ইহাঁরা ধারণ করেন নাই। আধুনিক সময়ের ক্ষত্রিয়দিগের মধ্যে তিন চারি পুরুষের

এরূপ পাণ্ডিত্য দৃষ্ট হয় না। আমাদের অনুমান হয়, ইঁহারা বৈদ্যজাতীয় ছিলেন। গ্রন্থের শেষ শ্লোক এইঃ—যাবৎপ্রসন্নেন্দু নিভাননা শ্রীনারায়ণ-স্যাঙ্গমলঙ্করোতি। তাবন্মনঃ সম্মদয়ন্ কবীনামেষ প্রবন্ধঃ প্রথিতোঽস্তু লোকে। কবির আশা সফল হইয়াছে ও হইবে।

শ্রীরজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী।

সিদ্ধ বকুল।

ঈশ্বরের অপার সৃষ্টিতে কত অসংখ্য প্রকার আশ্চর্য্য পদার্থ বিদ্যমান, তাহার গণনা হয় না। কিন্তু আরও আশ্চর্য্যের বিষয়, যেখানেই কোন আশ্চর্য্য পদার্থ দেখিয়াছি, তাহার সহিত কোন না কোন অধিকতর আশ্চর্য্য-জনক ধর্ম্ম কিম্বদন্তীর নিত্যসম্বন্ধ রহিয়াছে। জানি না, হিন্দুর দেশ ভিন্ন সর্ব্ববস্তুতে এমন ধর্ম্মময়তা আর কোথাও আছে কি না। সামান্য প্রস্তরখণ্ড হইতে আরম্ভ করিয়া কোন সুপ্রাচীন মহীরুহ পর্য্যন্ত সকল পদার্থেই কোন না কোনরূপ ধর্ম্মপ্রবাদের অঙ্গীভূত। আরও আশ্চর্য্যের বিষয়, সেই সেই বস্তুগুলিতে এমন অসাধারণ দৃশ্য বর্ত্তমান, যদ্বারা তদ্বিষয়ক কিম্বদন্তিতে আস্থা স্থাপন না করিয়া, আর, অন্য কোনও কল্পিত সিদ্ধান্তই হৃদয়ের সন্দেহ দূরীভূত করিতে সমর্থ নহে। বুদ্ধবট, অক্ষয়বট প্রভৃতির বিষয় বোধ হয় অনেকেই অবগত আছেন, আজ একটী আশ্চর্য্য বৃক্ষের কথা অপনাদিগকে এই প্রবন্ধে শুনাইব। উৎকলের সমুদ্রতীরে কয়েকদিন বাস করিয়া "লোনা হাওয়ায় হঠাৎ আমি কিঞ্চিৎ অসুস্থ হইয়া পড়াতে প্রথমতঃ শ্রীশ্রীজগন্নাথের শ্রীমন্দিরের সন্নিকটস্থ মণিকর্ণিকাসাহীতে ও অতঃপর অপেক্ষাকৃত কিয়দ্দূরে মার্কণ্ডসরসাহীতে আমাদের বাসস্থান নির্দ্দেশ করিলাম। শেষোক্ত গৃহের প্রকোষ্ঠতল হইতেই, দ্বার ও গবাক্ষপথে সাগর দর্শন চলিত। শরীর একটু সুস্থ ছিল, অপরাহ্নে গৃহ-গবাক্ষ পার্শ্বে বসিয়া গবাক্ষপথে সুদূর সমুদ্রের অপূর্ব্ব তরঙ্গভঙ্গ দেখিতে চেষ্টা করিতেছিলাম। দ্বিপ্রহরে বৃষ্টি হইয়াছিল, উত্তাল তরঙ্গ অধিকতর উদ্দামভাবে গর্জ্জিয়া গর্জ্জিয়া উঠিয়া তটভূমি আহত করিতে-ছিল, দূর হইলেও আজ উত্তুঙ্গ শুভ্র তরঙ্গগুলি বেশ দেখা যাইতেছিল, অস্তগমনোন্মুখ সৌরকিরণ তাহার উপর প্রতিফলিত হইতেছিল। সূর্য্যাস্ত-

গমনের সে দৃশ্য কি অপূর্ব্ব সুন্দর! এমন সময়ে আমাদের পাণ্ডার গোমস্তা 'ছড়িদার' ভগবান পট্টনায়ক তাম্বুল চর্ব্বণ করিতে করিতে বাসায় উপস্থিত হইল। জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল, যাত্রী লইয়া সে 'সিদ্ধবকুল' দেখাইতে গিয়াছিল। আমি উৎসুকচিত্তে তাহার নিকট সকল বৃত্তান্ত শুনিলাম, পরে আগামী প্রত্যূষে সিদ্ধবকুল দর্শনে যাইব স্থির হইল।

পরদিন প্রত্যূষে বুঝিলাম, শরীরটা ভাল আছে, তাই মার্কণ্ডসরে স্নান করিয়া ভগবান আরও দুইজন সঙ্গী সহ সিদ্ধ বকুল দর্শনে চলিলাম। শ্রীমন্দিরের দক্ষিণ তোরণের বামপার্শ্বে এক বিরাট হনুমান মূর্ত্তি সংস্থাপিত, তাহারই সম্মুখে দক্ষিণ তোরণের বরাবর দক্ষিণ দিকে সমুদ্র গমনের এক সঙ্কীর্ণ পথ আছে; এই পথে সিদ্ধবকুল যাইতে হয়। হনুমান-পূজকের অতিশয় পীড়াপীড়িতে প্রত্যেকে অনূ্ন এক আনা হিসাবে "দক্ষিণা" প্রদানে শ্রীহনুমানজীউর 'পূজা দিয়া' আমরা সিদ্ধবকুলের পথ অবলম্বন করিলাম। কিয়ৎকাল পর এদিক ওদিক ঘুরিয়া সিদ্ধ বকুলের সমীপে উপস্থিত হইলাম। সে এক অপূর্ব্ব বৃক্ষ। সজীব সতেজ পত্রগুচ্ছ সমূহে সুশোভিত স্থূলকায় বকুলতরু কাণ্ড প্রকাণ্ড বিস্তার করিয়া দণ্ডায়মান, কিন্তু বৃক্ষের মধ্যে যথাই দৃষ্টি করিতে লাগিলাম, কেবল কোটরময়। বৃক্ষের মূল হইতে আরম্ভ করিয়া শাখার অগ্রভাগ পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র কোটরের পর কোটর, বৃক্ষের অভ্যন্তরে কোথাও একটুকরা (সার) কাষ্ঠ নাই, বিষম স্থূল বৃক্ষটির আমূল স্তম্ভ ও শাখা সর্ব্বত্র ফাঁকা, কেবলমাত্র বাকলের বৃক্ষটি শাখা প্রশাখায় পত্রে পরিশোভিত হইয়া দণ্ডায়মান! কেবল বাকলে সজীব বৃক্ষ হইতে পারে, তাহা জানিতাম না। ইহা বাঁশ কিম্বা অন্য জাতীয় বৃক্ষ নহে, প্রত্যক্ষ প্রকৃত বকুল,—ইহার চর্ম্ম ও পত্র প্রত্যক্ষ বকুলের। কত ভক্তিময়প্রাণা মহিলা ইহার মূলে সিন্দুর লেপন করিয়া দিতেছে, পাণ্ডারা দক্ষিণা চাহিতেছে, তাহা দিতেছে। আমরাও কিছু কিছু দক্ষিণা দিলাম। পাণ্ডার অনুমতি লইয়া বৃক্ষ হইতে একটা ক্ষুদ্র প্রশাখা ভাঙ্গিয়া রাখিলাম, দেশে লইয়া বন্ধুবান্ধবকে এই আশ্চর্য্য পদার্থ দেখাইব, কিন্তু দুর্দ্দৈব বশতঃ গৃহ প্রত্যাবর্ত্তন কালে বস্ত্রের পুলিন্দাসহ উহা ট্রেনপথে পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছি। যাহা হউক, সিদ্ধবকুল সম্বন্ধে সে সুন্দর কিম্বদন্তির উল্লেখ করিলেন, আমরা এস্থানে তাহা পুনরাবৃত্তি করিতেছি :—শ্রীক্ষেত্রের সমুদ্রসৈকতে বালুকাস্তূপের উপর বসিয়া এক পরম বৈষ্ণব সাধু ইষ্টারাধনা করিতেন। তিনি কখনও জনকোলাহলময় পুরীর

নগর মধ্যে প্রবেশ করিতেন না, গ্রীষ্ম বর্ষাদি ষড়ঋতু তাঁহার মাথার উপর দিয়া চলিয়া যাইত, মহাপুরুষ শীতরৌদ্র ঝঞ্ঝাদি অবিরক্তভাবে সহ্য করিয়া মহামহিমের মহাধ্যানে মগ্ন থাকিতেন। প্রেমাবতার শ্রীশ্রীচৈতন্য একদা নিদাঘের তীব্র মধ্যাহ্নে সমুদ্রে অবগাহন মানসে সৈকতের সেই প্রদেশ অতিবাহিত করিতে সেই মহাপুরুষকে তদবস্থায় দেখিয়া ভাবিলেন, এই রৌদ্র-ক্লিষ্ট মহাপুরুষের মস্তকোপরি কোন প্রকার ছায়া প্রদান করা কর্ত্তব্য। অনন্তর সাধুর নিকটে উপস্থিত হইয়া তাঁহার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলে, সাধু ভগবানের ইচ্ছার প্রতিবাদ না করিয়া মৌনভাবে রহিলেন। তখন শ্রীপ্রভু তাঁহার দন্তধাবন কাষ্ঠ (দাঁতন) খানি সাধুর পার্শ্বে নিক্ষেপ করিয়া দ্রুত চলিয়া গেলেন; সাধু মহাপ্রভুর দাঁতন কাষ্ঠটিকে বালুকা মধ্যে প্রোথিত করিয়া তাহার মূলপ্রদেশে সলিল সেচন করত পুনরায় ধ্যানে মগ্ন হইলেন। অপরাহ্নে ধ্যানভঙ্গে দেখিলেন, সেই দন্তধাবন কাষ্ঠ মুঞ্জরিত হইয়া সুন্দর বকুল বৃক্ষে পরিণত হইয়াছে! অতঃপর সেই বৃক্ষ প্রতিদিবস এক হস্ত পরিমাণ দীর্ঘ হইতে আরম্ভ করিল, এইরূপ ২৮ দিবসে সিদ্ধবকুল ২৮ হাত লম্বা ও তৎপরিমিত স্থূল হইল; তাহার পর বৃক্ষ আর বাড়িল না। কয়েক বৎসর অতিবাহিত হইলে সাধু চিরসমাধি প্রাপ্ত হইলেন, তাঁহার প্রধান শিষ্য সেই বৃক্ষতলে গুরুর আসন অধিকার করিলেন।

এক বৎসর শ্রীশ্রীজগন্নাথ মহাপ্রভুর রথ নির্ম্মাণে চক্র প্রস্তুতের কাষ্ঠের অভাব হইল। দূত মুখে রাজা শুনিতে পাইলেন, সাগরতীরে এক প্রকাণ্ড বকুল আছে, রথচক্র হইবার সেই অতিশয় উপযুক্ত। রাজাজ্ঞায় সূত্রধর বকুল বৃক্ষ ছেদনে অগ্রসর হইল। বৃক্ষতলে সাধুর শিষ্য সূত্রধরের নিকট সকল বৃত্তান্ত অবগত হইয়া বলিলেন, রাজাজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে পারিব না, তোমরা বৃক্ষ ছেদন করিও। কিন্তু আমার গুরুর স্থাপিত বৃক্ষ তোমরা আমার সম্মুখে ছেদন করিও না; কাল প্রত্যুষে আমি প্রাতঃস্নানে গমন করিব, তৎকালে বৃক্ষ ছেদন করিয়া লইয়া যাইও। সূত্রধরেরা সম্মত হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিল, শিষ্য রাত্রিতে ধ্যানাদি সমাপনান্তে বকুল বৃক্ষকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"হে মহীরুহ! শ্রীশ্রীমহাপ্রভু-প্রসাদাৎ পূজার্হ গুরুদেব তোমাকে প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন, এতকাল তোমার ছায়ার ক্রোড়ে প্রতিপোষিত হইয়া আমরা উত্তপ্ত বালুকা সৈকতের যন্ত্রণা বুঝিতে পাই নাই, আমাদের ধারণা ও কামনা ছিল, তুমি চিরকাল এখানে থাকিয়া এমনি

বহুজীবকে শান্তি প্রদান ও আমার গুরুর সাধন-মহিমার চিহ্নস্বরূপ বিরাজ কর। রাজাজ্ঞায় সূত্রধরেরা আগামী প্রত্যূষে তোমাকে ছেদন করিবে, আমরা দুর্ব্বল বাধা দিতে পারিব না; যদি তোমার স্বকীয় শক্তি থাকে, কোন কৌশলে আত্ম রক্ষা করিও।" এই বলিয়া শিষ্য আবেগ-সংক্ষুব্ধ হৃদয়ে রজনী প্রভাত হইতে না হইতে সে স্থল পরিত্যাগ করিলেন। প্রভাতে সূত্রধরেরা আসিয়া যাহা দেখিল, তাহাতে তাহারা স্তম্ভিত হইয়া গেল। সে সমুচ্চ বিশাল সারবান বকুল, খর্ব্বাকৃতি সারশূন্য কোটরময় বল্কলবৃক্ষে পরিণত হইয়াছে, বৃক্ষের যে স্থানেই অনুসন্ধান করিল, অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ কাষ্ঠও কোথাও পাইল না। এই অতি অদ্ভুত সংবাদ তৎক্ষণাৎ রাজার কর্ণগোচর করা হইল, রাজা স্বয়ং আসিয়া সে ব্যাপার দর্শন করিয়া বিস্মিত ও ভীত হইয়া রথচক্রের জন্য অন্য কাষ্ঠ সংগ্রহের অনুমতি করিলেন এবং তদবধি সেই বকুলতরু 'সিদ্ধবকুল' নামে অভিহিত হইয়া তীর্থযাত্রীগণের দর্শনীয় ও পূজনীয় ভাবে অবস্থান করিতেছে। যাহা হউক 'সিদ্ধবকুল' একবার প্রত্যক্ষ করিলে, যিনি প্রবাদের সত্যে সন্দিহান, তিনিও স্বীকার করিবেন যে, এই সিদ্ধবকুল জগতে এক অতি অপূর্ব্ব পদার্থ। *

* B. N. Railwayর উৎকলে 'দাঁতন' বলিয়া একটা ষ্টেসন আছে, পাণ্ডা মহাশয় বলিলেন, "শ্রীপ্রভু তথা হইতে দাঁতন করিতে করিতে সমুদ্র স্নানে আসিতেছিলেন বলিয়া তাহার নাম দাঁতন হইয়াছে; যে আদ্য বকুল বৃক্ষ হইতে শ্রীপ্রভু দাঁতন কাষ্ঠ সংগ্রহ করেন, আজিও তাহা তথায় সকলের পূজ্য বৃক্ষরূপে দণ্ডায়মান।" আমরা নানা অসুবিধা বশতঃ এই আদি বকুল বৃক্ষ দেখিয়া আসিতে পারি নাই। লেখক।

'চাকিয়া পিষোরে'।

বাল্য কথা মনে ফিরে আসে—
পশ্চিমে রমণী যত মুখোমুখী বসে'
যাঁতা পিশে, গান গাহে সবে সমস্বরে
'চাকিয়া পিষোরে'!
'চাকিয়া' ঘুরিয়া চলে' যায়,
ভগ্ন, চূর্ণ শস্যগুলি বাহিরে ছড়ায়,
নাহি দয়া তাহাদের, গাহে সমস্বরে
'চাকিয়া পিষোরে'!
আজো যেন শুনি মনে হয়
অদৃষ্ট রাজ্যেতে কোন বুঝি স্বপ্নময়,
নিয়তি বালারা বসি' গাহে যাঁতা ধরে'
'চাকিয়া পিষোরে'!
যন্ত্রের পেষণে পড়ে নর
অশ্রুসিক্ত, জীর্ণদেহ, ব্যথিত অন্তর;
হরষে হাসিয়া তারা গাহে একস্বরে,
'চাকিয়া পিষোরে'!
কাল-চক্র নিত্য আবর্ত্তনে,—
নিয়তি বালার হাতে,—চূর্ণ করি আনে
জগতের দ্রব্য চয়; তারা গান করে
'চাকিয়া পিষোরে'!
স্বপ্নময় অদৃষ্ট রাজ্যের
নিয়তি বালার গান শুনি মানবের
অবসান; গাহিবেক তারা চিরতরে
'অদৃষ্টের চাকিয়া পিষোরে'।

শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—বি. এ.

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত।

(শ্রীম-কথিত) *

ঊনবিংশতি বর্ষ পূর্ব্বে।

ঠাকুর রামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে ভক্ত সঙ্গে।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

প্রাতঃকাল বেলা আন্দাজ আটটা। মাষ্টার দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইয়া দেখেন, ঠাকুর রামকৃষ্ণ সহাস্যবদন কক্ষমধ্যে ছোট খাটিটীর উপর উপবিষ্ট, মেজেতে কয়েকটী ভক্ত বসিয়া আছেন, তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।

প্রাণকৃষ্ণ জনাইয়ের মুখুয্যেদের বংশসম্ভূত। কলিকাতায় শ্যামপুকুরে বাড়ী, ম্যাকেঞ্জি লায়াল এবং কোর exchange নামক নীলাম ঘরের কার্য্যা-

---

* শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত প্রথমভাগ, মূল্য ১৲ টাকা। ১৩।২ গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর গলিতে শ্রীপ্রভাস চন্দ্র গুপ্তের নিকট প্রাপ্তব্য।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতের ইংরাজী অনুবাদ শীঘ্র ছাপা হইবে—অর্থাৎ GOSPEL OF SRI RAMAKRISNA এই পুস্তক সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দ শ্রীম—কে নিম্নলিখিত পত্র লিখিয়াছিলেন।

Dehra Dhun, 24th November, 1897.

My Dear M.—

Many many thanks for your second pamphlet. It is indeed wonderful. The move is quite original and never the life of a great teacher was brought before the public untarnished by the writer's mind as you are doing. The language also is beyond all praise, so fresh, so pointed, and withal so plain and easy.

I cannot express in adequate terms how I have enjoyed them. I am early in a transport when I read them. Strange is'nt it? Our Teacher and Lord was so original and each one of us will have to be original or nothing. I now understand why none of us attempted his life before—It has been reserved for you, this great work. He is with you evidently. With all love and namaskar.

(Sd.) VIVEKANANDA.

Socratic Dialogues are Plato all over. You are entirely hidden. Moreover the dramatic part is infinitely beautiful. Everybody likes it, here or in the West. V.

ধ্যক্ষ। তিনি গৃহস্থ, কিন্তু বেদান্ত চর্চ্চায় বড় প্রীতি। পরমহংসদেবকে বড় ভক্তি করেন ও মাঝে মাঝে আসিয়া দর্শন করেন। ইতিমধ্যে একদিন নিজের বাড়ীতে ঠাকুরকে লইয়া গিয়া মহোৎসব করিয়াছিলেন। তিনি বাগবাজারের ঘাটে রোজ প্রত্যূষে গঙ্গাস্নান করিতেন ও নৌকার সুবিধা হইলেই একেবারে দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া ঠাকুরকে দর্শন করিতেন। আজ এইরূপে নৌকা ভাড়া করিয়াছিলেন, মাষ্টারকেও তুলিয়া লইয়াছিলেন। নৌকা কূল হইতে একটু অগ্রসর হইলেই ঢেউ লাগিতে লাগিল। মাষ্টার বলিলেন, আমাকে নামাইয়া দিতে হইবে। প্রাণকৃষ্ণ ও তাঁহার বন্ধু অনেক বুঝাইতে লাগিলেন, কিন্তু তিনি কোন মতে শুনিলেন না। বলিলেন, "আমাকে নামাইয়া দাও" আমি হেঁটে দক্ষিণেশ্বরে যাব।" অগত্যা প্রাণকৃষ্ণ তাঁহাকে নামাইয়া দিলেন।

মাষ্টার পৌঁছিয়া দেখেন যে, তাঁহারা কিয়ৎক্ষণ পৌঁছিয়াছেন ও ঠাকুরের সঙ্গে সদালাপ করিতেছেন। ঠাকুরকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া তিনি এক পাশে বসিলেন।

[অবতারবাদ।]

[Humanity and Divinity of *Avatar*]

শ্রীরামকৃষ্ণ (প্রাণকৃষ্ণের প্রতি)। অবতারবাদ কিন্তু মানুষে তিনি বেশী প্রকাশ। যদি বল, অবতার কেমন করে হবে, যাঁর ক্ষুধা, তৃষ্ণা, জীবের ধর্ম্ম অনেক আছে। হয়ত রোগ শোকও আছে। তার উত্তর এই যে, পঞ্চভূতের ফাঁদে ব্রহ্ম পড়ে কাঁদে।

"দেখ না, রামচন্দ্র সীতার শোকে কাতর হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন।"

"হিরণ্যাক্ষ বধ করবার জন্য বরাহ অবতার হ'লেন। হিরণ্যাক্ষ বধ হ'লো, কিন্তু নারায়ণ স্বধামে যেতে চান না। বরাহ হ'য়ে আছেন। কতক-গুলি ছানাপোনা হ'য়েছে। তাদের নিয়ে এক রকম বেশ আনন্দে রয়েছেন। দেবতারা বলিলেন, এ কি হ'লো ঠাকুর যে আর আসতে চান না। তখন সকলে শিবের কাছে গেল ও, ব্যাপারটী তাঁহাকে নিবেদন করলে। শিব গিয়ে তাঁকে অনেক জেদাজেদি করলেন। তিনি ছানাপনাদের মাই দিতে লাগিলেন। তখন শিব ত্রিশূল এনে শরীরটা ভেঙ্গে দিলেন। ঠাকুর হি হি করে হেসে তখন স্বধামে চলে গেলেন।

প্রাণকৃষ্ণ। (ঠাকুরের প্রতি) মহাশয় অনাহত শব্দটি কি?

শ্রীরামকৃষ্ণ। অনাহত শব্দ সর্ব্বদাই এমনি হ'চ্ছে। প্রণবের ধ্বনি, এই ধ্বনি পরমব্রহ্ম থেকে আস্‌ছে, যোগীরা শুন্‌তে পায়। বিষয়াসক্ত জীব শুন্‌তে পায় না। যোগী জানতে পারে যে, সেই ধ্বনি নাভি থেকে উঠে একদিকে ও আর একদিকে সেই ক্ষীরোদশায়ী পরব্রহ্ম হইতে উঠে।

[পরলোক।]

প্রাণকৃষ্ণ। মহাশয়, পরলোক কি রকম?

শ্রীরামকৃষ্ণ। কেশবসেনও ঐ কথা জিজ্ঞাসা করেছিল। যতক্ষণ মানুষ অজ্ঞান থাকে, অর্থাৎ যতক্ষণ ঈশ্বরলাভ হয় নাই, ততক্ষণ আবার জন্মগ্রহণ কর্ত্তে হবে। কিন্তু জ্ঞানলাভ হলে আর এ সংসারে আসিতে হয় না। পৃথিবীতে বা কোন লোক যেতে হয় না।

"কুমোররা হাঁড়ি রৌদ্রে শুকুতে দেয়, দেখনি, তার ভিতর পাকা হাঁড়িও আছে। আবার কাঁচা হাঁড়িও আছে। গরু টরু চলে গেলে হাঁড়ি কতক কতক ভেঙ্গে যায়। পাকা হাঁড়ি ভেঙ্গে গেলে কুমোর সেগুলিকে ফেলে দেয়, তার দ্বারায় আর কোন কাজ হয় না। পাকা হাঁড়ির আর কুমোরের চাকে আসতে হয় না। কাঁচা হাঁড়ি ভাঙ্গলে কুমোর তাদের আবার লয়। নিয়ে চাকেতে তাল পাকিয়ে দেয়, নূতন হাঁড়ি তৈয়ার হয়।

"তাই যতক্ষণ ঈশ্বর দর্শন হয় নাই, ততক্ষণ কুমারের হাতে যেতে হবে, অর্থাৎ এই সংসারে ফিরে২ আসতে হবে। সিদ্ধধান হলে আর পুঁতলে কি হবে? তাতে আর গাছ হয় না। মানুষ জ্ঞানাগ্নিতে সিদ্ধহলে, তার দ্বারা আর নূতন সৃষ্টি হয় না, সে মুক্ত হয়ে যায়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

[বেদান্ত ও অহংকার।]

"পুরাণ মতে ভগবান একটী; আমি একটী; তুমি একটী, শরীর যেন সরা, মন বুদ্ধি, অহংকার যেন জল, ব্রহ্ম যেন সূর্য্য। এই শরীর সারা মধ্যে মন, বুদ্ধি, অহংকার রূপ জল র'য়েছে। আর ব্রহ্ম সূর্য্যস্বরূপ। তিনি এই জলে প্রতিবিম্বিত হচ্ছেন। ভক্ত তাই ঈশ্বরীয় রূপ দর্শন করে।

"বেদান্ত মতে ব্রহ্মই বস্তু, আর সমস্ত মায়া, স্বপ্নবৎ। অহং রূপ একটা লাঠি—সচ্চিদানন্দ সাগরের মাঝখানে পড়ে আছে।

"(মাষ্টারের প্রতি) এইটি শুনে যাও—অহং লাঠি তুলে নিলে এক সচ্চিদানন্দ সমুদ্র। অহং লাঠিটি থাকলে দুটো দেখায়, এ এক ভাগ জল। ব্রহ্মজ্ঞান হ'লে সমাধিস্থ হয়, তখন এই অহং পুঁছে যায়।

"তবে লোক শিক্ষার জন্য শঙ্করাচার্য্য বিদ্যার আমি রেখেছিলেন।

(প্রাণকৃষ্ণের প্রতি) "কিন্তু জ্ঞানীর লক্ষণ আছে। কেউ কেউ মনে করে জ্ঞানী হইয়াছি। লক্ষণ কি। জ্ঞানী কারু অনিষ্ট কর্‌তে পারে না। বালকের মত হয়ে যায়। লোয়ার খড়্গো যদি পরেশ মাণিক ছোঁয়ান হয়, তখন খড়্গ সোণা হ'য়ে যায়। সোণার খড়্গো হিংসার কাজ হয় না। তবে বাহিরে হয়ত দেখায় যে রাগ আছে, কি অহংকার আছে, কিন্তু বস্তুতঃ জ্ঞানীর তাহা কিছুই থাকে না।

"দূর থেকে পোড়া দড়ি দেখিলে বোধ হয় যে ঠিক এক গাছা দড়ি পড়ে আছে। কিন্তু কাছে এসে ফুঁ দিলে সব উড়ে যায়। ক্রোধের আকার, অহংকারের আকার কেবল। কিন্তু সত্যিকার ক্রোধ নয়, অহংকার নয়।

"বালকের আঁট থাকে না। এই খেলাঘর কর্‌লে, কেউ হাত দেয়, ত ধেই ধেই করে নেচে কাঁদ্‌তে আরম্ভ কর্‌বে। আবার নিজে ভেঙ্গে ফেলবে সব। এই কাপড়ে এত আঁট, বল্'বে আমার বাবা দিয়েছে দেবো না। আবার একটা পুঁতুল দিলে পরে কাপড়খানা ফেলে দিয়ে চলে যায়।

"এই সব জ্ঞানীর লক্ষণ। হয়ত বাড়ীতে খুব ঐশ্বর্য্য কোচ, কেদারা, ছবি গাড়ি, ঘোড়া, আর সব ফেলে কাশী চ'লে যাবে।

[বেদান্ত ও "অবস্থাত্রয় সাক্ষী* ।"]

"বেদান্ত মতে জাগরণ অবস্থাও কিছু নয়। এক কাঠুরে স্বপন দেখেছিল। একজন লোক তার ঘুমভাঙ্গানতে সে বিরক্ত হ'য়ে ব'লে উঠলো, তুই কেন আমার ঘুমভাঙ্গালি, আমি রাজা হ'য়েছিলুম। সাত ছেলের বাপ হ'য়েছিলুম। ছেলেরা সব লেখা পড়া, অস্ত্রবিদ্যা, সব শিখছিল আমি সিংহাসনে ব'সে রাজত্ব করেছিলুম। কেন তুই আমার সুখের সংসার ভেঙ্গে দিলি। সে

* 'অবস্থাত্রয় সাক্ষী" মাণ্ডুক্যউপনিষদ্।

ব্যক্তি বলিল, ওত স্বপন ওতে আর কি হ'য়েছে।" কাঠুরে বল্লে, 'দুর তুই বুঝলি' না, আমার কাঠুরে হওয়া যেমন সত্যি, স্বপনে রাজা হওয়াও তেমনি সত্যি। কাঠুরে হওয়া যদি সত্যি হয়, তাহালে রাজা হওয়াও সত্যি।

মাষ্টার (স্বগতঃ)। প্রাণকৃষ্ণ জ্ঞান জ্ঞান করেন। তাই ঠাকুর বুঝি জ্ঞানীর অবস্থা বলিতেছিলেন। এইবারে ঠাকুর বিজ্ঞানীর অবস্থা বলিতেছেন। ইহাতে কি নিজের অবস্থার ঈঙ্গিত করিতেছেন ?

[জ্ঞান ও বিজ্ঞান।]

শ্রীরামকৃষ্ণ। নেতি নেতি করে আত্মাকে ধরার নাম জ্ঞানে। নেতি নেতি বিচার ক'রে সমাধিস্থ হ'লে আত্মাকে ধরা যায়।

"বিজ্ঞান, কি না বিশেষরূপে জানা। কেউ দুধ শুনেছে। কেউ দুধ দেখেছে। কেউ দুধ খেয়েছে। যে শুনেছে, সে অজ্ঞান, যে দেখেছে সে জ্ঞানী, যে খেয়েছে তারই বিজ্ঞান অর্থাৎ বিশেষরূপে জানা হ'য়েছে। ঈশ্বর দর্শন ক'রে তাঁহার সহিত আলাপ, যেন তিনি পরম আত্মীয়। এর নাম বিজ্ঞান।

প্রথমে নেতি নেতি কর্ত্তে হয়। তিনি পঞ্চভূত ন'ন, তিনি ইন্দ্রিয় নন্, তিনি মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ন'ন, তিনি সকল তত্ত্বের অতীত। অর্থাৎ ছাতে উট্‌তে হবে। সব সিঁড়ি একে একে ত্যাগ ক'রে যেতে হবে। সিঁড়ি ছাত নয়। কিন্তু ছাতের উপর পৌঁছে দেখা যায় যে, যে জিনিসে ছাত তৈয়ারি, ইট, চুণ, সুরকি, সেই জিনিসেই সিঁড়ি তৈয়ারী। যিনি পরমব্রহ্ম তিনি এই জীবজগৎ হ'য়েছেন। চতুর্বিংশতি তত্ত্ব হ'য়েছেন। যিনি আত্মা, তিনিই পঞ্চভূত হ'য়েছেন। মাটি টাটি এত শক্ত হয় কেন? যদি আত্মা থেকেই হ'য়েছে। তাঁর ইচ্ছাতে সব হ'তে পারে। শোণিত শুক্র থেকে হাঁড় মাস হ'চ্চে। সমুদ্রের ফেনা কত শক্ত হয়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

[গৃহস্থ ও বিজ্ঞান।]

"বিজ্ঞান হ'লে সংসারেও থাকা যায়। তখন বেশ অনুভব হয় যে তিনিই জীব জগৎ হ'য়েছেন। সংসার তিনিছাড়ান'ন। তাই রামচন্দ্র যখন জ্ঞান

লাভের পর সংসারে থাক্‌বো না বল্লেন, দশরথ বশিষ্টকে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিলেন, বোঝাবার জন্য। বশিষ্ট ব'ল্লেন, "রাম যদি সংসার ঈশ্বর ছাড়া হয়, ত তুমি ত্যাগ ক'রতে পার।" রামচন্দ্র তখন চুপ ক'রে রৈলেন। তিনি বেশ জানেন যে ঈশ্বর ছাড়া কিছুই নাই। তাঁর আর সংসার ত্যাগ করা হ'লোনা।

"(প্রাণকৃষ্ণের প্রতি)। কথাটা এই, মনশুদ্ধ হ'লেই সেই চক্ষু হয়। দেখনা কুমারী পূজা। হাগা মোতা মেয়ে, তাকে ঠিক দেখ্‌লুম সাক্ষাৎ ভগবতী। একদিকে স্ত্রী, একদিকে ছেলে, দুজনকেই আদর করছে। কিন্তু ভিন্নভাবে। তবেই হ'লো মন নিয়ে কথা। শুদ্ধ মনেতে এক ভাব হয়, সেই মনটী পেলে সংসারেই ভগবান দর্শন হয়। তবে সাধন চাই।"

[গৃহস্থ ও 'কামিনী']

"সাধন চাই। এইটী জেনো যে স্ত্রীলোক সম্বন্ধে সহজেই আসক্তি হয়। স্ত্রীলোক স্বভাবতঃই পুরুষকে ভালবাসে। পুরুষ স্বভাবতঃই স্ত্রীলোক ভালবাসে। তাই শীগ্‌গির পড়ে যায়।

"কিন্তু সংসারে তেমনি খুব সুবিধে। বিশেষ দরকার হ'লে হ'লো একবার স্বদারায় গমন কর্‌লে।

(মাষ্টারের প্রতি)। মাষ্টার, হাস্‌চো কেন ?

মাষ্টার (স্বগতঃ)। সংসারীলোক একেবারে পেরে উঠবেনা বলে, ঠাকুর এই পর্য্যন্ত অনুমতি দিচ্চেন। ষোলআনা ব্রহ্মচর্য্য সংসারে থেকে কি একেবারে অসম্ভব ?

[হটযোগীর প্রবেশ।]

পঞ্চবটীতে একটী হটযোগী কয়দিন ধরিয়া আছেন। তিনি কেবল দুধ আর আফিং খান, আর হটযোগ করেন, ভাতটাত খান না। আফিমের ও দুধের পয়সার অভাব হইয়াছিল। ঠাকুর যখন পঞ্চবটীর কাছে গিয়াছিলেন, তখন হটযোগীর সহিত আলাপ করিয়া আসিয়াছিলেন। হটযোগী রাখালকে বলেন যে, পরমহংসজীকে ব'লে যেন আমার ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া হয়। ঠাকুর বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন, 'কল্‌কেতার বাবুরা এখন ব'লে দেখবো।

ক্রমশঃ

আরতি।

৩য় বর্ষ] ফাল্গুন, ১৩০৯। [৯ম সংখ্যা।

বঙ্গভাষার আদিম গদ্য।

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য দেবের আবির্ভাবের পূর্ব্ব সময়ের বাঙ্গালা পদ্য গ্রন্থ আমরা পাইয়াছি। উহার মধ্যে কোন খানির ভাষা এমন বিশুদ্ধ যে, বর্ত্তমান কালের লব্ধযশা বাঙ্গালী কবির পক্ষেও সেরূপ লেখা প্রশংসার বিষয়ই বটে। রসসাগর চণ্ডীদাস ঠাকুর এই দলের প্রধান। অপর গুলির ভাষা মৈথিল না মৈথিল মিশ্রিত বাঙ্গালা। সে সময়ের ন্যায় ভাষার উপরও মিথিলার বিলক্ষণ আধিপত্য ছিল।

চৈতন্য দেবের আবির্ভাবের পূর্ব্বের বাঙ্গালা সাহিত্যে খনার বচন এক উজ্জ্বল রত্ন। বড়ই দুঃখ, খনার সম্বন্ধে যে সকল প্রবাদ প্রচলিত আছে, তাহার কোনটীর উপরেই আস্থা স্থাপন করা যায় না। খনার বচন বাঙ্গালা ভাষার এবং বাঙ্গালীর মনস্বিতার এক অপূর্ব্ব বিজয়-স্তম্ভ। যিনি এ বচনগুলির রচয়িতা, তিনি অসাধারণ ব্যক্তি ছিলেন। জ্যোতিষ শাস্ত্রে তাঁহার সমকক্ষ কেহ বঙ্গদেশেতে জন্মেই নাই, ভারতের অন্যত্রও দুর্লভ। খনার বচন পড়িলে সেই সুদূর অতীতেও বাঙ্গালা ভাষাকে একটী সুগঠিত ভাষা বলিতে হয়। খনার রচনা সংক্ষিপ্ত ও রসাল, উহার আরও চমৎকারিত্ব এই যে, জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিত বহুগণনায় ও বহু আয়াসে যে সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইবেন, খনার বচনে, ইন্দ্রজালের কুহকের মত, মুহূর্ত্তমধ্যে সে ফল পাওয়া যায়। জ্যোতির্ব্বিদের সিদ্ধান্তে ভুল হইতে পারে, কিন্তু খনার সিদ্ধান্তে ভুল নাই।

চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্ব্বে এইরূপ বাঙ্গালা পদ্য পাওয়া যায়। কিন্তু চৈতন্যদেবের পূর্ব্বে বা তৎসময়ে রচিত কোনও গদ্য গ্রন্থ আজিও পাওয়া যায় নাই। প্রকৃত পক্ষে ইংরেজ শাসন আরম্ভের পূর্ব্বে বর্ত্তমান কালের ন্যায় কোনও গদ্য গ্রন্থ রচিত হয় নাই। তখন বাঙ্গালা কথ্য ভাষা হইলেও রাজকীয় কাজকর্ম্ম পারশীতে হইত। মহাজনী হিসাব, তমঃসুক, চিঠীপত্র বাঙ্গালা ভাষাতেই লিখিত হওয়া সম্ভব। এখন আমরা পারশী, সংস্কৃত ও বাঙ্গালা মিশ্রিত যে তমঃসুকের পাঠ দেখিতে পাই, বোধ হয়, উহা সেই

কালেরই সৃষ্টি। চিঠী পত্রও ঐরূপ মিশ্রিত ভাষাতেই লিখিত হইত। ৭০।৮০ বৎসরের পূর্ব্বের গ্রাম্য চিঠী পত্রে তিন ভাষাই দেখিতে পাই। সে সময়ে হকারের প্রচলনটা কিছু বেশী ছিল। পত্রে আমিহ, তুমিহ, সেহ, তেঁহ প্রভৃতি দেখা যায়। এই হ, তুহি, মুহি, সোহির হ। হিন্দী ও মৈথিল ভাষার নিকট বঙ্গভাষা বড় ঋণী।

চৈতন্যদেবের তিরোভাবের কিয়ৎকাল পরে লিখিত একখানি পদ্য গদ্য পুথি পাওয়া গিয়াছে। উহা বৈষ্ণবাচার্য্য নরোত্তম দাস ঠাকুরের লিখিত। নরোত্তম সাধন বলে বৈষ্ণব সমাজে 'ঠাকুর মহাশয়' নামে পরিচিত। যাঁহারা বৈষ্ণব-সাহিত্য কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারাই ঠাকুর মহাশয়ের 'প্রার্থনার' সহিত পরিচিত। প্রার্থনার করুণতানে হৃদয় দ্রবীভূত হয় না, এমন কেহ নাই। ঠাকুর মহাশয় প্রার্থনা ব্যতীত আরও বহু গ্রন্থ লিখিয়াছেন, সমুদয়ই পদ্যে। কেবল একখানি গ্রন্থের প্রায় অর্দ্ধেক গদ্যে লিখিত হইয়াছে। গ্রন্থ খানির নাম আশ্রয় নির্ণয়। বৈষ্ণব ধর্ম্মের বহু জ্ঞাতব্য কথা উহাতে প্রশ্নোত্তর ভাবে লিখিত হইয়াছে। সাহিত্য-সেবী পাঠকগণ এই প্রশ্নোত্তর হইতে সে কালের গদ্যের অবস্থা বুঝিতে পারিবেন। আমরা আশ্রয়-নির্ণয়ের কিয়দংশ পাঠকদিগকে উপহার দিতেছি ঃ—

অথ আশ্রয়-নির্ণয়।

আশ্রয় পঞ্চ প্রকার।

কি কি পঞ্চ প্রকার।

নামাশ্রয়, মন্ত্রাশ্রয়, ভাবাশ্রয়, প্রেমাশ্রয়, রসাশ্রয়, এই পঞ্চ প্রকার।

সেবা কয় মত প্রকার হয়।

সেবা দুইমত প্রকার হয়।

কি কি দুই মত।

সাধকরূপে সেবা আর সিদ্ধিরূপে সেবা।

প্রেম বলি কারে।

শ্রীমতী রাধিকা।

প্রেমের অন্তর কি।

আসক্তি।

আসক্তি বলি কারে।

পরকীয়া ভাবে প্রীতি।

পাত্র কে।

শ্রীরাধাকৃষ্ণ।

কোন রতি।

বিলাস রতি।

অথ রস বলি কারে।

শ্রীরাধাকৃষ্ণ লীলা।

ক্রিয়া কি।

সম্ভোগ।

সম্ভোগ কয়মত প্রকার হয়।

দুই মত প্রকার।

কি কি দুই মত।

স্বকীয়া ভাবে। পরকীয়া ভাবে।

স্বকীয়ার পাত্র শ্রীমতী রুক্মিণী

পরকীয়ার পাত্র শ্রীমতী রাধিকাজীউ।

শ্রীরাধিকার কোন রতি।

সমর্থা রতি।

শ্রীকৃষ্ণের কোন রতি।

কাম রতি।

কামরতি বর্ত্তে কোথা।

ভাবোল্লাস রতিতে।

ভাবোল্লাস রতি বর্ত্তে কোথা।

শ্রীরাধাকৃষ্ণে।

ভাবোল্লাসের পাত্র কে।

শ্রীরূপ মঞ্জরী।

তার ক্রিয়া কি।

শ্রীরাধাকৃষ্ণ সুখে সুখী। ইত্যাদি।

আশ্রয়-নির্ণয়ের যে হস্তলিপি আমরা পাইয়াছি, উহা বড়ই পুরাতন। উহার কয়েকটী অক্ষরের আকৃতি বর্ত্তমান বাঙ্গলা অক্ষর হইতে বড়ই বিভিন্ন।

শ্রীরসিকচন্দ্র বসু।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত।

(শ্রীম-কথিত)

উনবিংশতি বর্ষ পূর্ব্বে।

ঠাকুর রামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে ভক্ত সঙ্গে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

হটযোগী। (ঠাকুরের প্রতি) আপ্, রাখালসে ক্যেয়া বোলা থা?

শ্রীরামকৃষ্ণ। হাঁ, বলেছিলুম, দেখবো যদি কোন বাবু কিছু দেয়। তা, ঠিক,—

(প্রাণকৃষ্ণাদি ভক্তদের প্রতি) তোমরা বুঝি এদের কর না?

প্রাণকৃষ্ণ চুপ ক'রিয়া রহিলেন।

[হটযোগীর প্রস্থান]

ঠাকুরের কথা চলিতে লাগিল।

[ঠাকুর রামকৃষ্ণ ও সত্যকথা।]

শ্রীরামকৃষ্ণ (প্রাণকৃষ্ণাদি ভক্তদের প্রতি)। আর সংসারে থাকতে গেলে সত্যকথার আঁট চাই। সত্যতেই ভগবানকে লাভ করা যায়। আমার সত্য কথার আঁট এখন তবু একটু কমচে, আগে ভারি আঁট ছিল, যদি বল্‌তুম নাইবো। গঙ্গায় নামা হ'লো, মন্ত্রোচ্চারণ হ'লো, মাথায় একটু দিলুম, তবু সন্দেহ হ'লো পুরো নাওয়া বুঝি হ'লো না। অমুক জায়গায় হাগ্‌তে যাবো, ত সেইখানেই যেতে হবে। রামের বাড়ী গেলুম, কলকতায়। বলে ফেলেছি লুচি খাবো না। যখন খেতে দিলে, তখন আমার খিদে পেয়েছে কিন্তু লুচি খাবো না বলেছি, তখন মেটাই দিয়ে পেট ভরাই।

"এখন তবু একটু আঁট কমেচে। বাহ্যে পায় নি। যাবো বলে ফেলেছি। কি হবে? রামকে * জিজ্ঞাসা কল্লুম। সে বল্লো গিয়ে কাজনেই। তখন বিচার ক'ল্লুম, ভাবলুম, সব ত নারায়ণ। রামও নারায়ণ। ওর কথাটাই বা না শুনি কেন?

"হাতি নারায়ণ বটে, কিন্তু মাহুতও ত নারায়ণ। মাহুত যেকালে ব'লচে হাতীর কাছে এসোনা। সেকালে মাহুতের কথা না শুনি কেন?

"এই রকম বিচার ক'রে আগেকার চেয়ে একটু আঁট কমেচে।

* শ্রীযুক্ত রাম চাটুয্যে, ঠাকুর বাড়ীর পূজারি।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

[ঠাকুর রামকৃষ্ণ ও নরলীলা।]

শ্রীরামকৃষ্ণ। এখন দেখ্‌চি, এখন আবার একটা অবস্থা বদ্‌লাচ্চে। অনেক দিন হ'লো বৈষ্ণবচরণ বলেছিল, মানুষের ভিতর যখন ঈশ্বর দর্শন হবে, তখন পূর্ণজ্ঞান হবে। এখন দেখ্‌চি তিনিই এক একরূপে বেড়াচ্চেন। কখন সাধুরূপে, কখন ছলরূপে, কোথায় রাখালরূপে। তাই বলি, সাধুরূপ নারায়ণ, ছলরূপ নারায়ণ, খলরূপ নারায়ণ, লুচ্চরূপ নারায়ণ। (সকলের হাস্য)

"এখন ভাবনা হয়, সব্বাইকে খাওয়ান কেমন ক'রে হয়।

সব্বাইকে খাওয়াতি ইচ্ছা করে। তাই তুই একজনকে এখানে রেখে খাওয়াই।

প্রাণকৃষ্ণ (মাষ্টার দৃষ্টে)। আচ্ছা লোক ! মহাশয় নৌকা থেকে নেমে তবে ছাড়লেন !

শ্রীরামকৃষ্ণ। (হাসিতে হাসিতে) কি হ'য়ে ছিল ?

প্রাণকৃষ্ণ। নৌকায় উঠে ছিলেন। একটু ঢেউ দেখে বল্লেন, নামিয়ে দাও—(মাষ্টারের প্রতি) কিসে ক'রে এলেন ?

মাষ্টার। হেঁটে।

ঠাকুর হাসিতে লাগিলেন।

[সংসারীলোক ও বিষয় কর্ম্ম ত্যাগ।]

প্রাণকৃষ্ণ (ঠাকুরের প্রতি)। মহাশয়, এইবার মনে কচ্চি কর্ম্ম ছেড়ে দেবো। কর্ম্ম ক'ত্তে গেলে আর কিছু হয় না। (সঙ্গী বাবুকে দেখাইয়া) একে কাজ শেখাচ্চি আমি ছেড়ে দিলে, ইনি কাজ ক'র্ব্বেন। আর পারা যায় না।

শ্রীরামকৃষ্ণ। হাঁ, বড় ঝঞ্ঝাট। এখন দিনকতক নির্জ্জনে ঈশ্বর চিন্তা করা খুব ভাল। তুমি ব'ল্‌চো বটে, ছাড়বে, কিন্তু কাপ্তেনও ঐ কথা ব'লেছিল। সংসারী লোকেরা বলে কিন্তু পেরে উঠে না।

[পণ্ডিত ও বিবেক বৈরাগ্য।]

"অনেকে পণ্ডিত আছে। কত জ্ঞানের কথা বলে। মুখেই বলে, কাজে

কিছুই নয়। যেমন শকুনি খুব উচুতে উঠে, কিন্তু ভাগাড়ের দিকে নজর অর্থাৎ সেই কামিনী কাঞ্চন সংসারের উপর আসক্তি।

"যদি শুনি, পণ্ডিতের বিবেক বৈরাগ্য আছে, তবে ভয় হয়। তা না হ'লে কুকুর ছাগল জ্ঞান হয় না।

প্রাণকৃষ্ণ প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। মাষ্টারকে বলিলেন, আপনি যাবেন? মাষ্টার বলিলেন, না আপনারা আসুন। প্রাণকৃষ্ণ হাসিতে লাগিলেন ও বলিলেন, তুমি আর যাও।. (সকলের হাস্য)

মাষ্টার একটু পঞ্চবটীর কাছে নির্জ্জনে বেড়াইতে লাগিলেন। পরে যে ঘাটে ঠাকুর স্নান করিতেন, সেই ঘাটে স্নান করিলেন। তৎপরে ভবতারণী ও রাধাকান্ত দর্শন ও প্রণাম করিলেন। ভাবিতে লাগিলেন, আমি শুনিয়াছিলাম ও জানিতাম, ঈশ্বর নিরাকার। তবে এই প্রতিমার সম্মুখে কেন প্রণাম করিতেছি। কেন করিতেছি? ঠাকুর রামকৃষ্ণ সাকার দেব দেবী মানেন, এইজন্য। আমি তো ঈশ্বরের সম্বন্ধে কিছু জানি না। ঠাকুর রামকৃষ্ণ যেকালে মানেন সেকালে আমি কোন ছার, মানিতেই হইবে।

ভবতারিণীকে দর্শন করিতে লাগিলেন, দেখিলেন, বামহস্তদ্বয়ে নরমুণ্ড ও অসি, দক্ষিণ হস্তদ্বয়ে বরাভয়, একদিকে ভয়ঙ্করা মূর্ত্তি, আর একদিকে মা ভক্তবৎসলা। দুইটী ভাবের সমাবেশ। ভক্তের কাছে, তাঁর দীনহীন জীবের কাছে, মা দয়াময়ী স্নেহময়ী। আবার এও সত্য যে মা ভয়ঙ্করা কালকামিনী। একাধারে কেন দুই ভাব, মাই জানেন!

ঠাকুর রামকৃষ্ণের কালীমূর্ত্তি মানে এই, মাষ্টার স্মরণ করিতে লাগিলেন। আর ভাবিতে লাগিলেন, শুনেছি, কেশব সেন ঠাকুরের কাছে কালী মানিয়াছেন। এই কি দেখিতেছি "মৃণ্ময় আধারে চিন্ময়ী দেবী?" কেশব ত এই কথা বলিতেন।

মাষ্টার নির্জ্জনে বেড়াইতে লাগিলেন। তারপরে ভাবিতে লাগিলেন, "ঠাকুর বিজ্ঞানীর অবস্থা বর্ণনা করে নিজের অবস্থাই বুঝি ব'ল্লেন। কেউ দুধ শুনেছে, কেউ দুধ দেখেছে, কেউ দুধ খেয়েছে। ইনিত দেখছি, দুধ খেয়েছেন। তা না হ'লে মার সঙ্গে একলা একলা সর্ব্বদাই কথা কন, যেন কত আলাপ। ঈশ্বরের সঙ্গে মায়ে পোয়ে কথা! এমন ঘনিষ্ট সম্বন্ধ কোথাও দেখি নাই, শুনি নাই!

"আর এটী মানে কি? পঞ্চ ভূতের ফাঁদে, ব্রহ্ম পড়ে কাঁদে। ঠাকুর

আজ কাল কেবল ব'লছেন যে নরলীলায় বিশ্বাস হ'চ্চে। বলেন, বৈষ্ণব চরণ এই কথা বলেছিল। নরলীলায় বিশ্বাস না হ'লে পূর্ণজ্ঞান হয় না। অর্থাৎ ঈশ্বর মানুষ হ'য়ে খেলা করেন। তবে বুঝি ওঁর নিজের ভিতর ঈশ্বর দর্শন করিতে ইঙ্গিত ক'রছেন। তা না হ'লে বার বার কেন ব'লছেন, পঞ্চ ভূতের ফাঁদে ব্রহ্ম পড়ে কাঁদে। ওঁরই মুখে শুনি যে, সেই পরমব্রহ্ম রামরূপে, কৃষ্ণরাধা, গৌরাঙ্গ রূপে এসেছিলেন। খ্রীষ্টানেরাও বলেন যে, খ্রীষ্টরূপে এসেছিলেন।

'এ তো কম বিশ্বাসের কথা নয়! যাঁকে অখণ্ড সচ্চিদানন্দ বলছি, তিনি আবার চোদ্দ পোয়া মানুষ। অবশ্য হ'বে, যখন ইনি ব'ল্‌ছেন। তবে বুঝিতে কিছু পারিলাম না।

এইবার তিনি ঠাকুর রামকৃষ্ণের কাছে আসিয়া বসিলেন। তিনি স্নান করিয়াছেন দেখিয়া ঠাকুর তাঁহাকে প্রসাদ খাইতে দিলেন। তিনি পশ্চিম দিকে গোল বারাণ্ডায় বসিয়া প্রসাদ পাইলেন। পান করিবার জলের ঘটী বারাণ্ডাতেই ছিল। তৎপরে ঠাকুরের কাছে তাড়াতাড়ি আসিয়া তাঁহার সম্মুখে বসিতে যাইতেছেন। এমন সময়ে ঠাকুর বলিলেন, "ঘটী আন্‌লে না?"

মাষ্টার। আজ্ঞে হাঁ, আনছি।

শ্রীরামকৃষ্ণ। বাহা!

মাষ্টার অপ্রস্তুত হইয়া পুনরায় বারাণ্ডায় গিয়া ঘটী আনিয়া ঘরের মধ্যে রাখিলেন।

মাষ্টারের বাড়ী কলিকাতায়। কিন্তু তিনি গৃহে অশান্তি হওয়াতে তখন শ্যামপুকুরে বাড়ী ভাড়া করিয়া আছেন। সেই বাড়ীর কাছেই কর্ম্ম-স্থল ছিল। তাঁহার ভদ্রাসন বাটীতে তাঁহার পিতা ও ভাইয়েরা থাকিতেন। ঠাকুরের ইচ্ছা তিনি বসত বাটীতে গিয়া থাকেন। একান্নভুক্ত পরিবার মধ্যে থাকিলে ঈশ্বর চিন্তা করিবার অনেক সুবিধা। কিন্তু ঠাকুর মাঝে মাঝে যদিও ঐরূপ বলিতেন, মাষ্টারের দুর্দ্দৈব ক্রমে তিনি বাটীতে ফিরিয়া যান নাই। আজ ঠাকুর আবার সেই বাড়ীর কথা তুলিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। কেমন এইবার তুমি বাড়ী যাবে?

মাষ্টার। আমার সেখানে ঢুকতে কোন মতে মন উঠে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ। কেন? তোমার বাবা বাড়ী ভেঙ্গে চুরে নূতন করছে।

মাষ্টার। আমি অনেক কষ্ট পেয়েছি। আমার যেতে কোন মতে মন হয় না।

শ্রীরামকৃষ্ণ। কাকে তোমার ভয়?

মাষ্টার। সব্বাইকে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। সে তোমার নৌকাতে উঠতে ভয়।

যথা সময়ে ঠাকুরদের ভোগ হইয়া গেল। আরতি হইতেছে ও কাঁসর ঘণ্টা বাজিতেছে। কালী বাটী আনন্দে পরিপূর্ণ হইল। আরতির শব্দ শুনিয়া কাঙ্গাল, সাধু, ফকির সকলে অতিথিশালায় আসিতে লাগিল। কারু কারু হাতে শালপাতা, কারু হাতে বা তৈজস পত্র থালা ঘটী। সকলে অতিথিশালায় প্রসাদ পাইল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

আজ মাষ্টারও ভবতারিণীর প্রসাদ পাইয়াছিলেন।

ঠাকুর প্রসাদ গ্রহণ করে কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিতেছেন। এমন সময় রাম, গিরীন্দ্র ও আর কয়েকটী ভক্ত আসিয়া উপস্থিত। ভক্তেরা আসিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন ও তৎপরে আসন গ্রহণ করিলেন।

[কেশবচন্দ্র সেন ও নববিধান।]

কেশব সেনের নববিধানের কথা পড়িল।

রাম। (ঠাকুরের প্রতি) মহাশয়, আমার ত নববিধানে কিছু উপকার হ'য়েছে ব'লে বোধ হয় না। কেশব বাবু যদি খাঁটি হ'তেন, শিষ্যদের অবস্থা এরূপ কেন? আমার মত, ওর ভিতরে কিছু নেই। যেমন খোলামকুচি নেড়ে ঘরে তালা দেওয়া। লোকে মনে ক'চ্চে খুব টাকা ঝন ঝন ক'চ্চে। কিন্তু ভেতরে কেবল খোলামকুচি। বাহিরের লোকে ভিতরের খবর কিছু জানে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ। কিছু সার আছে বৈকি। তা না হ'লে এত লোকে কেশবকে মানে কেন? শিবনাথকে কে চেনে। ঈশ্বরের ইচ্ছা না থাক্‌লে এরকম একটা হয় না। তবে সংসার ত্যাগ না ক'র্‌লে হয় না। লোকে মানে না। লোকে বলে, এ সংসারী লোক। এ নিজে কামিনী কাঞ্চন।

লুকিয়ে ভোগ করে, আর আমাদের বলে ঈশ্বর সত্য, সংসার স্বপ্নবৎ। সর্ব্বত্যাগী না হ'লে তার কথা সকলে নেয় না।

"কেশবের সংসার ছিল? কাজে কাজেই সংসারের উপর মনও ছিল। সংসারটীকে ত রক্ষা ক'র্ত্তে হবে। তাই অত লেক্‌চার দিয়েছে, কিন্তু সংসারটী বেশ পাকা ক'রে রেখে গেছে। অমন জামাই! বাড়ীর ভিতরে গেলুম, বড় বড় খাট!

রাম। ও খাট বাড়ী বক্‌রার সময় কেশব সেন পেয়েছিলেন, কেশব সেনের বক্‌রা। মহাশয়, যাই বলুন, বিজয়বাবু ব'লেছেন, কেশবসেন এমন কথা বিজয় বাবুকে বলেছেন যে, আমি Christ আর গৌরাঙ্গের অংশ্বন
তুমি বল যে তুমি অদ্বৈত। আবার কি বলে জানেন? আপনি নববিধানীদের

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাসিতে হাসিতে)। কে জানে বাবু, আমি কিন্তু ন-
মানে জানি না। ,জে রেঁধে

রাম। কেশবের শিষ্যেরা বলে, জ্ঞান আর ভক্তির প্রথম স
বাবু ক'রেছেন। /?

শ্রীরামকৃষ্ণ (অবাক্ হইয়া)। সে কি গো? অধ্যা
নারদ রামচন্দ্রকে স্তব ক'র্‌তে লাগলেন, বল্লেন, হে রাম! দিয়ে থাবে।
ব্রহ্মের কথা আছে, সে তুমিই। তুমিই মানুষরূপে আমাদের
হ'চ্ছ, বস্তুতঃ তুমি মানুষ নও, সেই পরব্রহ্ম। রামচন্দ্র বলিলেন,
উপর বড় প্রসন্ন হয়েছি, তুমি বর নাও। নারদ ব'ল্লেন, "রাম!
চাহিব? তোমার পাদপদ্মে শুদ্ধা ভক্তি দাও। আর তোমার মায়ায় পরম
কর
মুগ্ধ করো না। অধ্যাত্মে কেবল জ্ঞান ভক্তির কথা!

রাম। কেশবের শিষ্য অমৃতের কথা পড়িল।

রাম। অমৃত বাবু এক রকম হ'য়ে গেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। হ্যাঁ। সেদিন বড় রোগা দেখলুম।

রাম। মহাশয়, অমৃত বাবুর লেকচারের কথা শুনুন। যখন খোলের শব্দ হয়, সেই সময় বলে কেশবের জয়। আপনি বলেন কি না যে গেঁড়ে ডোবায় দল হয়। তাই একদিন লেকচারে অমৃতবাবু বল্লে, সাধু বলেছেন বটে, গেঁড়ে ডোবায় দল বাঁধে, কিন্তু ভাই দল চাই, সত্যি বল্‌চি, সত্যি বল্‌চি। দল চাই। (সকলের হাস্য)

* অধ্যাত্ম অর্থাৎ অধ্যাত্ম রামায়ণ।

শ্রীরামকৃষ্ণ। একি ছ্যা! ছ্যা! ছ্যা! একি পেকচার!

রাম। কেশব বাবু একটু প্রশংসা ভাল বাসিতেন, এই কথা হইল।

• শ্রীরামকৃষ্ণ। নিমাই সন্ন্যাসের যাত্রা হ'চ্ছিল, কেশবের ওখানে আমায় নিয়ে গিছিল। সেই দিন দেখেছিলুম, কেশব আর প্রতাপকে একজন কে এসে বল্লে এরা দুজন গৌর নিতাই। প্রসন্ন তখন আমাকে জিজ্ঞাসা ক'ল্লে তা হ'লে আপনি কে হ'লেন? দেখলুম কেশব চেয়ে রৈল, আমি কি বলি দেখবার জন্য। আমি বল্লাম, আমি তোমাদের দাসানুদাস, রেণুর রেণু। গু কেশব হেসে ব'ল্লে, ইনি ধরা দেন না।

কারু রাম। কেশব কখন বল্‌তেন, আপনি John the Baptist আবার

অতিথি কথন ব'লতেন, Nineteenth century (উনবিংশ শতাব্দীর) চৈতন্য

ং।

ামকৃষ্ণ। ওর মানে কি?

ভক্ত। আজ কাল চৈতন্যদেব আবার আসিয়াছেন, সে আপনি।

। তা ত হ'লো। এখন হাতটা আরাম কেমন ক'রে হয়

আজ মাষ্টার ও ভ

ান কেমন ক'রে হাতটা সারবে।

ঠাকুর প্রসাদ

র গানের কথা পড়িল। ত্রৈলোক্য ও কেশবের সমাজে

রাম, গিরীন্দ্র ও

গুণকীর্তন করেন!

ভূমিষ্ট হইয়া প্রণ

কৃষ্ণ। আহা! ত্রৈলোক্যের কি গান!

। কি, ঠিক ঠিক সব?

কেশব

শ্রীরামকৃষ্ণ। হাঁ। সব ঠিক ঠিক, তা নইলে মন অত টানে কেন?

রাম। সব আপনার এখানকার ভাব নিয়ে গান বেঁধেছেন। কেশব সেন উপাসনার সময় সেই ভাবগুলি সব বর্ণনা ক'রতেন, আর ত্রৈলোক্য বাবু সেইরূপ গান বাঁধতেন। এই দেখুন না ঐ গানটা,—

"প্রেমের বাজারে আনন্দের মেলা।

হরিভক্ত সঙ্গে রসরঙ্গে * করিছেন কত খেলা॥"

আপনি ভক্ত সঙ্গে যেরূপ আনন্দ করেন, সেই সকল নিয়ে ঐ গান সব বাঁধা হয়।

---

* কিয়ৎদিন পূর্ব্বে ঠাকুর পড়িয়া গিয়া হাত ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছেন। হাতে বাড় দিয়া অনেক দিন বাঁধিয়া রাখিতে হইয়াছিল।

গিরীন্দ্র। ব্রাহ্মেরা বলে, পরমহংসদেবের faculty of organisation নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ। এর মানে কি ?

রাম। আপনার বুদ্ধি কম বলে।

একজন ভক্ত। আপনি দল চালাতে জানেন না। (সকলের হাস্য)

শ্রীরামকৃষ্ণ। তুমি আর জ্বালিও না, একে ত যারা ঘোমটা খুলে নাচ্চে, তাদের লজ্জা নাই, বরং যারা দেখছে তাদের লজ্জা হয়। তবে আবার আমায় জড়াও কেন ?

শ্রীরামকৃষ্ণ (রামের প্রতি)। এখন বল দেখি, আমার হাত কেন ভাঙ্গলো ? তুমি এই কথা নিয়ে দাঁড়িয়ে একটা লেকচার দাও। (সকলের হাস্য)

ঠাকুর রামকৃষ্ণ শুনিলেন যে, রাম বাড়ীতে মাঝে মাঝে নিজে রেঁধে খান।

শ্রীরামকৃষ্ণ। (মাষ্টারের প্রতি) তুমিও কি রেঁধে খাও ?

মাষ্টার। আজ্ঞে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ। রেঁধে খেয়ে দেখোনা। একটু গাওয়া ঘি দিয়ে খাবে। বেশ শরীর মন শুদ্ধ হবে।

[পিতা মাতার প্রতি কর্ত্তব্য]

রামের ঘরকন্নার অনেক কথা হইতে লাগিল। রামের বাবা পরম বৈষ্ণব। বাড়ীতে শ্রীধরের সেবা। তবে রামের বাবা দ্বিতীয় পক্ষের বিবাহ করিয়াছিলেন—রামের তখন খুব অল্প বয়স। পিতা ও বিমাতা রামের বাড়ীতেই ছিলেন। কিন্তু বিমাতার সঙ্গে ঘর করিয়া রাম সুখী হন নাই। এক্ষণে বিমাতার বয়স ৪০ বৎসর। বিমাতার সহিত ব্যবহারে রাম পিতার উপরও মাঝে মাঝে অভিমান করিতেন। আজ সেই সকল কথা হইতেছিল।

রাম। বাবা গোল্লায় গেছেন !

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি)। শুনলে ? বাবা গোল্লায় গেছেন, আর উনি ভাল আছেন ?

রাম। তিনি (বিমাতা) বাড়ীতে এলেই অশান্তি। একটা না একটা

গণ্ডগোল হবেই। আমাদের সংসার ভেঙ্গে যায়। তাই আমি বলি, তিনি বাপের বাড়ী গিয়ে থাকুন না কেন?

গিরীন্দ্র (রামের প্রতি)। তোমার স্ত্রীকেও ঐ রকম বাপের বাড়ীতে রাখ না?

শ্রীরামকৃষ্ণ। একি হাঁড়ি কলসী গা? হাঁড়ি এক জায়গায় আর সরা আর এক জায়গায় রৈল?

রাম। মহাশয়, আমরা আনন্দে আছি, উনি এলে সংসার ভাঙ্গবে। এরূপ স্থলে —

শ্রীরামকৃষ্ণ। হাঁ, তবে আলাদা বাড়ী যদি করে দিতে পার, ত সে এক। মাসে মাসে সব খরচ দেবে।

"বাবা মা কত বড় গুরু। রাখাল আমায় জিজ্ঞাসা করে যে, বাবার পাতে কি খাবো? আমি বলি, সে কিরে? তোর কি হয়েছে যে তুই বাবার পাতে খাবি না?

"তবে একটা কথা আছে? যারা সৎ তারা উচ্ছিষ্ট কাউকে দেয় না। এমন কি উচ্ছিষ্ট কুকুরকেও দেওয়া যায় না।

গিরীন্দ্র। মহাশয়, বাপ মা যদি কোন গুরুতর অপরাধ ক'রে থাকেন? কোন ভয়ানক পাপ ক'রে থাকেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ। তা হোক। মা দ্বিচারিণী হ'লেও ত্যাগ ক'রবে না— অমুক বাবুদের গুরুপত্নীর চরিত্র নষ্ট হওয়াতে তারা ব'ল্লে যে, তবে ওঁর ছেলেকে গুরু করা যাক। আমি বল্লুম সে কি গো? ওলকে ছেড়ে ওলের মুখী নেবে? নষ্ট হ'লো ত কি? তুমি আপনি তাঁকে ইষ্ট বলে জেনো।

"যদ্যপি আমার গুরু শুঁড়ি বাড়ী যায়।
তথাপি আমার গুরু নিত্যানন্দ রায়॥"

[চৈতন্যদেব ও মা।]

"মা বাপ কি কম জিনিস গা? তাঁরা প্রসন্ন না হ'লে ধর্ম্ম কর্ম্ম কিছুই হয় না। চৈতন্যদেব ত প্রেমে উন্মত্ত হ'য়েছিলেন, কিন্তু তবু সন্ন্যাসের আগে কতদিন ধরে বোঝান! ব'ল্লেন, আমি মাঝে মাঝে এসে মা তোমাকে দেখা দেবো।

(মাষ্টারের প্রতি, তিরস্কার করিতে করিতে) আর তোমায় বলি। বাপ মা মানুষ ক'ল্লে, এখন মাগ নিয়ে, কত ছেলে পুলেও হ'লো, বেরিয়ে এলে। (সভাশুদ্ধ সকলে স্তব্ধ।)

(মাষ্টারের প্রতি) বাপ মাকে ফাঁকি দিয়ে ছেলে মাগ নিয়ে, বাউল বৈষ্ণবী সেজে বেরোয়। তোমার বাপের অভাব নেই ব'লে; তা না হ'লে আমি বল্‌তুম ধিক্!

[মানুষের ঋণ।]

"কতকগুলি ঋণ আছে। মাতৃঋণ, পিতৃঋণ, স্ত্রীঋণ, মা বাপের ঋণ। এ সব পরিশোধ না করলে কোন কাজ হয় না।

"স্ত্রীর কাছেও ঋণ আছে। সতীস্ত্রীর ভরণপোষণ করতে হইবে। হরীশ স্ত্রীকে ত্যাগ ক'রে এখানে এসে র'য়েছে। যদি তার খাবার জোত্তর না থাকতো, তা হ'লে বল্‌তুম, "ঢ্যাম্‌নাশালা"!

"জ্ঞানের পর ঐ স্ত্রীকে দেখবে সাক্ষাৎ ভগবতী

"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা"

"আবার তিনিই মা হ'য়েছেন। "যা দেবী সর্ব্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা"।

"কেউ কেউ শোলক ঝাড়ে, লম্বা লম্বা কথা কয়, কিন্তু ব্যবহারে আর এক রকম। রামপ্রসন্ন ঐ হটযোগীর কিসে আফিম্ আর দুধের জোগাড় হয়, এই ক'রে ক'রে বেড়াচ্ছে! বলে মনুতে সাধু সেবার কথা আছে। এদিকে বুড়ো মা খেতে পায় না, নিজে হাট বাজার ক'রতে যায়! এমনি রাগ হয়।

[কে সকল ঋণ হইতে মুক্ত।]

"তবে একটী কথা আছে। যদি প্রেমোন্মাদ হয়, তাহলে কেবা বাপ, কেবা মা, কেবা স্ত্রী! ঈশ্বরকে এত ভালবাসা যে পাগলের মত হ'য়ে গেছে! তার কিছুই কর্ত্তব্য নেই। সব ঋণ থেকে মুক্ত। প্রেমোন্মাদ কি রকম? সে অবস্থা হ'লে জগৎ ত ভুল হ'য়ে যায়। নিজের দেহ যে এত প্রিয় জিনিস, তাও ভুলে যায়। চৈতন্যদেবের হ'য়েছিল। সাগরে ঝাঁপ দিয়ে পড়লেন, সাগর ব'লে বোধ নাই। মাটীতে বার বার আছাড় খেয়ে প'ড়চেন! ক্ষুধা নেই, তৃষ্ণা নেই, নিদ্রা নেই! শরীর ব'লে বোধ নেই।

বাণী।

শ্রীরজনীকান্ত সেন প্রণীত, মূল্য আট আনা মাত্র।

বাণী এক খানা অনতি-বৃহৎ সঙ্গীত গ্রন্থ। উহা তিন ভাগে বিভক্ত— আলাপে, বিলাপে, ও প্রলাপে। আলাপের প্রারম্ভেই কবি ভারতের প্রাচীন গৌরব ও আধুনিক অধঃপতন স্মরণ করিয়া সঙ্কুচিত হৃদয়ে যে গীত গাহিয়াছেন, তাহা ভাবে ভাষায় গম্ভীর ও প্রাণস্পর্শী হইয়াছে। সঙ্গীতটী নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল।

সেথা আমি কি গাহিব গান?

যেথা, গভীর ওঙ্কারে, সাম ঝঙ্কারে,
কাঁপিত দূর বিমান।

যেথা, স্বর সপ্তকে বাঁধিয়া বীণা,
বাণী শুভ্র কমলাসীনা,
রোধি' তটিনী-জল-প্রবাহ,
তুলিত মোহন তান।

যেথা, আলোড়ি' চন্দ্রালোক শারদ,
করি হরি গুণ গান নারদ,
মন্ত্র মুগ্ধ করিত ভুবন,
টলাইত ভগবান।

যেথা, যোগীশ্বর পুণ্য পরশে
মূর্ত্তরাগ উদিল হরষে
মুগ্ধ কমলাকান্ত চরণে
জাহ্নবী জনম পান।

যেথা, বৃন্দাবন কেলি কুঞ্জে,
মুরলী রবে পুঞ্জে পুঞ্জে,
পুলকে শিহরি ফুটিত কুসুম
যমুনা যে'ত উজান।

আর কি ভারতে আছে সে যন্ত্র,
আর কি আছে সে মোহন মন্ত্র,
আর কি আছে সে মধুর কণ্ঠ,
আর কি আছে সে প্রাণ ?

এই সূচনা-সঙ্গীত ব্যতীত 'আলাপে' আরও ৩০টী কবিতা আছে। এর অধিকাংশই আমাদের নিকট উৎকৃষ্ট বলিয়া মনে হইল। করুণাময় কবিতা-টীও উদ্ধৃত করিবার প্রলোভন ত্যাগ করিতে পারিলাম না।

(আমি) অকৃতি অধম ব'লেও তো কিছু
কম করে মোরে কিছু দাও নি !
যা' দিয়েছ তারি অযোগ্য ভাবিয়া
কেড়েও ত কিছু নাও নি !
(তব) আশিষ-কুসুম ধরি নাই শিরে,
পায়ে দ'লে গেছি, চাই নাই ফিরে ;
তবু দয়া ক'রে কেবলি দিয়েছ ;
প্রতিদান কিছু চাও নি।
(আমি) ছুটিয়া বেড়াই জানি না কি আশে,
সুধা-পান ক'রে মরি গো পিয়াসে,
তবু যাহা চাই সকলি পেয়েছি ;
তুমি ত কিছুই পাও নি।
(আমার) রাখিতে চাও গো বাঁধনে আঁটিয়া
শতবার যাই বাঁধন কাটিয়া,
ভাবি ছেড়ে গেছ—ফিরে চেয়ে দেখি,
এক পাও ছেড়ে যাও নি।

পুস্তকের দ্বিতীয় ভাগ 'বিলাপে'। ইহাতে দশটী কবিতা—সরল এবং সুখপাঠ্য। এই সকল সুখপাঠ্য কবিতা কবিবর রবীন্দ্র নাথের অক্ষয় লেখনীর অনুকরণে লিখিত হইলেও, তাঁহার অন্যান্য অনেক শিষ্যের কবিতার ন্যায়, বাণীর কবিতায় দুর্বোধ প্রহেলিকার দ্বারা কল্পনার অসারতা গোপনের নিষ্ফল প্রয়াস নাই।

এই বার পুস্তকের শেষভাগ—'প্রলাপে'। ইহাতে 'তিনকড়ি শর্ম্মা' 'জেনে রাখ', 'বরের দর', 'বৈয়াকরণ দম্পতির বিবাহ', 'কিছু হলো না'

'বিদায়' প্রভৃতি ৯টী কবিতা স্থান পাইয়াছে। প্রলাপের কবি স্বজ্ঞানে অতি "সাব সত্যের" অবতারণা করিয়াছেন। এই অংশে তাঁহার কৃতিত্ব ও কবিত্ব সমধিক প্রকাশ পাইয়াছে। 'প্রলাপে' 'আষাঢ়ে' র অনুকরণে রচিত, কিন্তু অক্ষম অনুকরণ নহে। রহস্য কবিতা বাঙ্গলা সাহিত্যে সম্পূর্ণ নূতন জিনিস। আষাঢ়ে-কবি শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্র লাল রায় ইহার জন্মদাতা। দ্বিজেন্দ্র বাবুর কবিতাগুলি পড়িয়া আমরা যত আমোদ পাইয়াছি, রজনী বাবুর কবিতাতেও যেন সেই টুকু পাইলাম। কোন নব্য কবির পক্ষে ইহা শ্লাঘার বিষয়, সন্দেহ নাই। 'বরের দর' বর্ত্তমান সমাজের একটী নিখুঁত ফটো, কবিতাটী অতিরিক্ত দীর্ঘ হইলেও উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

কন্যা দায়ে বিব্রত হ'য়েছ বিলক্ষণ ;
তাই বুঝে সংক্ষেপে কচ্ছি ফর্দ্দ সমাপন।
নগদে চাই তিনটি হাজার,
তাতেই আবার গিন্নি বেজার,
বলেন, এবার বরের বাজার কসা কি রকম !
(কিন্তু) তোমার কাছে চক্ষুলজ্জা লাগে যে বিষম।
(আর) পড়ার খরচ মাসে তিরিশ,
হয় না কমে, বলে 'গিরিশ',
কাজেই সেটা, হ্যাঁ হ্যাঁ, বেশী বলা অকারণ ;
সোণার চেন্ ঘড়ি, আইভরি ছড়ি,
ডায়মণ্ড কাটা সোণার বোতাম,
দিও এক সেট্, কতই বা দাম ?
বিলিতি বুট; ভাল শ্লিপার, বরের প্রয়োজন ;
ফুল এষ্টিকিং রেসমী রুমাল, দিও দু'ডজন।
ছাতি বুরুষ আয়না চিরুণ,
ফুল কাটা সার্ট, কোট পেন্টালুন,
দু জোড়া শাল, সার্জ্জের চাদর, গরদ সুচিক্কণ,
জমকাল র‍্যাপার, আতর ল্যাভেণ্ডার,
থান পনের দিশি ধুতি, রেশমী না হয় দিও সুতি ;
হ্যাদ্দ্যাখো ধরিনি 'চস্মা' কেমন ভুলো মন।
ছেলে; তুমি পেলে খুসি, একটু খাটো-দরশন।

খাট চৌকী মশারি গদি, এর মধ্যে নেই 'পারি যদি',
তাকিয়া তোষক বালিশাদি, দস্তুর মতন ;
হবে দু'প্রস্ত, শয্যা প্রশস্ত,
(আর) টেবিল, চেয়ার, আলনা, ডেস্ক,
হাতির দাঁতের হাত বাক্স,
ষ্টীল ট্র্যাঙ্ক খুব বড় দু'টো, যা দেশের চলন ;
আর তারি সঙ্গে পুরো এক সেট্ রূপার বাসন।
গিন্নী বলেন, বাউটী সুটে, রূপ লাবণ্য ওঠে ফুটে,
একশ ভরি হলেই, হবে একটী সেট্ উত্তম ;
যেন অলঙ্কার দেখে', নিন্দে করে না লোকে,
দিও বাপারসী বোম্বাই ; ফর্দ্দ কিছু হ'ল লম্বাই,
তা, তোমার মেয়ে, তোমার জামাই, তোমার আকিঞ্চন ;
আমার কি ভাই ? আজ বাদে কাল মুদব দুনয়ন !

* * * *

* * * * *

ছেলেটি মোর নব কার্ত্তিক,
ভাবটি আবার খাটি সাত্ত্বিক,
এই বয়সে তার তাত্ত্বিক, কত্তাদের মতন ;
যদি দিতেন একটি 'পাশ' তবে লাগিয়ে দিতেম ত্রাস,
ফেল ছেলে তাই এত কম পণ,
এতেই তোমার উঠ্ল কম্পন ?

* * * * *

বাণীর অনেক কবিতায় যতি ভঙ্গ দোষ ও ছন্দের উচ্ছৃঙ্খলতা লক্ষিত হইতেছে। সঙ্গীতের পক্ষে এ সকল দোষ মার্জ্জনীয় হইলেও, কবিতা আবৃত্তির পক্ষে বাঞ্ছনীয় নহে। বাণীকে সঙ্গীত-গ্রন্থরূপে পরিচিত করিবার জন্য একটী ছোট খাট ভূমিকার অবতারণা করা হইয়া থাকিলেও, সঙ্গীতরসাভিজ্ঞ আমরা তাহাকে কবিতা গ্রন্থ বলিয়াই গ্রহণ করিলাম, গ্রন্থকারেরও বোধ হয় তাহাই ইচ্ছা, নতুবা তিনি সঙ্গীতগুলির রাগ রাগিণী নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন না কেন ? গ্রন্থে সূচী থাকিলে ভাল হইত।

মোহাম্মদ ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

মদিনার আপামর সাধারণ সকলেই মোহাম্মদের শুভাগমনে আনন্দে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল এবং তাঁহাকে মহা সমারোহে অভ্যর্থনা করিল। এখানে তাঁহার জীবনের নূতন অধ্যায় আরম্ভ হইল। মোহাম্মদ মক্কায় বাস কালে স্বহস্তে নিজের পরিধেয় বস্ত্রের সংস্কার করিতেন এবং এক এক দিন অন্নভাবে অনাহারে থাকিতেন। তাঁহার জীবনের নূতন অধ্যায়েও এ বিষয়ে অবস্থান্তর ঘটিয়াছিল না। কিন্তু তিনি পৃথিবীর প্রবলতম সম্রাট অপেক্ষাও অধিক শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন, তাহা অনুশীলন-যোগ্য। আমরা এই বিচিত্র কথা সংক্ষেপে বর্ণনা করিতেছি।

মোহাম্মদ মদিনায় আগমন করিয়া সমস্ত অধিবাসীকে এসলাম ধর্ম্মানুরাগী দেখিয়া তাহাদের ধর্ম্মচর্চ্চার জন্য যথোপযুক্ত বন্দোবস্ত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি প্রথমেই একমাত্র অদ্বিতীয় নিরাকার পরমেশ্বরের উপাসনার জন্য মন্দির এবং গৃহতাড়িত মোসলমানদের জন্য বাসভবন নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি স্বহস্তে মন্দিরের নির্ম্মাণ কার্য্যে সাহায্য করিয়াছিলেন। এই ধর্ম্ম মন্দির সৌষ্ঠবশালী ছিল না। মন্দিরের প্রাচীর ইষ্টক ও কর্দ্দমের এবং ছাদ তাল পত্রের ছিল। মন্দিরের একাংশ নিরাশ্রয় ব্যক্তিগণের বাস জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল। এই অনাড়ম্বর মন্দিরের প্রত্যেক অনুষ্ঠানও বিনা জাঁকজমকে সম্পাদিত হইত। মোহাম্মদ কখনও আবরণহীন গৃহ তলে দণ্ডায়মান হইয়া, কখনও বা একটী তাল বৃক্ষে ভর দিয়া ব্যাকুল হৃদয়ে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিতেন এবং অনুরক্ত শ্রোতৃবৃন্দ তাঁহার প্রাণোন্মাদকর উপদেশে আত্মহারা হইত।

এই সময় মদিনার অধিবাসিগণ দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিল। এক সম্প্রদায়ের নাম আউস, অপর সম্প্রদায়ের নাম খজরাজ। এই সম্প্রদায়দ্বয় মধ্যে সদ্ভাব ছিল না, তাহারা একে অন্যের রক্তপাত জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিত। আউস ও খজরাজগণ ধর্ম্ম বিশ্বাসের গুণে আপনাদের চিরাগত শত্রুতা বিস্মৃত হইয়া এসলাম ধর্ম্মের পতাকামূলে মিলনের মোহন মন্ত্রে সমবেত

হইল। মোহাম্মদ মদিনাবাসীদের সমস্ত বিবাদের নিরসন করিয়া তাহাদিগকে এক সূত্রে সম্মিবদ্ধ করিলেন এবং এই সম্মিলন সুদৃঢ় করিবার উদ্দেশে তাহাদিগকে এক সাধারণ উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন। এই উপাধির নাম আনসার। আনসার শব্দের অর্থ সহায়তাকারী। মদিনাবাসীরা সঙ্কট কালে এসলাম ধর্ম্মের সহায়তা করিয়াছিল বলিয়া এই গৌরবসূচক উপাধি লাভ করিল। যে সকল মক্কাবাসী স্বধর্ম্ম রক্ষার জন্য স্বর্গাদপি গরীয়সী জন্মভূমি এবং স্নেহ মমতার পীঠস্থান গৃহ পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছিল, তাঁহাদিগকে মুহাজেরিণ (নির্ব্বাসিত) উপাধি প্রদত্ত হইল। মোহাম্মদ মুহাজেরিণ ও আনসারদের মধ্যে অচ্ছেদ্যবন্ধন সংস্থাপন জন্য তাহাদিগকে লইয়া ধর্ম্মমণ্ডলীর প্রতিষ্ঠা করিলেন। মণ্ডলীর বিশ্বাসী মাত্রেই ভ্রাতৃভাবে অনুপ্রাণিত এবং সুখে দুঃখে এক সূত্রে সন্নিবদ্ধ হইল।

মোহাম্মদ নবপ্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মমণ্ডলীকে একমাত্র ধর্ম্মবলে অনুবিদ্ধ করিয়া ক্ষান্ত রহিলেন না। এক মাত্র অদ্বিতীয় নিরাকার পরমেশ্বরের উপাসনার প্রতিষ্ঠা, পাপে আকণ্ঠ-নিমজ্জিত আরব সমাজের উদ্ধার এবং বহুধা-বিভক্ত আরব-জাতির ঐক্য-বন্ধন মোহাম্মদের জীবনের উদ্দেশ্য ছিল। এই উদ্দেশ্য সাধন কল্পে কেবল ধর্ম্মবলই যথেষ্ট ছিল না, রাজশক্তিরও প্রয়োজন ছিল। দুর্দ্ধর্ষ আরবজাতিকে এসলাম-ধর্ম্ম মূলক নৈতিক ও সামাজিক অনুশাসনের সম্যক অনুগত করিবার জন্য রাজশক্তির প্রয়োজন ছিল। এজন্য মোহাম্মদ নবপ্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মমণ্ডলীকে রাজশক্তি-সম্পন্ন করিয়া এক প্রজাতন্ত্র রাজ্যের সূত্রপাত করিলেন। কোন স্থানের অধিবাসিগণ কর্ত্তৃক এসলামধর্ম্ম পরিগৃহীত হইলেই সে স্থানকে এই মণ্ডলীর শাসনাধীন করিবার নিয়ম বিধিবদ্ধ হইল। মোহাম্মদ আপনাকে মণ্ডলীর অধিনেতৃ পদে প্রতিস্থাপিত করিলেন। তিনি এইরূপে একাধারে ধর্ম্ম-সংস্থাপক, শাসনকর্ত্তা, অধিনেতা, ব্যবস্থাপক ও বিচারক হইলেন। (১)

---

(১) নবধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করিয়া মানবজাতির কল্যাণ সাধন করাই মোহাম্মদের জীবনের উদ্দেশ্য ছিল। রাজ্য-লালসা কখনও তাঁহার হৃদয় অধিকার করে নাই, নবধর্ম্মের সর্ব্বাঙ্গীন প্রতিষ্ঠার জন্য আবশ্যক বলিয়াই তিনি এক অভিনব সাম্রাজ্যের পত্তন করিয়াছিলেন। তাঁহার ন্যায় সংসার-নির্লিপ্ত মহাপুরুষ এ পৃথিবীতে অতি বিরল। মোহাম্মদের আশ্চর্য্য বৈরাগ্য ছিল। নূতন সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা মোহাম্মদ একদা তদীয় প্রিয়তমা কন্যা ফতেমার গৃহে গমন করেন। এই সময় ফতেমা অন্নাভাবে তিন দিন উপবাস রহিয়া ছিলেন। প্রিয়-

এই সময় মদিনা ও তাহার চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী স্থান সমূহ বহুসংখ্যক ইহুদির বাসভূমি ছিল। এই সকল ইহুদি কনিকা, বনি নজির, করিজা প্রভৃতি নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিল। মোহাম্মদ ইহুদিদিগকে সন্তুষ্ট করিতে উদ্যোগী হইয়া তাহাদের সঙ্গে সন্ধি সংস্থাপন করিলেন। এই সন্ধি অনুসারে মোহাম্মদ তাহাদিগকে স্বচ্ছন্দভাবে স্ব স্ব ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে অনুমতি দিলেন এবং ইহুদিরাও মোসলমানদের সঙ্গে কোন প্রকার শত্রুতাচরণ না করিতে অঙ্গীকার করিল। এসলাম ধর্ম্মের সঙ্গে তাহাদের ধর্ম্মমতের প্রভূত পার্থক্য ছিল। একারণ তাহারা মোহাম্মদের প্রতি কিছুতেই সন্তুষ্ট হইতে পারিল না। তাঁহার উদার ব্যবহার নিবন্ধন তাঁহারা প্রকাশ্যে তাঁহার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিল, কিন্তু তাহাদের অন্তরে অন্তরে বিদ্বেষভাব পরিপুষ্ট হইতে লাগিল।

মদিনাবাসীর প্রাণগত আনুকূল্যনিবন্ধন এসলাম ধর্ম্মের মূল সুদৃঢ় হইয়া উঠিল এবং মোহাম্মদ জ্বলন্ত উৎসাহে আরবদেশের সর্ব্বত্র একেশ্বরবাদের মহিমা ঘোষণা করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার প্রচার ফলে বহুস্থানের অসংখ্য নরনারী পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক একেশ্বরবাদে দীক্ষিত হইয়া মদিনার ধর্ম্মমণ্ডলীর আশ্রয় গ্রহণ করিতে লাগিল। ইহাতে প্রত্যহ মোহাম্মদের প্রভাব ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। একারণ কোরেশদের ক্ষোভের সীমা রহিল না। তাহারা মোহাম্মদকে ধ্বংস করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইল। মদিনাবাসী ইহুদিদের এসলামধর্ম্ম-বিদ্বেষের কথা মক্কায় অপরিজ্ঞাত ছিল না। অনেকেশ্বরবাদী কোরেশেরা একমেবাদ্বিতীয় পরমে-

---

তমা কন্যার মুখে এই দুরবস্থার কথা শুনিয়া মোহাম্মদ ধীরচিত্তে বলেন, ফতেমা দুঃখিত হইও না; তোমার পিতাও অদ্য চারি দিন উপবাস-ক্লিষ্ট। এই বলিয়া তিনি গাত্রাবরণ উন্মোচন করিয়া ক্ষুধার যন্ত্রণা উপশম করিবার জন্য উদরে যে প্রস্তরখণ্ড বন্ধন করিয়াছিলেন, তাহা প্রদর্শন করেন। আমরা আর একটী ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। এক দিন মোহাম্মদ দিবাভাগে মোটা দড়ির জাল বোনা খাটিয়ার উপর বিনা শয্যায় শয়ন করিয়া নিদ্রিত হইয়াছিলেন। ঐ সকল মোটা দড়ির স্পর্শে তাঁহার কোমল অঙ্গে রক্তাক্ত দাগ পড়িয়াছিল। ওমর তাঁহাকে এই অবস্থায় দেখিয়া অশ্রুজল সম্বরণ করিতে পারিয়াছিলেন না। মোহাম্মদ জাগ্রত হইয়া তাঁহার অশ্রুজল মোচনের কারণ-জিজ্ঞাসু হন, তিনি ওমরের কথা শুনিয়া বলেন, "ইহকালের সুখ আমার লক্ষ্য নহে, আমি পরলোকের সম্পদপ্রার্থী; তুমি কি ইচ্ছা কর না?"

শ্বরের উপাসক মোহাম্মদের ধ্বংস কামনায় ষড়যন্ত্র করিবার জন্য একেশ্বরবাদী ইহুদিদের নিকট দূত প্রেরণ করিতে আরম্ভ করিল। একারণ মোহাম্মদ আশ্রয়দাতা শিষ্যবৃন্দের রক্ষার জন্য উৎকণ্ঠিত হইলেন।

কিছুতেই কোরেশদের উৎপীড়নের নিবৃত্তি না দেখিয়া, মোহাম্মদ বুঝিতে পারিলেন যে, অস্ত্রবলের প্রয়োগ ব্যতীত দেশব্যাপী শত্রুতাচরণের মূলোচ্ছেদ করিবার অন্য উপায় নাই এবং তরবারি হস্তে অগ্রসর না হইলে দেশ মধ্যে শান্তির প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর নহে। এজন্য তিনি কোরেশদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করাই আবশ্যক বলিয়া বোধ করিলেন এবং তদনুরূপ প্রত্যাদেশও প্রাপ্ত হইলেন। (১) ইহার পর মোহাম্মদ যুদ্ধায়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন। কোরেশেরাও উদাসীন রহিলেন না, দিবারাত্রি পরিশ্রম করিয়া অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করিতে লাগিল। এই উদ্যোগ পর্ব্বকালে মোহাম্মদ যুদ্ধোপকরণ সংগ্রহকারী একদল কোরেশ-বণিককে আক্রমণ করিবার জন্য সসৈন্যে বদর নামক স্থানে গমন করিলেন। (২)

---

(১) আমরা এই প্রসঙ্গে গিরিশ বাবুর গ্রন্থাবলী হইতে কোরাণের দুইটী বচন উদ্ধৃত করিতেছি। "তুমি তাহাদের সহিত যুদ্ধ কর, যেহেতু তাহারা অত্যাচার করিতেছে, ঈশ্বর সাহায্য করিতে সক্ষম এবং যাবৎ দৌরাত্ম্য থাকে তাবৎ যুদ্ধ করিতে থাক।" "স্বর্গলোক তরবারির নিম্নে।" মোহাম্মদ এই সকল প্রত্যাদেশ এই সময়েই লাভ করিয়াছিলেন।

(২) শ্রীযুক্ত গিরিশ বাবুর পুস্তক পাঠ করিয়া আমরা জানিতে পারি যে, বদরের যুদ্ধের পূর্ব্বে মোসলমানগণ সাত বার যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিল। কিন্তু এই সময় যুদ্ধ সামান্য ছিল। বিদেশগামী কোরেশ-বণিকদিগকে আক্রমণ করাই এই সকল অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল। প্রথম অভিযানে যুদ্ধ হইয়াছিল না, মোসলমানগণ কোরেশদের সঙ্গে সন্ধি সংস্থাপন করিয়া মদিনায় ফিরিয়া আইসে। দ্বিতীয় অভিযানে মোসলমানগণ কোরেশ-বণিকদের সম্মুখবর্ত্তী হইলে তাহারা ভয় পাইয়া পলায়ন করে। তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম বার মোসলমানগণ কোরেশ-বণিকদের আগমনসংবাদ পাইয়া মদিনা হইতে বহির্গত হয়। কিন্তু প্রতিবারেই তাহাদের পৌঁছিবার পূর্ব্বে কোরেশরা চলিয়া যায় এবং তাহারা নিরাশ হইয়া মদিনায় ফিরিয়া আইসে। এক জন মক্কাবাসী মদিনার প্রান্ত হইতে উষ্ট্র সকল অপহরণ করিয়া লইয়া যাওয়ায় ষষ্ঠ অভিযান করা হয়। এবারও মোসলমানদের পৌঁছিবার পূর্ব্বেই কোরেশরা চলিয়া গিয়াছিল। সপ্তম অভিযানে নতনল খেলা নামক স্থানে মোসলমানদের সঙ্গে একদল কোরেশ-বণিকের যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে কোরেশেরা সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হয় এবং মোসলমানগণ তাহাদের সমস্ত পণ্য দ্রব্য হস্তগত করে। এই যুদ্ধ রজত মাসে সংঘটিত হইয়াছিল। তৎকালের আরব সমাজে রজত মাসে যুদ্ধ করা অত্যন্ত গর্হিত কাজ বলিয়া পরিগণিত ছিল। এজন্য রজত মাসে যুদ্ধ হওয়াতে মোহাম্মদের নামে নিন্দাবাদ হয়।

দ্বিতীয় হিজিরীর (৬২৩ খৃঃ) রমজান মাসের দ্বাদশ দিবসে উভয় দল পরস্পরের সম্মুখবর্ত্তী হইল। কোরেশ বণিকেরা শত্রুর আগমন সংবাদ অবগত হইয়া মক্কায় সংবাদ প্রেরণ করিয়াছিল। সংবাদ পাইয়া অবিলম্বে এক-সহস্র বীরপুরুষ তাহাদের সাহায্যার্থে বদরে আসিয়া উপনীত হইল। মোহাম্মদের সঙ্গে কেবল মাত্র তিন শত পাঁচ জন যোদ্ধা ছিল। কিন্তু তিনি শত্রুর সংখ্যাধিক্য নিবন্ধন ভীত হইলেন না, ঈশ্বরের নাম স্মরণ করিলেন। তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। কোরেশ সৈন্য মোসলমানের প্রবলপরাক্রম সহ্য করিতে না পারিয়া ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। মোহাম্মদ জয়শ্রী লাভ করিয়া সপ্ততিজন বন্দী সহ মদিনায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। (১)

মোহাম্মদ মদিনায় প্রত্যাবৃত্ত হইয়াই কোরেশ বন্দীদিগকে মুক্তি প্রদান করিলেন। মোসলমানগণ বন্দীদের সঙ্গে যথেষ্ট সদ্ব্যবহার করিয়াছিল।

কিন্তু এই যুদ্ধে তাঁহার সম্মতি ছিল না। যুদ্ধ-কর্ত্তৃগণ মদিনায় প্রত্যাবৃত্ত হইলে তিনি তাহাদিগকে যথেষ্ট তিরস্কার করিয়াছিলেন। তিনি লুণ্ঠিত দ্রব্যের কিঞ্চিৎমাত্রও গ্রহণ করিয়াছিলেন না।

(১) আইরভিং প্রভৃতি খৃষ্টান-লেখকগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, কোরেশ-বণিকদের ধন লুণ্ঠনের জন্যই মোহাম্মদ বদরের যুদ্ধ করিয়াছিলেন। আমীর আলী প্রভৃতি মোসলমানলেখকগণের মতে, মোসলমানদিগকে পর্য্যুদস্ত করিবার জন্য মদিনা আক্রমণ করিতে অগ্রসর হওয়াতেই বদরের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। আমরা গিরিশ বাবুর গ্রন্থ পাঠ করিয়া জানিতে পারি যে, মোহাম্মদের সমসময়ে একদল মদিনাবাসীর বিশ্বাস ছিল যে, তিনি অর্থ লোভেই বদরের যুদ্ধ করিয়াছিলেন। কতিপয় মোসলমান যুদ্ধ করিবার জন্য মোহাম্মদের সহিত মদিনা হইতে বহির্গত হইয়াছিল, কিন্তু কিয়দ্দূর গমন করিয়াই প্রাগুক্ত বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া যুদ্ধ না করিয়াই মদিনায় প্রত্যাবর্ত্তন করে। কয়স নামক একজন বীরপুরুষ যুদ্ধ করিবার জন্য মোহাম্মদের সঙ্গে বহির্গত হয়। মোহাম্মদ তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন, "তুমি কিজন্য যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করিয়াছ?" কয়স উত্তর করে, মক্কার বণিকদের পণ্য দ্রব্যই আমাকে যুদ্ধে ব্রতী করিয়াছে। কয়স এসলাম ধর্ম্ম বিশ্বাসী ছিল না; এজন্য মোহাম্মদ তাহাকে ফিরাইয়া দেন। মোসলমানগণ এসলামধর্ম্ম বিরোধী কোরেশদিগকে দলন করিবার জন্যই বদরের যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, এরূপ সমসাময়িক প্রমাণেরও অভাব নাই। এই যুদ্ধের প্রাক্কালে মোহাম্মদ সহচর বন্ধুগণের মত জিজ্ঞাসা করেন। আবুবেকর তাঁহার প্রশ্নের উত্তরে বলেন, "কোরেশ-দলপতিরা কখনও এসলামধর্ম্ম গ্রহণ করিবে না এবং সর্ব্বদা অন্যের ধর্ম্মাচরণে ব্যাঘাত জন্মাইবে। একারণ তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধ করাই শ্রেয়।" আবুবেকর মোহাম্মদের একান্ত অন্তরঙ্গ ছিলেন। মোহাম্মদের কোন মনোভাব আবুবিকারের নিকট লুক্কায়িত থাকিবার সম্ভাবনা ছিল না।

তাহারা পদব্রজে চলিয়া বন্দীদের কষ্ট নিবারণের জন্য অশ্ব দিত, নিজেরা খর্জ্জুর দ্বারা উদর পূর্ত্তি করিয়া তাহাদের তৃপ্তির জন্য রুটী সংগ্রহ করিত। মোহাম্মদ বদরের যুদ্ধে অল্প সংখ্যক সৈন্য লইয়া বহুসংখ্যক কোরেশ-সৈন্য পরাজিত করিয়াছিলেন। ইহাতে মোসলমানদের ধর্ম্মবিশ্বাস সুগভীর হইল। এসলামধর্ম্ম ও তাহার প্রতিষ্ঠা ঈশ্বরেরই বিধান বলিয়া তাহাদের সুদৃঢ় প্রতীতি জন্মিল। তাহারা ধর্ম্মের জন্য জীবন পণ করিল। ফলতঃ মোসলমানেরা বদরের যুদ্ধক্ষেত্রে জয়লাভ করিয়া সমধিক দুর্জ্জয় হইয়া উঠিল।

কোরেশরা যুদ্ধে পরাজিত হইয়া জ্বলিতে লাগিল এবং অপমানের প্রতিশোধ লইবার কল্পনায় দুইশত অশ্বারোহী সৈন্য গুপ্তভাবে মদিনায় গমন করিয়া মোসলমানদিগকে নির্যাতন করিতে আরম্ভ করিল। মোসলমান বীরপুরুষগণ কোরেশদের আগমনের সংবাদ পরিজ্ঞাত হইয়া রণসজ্জা পরিধান পূর্ব্বক বহির্গত হইল। কোরেশ-সৈন্য তাহাদিগকে দর্শন করিয়া ভয় বিহ্বলচিত্তে পৃষ্ঠভঙ্গ দিল। মোসলমানগণ পলায়মান সৈন্যের পশ্চাদ্বর্ত্তী হইল। (১)

কোরেশরা বার বার দুই বার এই ভাবে পরাজিত হইয়া কিছু কালের জন্য শত্রুতাচারণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক নীরব হইল। বদরের যুদ্ধে মোহাম্মদ জয়শ্রী লাভ করাতে এসলাম বিদ্বেষী ইহুদিদিগের ক্ষোভের পরিসীমা রহিল না। তাহারা নানা প্রকারে মোসলমানদের সঙ্গে শত্রুতাচরণ করিতে আরম্ভ করিল। তাহারা মোহাম্মদ এবং এসলাম ধর্ম্মকে লোকের নিকট অবজ্ঞাত করিবার অভিপ্রায়ে বিদ্রূপাত্মক কবিতার প্রচার করিতে আরম্ভ করিল। কাব নামক এক জন ইহুদি মক্কা নগরে গমন পূর্ব্বক যুদ্ধ ক্ষেত্রে নিহত

(১) এই অনুকরণকালে একদা মোহাম্মদ শিবির হইতে কিয়দ্দূরে একাকী একটী বৃক্ষের তলে শয়ন করিয়াছিলেন। ডারথার নামক একজন অমিতবলবান দুর্দ্দান্ত কোরেশ তাঁহাকে তদবস্থায় আক্রমণ করে এবং তাঁহাকে বধ করিবার জন্য তরবারি নিষ্কাশিত করিয়া বলে, "হে মোহাম্মদ, এখন তোমাকে কে রক্ষা করিবে?' কিন্তু মোহাম্মদ কিঞ্চিন্মাত্র ভীত না হইয়া বজ্রকঠোর স্বরে উত্তর করেন, "ঈশ্বর।" এই উত্তরে ডারথারের হৃদয় কম্পিত হইয়া উঠিল, তরবারি তাহার হস্ত হইতে খসিয়া পড়িল। মোহাম্মদ বিদ্যুদ্বেগে সে তরবারি তুলিয়া লইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন, "এখন তোমাকে কে রক্ষা করিবে?" ডারথার ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল "আমার আর কেহ নাই, তুমি আমাকে রক্ষা কর।" মোহাম্মদ তাঁহাকে ক্ষমা করিলেন, তাহার তরবারি তাহাকে ফিরাইয়া দিলেন। ডারথার এসলামধর্ম্ম গ্রহণ করিল।

কোরেশ-বীরদের শৌর্য্য বীর্য্যের কাহিনী গৃহে গৃহে প্রচার করিয়া তাহাদের পরিবারবর্গের শোকভারাবনত হৃদয় উত্তেজিত করিয়া বিদ্বেষভাবে পরিপুষ্ট করিতে লাগিল। এক দিন কতিপয় কনিকা বংশীয় ইহুদী ইন্দ্রিয়-পরবশ হইয়া একজন মোসলমান-কিশোরীর লজ্জাশীলতার ব্যাঘাত করিল। মোহাম্মদ ইহাতে উত্যক্ত হইয়া তাহাদিগকে এসলাম ধর্ম্মগ্রহণ করিতে অথবা অঙ্গনা পরিত্যাগ করিয়া যাইতে আদেশ করিলেন। তাহারা মোহাম্মদের আদেশ অবহেলা করিয়া আপনাদের দুর্গ মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিল। মোহাম্মদ সসৈন্যে তাহাদের দুর্গ পরিবেষ্টন করিলেন। পঞ্চদশ অহোরাত্রি ব্যাপী অবরোধের পর তাহারা তাঁহার হস্তে আত্ম সমর্পণ করিল। তিনি তাহাদিগকে ক্ষমা করিলেন, তাহারা (সাতশত) স্ব স্ব অস্ত্র শস্ত্র মোসলমানদের হস্তে পরিত্যাগ পূর্ব্বক সিরিয়া রাজ্যে প্রস্থান করিল।

কোরেশরা মোসলমানদের হস্তে দুইবার পরাজিত হইয়া কিছু কালের জন্য নীরব হইয়াছিল, কিন্তু মোহাম্মদকে ধ্বংস করিবার সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়াছিল না। তৃতীয় হিজিরীতে তাহারা পুনরায় মোহাম্মদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া তিন সহস্র সৈন্য সমভিব্যাহারে মদিনার অভিমুখে ধাবিত হইল। এই বিপুল বাহিনী দশম দিনে মদিনার অদূরবর্ত্তী (৩ মাইল) ওহদ পর্ব্বত শৃঙ্গে আসিয়া পৌছিল। মোহাম্মদ এক সহস্র মোসলমান সৈন্য লইয়া শত্রুর গতিরোধ করিতে আগমন করিলেন। ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। মোসলমানগণ শত্রুসৈন্যের অস্ত্রাঘাতে দলে দলে প্রাণ পরিত্যাগ করিতে লাগিল। স্বয়ং মোহাম্মদ অত্যন্ত আঘাত পাইলেন। বিজয়শ্রী কোরেশদের অঙ্কশায়িনী হইলেন। কিন্তু এই বিজয়শ্রী লাভ করিতে তাহাদের বহু সংখ্যক বীরপুরুষ শত্রুহস্তে প্রাণ পরিত্যাগ করে। ইহাতে কোরেশ-সৈন্য দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। এজন্য তাহারা জয়লাভ সত্ত্বেও মদিনা আক্রমণ না করিয়াই মক্কায় প্রস্থান করিল। (১)

---

(১) সাত শত ইহুদির মদিনা পরিত্যাগের পর এবং উহাদের যুদ্ধের পূর্ব্বে মোসলমানগণ তিনবার যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিল। আমরা গিরিশ বাবুর গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া এই অভিযান বিবরণ প্রদান করিতেছি। কর করতোল কদর নামক স্থানের কতিপয় লোক মোহাম্মদের বিরুদ্ধে দলবদ্ধ হইয়াছে, এই সংবাদে শুনিয়া দুই শত মোসলমান সৈন্য যুদ্ধযাত্রা করে। কিন্তু নির্দ্দিষ্ট স্থানে কোন শত্রু না দেখিয়া তাহারা ফিরিয়া আইসে। মোহাম্মদ নিজে এই সৈন্যদলের সঙ্গে ছিলেন। সালবা ও মহাতেল কুলের কতিপয় লোক দলবদ্ধ

কোরেশরা মক্কায় প্রত্যাবৃত্ত হইয়া মদিনা আক্রমণ না করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হওয়ার জন্য অনুশোচনা করিতে আরম্ভ করিল। এজন্য তাহারা অচিরে যুদ্ধায়োজনে প্রবৃত্ত হইল। এই সংবাদ মদিনায় পৌঁছিলে মোহাম্মদ মোসলমানের প্রতাপ প্রদর্শন করিয়া শত্রুকুলের মনে ভয় উৎপাদন পূর্ব্বক তাহাদিগকে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত করিতে মনন করিলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি সসৈন্যে মদিনা পরিত্যাগ করিয়া হমরাল আসাদ নামক স্থানে আসিয়া শিবির সংস্থাপন করিলেন। কোরেশরা এই সংবাদ অবগত হইয়া স্তম্ভিত হইয়া পড়িল এবং সমস্ত যুদ্ধায়োজন পরিত্যাগ করিল। মোহাম্মদ সসৈন্যে মদিনায় ফিরিয়া গেলেন।

ইহার পর (হিজিরী চতুর্থ অব্দে) মোহাম্মদ ইহুদিদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হন। (১) আবুরা নামক একজন আরব অধিনেতা মদিনা হইতে চারি দিনের পথ দূরবর্ত্তী নাজেদ নামক স্থানে ধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্য মোসলমানদিগকে আহ্বান করিলেন। তদনুসারে মোহাম্মদ সত্তর জন মোসলমানকে তথায় প্রেরণ করিলেন। তত্রত্য অধিবাসীরা প্রেরিত মোসলমানদিগকে আবুরার অজ্ঞাতসারে আক্রমণ করিল। সমস্ত মোসলমান নিহত হইল। কেবলমাত্র আমরু প্রাণ রক্ষা করিয়া মদিনার অভিমুখে যাত্রা করিলেন। আমরু পথি মধ্যে দুইজন নাজেদ অধিবাসীকে নিদ্রিত অবস্থায় দেখিতে পাইলেন এবং প্রতিহিংসার বশবর্ত্তী হইয়া তাহাদিগকে তদবস্থাতেই বধ করিলেন। অতঃপর তিনি মদিনায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া মোহাম্মদের নিকট সমস্ত অবস্থা জ্ঞাপন

হইয়া মদিনার প্রান্তে তস্করবৃত্তি আরম্ভ করে। ইহাতে মোহাম্মদ তাহাদের বিরুদ্ধে সসৈন্যে যাত্রা করেন। এবারও বিরুদ্ধবাদীদের সঙ্গে মোসলমান সৈন্যের সাক্ষাৎ হইয়াছিল না। এই অভিযানের ফলে জব্বার নামক একব্যক্তি এসলামধর্ম্ম গ্রহণ করে। তুরস্কগামী একদল কোরেশ বণিককে আক্রমণ করিবার উদ্দেশ্যেই তৃতীয় অভিযান হইয়াছিল। এজন্য এক শত অশ্বারোহী সৈন্য প্রেরিত হয়। বণিকদল মোসলমান সৈন্য দেখিয়া পলায়ন করে। সৈন্যগণ পলায়িত বণিকদের পরিত্যক্ত অর্থাদি হস্তগত করিয়া মদিনায় প্রত্যাবর্ত্তন করে।

(১) চতুর্থ হিজিরীতে ইহুদিদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিবার পূর্ব্বে তলহা ও সলমা নামক দুইজন আরব অধিনেতা দলবদ্ধ হইয়া মদিনার পার্শ্ববর্ত্তী স্থান সমূহ লুণ্ঠন করিতে উদ্যত হওয়ায় মোসলমান সৈন্য যুদ্ধযাত্রা করে। শত্রুগণ তাহাদিগকে দেখিয়া ঘরবাড়ী ছাড়িয়া পলায়ন করে। মোসলমান সৈন্য তাহাদের সমস্ত সম্পত্তি হস্তগত করিয়া মদিনায় ফিরিয়া যায়।

করিলেন। মহাপুরুষ মোসলমানদের শোচনীয় মৃত্যুতে একান্ত মর্ম্মাহত হইলেন। পথিমধ্যে নিহত দুই ব্যক্তি তাঁহার নিকট অভয় প্রাপ্ত হইয়াছিল। এজন্য তিনি তাহাদের হত্যার সংবাদ শ্রবণ করিয়া আমরুকে তাহাদের হত্যার জন্য ক্ষতিপূরণ করিতে আদেশ করিলেন। নাজেদের অধিবাসীরা বনি নজিরবংশীয় ইহুদিদের সঙ্গে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ ছিল। মোহাম্মদের সঙ্গে বনিনজির বংশীয় ইহুদিদের সন্ধি ছিল। মোহাম্মদ ইহাদের অধিনেতার যোগে প্রাগুক্ত ক্ষতিপূরণের অর্থ নিহত ব্যক্তি দ্বয়ের উত্তরাধিকারীদিগকে প্রদান করিবার অভিপ্রায়ে তাহার গৃহে গমন করিলেন। বনি নজির বংশীয়গণ আন্তরিক বিদ্বেষের বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহাকে হত্যা করিবার জন্য আয়োজনে প্রবৃত্ত হইল। মোহাম্মদ এই বিষয় গোপনে অবগত হইয়া তাহাদের গ্রাম হইতে উদ্ধার পাইলেন। তিনি গৃহে গমন করিয়া তাহাদিগকে এসলামধর্ম্ম গ্রহণ অথবা মদিনা পরিত্যাগ করিতে আদেশ করিলেন। তাহারা কিয়ৎকাল প্রতিকূলাচরণ করিল। কিন্তু পরিশেষে গত্যন্তর না দেখিয়া অস্ত্র শস্ত্র ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত সম্পত্তি সঙ্গে লইয়া মদিনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক চলিয়া গেল।

বনিনজির বংশীয় ইহুদিদের নির্ব্বাসনের অল্প দিন পরেই অর্থাৎ পঞ্চম হিজিরীতে মোহাম্মদকে আবার অস্ত্রধারণ করিতে হইল। (১) লোহিত সাগরের অনতিদূরে মস্তলক বংশীয়দের বাস ছিল। হারেশ নামক একজন বীর পুরুষ তাহাদের অধিপতি ছিল। মস্তলকবংশীয়েরা কোরেশদের সঙ্গে সম্পর্কান্বিত এবং তাহাদের ন্যায় পৌত্তলিক ছিল। তাহারা পঞ্চম হিজিরীতে মোহাম্মদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে সমুদ্যত হয়। মোহাম্মদ এই সংবাদ

---

(১) বনি নজির বংশীয় ইহুদিদের নির্ব্বাসনের পরে এবং এই যুদ্ধের পূর্ব্বে মোসলমান সৈন্য দুইবার যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিল। আল্‌মার ওসালন কুলের লোকেরা মোহাম্মদের বিরুদ্ধে সৈন্য সংগ্রহ করিয়াছিল। একারণ তাহাদিগকে দমন করিতে সৈন্য প্রেরণ করা হয়। কিন্তু তাহারা মোসলমান সৈন্যের আগমনে লুক্কায়িত হয়। একারণ কোন যুদ্ধ হইয়াছিল না। ইহার অব্যবহিত পরেই দোমতল জন্দান নামক স্থানে মোহাম্মদ সসৈন্যে গমন করেন। এই স্থানে খোর্ম্মা ও যবের আমদানী হইত। এই স্থানের কতকগুলি দুষ্টলোক দলবদ্ধ হইয়া বিদেশীয়দের প্রতি অত্যাচার করিত। মোহাম্মদ তাহাদিগকে দমন করিবার জন্যই সসৈন্যে অভিযান করেন। কিন্তু শত্রুকুল তাঁহার আগমন সংবাদ শুনিয়াই পলায়ন করে। মোসলমান সৈন্য বিনা যুদ্ধে মদিনায় ফিরিয়া যায়।

অবগত হইয়া সসৈন্যে তাহাদের আবাসভূমিতে উপনীত হইলেন। মস্ত-লকেরা মোসলমান সৈন্যের গতিরোধ জন্য আগমন করিল। উভয় সৈন্য পরস্পরের সম্মুখবর্ত্তী হইলে ওমর উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "এসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ কর, তোমাদের জীবন ও ধর্ম্মসম্পত্তি রক্ষা পাইবে।" তাহারা অস্বীকার করিল। তখন মোসলমান সৈন্য তাহাদিগকে আক্রমণ করিল। তাহাদের প্রবল আক্রমণে মস্তলকেরা পরাজিত হইল। মোসলমান সৈন্য বিজয়োল্লাসে মদিনায় প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

মোহাম্মদ মস্তলকের যুদ্ধ হইতে মদিনায় প্রত্যাবৃত্ত হইয়াই অভিনব বিপদে পতিত হইলেন। তাঁহার প্রত্যাগমনের অল্পদিন পরেই দশ সহস্র কোরেশ সৈন্য মদিনা বিধ্বস্ত করিবার জন্য মক্কা হইতে বহির্গত হইল। করিজাবংশীয় ইহুদিরা তাহাদের সঙ্গে যোগ দিয়া মোহাম্মদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণা করিল। মোহাম্মদ শত্রুর গতিরোধ জন্য তিন সহস্র সৈন্য সহ মদিনার অদূরবর্ত্তী যালা পর্ব্বতের পাদদেশে উপনীত হইলেন। শত্রুসৈন্য আসিয়া মোসলমান সৈন্যের সম্মুখে শিবির সংস্থাপন করিল। প্রথম দিনের যুদ্ধে আলী ওমর নামক একজন কৃতান্ত সদৃশ প্রবলপরাক্রান্ত বীরপুরুষকে দ্বৈরথ যুদ্ধে হত্যা করিলেন। ক্রমাগত যুদ্ধ চলিতে লাগিল। এই যুদ্ধকালে নসির নামক একজন কোরেশ গোপনে এসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া মোহাম্ম-দের শরণাগত হইল। তাহার চক্রান্তে করিজা ও কোরেশ সৈন্যের মধ্যে ভেদ উপস্থিত হইয়া নানা প্রকার গোলযোগের সৃষ্টি করিল। তাহারা ভীত হইয়া পড়িল। যুদ্ধ স্থান পরিত্যাগের কল্পনা তাহাদের মনে উত্থিত হইল। তাহাদের ঈদৃশ মানসিক অবস্থার সময় দুরন্ত ঝটিকা উপস্থিত হইয়া তাহাদের সমস্ত শিবির বিশৃঙ্খল ও বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিল। তাহারা এই ঘটনায় ভীতি বিহ্বল হইয়া পলায়ন করিল। যালা পর্ব্বতের পাদদেশে মোসলমান সৈন্যকে এই ঝটিকায় ঊনত্রিশ দিন অবস্থান করিতে হইয়াছিল। এই সময় মধ্যে দুরন্ত শীত এবং খাদ্যাভাব নিবন্ধন তাহাদের কষ্টের একশেষ হইয়াছিল। মোহাম্মদকে এই যুদ্ধে যেরূপ কষ্টভোগ ও পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল, অন্য কোন যুদ্ধে সেরূপ হয় নাই।

মোহাম্মদ মদিনায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াই করিজা ইহুদিদের বাসস্থান অব-রোধ করিলেন। তাহারা পঞ্চবিংশতি দিন ব্যাপী অবরোধের পর আত্ম সমর্পণ পূর্ব্বক জীবন ভিক্ষা করিয়া নির্ব্বাসন দণ্ড প্রার্থনা করিল। মোহাম্মদ

তাহাদের প্রার্থনা গ্রাহ্য করিলেন না; কিন্তু তাহারা তাহাতে নিরাশ না হইয়া পুনঃ পুনঃ কাকুতি মিনতি করিতে লাগিল। সাদ নামক মোহাম্মদের এক জন প্রধান শিষ্য করিজা ইহুদিদের বন্ধু বলিয়া খ্যাত ছিলেন। মোহাম্মদ তাঁহার হস্তে তাহাদের বিচার ভার অর্পণ করিলেন। ইহাতে তাহারা সন্তুষ্ট হইল। কিন্তু সাদের নৃশংস বিচারে পুরুষদিগের প্রাণদণ্ড এবং রমণী ও বালকদের দাসত্ব বিধান হইল। সাদ প্রাগুক্ত যুদ্ধে অত্যন্ত আহত হন, এ জন্যই তিনি করিজাদের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া তাদৃশ কঠোর ব্যবস্থা করিয়াছিলেন বলিয়া ইতিহাসে লেখকগণ উল্লেখ করিয়াছেন।

করিজা ইহুদিদের নির্ব্বাসনের পর মোহাম্মদ এক বার জন্মভূমি মক্কা দর্শন করিবার জন্য আগ্রহান্বিত হইলেন। (১) তিনি পুণ্যমাসে (জেলকাদ মাসের প্রথম সোমবার) ছয় শত মোসলমান সৈন্য সমভিব্যাহারে নিরস্ত্র হইয়া মক্কা যাত্রা করিলেন। কোরেশরা এই সংবাদ অবগত হইয়া তাঁহার গতিরোধ করিবার জন্য সৈন্য প্রেরণ করিল। মোহাম্মদ তাহাদের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। কোরেশরা তাঁহার দূতকে অবজ্ঞা করিয়া ফিরাইয়া দিল। নির্ব্বিবাদে মক্কা দর্শন করিয়া মদিনায় প্রত্যাবর্ত্তন করাই মোহাম্মদের ইচ্ছা ছিল। এ কারণ তিনি পুনর্ব্বার দূত প্রেরণ করিলেন। বহু আন্দোলনের পর দশ বৎসরের জন্য সন্ধি স্থাপিত হইল। মোসলমান এবং কোরেশ কেহই দশ বৎসরের জন্য কাহারও বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিবে না, প্রতিশ্রুত ছিল। মোহাম্মদ মক্কায় প্রবেশ না করিয়াই মদিনায় প্রত্যাবর্ত্তন করিতে স্বীকৃত হইলেন এবং কোরেশরা পর বৎসর তাঁহাকে সশিষ্যে কোষবদ্ধ তর-

---

(১) করিজা ইহুদিদের হত্যার পর এবং মোহাম্মদের মক্কা যাত্রার পূর্ব্বে মোসলমান সৈন্য পাঁচটা ক্ষুদ্র অভিযান করিয়াছিল। আমরা গিরিশ বাবুর গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া এই সকল অভিযানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করিতেছি। (১) সয়ফলকার অভিযান, কোন যুদ্ধ হইয়াছিল না। (২) মদিনার নিকটবর্ত্তী কোন স্থানের অধিবাসীরা দুইজন মোসলমানকে হত্যা করিয়াছিল। মোহাম্মদ তাহাদিগকে প্রতিফল দিবার জন্য সৈন্য প্রেরণ করেন। তাহাদের আগমনে অধিবাসীরা পলায়ন করে। মোসলমান সৈন্য বিনা যুদ্ধে ফিরিয়া যায়। (৪) মোহাম্মদ ফদকের সাদ বংশীয়দের বিরুদ্ধে মহাবীর আলীকে প্রেরণ করেন। আলী যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া মদিনায় প্রত্যাবৃত্ত হন। (৫) কতিপয় তস্কর মোহাম্মদের দুইটী উষ্ট্র অপহরণ করায় মদিনার বহির্ভাগে একটী যুদ্ধ হয়। তস্করেরা মোসলমান সৈন্যের অস্ত্রাঘাত সহ্য করিতে না পারিয়া পলায়ন করে।

বারি লইয়া তিন দিন মক্কায় যাপন করিতে দিতে অঙ্গীকার করিল। মোসলমানগণ মক্কায় ফিরিয়া আসিল। এই সন্ধির নাম হোদয়বিয়ার সন্ধি।

মোহাম্মদ মদিনায় ফিরিয়া আসিয়া খয়বারের ইহুদিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিলেন। খয়বারের ইহুদিরা অত্যন্ত পরাক্রমশালী ছিল। তাহারা মোসলমানদের উচ্ছেদ সাধনার্থ যুদ্ধের আয়োজনে প্রবৃত্ত ছিল। মোহাম্মদ এ জন্যই তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিলেন। মোসলমানগণ খয়বার আক্রমণ করিলে ইহুদিরা প্রবল পরাক্রমে যুদ্ধ করিতে লাগিল। কিন্তু আলীর নেতৃত্বাধীনে মোসলমানসৈন্য তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া খয়বার অধিকার করিল। ইহার পর মোহাম্মদ ফদক এবং ওয়াদি উল করার ইহুদিদিগকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া মদিনায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। (৭ম হিজিরী।)

মোহাম্মদ মদিনায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া হোদয়বিয়ার সন্ধির নির্দ্দিষ্ট সময় মত দুই সহস্র শিষ্য সমভিব্যাহারে মক্কা গমন করিলেন। কোরেশরা তাঁহার আগমনে মক্কা পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিল। (ক্রমশঃ)

ঊষা।

[ঊষা, বাণরাজার দুহিতা; অনিরুদ্ধ, শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র, এবং কামদেবের পুত্র। চিত্রলেখা, ঊষার সখী। ইনি স্বপ্নে অনিরুদ্ধকে দেখিয়া চিত্রলেখাকে তাঁহার উদ্দেশে প্রেরণ করিয়াছিলেন]

(১)

কেন গো সজনি রজনী পোহায়
ভাঙ্গিয়া সুখের স্বপ্ন ?
কোথা সে আমার পুরুষ সুজন
রমণী জীবন রত্ন ?
রুদ্ধ ভবনে কেমনে না জানি,
উদিল গো অনিরুদ্ধ,
হরিয়া পরাণ করিল আমায়
হৃদয়-প্রণয়লুব্ধ।

সঙ্গীত রস -মগ্ন নয়ন
প্রেমভরে করে নৃত্য ;
সঙ্গম সুখ- -মদিরা অধরে
পাগল করিল চিত্ত।
কুসুম গঠিত দেহ মনোহর
বিথারিল ফুল গন্ধ ;
সুখের নেশায় আবদ্ধ করিয়া
উদিল হৃদয়ানন্দ।

(২)

ললিত পরশে লুলিত অঙ্গ,
লালসা জাগিল অন্তরে ;
শিথিল হইল কঞ্চুক মম
খসিল নীবীর বন্ধরে।
নিশ্বাসে তার বিশ্বাস সখি
বিচরিল আসি বক্ষে ;
মোহন দৃশ্যে নবীন বিশ্ব
ভাতিল আমার চক্ষে।
উথলিল হিয়া আবেগে অধীর,
আলসে মানসভ্রান্ত ;
মুদিয়া নয়ন বদন হেরিনু
মদনমোহন কান্ত।
নিশার স্বপ্ন প্রভাতে পালায়!
জীবন স্বপ্ন নহে কি ?
সুখ যাতনায় আসেরে মরণ ;
সুখের জীবন রহে কি ?
এসুখ নিশায় আঁধার বাড়িবে
ক্ষণিকের সুখ স্বপনে ;
যাবে গো জীবন যৌবন সখি,
নিজনে বিরহ রোদনে।

(৪)

যে সুধার লাগি যুবতি-হৃদয়
তৃষায় কাতর নিত্য,
কেন রে বিধাতা পুরুষের তনু
করিলে সে সুধাসিক্ত ?
পুরুষ-পরশ রমণীর প্রাণে
হরষ, জীবন, দীপ্তি ;
পুরুষ সঙ্গে রচিল বিধাতা
কামিনীর সুখতৃপ্তি।

(৫)

আঁধার ভাসিছে নয়নে আমার,
কোথা গেল বল কান্ত ?
যাও সখি যাও আন গো ডাকিয়া,
করহ হৃদয় শান্ত।
তেজি সুরপুরী মদনানন্দ
যদি না আসিতে চাহে,
অভাগী উষার প্রেম নিবেদন
জানায়ো যতনে তাহে।
নবীন মদন- -ভবন হেথায়
দুজনা বসিয়া গড়িব ;
যৌবন-মধু বিতরি তাহায়
হৃদয় স্নিগ্ধ করিব।

শ্রীবিজয় চন্দ্র মজুমদার।

শ্রীক্ষেত্রে গুণ্ডিচাবাটী ও বর্‌দাণ্ড।

ভারতবর্ষের প্রত্যেক বিভাগের লোকেই শ্রীক্ষেত্রে যাইয়া থাকেন, এবং সাত আট দিবশ মাত্র সে স্থানে অবস্থান করিয়া পুনরায় স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন। প্রকৃত পক্ষে বহু দিবস বাস না করিলে জগন্নাথের সুরম্য পুরীর এবং সৌন্দর্য্যময়ী শ্রীক্ষেত্রের কোনরূপ সৌন্দর্য্য কাহারও নয়নগোচর

করিবার অবসর হয় না। জগন্নাথের পুরীর মধ্যে প্রায় দেড় লক্ষ দেব দেবীর মূর্ত্তি স্থিত আছে। এই সুবৃহৎ পুরী যেমন সর্ব্বদা ভীষণ কোলাহলে পরিপূর্ণ থাকে, তেমনি ইহার স্থানে স্থানে আবার স্তব্ধ শান্তিও বিরাজমান দেখিতে পাওয়া যায়।

কোন কোন মন্দির হইতে নর্দ্দামা দ্বারা নির্ঝরিণীর ন্যায় চরণামৃত প্রবাহিত হইতেছে, স্থানে স্থানে নির্ম্মাল্য গুলি স্তবকে স্তবকে নিপতিত রহিয়াছে, দুর্দ্দান্ত ষাঁড়গুলি তাহা ভক্ষণ করিতে আসিয়া সেই মধুর নীরবতা ভগ্ন করিতেছে। এই সব শান্তিময়ী স্থানে আগমন করিলে মানব ক্ষণকালের জন্যও শোক দুঃখের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করে। হিন্দু গ্রন্থে এমন দেব দেবীর নাম শ্রুত হওয়া যায় না, যাহা জগন্নাথের পুরীতে নাই। একদিকে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর; অপর দিকে লক্ষ্মী, ভুবনেশ্বরী ও বিমলা প্রভুর প্রসাদ লাভের জন্যই পুরীতে বিরাজমান রহিয়াছেন—জনশ্রুতিতে এইরূপ প্রকাশ।

এক মাস যদি প্রত্যহ দুই বেলা পুরী প্রদক্ষিণ করা যায়, তথাপি পুরীর নূতনত্ব শেষ হয় না। এইরূপ নিয়মেই যদি দেবদেবী মূর্ত্তি দর্শন করিয়া বেড়ান যায়, তথাপি দেব দেবীর মূর্ত্তি দর্শন করিয়া ইয়ত্তা করা যায় না। শতবার দর্শন কর, সহস্রবার দর্শন কর, কিন্তু ইহার পর দর্শনে গেলেই দেখিবে পাণ্ডা, এক নূতন স্থানে লইয়া গিয়া নূতন মূর্ত্তি দেখাইতেছে। অনেক সময় চক্ষে ধাঁধাঁ লাগে, মন বিস্ময়াবিষ্ট হয়।

ক্রিয়া উৎসবের শেষ নাই। আজ এক রূপ কাল অন্যরূপ। প্রভাতে এক, প্রদোষে এক। নিত্য নূতন। পুরীর অভ্যন্তরেই "আনন্দবাজার," এস্থানে ভোগবস্তু সকল ক্রয় বিক্রয় হয়। স্থানটী ক্রেতা বিক্রেতায় সর্ব্বদা পূর্ণ থাকে। নামের সঙ্গে স্থানের অনেক ঐক্য দেখা যায়। "আনন্দবাজার" প্রকৃতই "আনন্দবাজার।" "আনন্দবাজারের" ভোগ ক্রয় বিক্রয় প্রথা বহুদিন পূর্ব্বে "বামাবোধিনী"তে "চন্দনতলার চাপ" নামক প্রবন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিবৃত করিয়াছিলাম। অতএব এস্থলে সে সব বিষয়ের পুনরুল্লেখ আর প্রয়োজন মনে করিলাম না। অপর শ্রীক্ষেত্রে অনেকগুলি "মঠ' দেখিতে পাওয়া যায়। "মঠ" গুলি জগন্নাথের অতি উপাদেয় সৃষ্টি বলিয়া বিবেচিত হয়, এসব "মঠ" চিরকাল রীতিমত দেবপূজার ভার বহন করে এবং সাধু সন্ন্যাসীতে পূর্ণ থাকে। ধনী মোহন্তগণ এই সব "মঠে"র সম্পূর্ণ ব্যয় বহন করিতে বাধ্য। এবং "মঠে" প্রত্যহ বহু বহু লোকের জীবিকা নির্ব্বাহ হয়। সময়

সময় এই ভোগাংশ সহরের সমুদয় বড় বড় লোকদিগের গৃহে প্রেরিত হয়। এইরূপ নিয়ম প্রত্যেক মঠেই প্রচলিত আছে।

প্রত্যেক "মঠ"ই এক একটী শ্রুতিমধুর নামে খ্যাত। সহরের এক এক অংশ একটি পাড়ায় বিভক্ত। এই পাড়া গুলিকে আবার এক একটি নাম দেওয়া হইয়াছে,—যথা যে পাড়ায় "রামচণ্ডী" দেবী স্থিতা আছেন, সে পাড়ার নাম "রামচণ্ডি-সাই"; যে পাড়ায় "মার্কণ্ড পুকুর" সে পাড়ার নাম "মার্কণ্ড-সাই" ইত্যাদি।

"গুণ্ডিচাবাটী" জগন্নাথের পুরীর একটি অন্যতম পুরী। ইহা সু-বৃহৎ ও সু-প্রশস্ত। ইহার আকার অবয়বও অনেকটা জগন্নাথের পুরীর ন্যায়। পাকশালা, রন্ধন-প্রণালী ও তদনুরূপ "মণিকোঠা" "রত্নবেদী"র গঠন একরূপ হইলেও পুরীর "মণিকোঠা" ও রত্নবেদীর গঠনের ন্যায় ইহাতে পারিপাট্য দৃষ্ট নয় না।

"গুণ্ডিচাবাটী" চর্ম্মচটিকার আবাসভূমি এবং নির্জ্জনতার জীবন্ত মূর্ত্তি, কচিৎ দর্শনেচ্ছুক যাত্রীগণ দ্বারা এই নির্জ্জনতা ভগ্ন হইতে দেখা যায়।

"ইন্দ্রদ্যুম্ন" পুকুরের অনতিদূরেই বিস্তীর্ণ ভূমি অধিকার করিয়া এই বিশালকায় বাটী দণ্ডায়মান রহিয়াছে। ইহার ভিতরেও দেবদেবী মূর্ত্তির অভাব নাই।

পুরীর ন্যায় "গুণ্ডীচাবাটী"র চারিদিকও কুৎসিৎচিত্রে পূর্ণ। প্রয়োজনীয় কাজকর্ম্মের জন্য এখানে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ইঁদারা খোদিত করা হইয়াছে। বাটীর ভিতরে প্রবেশ দ্বার দুইটি। সমস্ত বৎসর পর রথযাত্রার সময় জগন্নাথের পুরীর ন্যায় "গুণ্ডিচাবাটী"ও অতুল সৌন্দর্য্যশালিনী এবং জনমানবে পূর্ণ হয়।

জগন্নাথ রথারোহণপূর্ব্বক এই "গুণ্ডিচাবাটী"তে আগমন করেন এবং "মণিকোঠা"য় প্রবেশকরতঃ রত্নাসনাসীন হন। পথি মধ্যে জগন্নাথের রথ জগন্নাথের মাসীর বাটীতে মুহূর্ত্তকালের জন্য দণ্ডায়মান হয়, কথিত আছে। সেই মুহূর্ত্তে মাসী তাঁহাকে ক্ষুদের পিষ্টক খাওয়াইয়া দেন। জগন্নাথের মাসী একখানি দেবী-প্রতিমা, ক্ষুদের পিষ্টক দ্বারা ইঁহার ভোগ ক্রিয়া সাধিত হয়। জগন্নাথের রথের সঙ্গে সঙ্গেই পুরীর দোকান পাট সব উঠিয়া "গুণ্ডিচাবাটী"তে আগমন করে। "গুণ্ডিচাবাটী"তে মহা আনন্দ উৎসব আরম্ভ হয়। পুরী কদাচিৎ নীরবতায় পূর্ণ হয়। জনশ্রুতি এইরূপ প্রকাশ করে, জগন্নাথ "রত্ন-

যাত্রায় শ্বশুরালয় গমন করিয়া থাকেন।" কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ মিথ্যা, কারণ সমুদ্রই জগন্নাথের শ্বশুর বলিয়া বিখ্যাত; কেননা নারায়ণের প্রিয় পত্নী লক্ষ্মী মাতা সমুদ্রোদ্ভবা, একথা জগজ্জনবিদিত এবং সর্ব্ববাদীসম্মত। "জগন্নাথমাহাত্ম্যে" "গুণ্ডিচাবাটী"কে জগন্নাথের প্রমোদ গৃহ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। ইন্দ্রদ্যুম্নে গুণ্ডিচাবাটী অবস্থিত। শ্রীক্ষেত্রে এখনো "ইন্দ্রদ্যুম্ন" রাজার একটী বিশাল বাটী আছে, এরূপ প্রবাদ শ্রুত হওয়া যায়। কিন্তু তাহা সত্য নয়। "ইন্দ্রদ্যুম্ন'' রাজার স্বতন্ত্র একটা বাটী নাই। "ইন্দ্রদ্যুম্ন" নামে একটি বৃহৎ সরোবর আছে মাত্র। তাহা সহর হইতে বহু দূর ব্যবধান।

যে পথে জগন্নাথের রথ "গুণ্ডিচাবাটী'' যায় এবং পুনরায় পুরীতে প্রত্যাগমন করে, সেই পথের নাম "বর্দাণ্ড''। বর্দাণ্ডের প্রশস্ততা অনুমান ১৫-২০ হাতের ন্যূন হইবে না। দুই ধারে ক্ষুদ্র অথচ সুসজ্জিত বিপণিগুলি "বর্দাণ্ডের'' সমধিক শোভা বর্দ্ধন করিতেছে। "বর্দাণ্ডের অন্য শাখা প্রশাখা নাই। "বর্দাণ্ড'' আপনার নামে আপনি বড়।

যখন ঘর্ঘর শব্দে জগন্নাথের বৃহৎ রথ "বর্দাণ্ডের'' প্রশস্থ বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া ইন্দ্রদ্যুম্নাভিমুখে যাত্রা করে, তখন অগণ্য জনস্রোত জলস্রোতের ন্যায় শতমুখী হইয়া কল কল শব্দে দিক্‌দিগন্ত মুখরিত করিয়া তোলে। এই জনস্রোত বর্দাণ্ডকে অধিক শোভায় সজ্জিত করে। বর্দাণ্ডের নির্জ্জনতা অতি বিরল, যাত্রী পদভরে বর্দাণ্ড সর্ব্বদা টলটলায়মান।

শ্রীঅম্বুজা সুন্দরী দাস।

ঐতিহাসিক যৎকিঞ্চিৎ।

পালিভাষায় লিখিত বৌদ্ধগ্রন্থ "মহাবংশ" আলোচনা করিলে ভারতবর্ষের পৌরাণিক খবর কিছু প্রাপ্ত হওয়া যায়। ভারতীয় পুরাতত্ত্বের আলোচনায় সুফল ফলিবার সম্ভাবনা। ইহাতে জাতীয়গৌরব এবং অতীত স্মৃতি উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে। একারণ আজ আরতির পাঠকগণের সম্মুখে একটী ঐতিহাসিক প্রস্তাব উত্থাপন করিতেছি।

খৃষ্ট পূর্ব্বে ৫৪৩ অব্দে বিজয়শর নামক বঙ্গদেশের এক রাজকুমার সাত

শত অনুচর সমভিব্যাহারে তাম্রপর্ণীতে (লঙ্কায়) পদার্পণ করেন এবং সে স্থানের অধিবাসীদিগকে বিধ্বস্ত করিয়া এক রাজ্য স্থাপন করেন। তথায় তাঁহার উত্তরাধিগণ ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন।

বিজয়শূর লালারাজ্যের রাজধানী সিহাপুরের প্রতিষ্ঠাতা সিহাবহুর জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন। "সিহাপুর" অথবা "সিংহাপুর" বোধ হয় বর্ত্তমান "সিংভূম"। সিহাপুর বঙ্গ এবং মগধের মধ্যবর্ত্তী—লালা নামক রাজ্যের রাজধানী ছিল। বিজয়শূরের পিতা শিহাবহু এই রাজ্যের অধিপতি ছিলেন। বঙ্গদেশে সিহা বহুর জন্ম-বিবরণ অলৌকিক ঘটনায় পরিপূর্ণ। বঙ্গদেশে পূর্ব্বে একজন নরপতি ছিলেন। কলিঙ্গ-রাজ-দুহিতা এই বঙ্গনরপতির প্রধানা মহিষী ছিলেন।

"ঐ রাণীর গর্ভে রাজার সুপ্রাধীর নামে এক কন্যা জন্মে। * * * একদা রাজকুমারী ছদ্মবেশে এবং অরক্ষিত অবস্থায় মগধ রাজ্যে গমন করিতেছিলেন। মরুভূমি অতিক্রম করিয়া তাঁহার অনুচরবর্গ ঘটনাচক্রে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে।

লালা রাজ্যের প্রান্তরে রাজকুমারীর সঙ্গীকে এক সিংহ তাড়া করে। যে দিক হইতে সিংহ আসিতেছিল, রাজকুমারী সেই দিকেই পলাইতে লাগিলেন। * * * রাজকুমারী সিংহের সহিত একত্রে বাস করিতে লাগিলেন এবং কিছু দিন পর যমজ সন্তান প্রসব করেন। তন্মধ্যে একটী পুত্র ও অপরটী কন্যা। এই পুত্রের নাম সিহাবহু এবং কন্যার নাম সিহাশিবা। পুত্র কন্যা বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে রাজকুমারী তাহাদিগকে লইয়া সিংহশিবির হইতে পলায়ন করেন। সিংহ তাহাদের অদর্শনে ব্যথিত ও কুপিত হইয়া সমস্ত বঙ্গে উৎপীড়ন করিতে আরম্ভ করে। কিন্তু অচিরেই সে সিহাবহুর হস্তে প্রাণ বিসর্জ্জন করে। বঙ্গাধিপতি ইহাতে সন্তুষ্ট হইয়া সিহাবহুকে অর্দ্ধেক রাজ্য ছাড়িয়া দেন। বঙ্গাধিপতির মৃত্যুর পর সিহাবহু সমস্ত বঙ্গরাজ্য অধিকার করেন। কিন্তু অল্পদিন পরেই বঙ্গরাজ্য তাহার পিতা অনুরাকে (সিংহের কবল হইতে উদ্ধার পাইয়া তাঁহার মাতা যাহাকে বিবাহ করিয়াছিলেন) অর্পণ করিয়া লালা প্রদেশে গমন পূর্ব্বক সিহাপুর রাজধানী সংস্থাপন করেন।" শত যোজন বিস্তৃত লালারাজ্য পূর্ব্বে বঙ্গদেশ এবং পশ্চিমে মগধের মধ্যে অবস্থিত ছিল।

এই প্রবাদ গল্প হইতে জানা যায় যে, 'সিংহ' অথবা 'শূর' উপাধিধারী

সিংহবহু—খৃষ্টের জন্মের ছয় সাত বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গ এবং মগধের মধ্যবর্ত্তী স্থানে একটী নূতন রাজ্য স্থাপন করেন। (১)

তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র বিজয় সিংহপুরের নিকটবর্ত্তী শত যোজন পরিমিত গহন কানন পরিষ্কার করিয়া মানবের বাসের উপযুক্ত করেন এবং প্রজাগণের ব্যবহারের জন্য বহু জলাশয় প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে পিতা কর্ত্তৃক যৌব-রাজ্যে অভিষিক্ত হন। কিন্তু অচিরেই তাহার চরিত্র বিকৃত হয় এবং বহু কুসঙ্গী আসিয়া তাহাকে পরিবেষ্টন করে। রাজা পুত্রের অনুচরদিগকে তিরস্কার করিয়া তাহাকে সাবধান করিয়া দিলেন। বিজয় বহু দিন শান্তভাবে থাকিলেন; তার পর পুনর্ব্বার পূর্ব্বের ন্যায় অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিল। প্রজাগণ রাজার নিকট অভিযোগ করিল। রাজা এবারও পুত্রকে সতর্ক করিয়া দিলেন। কিন্তু বিজয় পিতৃবাক্য অবহেলা করিয়া পূর্ব্ববৎ প্রজাপীড়ন করিতে লাগিলেন। প্রজাগণ অতিশয় উত্যক্ত হইয়া উঠিল এবং তাহারা রাজাকে বলিল, আপনার পুত্রকে হত্যা করুন; নচেৎ আমরা নিজেরাই ইহার প্রতিবিধান করিব। রাজা, প্রজার কাতর বাক্যে বিচলিত হইয়া, ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য; পুত্র ও তদীয় সাতশত অনুচরকে মস্তক অর্দ্ধ মুণ্ডন করিয়া এক খানি অর্ণবপোতে ভাসাইয়া দিলেন। যে দিবস নগরে শালবৃক্ষ তলে শাক্য সিংহ তপস্যাবলে নির্ব্বাণ লাভ করেন, সেই দিবস তাঁহারা লঙ্কার তাম্রপর্ণীতে অবতরণ করেন।

বিজয় পিতা কর্ত্তৃক নির্ব্বাসিত হইয়া, লঙ্কার যে ভাগে অবতরণ করেন, তাহার অধিবাসীদিগকে লোকে যক্ষ বলিত। রামায়ণে যক্ষ রাক্ষস সম্বন্ধে যে সকল ঘটনা বিবৃত হইয়াছে, মহাবংশে তাহার কিছুরই উল্লেখ নাই। সুতরাং উহাদের সহিত এই যক্ষের কোন সংস্রব ছিল কি না, তাহা জানি না।

যে স্থানে বিজয় তাঁহার অনুচরগণসহ অবতরণ করেন, সেই স্থানের নাম পরে জম্বপানি হয়। মহাবংশে লিখিত আছে, যৎকালে সপ্তশত অনুচর সহ রাজা ক্ষুৎপিপাসায় পরিশ্রান্ত ও জীর্ণ শীর্ণ হইয়া জাহাজ হইতে অবতরণ করিয়াছিলেন, তৎকালে তাঁহারা এতই দুর্ব্বল হইয়াছিলেন যে, মাটীতে ভর করিয়া তাহাদিগকে অগ্রসর হইতে হইয়াছিল। কিন্তু এ ভাবে তাহারা বেশীদূর অগ্রসর হইতে পারিয়াছিলেন না। এই ঘটনা হইতে ঐ স্থানের নাম জম্বপানি হয় এবং পরে ঐ নামেই প্রসিদ্ধি লাভ করে।

---

(১) এই বিবরণ "মহাবংশ" হইতে সঙ্কলিত হইল।

ইহার আর একটী নাম "সিহাল" (সিংহল)। মহাবংশে দেখিতে পাওয়া যায়, সিহাবহু সিংহকে নিহত করিয়াছিলেন, এ জন্য তাঁহার সন্তানগণ "সিহাল (সিংহহন্তা) উপাধিতে বিভূষিত হন। সুতরাং লঙ্কা সিহাল কর্ত্তৃক অধিকৃত হওয়ায় "সিহাল (সিংহল)" নাম প্রাপ্ত হন।

কথিত আছে, এক বিবাহোৎসবে এক যক্ষিনীর সাহায্যে বিজয় যক্ষ-রাজকে নিহত করিয়া রাজা হন। বিজয় ও তাঁহার অনুচরবর্গের রাজ্য বিস্তার পক্ষে তত আগ্রহ ছিল না। অল্প দিবস মধ্যেই তাঁহার কতিপয় অনুচর স্ব স্ব নামে পৃথক্ পৃথক্ রাজ্য স্থাপন করেন। কদম্ব নদীর তীরে এক জন অনুচরের নামানুযায়ী বিখ্যাত নগর 'অনুরুদ্ধ' সংস্থাপিত হয়।

বিজয়ের অনুচরগণ নিজে নিজে রাজ্য সংস্থাপন করিলেও তাঁহাকেই তাহাদের অধিপতি মনোনীত করিলেন। কিন্তু তিনি সে প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেন। এই সময় বিজয় সিংহ অবিবাহিত ছিলেন। কতিপয় অনুচর তাঁহার বিবাহের পাত্রীর জন্য উত্তর মাদুরার রাজা পাণ্ডবের নিকট লোক প্রেরণ করে। তাহারা মাদুরায় উপস্থিত হইয়া, সঙ্গে যে সকল মূল্যবান উপঢৌকন ছিল, তাহা রাজাকে দিয়া বলিল,—"সিহাবহুর পুত্র বিজয় লঙ্কা জয় করিয়াছেন। আপনার কন্যাকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করুন।"

রাজা পাণ্ডব মন্ত্রীবৃন্দের সহিত পরামর্শ করিয়া তাঁহার কন্যাকে বিজয়ের জন্য এবং তদীয় সাত শত অনুচরের জন্য সাত শতটি স্ত্রীলোক পাঠাইয়া দিলেন।

বিজয়ের বিবাহ এবং রাজ্যাভিষেক সম্বন্ধে মহাবংশে এইরূপ লিখিত আছে,—"বিজয় তাঁহার পূর্ব্বের ভীষণ চরিত্র সংশোধন করিয়া সুনীতি এবং ন্যায়ানুমোদিত ভাবে সমগ্র লঙ্কা শাসন করেন। এবং নিরুদ্বেগে এবং নিরুৎপাতে ৩৮ বৎসর কাল তাম্রপর্ণীতে অবস্থান করিয়া রাজত্ব করেন।"

বিজয় নিঃসন্তান ছিলেন। এজন্য তিনি জীবনের অপরাহ্ন কালে রাজ্যের উত্তরাধিকারীর জন্য তাঁহার ভ্রাতা সুনিষ্টের নিকট দূত প্রেরণ করেন। সুনিষ্ট পৈতৃক রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার তিন পুত্র ছিল। তিনি কনিষ্ঠ পুত্র পাণ্ডু বসুদেবকে বিজয়ের উত্তরাধিকারী মনোনীত করিয়া লঙ্কায় পাঠাইয়া দেন। এখন কথা হইতে পারে, এই বিজয় কি ইতিহাস প্রসিদ্ধ ব্যক্তি? এই বিষয়ের মীমাংসার জন্য নিম্নলিখিত বিষয় কয়টি বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত।

(১) বিজয়সিংহ হইতে শেষ নরপতি পর্য্যন্ত—(যিনি ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে ইংরেজ রাজ কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছিলেন) ২৩৪১ বৎসরে সর্ব্বশুদ্ধ ১৭৪ জন রাজা সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই হিসাবে গড়ে ১৩ বৎসর পাঁচ মাস কয়েক দিন ধরিয়া এক একজন রাজার রাজত্ব কাল ধরিলে বোধ হয় অসঙ্গত বোধ হইবে না।

(২) মহাবংশে যে সকল ঘটনা বিবৃত হইয়াছে, তাহা প্রকৃত বলিয়া বিশ্বাস হয় এবং যে সময়ের মধ্যে ঐসকল ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে, তাহাতে অনৈক্য কিছুই দৃষ্ট হয় না।

(৩) জনপ্রবাদ এখন কাগজের পৃষ্ঠাগত হইয়াছে। লঙ্কার লিখিত কোন প্রাচীন ইতিবৃত্ত নাই, উহার ইতিহাস পরে সঙ্কলিত হয়। সিংহলী-দিগের প্রথম ইতিবৃত্ত পালী ভাষায় লিখিত হয়, তাহার নাম 'পিত্তাকর্থ' এবং তাহার টীকার নাম 'অট্টকর্থ'। ভট্ট গেমিন অভয় অথবা বালাগাম্বত্রিকের রাজত্ব সময়ে (৮৮—৭৬ খৃঃ পূঃ) উহা রচিত হয়। মহাবংশ ৪১২ খৃষ্টাব্দে আরম্ভ হইয়া ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে শেষ হয়। উহার সত্যতা সম্বন্ধে কোন সন্দেহের উদ্রেক হইতে পারে না। সিংহলের রাজাগণ চন্দ্র কিম্বা সূর্য্যবংশ হইতে উদ্ভূত হইয়াছিলেন কি না, তাহা জানা যায় না। তাঁহাদের আদিপুরুষের পিতা নানা রাজ্যে শত যোজন স্থানে রাজ্য বিস্তার করেন। আদিপুরুষ পিতা কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়া ভিক্ষুকের মত অনুচরগণসহ ঘুরিয়া বেড়ায়।

(৪) সিংহলী অব্দে বিজয় সেন রাজত্ব করিয়াছেন। তিনিই রাজ্য-প্রতিষ্ঠাতা এবং সিংহলী অব্দের প্রথম বৎসরে ইঁহাদের রাজত্বের প্রথম বৎসর।*

---

* এটা সিংহলী ২৪৪৫ অব্দ। বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণের বৎসর হইতে এই অব্দ আরম্ভ হয়। মহাবংশে লিখিত আছে, যে দিবস বুদ্ধ শালবৃক্ষ নিম্নে নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন, সেই দিবসই বিজয় লঙ্কায় পদার্পণ করেন। সিংহলী অব্দ অনুসারে খৃষ্টের জন্মের ৫৪৩ বৎসর পূর্ব্বে বুদ্ধ নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন। এই স্থানে অন্যান্য ঐতিহাসিকগণের সহিত ২১ বৎসরের গোলমাল হইয়াছে। মহাবংশকার বলেন, "বুদ্ধের নির্ব্বাণ হইতে ২১৮ বৎসর পর অশোকের রাজ্যা-ভিষেক হয়।" অশোক, দেবনমপরিসিসার সমসাময়িক। সিংহলী ইতিবৃত্ত অনুসারে তিনি ৩০৭ খৃষ্টাব্দে রাজ্যপালন করেন। দেবনমপবনিসা পিতৃরাজ্য প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই অশোক রাজ্যাভিষিক্ত হন। সিংহলী ইতিহাস অনুসারে অশোকের পিতা বিন্দুশূর ২৮ বৎসর রাজ্যশাসন করেন। মহাবংশকারের মতে বিন্দুশূরের পিতা কাম্বুগোজু ৩৪ বৎসর রাজ্য-

বঙ্গদেশের সহিত লঙ্কার সংযোগ বহুকাল পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল। সময় সময় দেশে অশান্তি উপস্থিত হইত, কিন্তু তাহাতে সভ্যতা, রীতিনীতি এবং ধর্ম্মভাব পরিবর্ত্তিত হইত না। বাঙ্গালাদেশে বন্দর ছিল—তমলেটি (বর্ত্তমান (তমলুক)। বৌদ্ধধর্ম্ম লঙ্কায় সংস্থাপিত হইয়াছিল। দ্বীপের চারি-দিকে জলাশয় প্রতিষ্ঠিত এবং ধর্ম্মশালা স্থাপিত হইয়াছিল। ভাষা এবং সাহিত্য গঠিত হইয়াছিল। সিংহলীরা অন্যান্য জাতির ন্যায় নিজের দেশের ও রাজার বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল।

লঙ্কাও বঙ্গদেশের ন্যায় তাহার সন্তানগণকে সভ্যতা এবং ধর্ম্মস্থাপনের জন্য নিকটবর্ত্তী দ্বীপ সমূহে পাঠাইতে আরম্ভ করিয়াছিল।

ইতিহাসের সাহায্য ব্যতীতও উচ্চশ্রেণীর সিংহলবাসীদিগের আকৃতি, প্রকৃতি এবং ভাষা ও নামেই তাহাদের আদিম নিবাস নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

যদি পৌরাণিক এথেন্স্ এবং টায়ার ন্যায়, বঙ্গদেশের এককালে রাজ্য-বিস্তার নিমিত্ত এবং বাণিজ্যের উৎকর্ষের জন্য শত শত অর্ণবপোত বাণিজ্য-সম্ভার বোঝাই করিয়া দেশ বিদেশে পাঠাইতে থাকিত, তবে আজ তাহার এরূপ শোচনীয় দশা দেখিতে হইত না। ঐক্যবন্ধন এবং সহানুভূতির অভাবেই বাঙ্গালীর সমস্ত আশাভরসা একেবারে ডুবিয়া গিয়াছে। এবং উত্তাল তরঙ্গমালাসঙ্কুল 'কালাপানি' রূপ প্রতিবন্ধকই দেশের সমস্ত উন্নতির একমাত্র অন্তরায় হইয়া রহিয়াছে !!

শ্রীব্রজসুন্দর সান্যাল।

শাসন করেন। ৩০৭ খৃষ্টাব্দ হইতে ২৮ এবং ৩৪ বৎসর বাদ দিলে ২৪৫ খৃষ্টাব্দ হয়। এই বৎসর কান্দুগোত্তু এবং খুব সম্ভবতঃ চন্দ্রগুপ্ত অথবা গ্রীসীয় সণ্ড্রকোপটাস সিংহাসনে অধিরূঢ় হন। কিন্তু এই নির্দ্ধারণ চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বের সময়ের সহিত ঐক্য হয় না। সার উইলিয়ম জোন্স্ বলেন, চন্দ্রগুপ্ত ৩১২ খৃষ্টাব্দে রাজত্ব করেন এবং অশোক ২৭০ হইতে ২৫০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। এখানেও গলৎ আছে। ভারতীয় রাজত্বকাল নির্ণয়ের পক্ষে সিংহলী গ্রন্থ অতি প্রয়োজনীয়। লেখক।

গ্রীষ্মাধিক্যের শোচনীয় ফল

ও

তৎপ্রতিষেধক উপায়।

আজকাল অত্যন্ত গ্রীষ্ম পড়িয়াছে। গ্রীষ্মাতিশয্যের ফলে আমাদের মৃত্যু দুই প্রকারে ঘটিতে পারে।

প্রখর নিদাঘতাপে আমাদের দৈহিক রক্তের উত্তাপ তাহাদের স্বাভাবিক সীমা অতিক্রম করিয়া ২।৪ ডিগ্রি উপরে উঠিয়া থাকে; এবং সকলেই দেখিয়া থাকিবেন যে, তখন আমাদের শরীর হইতে প্রচুর পরিমাণে ঘর্ম্ম নির্গত হইয়া থাকে।

এই স্বেদ-স্রাব ব্যাপার বিধাতৃ-নির্দ্দিষ্ট একটী প্রাকৃতিক নিয়মের ফল, এবং উহা আমাদের মঙ্গলার্থই পরিকল্পিত। এটী আছে বলিয়াই আমরা এই গ্রীষ্মেও আমরা পৈত্রিক প্রাণটা লইয়া বাঁচিয়া আছি, নতুবা রক্তের তাপ-বৃদ্ধিবশতঃ কবে আমাদের প্রাণপাখী ধড়্ফড়্ করিতে করিতে দেহ-পিঞ্জর ছাড়িয়া পলায়ন করিত। ঐ নিয়মটীর ফলে আমাদের রক্ত প্রকৃতিস্থ থাকে। *

এক পেয়ালা জলকে অত্যল্প সময়ের মধ্যে আমরা অগ্ন্যুত্তাপ সাহায্যে বাষ্পে পরিণত করিয়া উড়াইয়া দি। যখন দেখিতে পাই যে, পাঁঠার মাংস সুসিদ্ধ হইয়া আসিয়াছে, কিন্তু ঝোল অতিরিক্ত মাত্রায় রহিয়া গিয়াছে, তখন ঝটিতি ঝোল কমাইবার অভিপ্রায়ে আমাদের উদরস্থ অগ্নির বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উনুনেরও অগ্নি বৃদ্ধির ব্যবস্থা করিয়া থাকি। এ সকল স্থলে

---

* ঘর্ম্ম নির্গম হইতে আমাদের আরো কতকগুলি উপকার সাধিত হয়। উহা আমাদের শরীরের অতিরিক্ত জলীয় অংশ বাহির করিয়া ফেলে, দেহস্থ বিষাক্ত পদার্থ (যেমন পারা প্রভৃতি) বিদূরিত করে। (পুরাকালে উপদংশাদি কদর্য্য ব্যায়াম ও পারা-সেবন দ্বারা যাহাদের শরীর বিষাক্ত হইত, তাহারা "বাক্স সাল্সা" খাইত বা 'সারকুলি' করিত। তাহার কঠোর নিয়মের ফলে শরীর হইতে যে অত্যধিক পরিমাণে ঘর্ম্ম নির্গত হইত, তদ্দ্বারা শরীরের বিষ নিরাকৃত হইত।)

এতদ্ব্যতীত ঘর্ম্মদ্বারা আমাদের শরীরের চর্ম্ম আর্দ্র ও কোমল থাকে, উহা না থাকিলে চর্ম্মের স্পর্শ-শক্তি ব্যাহত হইত।

প্রকাশ্যভাবে উত্তাপের সাহায্য লইয়া জলকে বাষ্প করা হয়—ইহাতে কোন লুকোচুরী নাই। কিন্তু গতকল্য আমার এই কাচের গ্লাসে যে জলটুকু ছিল, তাহাও দেখি বাষ্প হইয়া উড়িয়া গিয়াছে, অথচ তাহাতে বামুনঠাকুর বা অন্য কেহ উত্তাপ প্রয়োগ করেন নাই, ইহা নিশ্চিত। ধার কর্জ্জ হইবার ভয়ে আমি আজ কতদিন যাবৎ সাদা কাগজে কালীর আচড় দেই নি, অথচ রোজ কে আমার কালী চুরী করে, কালী কেমন ক'রে উড়ে যায়?

প্রকৃত কথা এই যে, গ্লাসের জল ও দোয়াতের কালীর জল অন্যের নিকট হইতে উত্তাপ না পাইয়া "যঃ পলায়তি সঃ জীবতি" বুঝিতে পারিয়া "গজভুক্ত কপিত্থবৎ" নীরবে বাষ্পাকারে প্রস্থান করিয়াছে। উত্তাপের জন্য তাহারা পরমুখাপেক্ষী না হইয়া আপনাদের পথ আপনি খুঁজিয়া লইয়াছে—অর্থাৎ এই গ্লাস ও দোয়াৎ হইতে খানিকটা উত্তাপ বলপূর্ব্বক অপহরণ করিয়া বাষ্পীয়যানে প্রস্থান করিয়াছে।

ফলতঃ জল কোন সময়ে উত্তাপের সাহায্য বিনা বাষ্পে পরিণত হইতে পারে না; কখন বা প্রকাশ্যরূপে উত্তাপের সাহায্য লয়, কখন বা (পুলিশের কর্ম্মচারীর উৎকোচের মত,) লুক্কায়িতভাবে লয়। *

---

* যখনই এইরূপ লুক্কায়িতভাবে তাপ গ্রহণ করে, তখনই তাপ-দাতাকে শীতলতর করিয়া রাখিয়া যায়। (যেমন পুলিশকে ঘুষ দিলে লোকের ত্রিতাপ জ্বালা যন্ত্রণা ঘুচিয়া যায়।) মাথা গরম হইলে আমরা মাথায় লেভেণ্ডার দিয়া থাকি। এই সুগন্ধি পদার্থটী অত্যন্ত উদ্বায়ী, অর্থাৎ উহা দ্রুতবেগে বাষ্পাকারে উড়িয়া যায়। এই বাষ্প হইবার কালে উহার উত্তাপের দরকার হয়। সেই উত্তাপ মাথা হইতে নেয় বলিয়া মাথা ঠাণ্ডা হয়। লেভেণ্ডার স্পিরিট্ প্রভৃতি হাতে লইলে খুব শীতল বোধ হয়, তাহারও এই কারণ। মেটে কলসীর জল পিতলের কলসীর জল অপেক্ষা শীতল, ইহা সকলেই জানেন। তাহার কারণ এই যে, কলসীর তল-দেশ বালুকা মিশ্রিত মৃত্তিকায় নির্ম্মিত বলিয়া উহা কিয়ৎপরিমাণে সচ্ছিদ্র, তাই উহার ভিতর দিয়া বিন্দু বিন্দু জল কলসীর বাহিরে আইসে। এই জল বাহিরে আসিয়াই বাষ্পে পরিণত হইতে থাকে, এবং সেই জন্য কলসী ও তাহার ভিতরস্থ জল শীতল হয়। শীতকালে আকণ্ঠ জলে নামিয়া স্নান করিবার সময়ে শীত বোধ হয়, সন্দেহ নাই; কিন্তু স্নানান্তে আর্দ্র শরীরে জল হইতে উঠিলে, (বিশেষতঃ) সেই সময়ে একটু হাওয়া বহিলে) আরো অধিকতর শীত বোধ হয়। তাহার কারণ এই যে, জল হইতে উঠিবামাত্র আমাদের শরীর-সংলগ্ন জল বাষ্প হইতে থাকে; এবং এই বাষ্প হইবার সময়ে যে উত্তাপের প্রয়োজন হয়, তাহা আমাদের দেহ হইতে অপহৃত হয় বলিয়া আমরা শীত অনুভব করি (আমাদের শরীর হইতে অন্য শরীরে উত্তাপ চলিয়া যাওয়ার সময়ে আমরা শীত বোধ করি, আর অন্য

গ্রীষ্মকালে আমাদের শরীর হইতে ঘর্ম্ম নির্গত হইয়া বাষ্প হইতে থাকে, এবং তাহার ফলে আমাদের শরীর শীতল থাকে * নতুবা গ্রীষ্মেই আমাদের শরীর ও শরীরস্থ রক্ত এত উত্তপ্ত হইত যে, তাহাতে আমাদের ব্যারাম বা মৃত্যু ঘটিত।

কিন্তু এই ঘর্ম্ম-নিঃসরণের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের শরীরে একটা অবসাদ—একটা দুর্ব্বলতা—আসিয়া উপস্থিত হয়; তাহা সকলেই লক্ষ্য করিয়া থাকি-

---

পদার্থ হইতে আমাদের শরীরে উত্তাপ আসিবার সময়ে আমরা গরম বোধ করিয়া থাকি। এইজন্য এক জ্বর-রোগী অপর জ্বর-রোগীর গাত্র স্পর্শ করিয়া শেষোক্তের জ্বর আছে বলিয়া টের পায় না, অর্থাৎ তাহার শরীর প্রথমোক্তের কাছে ঠাণ্ডা বলিয়াই বোধ হয়। এ স্থলে প্রথমের শরীর অধিকতর উত্তপ্ত বলিয়া দ্বিতীয়ের শরীর স্পর্শ করিবা মাত্র, তাপের সাধারণ নিয়মানুসারে, প্রথমের শরীর হইতে দ্বিতীয়ের শরীরে তাপ চলিয়া যাইতে থাকে, তাই সে দ্বিতীয়ের শরীর শীতল বলিয়া অনুভব করে।)

তরল বস্তু বাষ্প হইবার সময়ে যেমন সমীপস্থ বস্তু হইতে তাপ অপহরণ করিয়া থাকে, কঠিন বস্তু তরল হইবার সময়েও সেইরূপ তাপ অপহরণ করিয়া থাকে। এই জন্যই মিছরি, চিনি, সোডা প্রভৃতি জলে দ্রব করিলে সেই জল এত ঠাণ্ডা বোধ হয়।

সুতরাং আদ্যোপান্ত বিবেচনা করিলে নিম্নলিখিত প্রহেলিকাগর্ভ সত্যে আমরা উপনীত হইঃ—তরল পদার্থকে অগ্ন্যুত্তাপ সাহায্যেই হউক বা প্রবাহমান বায়ুর সাহায্যেই হউক, বাষ্পে পরিণত করিবার বেলা উত্তাপের আশ্রয় গ্রহণ করা ব্যতীত উপায়ান্তর নাই; এইরূপ কঠিন পদার্থকে অগ্ন্যুত্তাপে বা জল-সংমিশ্রণে তরল করিবার বেলাও তাপের সাহায্য গ্রহণ অনিবার্য্য।

* যে ঘর্ম্ম আমাদের শরীরের পক্ষে এত উপকারী—তাহার অভাব বা স্বল্পতা অনুভব করিলে ব্যায়াম বা শ্রমসাধ্য কার্য্যে যোগদান করা উচিত। ভৃত্য বা অন্য কেহ দ্বারা শরীর মর্দ্দন করাইয়া লওয়া উচিত, শরীরে লবণ তৈল মাখিয়া লইলে ঘর্ম্ম-নির্গমের পক্ষে আরো ভাল হয়। উষ্ণ জলে স্নান করিলেও স্নানান্তে বেশ ঘর্ম্ম নিঃসৃত হয়। অনেক সময়ে দেখা যায় যে, জ্বর সারিয়া যাওয়ার পরেও কাহারো কাহারো শরীরের উষ্ণতা সম্যক্‌রূপে যায় না—যেন একটু জ্বর আছে বলিয়া বোধ হয়। এ সব স্থলে সাহস পূর্ব্বক রোগীকে গরম জলে স্নান করাইয়া তাহার গায়ে একটা জামা দিয়া দেওয়া ভাল। তাহাতে প্রচুর পরিমাণে ঘর্ম্ম নির্গত হইয়া শরীর স্বাভাবিক উত্তাপ প্রাপ্ত হয়—অর্থাৎ নির্জ্বর-দেহীর শরীরের মত তাহার শরীর শীতল বোধ হয়।

পরিশ্রমের পরে শীতল জল দ্বারা হস্ত পদ মুখ প্রক্ষালন করিলেও ঘর্ম্ম-স্রাবের সাহায্য হয়। এইজন্য কোন স্থান হইতে বেড়াইয়া আসিবার পরে হাত পা মুখ ধোওয়া একটী ভাল প্রথা। দুর্ভাগ্যক্রমে আমরা ইহা ভুলিয়া যাইতেছি।

বেন। অত্যন্ত গ্রীষ্মের সময়ে অত্যধিক পরিমাণে স্বেদ-স্রাব হয় বলিয়া আমাদের শরীরে এই দুর্ব্বলতা এত বেশী পরিমাণে আসিয়া উপস্থিত হয় যে, তাহারই ফলে আমাদের মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। এই গেল গ্রীষ্মাতিশয্য বশতঃ মৃত্যুর প্রথম কারণ বা প্রকার।

দ্বিতীয় প্রকারের মৃত্যুর প্রচলিত নাম মৃগীরোগ। এস্থলে অত্যধিক গ্রীষ্মবশতঃ আমাদের স্নায়ুমণ্ডলীর কেন্দ্রীভূত যন্ত্র মস্তিষ্কাদির ক্রিয়া স্থগিত হইয়া মৃত্যু উপস্থিত হয়। এবং মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে ন্যূনাধিক সময়-ব্যাপী মূর্চ্ছা আসিয়া উপস্থিত হয়। কখন কখন কোন কোন ব্যক্তি মৃত্যুর হাত হইতে অব্যাহতি না পায়, এমন নহে। কিন্তু সে সকল ব্যক্তিদিগকে 'জীবিত' না বলিয়া 'জীবন্মৃত বলাই সঙ্গত ; কারণ তাহারা চিরদিনের জন্য উন্মত্ত, স্মৃতিশক্তি-বিরহিত বা চিন্তাশক্তি-বর্জ্জিত হইয়া আপনাদের দুর্ব্বহ জীবনকে টানিয়া লইয়া শেষে মৃত্যুর গভীর খাতে নিক্ষেপ করে।

এক্ষণে দেখা যাউক, এই সাক্ষাৎ যমের কবল হইতে রক্ষা পাইবার জন্য আমাদের কি কর্ত্তব্য ?

পরিশ্রমের মাত্রা কমাইয়া লওয়া উচিত ; কারণ এই সময়ে শীতকালের মত পরিশ্রম করিলে এত অধিক পরিমাণে স্বেদ-নির্গম হইবে যে, তাহাতে শরীরে দুর্ব্বলতা উপস্থিত হইয়া মৃত্যু ঘটিতে পারে।

রৌদ্রসেবন যথাসাধ্য পরিত্যাগ করা উচিত। রাত্রে সুনিদ্রার জন্য শয়ন-কক্ষের গবাক্ষগুলি (ঠিক মাথার দিকের নহে) উন্মুক্ত রাখা উচিত।

এই সময়ে আমরা অহর্নিশি এক উৎকট পিপাসা অনুভব করিয়া থাকি। কিন্তু ইহা প্রাকৃতিক পিপাসা নহে, এক বিকৃত কৃত্রিম পিপাসা মাত্র। অভ্যাস গুণে কেহ বা অল্প জল পান করিয়াই তৃপ্ত থাকিতে পারেন, আবার কেহ বা অভ্যাস-দোষে ঢক্ ঢক্ শব্দে ঘটী ঘটী জল খাইয়াও তৃপ্তি অনুভব করেন না।

এই পিপাসার অনুরোধে অতিরিক্ত জলপান* করিয়া উদরকে ভারাক্রান্ত না করিয়া, অল্প পরিমাণে জলপান করা উচিত। একেবারে জল না খাওয়াও অন্যায় ; কারণ পিপাসার সময়ে জলপান করিলে তাহার পরেই শরীর হইতে ঘর্ম্ম নির্গত হইয়া থাকে। ঘর্ম্মের এই নির্গমন ও বাষ্পীভবন আমাদের শরীরকে অতিরিক্ত পরিমাণে উত্তপ্ত হইতে না দিয়া উহাকে শীতল রাখে। কিন্তু জল

* লেমনেড, সোডা জিঞ্জারেড্‌ প্রভৃতি পান করাকেও আমরা 'জল পান' শব্দের অন্তর্ভুক্ত করিলাম।

খাওয়ার এই উপকারটুকু সামান্য পরিমাণে জলপান হইতেই পাওয়া যাইতে পারে, অধিক জলপানে বেশী কিছু লাভ নাই, বরং উদরাময়াদি ব্যারামের আশঙ্কা থাকে। বেশী জল খাইলে যে টস্ টস্ করিয়া ঘাম বাহির হইতে থাকে, তাহা শুধু অতিরিক্ত-জল-বোঝাই রক্তবহা নাড়ী সকলকে একটু আরাম দিবার জন্য, শরীরকে শীতল রাখার পক্ষে ঐ অত্যল্প অংশ মাত্র কার্য্যকর হয়। পক্ষান্তরে উহা অত্যধিক দুর্ব্বলতা আনয়ন করে, এবং গাত্রবস্ত্রাদি অষ্টপ্রহর আর্দ্র ও দুর্গন্ধ রাখে।

এই সময়ে দু-এক টুকরা বরফ মুখে লইয়া আস্তে আস্তে চুষিয়া খাওয়া ভাল, তাহাতে ব্যারামের সম্ভাবনা নাই, অথচ আরাম আছে।

গরমের দিনে কাল পোষাক পরিধান যথাসাধ্য পরিত্যাগ করা উচিত। এই স্বাধীনতা-পতাকা শোভনী বিংশ শতাব্দীর দীর্ঘ দর্পণের সাহায্যে অনেকেই আর ক্ষৌরকারের মুখ-প্রেক্ষী হইয়া থাকা ভালবাসেন না; কৃষ্ণ পরিচ্ছদ অবলম্বন করিলে রজকের প্রসাদ-ভিক্ষা হইতেও কিয়ৎ পরিমাণে অব্যাহতি পাওয়া যায়, সত্য; কিন্তু স্বাস্থ্যের মুখের দিকে চাহিয়া সকল রকম অপমানই সহ্য করা উচিত, রজকের চিত্তবিনোদন ত দূরের কথা।

যদি একান্তই কাল পোষাক ব্যবহার করিতে হয়, তবে তাহা পাতলা কাপড়ের না হইয়া পুরু কাপড়ের হওয়া উচিত। কারণ উহাতে তাহার দোষ কিয়ৎপরিমাণে সংশোধিত হয়। কাল পোষাকের দোষ এই যে, উহা অন্য বর্ণের পোষাক অপেক্ষা অধিক পরিমাণে তাপ-শোষণ করে, এবং উত্তপ্ত হয়। বস্ত্র যদি অধিক পুরু হয়, তবে এই তাপ বস্ত্রের উপরিভাগেই সঞ্চিত থাকে, পরিধানকারীর শরীরে সংক্রামিত হইতে পারে না।

শ্রীশ্রীনিবাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

চোখের বালি। *

চোখের বালি উপন্যাস এতদিনে সমাপ্ত হইয়াছে। সুতরাং এইক্ষণ সে সম্বন্ধে কোনরূপ অভিমত ব্যক্ত করিলে, বোধ হয়, নিতান্ত অসঙ্গত হইবে না। গ্রন্থোক্ত নায়ক নায়িকাগণের মধ্যে মহেন্দ্র, বিহারীলাল এবং আশালতা ও বিনোদিনীই সমালোচ্য গ্রন্থের অনেক স্থান অধিকার করিয়াছে। অপিচ মহেন্দ্র ও বিহারীলালের সহিত বিনোদিনীর প্রেম, বিরহ, পূর্ব্বরাগ ও মিলন, বিচ্ছেদ প্রভৃতি প্রেমবৈচিত্র্য, এই অভিনব কৃষ্ণলীলার বর্ণনীয় বিষয়। আমরা

* চোখের বালি, উপন্যাস—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত।

জানি, যেখানে রাধাকৃষ্ণ সেখানেই বৃন্দা দূতী। কবিবর ভারতচন্দ্র মালিনী মাসীকেও বোন্‌পো'র দৌত্যে অভি-নিযুক্ত করিয়াছিলেন; কিন্তু গ্রন্থকারের অভূতপূর্ব্ব কল্পনা তাহা অপেক্ষাও এক ডিগ্রি উপরে উঠিয়াছে। রাজলক্ষ্মীর প্রতি বিনোদিনীর উক্তিই তাহার জ্বলন্ত প্রমাণ।

"সে কথা ঠিক পিসিমা,—কেহ কাহাকেও জানে না। নিজের মনও কি সবাই জানে? তুমি কি কখন তোমার বউয়ের উপর দ্বেষ করিয়া এই মায়াবিনীকে দিয়া তোমার ছেলের মন ভুলাতে চাও নাই? একবার ঠাহর করিয়া দেখ দেখি?"

রাজলক্ষ্মী অগ্নির মত উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিলেন—কহিলেন—"হতভাগিনি, ছেলের সম্বন্ধে মা'র নামে এমন অপবাদ দিতে পারিস্? তোর জিব্ খসিয়া পড়িবে না?"

আমরা জিজ্ঞাসা করি, যদি ইহা বিনোদিনীর স্বকপোল-কল্পিত বাক্যই হয়, তবে এরূপ বেফাস কথাটা বিনোদিনীর মুখ দিয়া বাহির না করিলে কি ভাল হইত না? বলিহারি কল্পনা!

বিনোদিনী যুবতী ও বিধবা। রাজলক্ষ্মীর সাদর আহ্বানে আপ্যায়িত হইয়া তাঁহার আলয়ে অবস্থান করিতেছেন। মহেন্দ্রের প্রণয়িনী আশালতার সহিত তাহার সখীত্ব ভাবটুকুও নিতান্ত মন্দ নয়। কিন্তু এদিকে মহেন্দ্রকে প্রেমের ফাঁদে ফেলিবার জন্য তিনি উৎসুক ছিলেন। সুতরাং মহেন্দ্রের ঔদাসীন্য লক্ষ্য করিয়া বিনোদিনী মনে মনে গভীর দুঃখ অনুভব করেন।

দেখিতে দেখিতে বিনোদিনীর অশান্তি উপস্থিত হইল।

"মহেন্দ্রকে প্রতিদিন সে নানা পাশে ও নানা বাণে বিদ্ধ করিতেছিল, সে কাজ গিয়া বিনোদিনী যেন এপাশ ওপাশ করিতে লাগিল। * * * কিন্তু যে কারণেই হৌক মহেন্দ্রকে তাহার একান্ত প্রয়োজন। সে তাহার বিষদিগ্ধ অগ্নিবাণ জগতে কোথায় মোচন করিবে!"

এইরূপে প্রেমের লুকোচুরি খেলা কিছুদিন চলিল। নদীতে জোয়ার ভাটা আছে, প্রেম তরঙ্গিণীতেও না থাকিবে কেন? দেখিতে দেখিতে মহেন্দ্রের প্রতি বিনোদিনীর অনুরাগ স্রোতে ভাটা দেখা দিল। কিন্তু আর এক দিকে কোটালের বাণে জোয়ারের প্রবল তরঙ্গ উঠিল। জানি না কি কারণে বিহারীর প্রতি বিনোদিনীর চিত্ত আকৃষ্ট হইয়া পড়িল। সে আসক্তি কতদূর প্রবল, উল্লিখিত বর্ণনাটী এস্থলে পাঠকবর্গকে উপহার দিব।

"বিনোদিনী তাহার পশ্চাতে গিয়া গিয়া কহিল, "বিহারী ঠাকুরপো, আমাকে কি তোমার কোন কথা বলিবার নাই? যদি তিরস্কারের কিছু থাকে তবে তিরস্কার কর।"

"বিহারী যখন কোনও উত্তর না করিয়া চলিতে লাগিল, বিনোদিনী সম্মুখে আসিয়া দুই হাতে তাহার দক্ষিণ হস্ত চাপিয়া ধরিল। বিহারী অপরিসীম ঘৃণার সহিত তাহাকে ঠেলিয়া দিয়া চলিয়া গেল। সেই আঘাতে বিনোদিনী যে পড়িয়া গেল, তাহা সে জানিতেও পারিল না।"

মদনাবেশ-বিহ্বলা-বিলাসিনীগণ কুরঙ্গ-লাঞ্ছন নেত্রে তরঙ্গ তুলিয়া নয়নবাণে নায়কের হৃদয় বিদ্ধ করেন; তাঁহাদের মধ্যেও রমণী জনোচিত শালীনতার বিরোধী এরূপ প্রগল্‌ভতা দৃষ্ট হয় না।

বিহারীর প্রতি বিনোদিনীর অনুরাগ লক্ষ্য করিয়া, মহেন্দ্র ঈর্ষ্যায় জর্জ্জরিত হইতে লাগিলেন। কিন্তু তাহাতে বিনোদিনীর ভ্রূক্ষেপ নাই। তিনি অনায়াসে মহেন্দ্রকে প্রত্যাখ্যান করিতে উদ্যত। এখন বিহারীই তাঁহার একমাত্র প্রণয়ের আরাধ্য দেবতা! বিহারীকে প্রেমের বাগুরায় বদ্ধ করিবার জন্য বিনোদিনী এখন ব্যাধবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছেন। কিন্তু বিহারী ভ্রমেও একবার তাহার প্রতি ফিরিয়া চাহেন না। তথাপি বিহারীর জন্য বিনোদিনী এবং বিনোদিনীর জন্য মহেন্দ্র উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন। কিন্তু তাঁহাদের আশা-লতা ফলবতী হইল না। সুতরাং প্রেমিক প্রেমিকা যুগল (মহেন্দ্র ও বিনোদিনী) অতৃপ্ত প্রেমতৃষ্ণায় দিনে দিনে দগ্ধ হইতে লাগিলেন। এই নিরাশ প্রেমকাহিনী হা হুতাশ দীর্ঘনিশ্বাসে পর্য্যবসিত হয় নাই;—ঘরকন্নারূপ আবর্জ্জনার সঙ্গে মিশিয়া, ঘৃষ্ট ঘর্ষণ, পৃষ্ট পেষণ অথবা চর্ব্বিত চর্ব্বণরূপ প্রক্রিয়া প্রভাবে মেদস্ফীত রোগীর ন্যায় অযথা গ্রন্থ কলেবর পরিপুষ্ট হইয়াছে।

সমালোচ্য গ্রন্থের নায়িকাগণের মধ্যে আশা লতার চিত্রই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বলিতে হইবে। আশালতা যেমন মাধবী লতা, তেমনি পতিপ্রাণা। পতিই তাঁহার একমাত্র ধ্যান জ্ঞান ও উপাস্য দেবতা। আশা একদিন অভিমান করিয়া স্বামীকে পত্র লিখিতেছেন;—

"তুমি আমার চিঠির উত্তর দিলে না? ভালই করিয়াছ! * * * ভক্ত যখন তাহার দেবতাকে ডাকে, তিনি কি মুখের কথায় তাহার উত্তর দেন? দুখিনীর বিল্বপত্রখানি চরণতলে বোধ করি স্থান পাইয়াছে।

কিন্তু ভক্তের পূজা লইতে গিয়া শিবের যদি তপোভঙ্গ হয়, তবে তাহাতে রাগ করিয়ো না হৃদয়-দেব! তুমি বর দাও বা না দাও, চোখ মেলিয়া চাও বা না চাও, জানিতে পার বা না পার, পূজা না দিয়া ভক্তের আর গতি নাই!”

এ অভিমানটুকুও ভক্তিমাখা। বস্তুতঃ মহেন্দ্রের ন্যায় কাপুরুষ লম্পট স্বামীর প্রতি সমস্ত হৃদয় মন সমর্পণ করিয়া যিনি ভক্তিভাবে পূজা করিতে পারেন,—স্বামী পরদার-নিরত হইয়াছে জানিয়াও মান নাই, অভিমান নাই, অটল ভক্তি ও অবিচলিত ভালবাসা উপহার দিতে পারেন, তিনি আদর্শ হিন্দু ললনার লীলাভূমি ভারতে বঙ্গগৃহলক্ষ্মীরূপে প্রতিষ্ঠিতা হইবার যোগ্যা, সন্দেহ নাই। বস্তুতঃ বর্ত্তমান স্ত্রী-স্বাধীনতার যুগে পাতিব্রত্য ধর্ম্ম শিক্ষা দিবার জন্য আশালতার চিত্র আদর্শ স্থানীয়।

বিহারীলালের চরিত্রও অতি সুন্দর বর্ণে অনুরঞ্জিত হইয়াছে। বিহারী মহেন্দ্রের বাল্যসখা, অকপট বন্ধু ও পরামর্শদাতা মন্ত্রী। কিন্তু বৈশাখের প্রবল ঝড়ে শিমুল তুলা যেমন দিগ্‌দিগন্তে বিক্ষিপ্ত হয়, বিনোদিনীর অবৈধ প্রেমের প্রলোভনে বিহারীর প্রতি মহেন্দ্রের ভালবাসা সেইরূপ অন্তর্হিত হইয়াছিল। বিনোদিনীর প্রেমে বিহারীকে প্রতিযোগী মনে করিয়া মহেন্দ্র তাঁহাকে বিষনয়নে দেখিতে লাগিলেন। অযথা বাক্য বাণে জর্জ্জরিত করিতে অথবা কাপুরুষের ন্যায় তাঁহার প্রতি কঠোর ব্যবহার করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। কিন্তু বিহারী সেস্থলে প্রতিযোগিতা করা দূরে থাকুক, স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়াই বিনোদিনী হইতে শত হস্ত দূরে রহিতেন। অথচ মহেন্দ্রের দুর্ব্যবহারে উৎপীড়িত হইয়াও তাঁহার প্রতি অকপট বন্ধুত্ব হৃদয়ে পোষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এরূপ সখ্যতাও নিতান্ত অনায়াস-লভ্য নহে। এদিকে রাজলক্ষ্মী ও অন্নপূর্ণার প্রতি বিহারীর মাতৃভাবে ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা অনন্যসাধারণ।

বিহারীর চরিত্র যেমন পবিত্র তেমনি সরলতাময়। তিনি বিনোদিনীর সঙ্গে কোন কালেই সহানুভূতি দেখান নাই। তাহার সুখ দুঃখের পথে আসিয়া দাঁড়ান নাই। কিন্তু বিনোদিনী যখন তাঁহার জন্য জীবন বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত, তখন বিনোদিনীর দুঃখে ব্যথিত হইয়া তাহার দগ্ধ হৃদয়ে শান্তিবারি সেচনের জন্যই বিহারী তাহাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন। এরূপ উদারতাও মহত্ত্বের পরিচয়। তথাপি বিহারীর চরিত্র সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ নহে। আশালতার প্রতি একটু ভালবাসার উচ্ছ্বাস—যাহা বিনোদিনীর

মুখে ব্যক্ত হইয়াছে, গ্রন্থ পাঠেও তাহা নিতান্ত অমূলক বলিয়া বোধ হয় না। পরস্ত্রীর প্রতি এরূপ ভালবাসা অবৈধ, সন্দেহ নাই, এবং তাহা দাম্পত্য ধর্ম্মেরও বিরোধী। বলিতে গেলে, এইটুকুই বিহারীর চরিত্রের দুর্ব্বলতা।

বিনোদিনী ষোড়শী ও বিদূষী অথচ রসিকা। সুরুচি-সম্পন্ন গ্রন্থকার অভিসারিকাবেশে তাহার চিত্রটী কিরূপ অঙ্কিত করিয়াছেন, পাঠক তৎপ্রতি লক্ষ্য করুন।

"বিনোদিনী। আজ রাত্রে তবে আমি এইখানেই থাকি।

বিহারী। না, এত বিশ্বাস আমার নিজের প'রে নাই।"

বিনোদিনী বিহারীর এই স্তব্ধ বিহ্বল ভাব অনুভব করিয়া তাহার পা ছাড়িয়া দিয়া উঠিল, এবং চৌকিতে আসীন বিহারীর গলদেশ বাহুতে বেষ্টন করিয়া বলিল, "জীবনসর্ব্বস্ব, জানি তুমি আমার চিরকালের নও এক মুহূর্ত্তের জন্য আমাকে ভালবাস। * * * মরণ পর্য্যন্ত মনে রাখিবার মত আমাকে একটা কিছু দাও!"—বলিয়া বিনোদিনী চোখ বুজিয়া তাহার ওষ্ঠাধর বিহারীর কাছে অগ্রসর করিয়া দিল। মুহূর্ত্ত কালের জন্য দুইজনে নিশ্চল এবং সমস্ত ঘর নিস্তব্ধ হইয়া রহিল।"

যে মকরকেতন নিবাত-নিষ্কম্প প্রদীপের ন্যায় ধ্যানমগ্ন মহাদেবের যোগ-ভঙ্গ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, বিনোদিনী অনন্যোপায় হইয়া তাঁহার শরণা-পন্ন হইলেও মীনকেতুর দয়া হইল না। কারণ কিছুতেই বিহারীর মন টলিল না। হায়! বিনোদিনীর প্রেমের স্বপ্ন আকাশ-কুসুমে পরিণত হইল!

ধর্ম্মপরিণীতা পত্নী স্বামী প্রেমে বঞ্চিতা হইলে অভিমানে জলাঞ্জলি দিয়া এরূপ প্রেম যাচ্ঞা করা স্ত্রীস্বাধীনতার লীলাভূমি ইউরোপে ক্বচিৎ কুত্র সম্ভবপর হইলেও, তাহা এদেশে আশা করা যায় না। তাহাতে উপনায়ক নায়িকার মধ্যে—যেখানে প্রেমের স্বত্ব সাব্যস্ত হয় নাই, সেস্থলে প্রেমলীলার এরূপ অপূর্ব্ব অভিনয় (!)—লজ্জাহীনতার ঘৃণিত চিত্র আজ পর্য্যন্ত কোন উপন্যাস-লেখক কল্পনা করিতে পারেন নাই। বলি, ইহাই কি এই উপন্যাসের নূতনত্ব? /

কপালকুণ্ডলা গ্রন্থের লুৎফউন্নিসার চিত্র ইহা অপেক্ষা কত সুন্দর! বহু-পুরুষভোগ্যা বারবিলাসিনী লুৎফউন্নিসা প্রেমিকার ছায়া স্পর্শ করিবারও যোগ্য নহে। কিন্তু বঙ্কিমবাবু গণিকাকে প্রেমিকার বেশে সাজাইয়া নরক রাজ্যে স্বর্গের শোভা ফলাইয়াছেন। পাঠকের কৌতূহল পরিতৃপ্তি জন্য আমরা সে দৃশ্যটী উপস্থাপিত করিব। (ক্রমশঃ)

আরতি।

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

৩য় বর্ষ] বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ, ১৩১০। [১১শ ও ১২শ সংখ্যা।

দার্শনিক মতের সমন্বয়। (৫)

আমরা এত দিন যাহা বলিয়াছি, তাহাতেই পাঠক দেখিয়াছেন যে, বুদ্ধ আত্মা অস্বীকার করিলেও, তিনি প্রকারান্তরে এক নিত্য আত্মা স্বীকার না করিয়া পারেন নাই। বুদ্ধের এই আত্মা সম্বন্ধে আরো কিছু আলোচনা করিয়া দেখা আবশ্যক। এই আলোচনা হইতে ইহাও পরিস্ফুট হইবে যে, বাস্তবিকপক্ষে বৌদ্ধদর্শন, হিন্দুদর্শন হইতে তত বিভিন্ন নহে। একই সত্যের নানা দিক্ দিয়া, ভিন্ন ভিন্ন দর্শন দেখিয়াছেন বলিয়াই ভিন্নতা। বুদ্ধের বিজ্ঞানস্কন্ধ এবং সাংখ্য ও বেদান্তের অন্তঃকরণ একই। আমরা বিজ্ঞানস্কন্ধ ও অন্তঃকরণকে একই ধরিয়া লইতেছি। বুদ্ধ বলেন, মৃত্যুর পর, এই বিজ্ঞানই (Consciousness) নূতন দেহের বীজস্বরূপ হইয়া থাকে। এই বিজ্ঞানই, গর্ভে প্রবেশ করিয়া নূতন শরীরের আকার গ্রহণ করে। "From Consciousness come name and material form". অতএব এই বিজ্ঞানই আকৃতি ধারণের মূল কারণ বা ইহাকেই আকৃতি গ্রহণের Formative power বলা যাইতে পারে। গর্ভে, এই বিজ্ঞান যে জড়ীয় উপাদান প্রাপ্ত হয়, তাহাতেই এই বিজ্ঞানই আকার প্রদান করিয়া, উহাকে দেহরূপে পরিণত করে। এইরূপ হইলেই ইন্দ্রিয়াদিরও প্রাদুর্ভাব হয়। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় ও শব্দাদি বিষয়ই, বৌদ্ধের "রূপস্কন্ধ"। এই ইন্দ্রিয়, বিষয়সংস্পর্শে উপরঞ্জিত হইলেই, তাহা হইতে বৈষয়িক Sensation জন্মে। বিজ্ঞানই এই বিষয়-সংস্পর্শের হেতুভূত। এইরূপে যখন বিজ্ঞান বলে ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সংস্পর্শ হয়, তখন "বাসনা" দেখা দেয়।

এই বাসনাই যাবতীয় দুঃখের নিদান। সুখাদির বাসনা করি বলিয়াই, আমাদের পুনঃ পুনঃ জন্ম গ্রহণ করিতে হয়। এই বাসনা যিনি বশীভূত, করিতে পারিয়াছেন, তাঁহার আর দুঃখ থাকে না; এই বাসনার জন্যই, জীবনে এত আসক্তি (উপাদান)। যত দিন ইহার দাহ আছে, ততদিন এই দারুণ বাসনাগ্নি নিবিবে না। এই অগ্নিই একজন্ম হইতে জন্মান্তরে—দূরে—বহুদূরে—আমাদিগকে ক্রমাগত লইয়া যাইতেছে। এই বাসনাগ্নি নির্ব্বাপিত করাই নির্ব্বাণ-লাভ। সেই জন্যই, এই আসক্তি বা বাসনা বিধ্বংশের জন্যই বৌদ্ধের এক মাত্র চেষ্টা। আমরা নানাবিধ বৌদ্ধগ্রন্থ সমুদয়ের উক্তি হইতে, উপরোক্ত সারাংশ সংগ্রহ করিলাম। পাঠক দেখি-বেন, হিন্দুদর্শনও অবিকল এইরূপ কথাই বলিয়া থাকেন।

এখন দেখিতে হইতেছে যে, এই বিজ্ঞান বা Consciousness কোথা হইতে আসিল? বুদ্ধগ্রন্থে আছে যে, সংস্কার হইতেই বিজ্ঞানের উৎপত্তি। এই সংস্কারই বা কোথা হইতে আসিল? ইহার উত্তর আমরা দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইব। যাহাকে তুমি 'রাম' মনে করিতেছ, এই রাম পূর্ব্বজন্মে ও তাহার পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিল। পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে যে সকল সংস্কার অর্জ্জন করিয়াছিল, এ জন্মেও সেই সেই সংস্কারই লইয়া আসিয়াছে। পূর্ব্বজন্মের সংস্কার সমষ্টিই বিজ্ঞানাকারে ইহজন্মে রামে দেখা দিয়াছে। আবার এই জন্মে, এই সমস্ত সংস্কার বলে রাম যে যে কর্ম্ম করিবে, সেই কর্ম্মবশতঃ অন্তঃকরণে যে সমস্ত সংস্কার জন্মিবে, মৃত্যুর পরেও রাম সেই সংস্কারগুলি লইয়া যাইবে। সুতরাং রাম বলিয়া তুমি যাহাকে একটী খণ্ড ব্যক্তি (particular individual) মনে করিতেছ, বাস্তবিক রামের সেরূপ কোন ব্যক্তিত্ব (entity) নাই। রাম কেবল পরিবর্ত্তন প্রবাহ মাত্র। রাম অর্থ এই যে বিশেষ দেশ বিশেষ কালে আবদ্ধ কতকগুলি সংস্কার বা কর্ম্মসমষ্টি মাত্র। পূর্ব্বজন্মে উহা একরূপে ছিল, এজন্মে উহাই 'রাম'রূপে দেখা যাইতেছে, আবার পরজন্মে অন্যরূপ দেখা যাইবে। এইরূপে যতদিন না নির্ব্বাণ হইতেছে, ততদিন চলিতেই থাকিবে। কাজেই বুদ্ধের মতে স্থির আত্মা থাকিতে পারিতেছে না। বৌদ্ধমতে প্রতি সত্বাই কেবল পরিবর্ত্তন প্রবাহ মাত্র। "The "made"has existence only in the *process* of being made. Whatever is, is not so much a something which *is*, as the *process* rather of a being, self-generating and self-again-consuming being," তুমি, আমি,

প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজকৃত কর্ম্মের ফল মাত্র। মনুষ্যের মন ও শরীর উভয়ই মনুষ্যের অতীত ক্রিয়ার ফল সমষ্টি ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। অতএব "আত্মা" সংস্কার-সমষ্টি ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারিতেছে না। ইহার নাম বৌদ্ধের "আত্মা"। বুদ্ধ এই অর্থেই আত্মা শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। একটী মাত্র জন্মের একটী লোককে ব্যক্তি বলা যাইতে পারে না। কেন না, যাহাকে তুমি ব্যক্তি বলিতেছ, তাহার পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে কতবার সে ছিল, এবং পরজন্মেও সে অন্য আকারে থাকিবে। এই সমুদয় জন্মগুলি একত্র মিলাইয়া বরং ব্যক্তিত্ব বলা যাইতে পারে। অতএব যখন এই হিসাবে প্রাণীর ব্যক্তিত্ব টিকিতেছে না, তখন এই হিসাবে 'আত্মা'ও থাকিতে পারিতেছে না। কিন্তু তাই বলিয়া, সমুদয় পরিবর্ত্তন-ক্রিয়ার মূলে যে এক অখণ্ড নিত্যসত্তা আছে, সে কথা এতদ্বারা অস্বীকৃত হইতেছে না। যে নিত্যসত্তা বা Substratum এর উপরে জাগতিক পরিবর্ত্তন প্রবাহ চলিতেছে, সমুদয় পরিবর্ত্তনের মধ্যে যাহা নিত্য স্থির থাকিয়া যায়, তাহার নাম যদি "আত্মা" হয়, তবে সেরূপ আত্মা বুদ্ধ অস্বীকার করিতেছেন না। তিনি জগৎকে কেবল পরিবর্ত্তনের দিক্ দিয়া দেখিয়াছেন; পরিবর্ত্তনের অপর অংশের কথা তোলেন নাই।

কথাটা আমরা আরও পরিষ্কার করিয়া বুঝাইব। একটী বৃক্ষ-বীজ হইতে অঙ্কুর উদ্গত হইল; ক্রমে যতই দিন যাইতে লাগিল, ততই ক্রমে সেই অঙ্কুর হইতে পত্র পুষ্পাদি জন্মিতে লাগিল বৃক্ষ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিল, ক্রমে ইহা এক প্রকাণ্ড মহীরুহে পরিণত হইল। বড় বড় শাখা প্রশাখা জন্মিল, ক্রমে তাহাতে ফুল ফুটিল; আবার ফুলটী বীজে পরিণত হইল। জন্মাবধি মৃত্যু পর্য্যন্ত এই যে বৃক্ষটীতে কত শত অবিরত পরিবর্ত্তন ঘটিল, বিবেচনা করিলে বুঝা যাইবে যে, এই বহু পরিবর্ত্তনের উহার একটী ভাব চিরনিত্য থাকিতেছে। সেইটীই বৃক্ষের বৃক্ষত্ব। বাহ্যিক প্রতিবস্তু সম্বন্ধেই এই একই কথা খাটে। জড়ে নানারূপ নব নব পরিবর্ত্তন সর্ব্বদাই হয় বটে; কিন্তু উহার মধ্যে একটী স্থির থাকিয়া যায়। এই স্থির অংশটীকে উহার Matter বা জড়ত্ব বলা যাইতে পারে। অন্তর্জগতেও এই নিয়ম। মনে, প্রত্যেক মুহূর্ত্তে, কত শত চিন্তাস্রোত চলিয়া যাইতেছে, কত সহস্র পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে; কিন্তু সমুদয় পরিবর্ত্তনে একটী বস্তু অপরিবর্ত্তনীয়ভাবে রহিয়া যাইতেছে। এই নিত্য অপরিবর্ত্তনীয় পদার্থটী না থাকিলে, আমরা

'পরিবর্ত্তন ক্রিয়া'ই বুঝিতে পারিতাম না। এক অপরিণামী সত্ত্বের বক্ষস্থলে বিধৃত হইয়া, পরিণাম ক্রিয়া চলিতেছে। যাহার বক্ষে এই মহাপরিবর্ত্তনের লীলা চলিতেছে, তাহা নিষ্ক্রিয়, স্থির, নিত্য। অন্তর্জগতে ইহাকে "আত্মা" বলিতে পার, বহির্জগতে ইহাকে "জড়" বলিতে পার। দুই-ই নিষ্ক্রিয়, দুই-ই একই বস্তু। বেদান্ত এই নিত্য বস্তুর দিক্ অবলম্বন করিয়াই জগতত্ত্ব আলোচনা করিয়া দেখিয়াছেন। এই নিত্য বস্তুকে পার্শ্বে রাখিয়া, সঙ্গে সঙ্গে, এই পরিবর্ত্তনের তত্ত্ব বুঝাইয়া দিয়াছেন। কিন্তু বুদ্ধ এই নিত্য বস্তু সম্বন্ধে আদৌ কোন কথা তোলেন নাই। তিনি কেবলমাত্র এই পরিবর্ত্তনেরই তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কেবল পরিবর্ত্তন ক্রিয়া কিরূপে জগতে আসিতেছে ও যাইতেছে,—প্রকাশিত হইতেছে ও অপ্রকাশিত হইতেছে—আবার প্রকাশিত হইতেছে,—ইহা বুঝাইয়া দেওয়া যাঁহার অভিপ্রায়, তাঁহার উক্তিতে কাজেই নিত্য, অপরিবর্ত্তনীয় বস্তুর কোন কথা আশা করা যাইতে পারে না। এই জন্যই বৌদ্ধদর্শনে নিত্য "আত্মার" স্থান নাই। এই জন্যই, কেবল কর্ম্ম বা সংস্কাররাশিই, একজন্ম হইতে জন্মান্তরে গমনাগমন করিতে থাকে,—ইহাই বুদ্ধের উপদেশ। এই ক্রিয়া বা সংস্কারগুলিকে ধরিয়া রাখে কে?—এ কথা বুদ্ধ উত্থাপন করেন নাই। এই জন্যই, তাঁহার মতে কেবল মাত্রসংস্কার-সমষ্টিই "আত্মা" পদবাচ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া তিনি যে নিত্য পদার্থের অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়াছেন, তাহা নহে। তিনি তাহার কথা উত্থাপন করেন নাই, এই মাত্র। বুদ্ধকে এই ভাবে দেখিতে হইবে এবং এই ভাবে দেখিলে বুঝা যাইবে যে, বাস্তবিক পক্ষে বেদান্ত, সাংখ্য ও বৌদ্ধদর্শনে কোনই প্রভেদ নাই। প্রভেদ কেবল ভিন্ন ভিন্ন দিক্ দিয়া দেখিবার জন্য।

এইরূপে পরিবর্ত্তন ক্রিয়ার তত্ত্ব বুঝাইয়া দিয়া কি উপায় অবলম্বন করিলে, এই পরিবর্ত্তনগুলিকে বা সংস্কার সমূহকে সমূলে ধ্বংস করিতে পারা যায়, বুদ্ধ তাহারও উপদেশ দিয়াছেন। কাজেই এই সংস্কারগুলির একান্ত ধ্বংশ হইয়া গেলে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না, একেবারে নির্ব্বাণ লাভ হয়। এ কথার অর্থ কি? অর্থ এই যে, বুদ্ধ যেমন নিত্যবস্তুর সম্বন্ধে কোন কথা না তুলিয়া, জগতে মহাপরিবর্ত্তনপ্রবাহ দেখা যাইতেছে, তাহারই কথা বলিতে-ছিলেন, তেমনি নিত্যবস্তুর স্থায়িত্ব বা ধ্বংশ সম্বন্ধে কোন কথা না তুলিয়া তিনি এই সমস্ত পরিবর্ত্তন ক্রিয়াকে যে মানুষ একেবারে ধ্বংশ করিয়া দিতে

পারে, তাহারই উপায় বিধান করিয়া দিলেন। ইহাতে এ কথা বুঝিতে হইবে না যে, বুদ্ধ সেই নিত্য আত্মার বা নিত্য পরমাণুর উচ্ছেদ করিতে বসিয়াছেন। তাঁহার উদ্দেশ্য তাহা নহে। উপরে আমরা যে তত্ত্বের আভাস দিলাম, তাহাতে বোধ হয় পাঠক বুঝিয়াছেন যে, এই ভাবে দেখিতে গেলে ইহা সুস্পষ্ট বুঝা যাইবে যে, বুদ্ধ কেবল এই পরিবর্ত্তন-প্রবাহের ধ্বংসের কথাই বলিয়াছেন। ইহাই প্রকৃত বুদ্ধ মত।

এই ভাবে বুদ্ধকে না বুঝিয়া, লোকে সিদ্ধান্ত করিয়া বলিয়াছে,—বুদ্ধ বুঝি আত্মার উচ্ছেদ করিতে বসিয়াছেন,—বুদ্ধ বুঝি জগতের অন্তরালবর্ত্তী নিত্য বস্তুর বিলোপ সাধন করিতে উদ্যোগ করিয়াছেন। কি সে কথা সম্পূর্ণ অমূলক ও ভ্রমাত্মক।

বেদান্ত ও সাংখ্য উভয়েই এই পরিবর্ত্তন প্রবাহের একমাত্র ধ্বংসের ব্যবস্থা করিয়াছেন। এ অংশে ইহাঁদের বুদ্ধের সঙ্গে কিছুই পার্থক্য নাই। এবং এই ধ্বংসের প্রণালীও প্রায় সকলের মতেই একরূপ। তবে সাংখ্য সেই নিত্যস্থায়ী অণুর * ও নিত্য-আত্মার কথাও সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া গিয়াছেন এবং বেদান্ত অণু ও আত্মাকে এক ও অভিন্ন ধরিয়া লইয়া, সেই এক বস্তুই যে পরিবর্ত্তিত আকার ধারণ করিতেছে, তাহাও বুঝাইয়া দিয়াছেন। এ কথাটীও একটু পরিষ্কার করা আবশ্যক।

আমরা বলিয়াছি যে, বাহ্যজগতের মূলে এক নিত্যসত্ত্বা আছে, তাহারই বক্ষে এই বিশাল পরিবর্ত্তন প্রবাহ চলিয়া যাইতেছে। সাংখ্য এই নিত্য সত্ত্বার নাম "প্রকৃতি" বা "অব্যক্ত" রাখিয়াছেন। এই প্রকৃতি অবশ্য পাশ্চাত্য দার্শনিকের পরমাণু বা Atoms নহে। বরং অণুর Essenceকে প্রকৃতি বলা যাইতে পারে। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অবস্থাতেই atom বলা যায়, এ atomএর একরূপ ধ্বংশ আছে। এবং ইহার extensionও আছে। কিন্তু যাহা পরে ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য হইয়াছে, অবশ্যই তাহা পূর্ব্বে অব্যক্তভাবে বর্ত্তমান ছিল। একথা Tyndall এবং Herbert Spencerএর ন্যায় বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণও স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। অতএব atomsএর যাহা পূর্ব্ববর্ত্তী, অব্যক্ত, সূক্ষ্ম, শক্তিময় অবস্থা,—যে অবস্থা হইতে atoms ক্রমে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অবস্থায় আসিয়াছে, তাহাই নিত্য প্রকৃতি।

* এই প্রবন্ধে আমরা অণু বা পরমাণু শব্দ পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকের Matter যে অর্থে ব্যবহৃত হয়, সে অর্থে ব্যবহার করি নাই। Matter ও অণু এক কথা নহে।

কেন না, উহা নিত্য না হইলে, আসিল কোথা হইতে? এই অব্যক্ত প্রকৃতিতে, রূপ রসাদি গুণ ও সমস্ত নাম-রূপ, বীজে বৃক্ষ থাকার ন্যায়, লুক্কায়িত ছিল। ইহা হইতেই ক্রমে সমস্ত জগৎ কিরূপ প্রাদুর্ভূত হইয়াছে, সাংখ্য তাহার বিবরণ দিয়াছেন। যাহা নিত্যসত্তারূপে অবস্থিত ছিল, তাহা হইতে ক্রমে ক্রমে জাতি সমূহ (অবিশেষ) এবং জাতি হইতে ক্রমে ক্রমে ব্যক্তি সমূহ (বিশেষ) বাহির হইয়া আসিয়াছে। সমষ্টিভাবে দেখিতে গেলে, ইহাই বলিতে হয় যে, সেই এক অব্যক্ত উপাদান হইতে নানাবিধ ক্রিয়াবলে এই বিশ্ব প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। কিন্তু এই উপাদান, সেই ক্রিয়া বা পরিবর্ত্তনের মধ্যে চির-স্থির রহিয়াছে। ইহা Herbert Spencerএর "The one is not all worker of change." সাংখ্য এই অব্যক্তের সঙ্গে সঙ্গে আত্মচৈতন্যেরও যোগ রাখিয়াছেন। বেদান্ত একটু ভিন্ন পথে গিয়াছেন। আমরা অন্তর্জগতে অর্থাৎ মানসিক পরিবর্ত্তনের মধ্যে (Succession of ideas) যে একটী নিত্যসত্তার অনুভব করি, যাহা সমস্ত পরিবর্ত্তনের মধ্যে স্থির থাকিয়া যায়, বেদান্ত সেই নিত্য বস্তুকে "ব্রহ্ম" শব্দে ধরিয়া লইয়াছেন। বহির্জগতের অব্যক্ত সত্তাটীকে বেদান্ত, সেই চৈতন্যের সত্তারূপে, তাহারই শক্তিরূপে ধরিয়া উহারই অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। এইরূপে দুই সত্তাকে এক ধরিয়া লইয়া বেদান্ত জাগতিক পরিবর্ত্তনের রহস্য উদ্‌ঘাটিত করিয়াছেন। তাই, বেদান্তে এই চৈতন্যেরই প্রাধান্য। কিন্তু বুদ্ধ এই দুই নিত্যসত্তা সম্বন্ধে কোন কথা তোলেন নাই। তিনি কেবল যে যে পরিবর্ত্তন এই জগতে দেখা যাইতেছে, সেই পরিবর্ত্তনের কার্য্যকারণ শৃঙ্খলার কথা বলিয়া গিয়াছেন। এই তিন দর্শনে তাই ভিন্ন ভিন্ন 'প্রস্থান' হইয়াছে। কিন্তু একটী বিষয়ে তিন দর্শনেই বেশ মিল আছে। কিরূপে এই পরিবর্ত্তন প্রবাহ আসিতেছে ও যাইতেছে, কি কি কার্য্যকারণসূত্রে এই প্রবাহ ধৃত ও কিরূপে ইহা একটীর পর একটী জন্মিতেছে ও লয় পাইতেছে, তাহার বিবরণ প্রায় একইরূপ। আর একটী বিষয়েও মিল আছে। কিরূপে এই প্রবাহের সমূলে উচ্ছেদ করিতে হইবে এবং মানুষ যে তাহা করিতে পারে, এ কথারও মিল আছে। কিন্তু তাহা এই দর্শনত্রয়ের সাধন-প্রণালীর অন্তর্গত। সুতরাং তাহা আমাদের প্রতিপাদ্য বিষয় নহে।

তবে কি বৌদ্ধদর্শনে সেই নিত্যবস্তুর কোনই আভাষ নাই? কিন্তু সে কথা আমরা আগামীবারে বিবেচনা করিয়া দেখিব। (ক্রমশঃ)।

শ্রীকোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য এম্‌-এ,।

সাহিত্যে সহায়তা।

বিগত পঁচিশ বৎসরের মধ্যে বাঙ্গালা ভাষা যেরূপ উন্নতিলাভ করিয়াছে, তাহা ভাবিলে আনন্দ হয়। গল্পে শুনিয়াছি, কোনও গরীবের পুত্র ধনী হইয়া পিতাকে পিতা বলিয়া পরিচয় দিতে লজ্জিত হইয়াছিল। ইংরাজী-শিক্ষার প্রথম যুগে এদেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ও দীনহীনা মাতৃভাষাকে "মা" বলিয়া ডাকিতে লজ্জিত হইতেন। কিন্তু আজ আর সেদিন নাই। আজ শিক্ষিত-গণ মুক্তকণ্ঠে আপনার মাকে "মা" বলিয়া ডাকিয়া গৌরবান্বিত হইতেছেন, এবং স্বদেশ ও বিদেশ হইতে নানাবিধ ধনরত্ন ও বসনভূষণ সংগ্রহ করিয়া মাকে সাজাইতেছেন। স্বদেশীয় বিদেশীয় নানা প্রকার পুষ্পে ডালা পূরিয়া মায়ের চরণে দিতেছেন। বঙ্গীয় কাব্যকুঞ্জে শত শত বীণা বাজিয়া উঠিয়াছে। পুষ্প পুঞ্জের মধুর সৌরভে দিক্‌ আমোদিত হইতেছে। নিদাঘের প্রচণ্ড উত্তাপে যে ক্ষুদ্র নদী একেবারে শুষ্ক-বক্ষা বালুকাময়ী হইয়া গিয়াছিল, বর্ষার জল-সঞ্চারে আজি তাহা নির্ম্মলসলিলা কলনাদিনী শ্যামলতটিনী শ্রবণ নয়ন পরিতৃপ্ত করিতেছে। শব্দ, ভাষার প্রধান সম্পৎ। বঙ্গভাষার দ্বারদেশে আজি জগতের অধিকাংশ শব্দ-ভাণ্ডার খোলা রহিয়াছে, কিন্তু সকল অঙ্গে সকল ভূষণ মানায় না। অবয়ব, গঠন ও অঙ্গ দেখিয়া পরিচ্ছদ পরাইতে হয়। জুতার সঙ্গে গাউন সাজে, মলের সঙ্গে জুতা সাজে না। জ্যাকেটের উপর অনন্ত পরিলে একান্ত বিশ্রী হয়। এই গ্রীষ্মপ্রধান দেশে "উষ্ণ-চুম্বন"টা তেমন আরামদায়ক বা রুচিকর নহে। দেশ কাল ও প্রকৃতি বুঝিয়া উপাদান সংগ্রহ করিতে হয়। হিন্দু সতী, লক্ষহীরায় জড়িত হইয়াও যেমন হাতের লৌহতারটা পরিত্যাগ করেন না, সেইরূপ ভাষাও অশেষ পারিপাট্য, বহু আড়ম্বরের মধ্যে পড়িয়াও, প্রাকৃতিক অবস্থার সহিত তাহার যে সূক্ষ্ম সম্বন্ধ আছে, তাহা কিছুতেই পরিত্যাগ করিতে চাহে না। মনে হয় যেন উহাই ভাষার পাতিব্রত্যের চিহ্ন। যাহারা এই ধর্ম্মের দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া মাকে অযথা অলঙ্কারে সাজাইবেন, মা নিশ্চয়ই তাহাদের সে ভূষণ অঙ্গে রাখিবেন না।

প্রধানতঃ তিন প্রকারে বঙ্গভাণ্ডারে শব্দসম্পৎ সঞ্চিত হইতে পারে। এক প্রকার বিভিন্ন ভাষা হইতে শব্দ গ্রহণ, দ্বিতীয় প্রকার দেবভাষার

সাহায্যে শব্দ গঠন ও শব্দ শোধন। তৃতীয় প্রকার বঙ্গদেশের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে শব্দ গ্রহণ। প্রথম প্রকারের উপায় একরূপ অবলম্বিত হইতেছে, দ্বিতীয় প্রকারের অবলম্বনকারীদিগের সংখ্যা অতি অল্প মাত্র, তৃতীয় প্রকারের উপায় শৃঙ্খলা পূর্ব্বক অবলম্বিত হইতেছে না।

ফরিদপুরের কোন কোন স্থানে "বতর" শব্দ প্রচলিত আছে। বতর অর্থ (Harvest) শস্য কাটিবার কাল। বরিশালে "আয়ম" শব্দ প্রচলিত আছে। আয়ম বলিতে (Season) কাল বুঝায়। উহার ব্যবহার এইরূপ "আয়মে শস্য কিনিয়া রাখিতে হয়। আয়মে সমস্ত বস্তুই সস্তায় পাওয়া যায়। আয়মে না রাখিলে পশ্চাতে ঠকিতে হয়। এখন পাটের আয়ম নহে" ইত্যাদি। শস্য পরিপক্ক হইবার সময়কে আয়ম কহে, অথবা যে বস্তু যে সময়ে যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়, তাহাকে ঐ বস্তুর আয়ম কহে। কেবল কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপত্তিকাল বা প্রাপ্তিকাল সম্বন্ধেকেই "আয়ম" শব্দ ব্যবহৃত হয়। ঢাকা জেলার বিশেষতঃ বিক্রমপুরের অধিকাংশ স্থানে "ননাশ" শব্দ প্রচলিত। ননাশ—অর্থ স্বামীর জ্যেষ্ঠা ভগিনী। স্বামীর কনিষ্ঠা ভগিনী ননদিনী এবং জ্যেষ্ঠা ভগিনী "ননাশ।" ননদিনী সখী হইতে পারে কিন্তু ননাশ পূজনীয়া, তাহার সঙ্গে ভ্রাতৃবধূর হাস্য পরিহাস চলে না। বরিশালে "তড়" শব্দ প্রচলিত আছে। উহার প্রকৃত অর্থ "তট।" খুস্কী ও তড় একার্থ-বোধক। উহার ব্যবহার এইরূপ,—"নৌকায় আসিয়াছ কি তড়ে আসিয়াছ? যে দেশে নদী নাই সে দেশে তড়েই যাইতে হয়।" খুস্কী অপেক্ষা তড় সুশ্রাব্য এবং সংস্কৃতমূলক। বরিশাল ফরিদপুর ঢাকা জেলার অধিকাংশ স্থানে "নাইওর" শব্দ প্রচলিত, উহাকে কলিকাতার ভাষায় "নেয়োর" বলা যাইতে পারে। নাইওর অর্থ মেয়েদের পিত্রালয়। যাহারা পিত্রালয় কিম্বা পিতা মাতার সম্পর্কিত কোন কুটুম্ব আলয়ে বেড়াইতে যায়, তাহাদিগকে "নাইওরী" বা "নেয়োরী" মেয়ে বলে। "নাইওর" শব্দটী বোধ হয় হিন্দী "নৈহার" শব্দ হইতে গৃহীত। বাঙ্গালা ভাষায় এরূপ একটী শব্দের অভাব আছে।

উপরে কয়েকটী মাত্র দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইল। বঙ্গদেশের বিভিন্ন প্রদেশে এমন বহু শব্দ প্রচলিত আছে, যে সকল বর্ত্তমান বাঙ্গালা ভাষায় প্রবেশ লাভ করে নাই, অথচ ঐ সকল শব্দ দ্বারা ভাষার যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি ও পুষ্টি সাধিত হইতে পারে।

বর্ত্তমান কলিকাতা বঙ্গদেশের প্রধান স্থান, এজন্য বাঙ্গালা ভাষাও কলিকাতার অনুকরণ করিয়া চলিতে চাহিতেছে, তাহাতে কিছু ক্ষতি নাই। কিন্তু কলিকাতার বাহিরে যে অনেক বস্তু আছে; তাহা ভুলিয়া যাওয়া সঙ্গত নহে। শ্রীহট্টের কমলালেবু যেমন কলিকাতার বাজারে আদরের বস্তু, ফরিদপুরের "বতর" বা বরিশালের "আয়ম" সেইরূপ রাজধানীর শব্দ-সমাজে আদরের বস্তু হয়, ইহা বাঞ্ছনীয়। যে শব্দ কলিকাতায় ব্যবহৃত হয় না, বক্তৃতায় কি রচনায় সেরূপ শব্দ প্রয়োগ করিলে অনেক সময় উপহাসাস্পদ হইতে হয়। এইরূপ উপহাসের ভয়ে কলিকাতা ও চব্বিশ পরগণার বাহিরের প্রচলিত শব্দ বাঙ্গালা ভাষায় প্রবেশ লাভ করিতে পারিতেছে না। ইহাতে বঙ্গভাষার বিশেষ ক্ষতি হইতেছে। "সাহিত্য-পরিষৎ" কিম্বা "সাহিত্য সভা" বাঙ্গালা দেশের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে শব্দ সংগ্রহের জন্য চেষ্টা করিতেছেন কি না, জানি না। আজ কাল মফঃস্বলের অনেক স্থানে সাহিত্য-চর্চ্চা হইতেছে এবং প্রত্যেক জেলা হইতেই সাহিত্য বিষয়ক পত্রিকা প্রকাশিত হইতেছে, এ অবস্থায় উপরিলিখিতরূপ শব্দ সংগ্রহ করা কঠিন কার্য্য নহে। "সাহিত্যপরিষৎ" ও "সাহিত্যসভা" যদি যত্ন করেন, তবে মফঃস্বল হইতে এ বিষয়ের যথেষ্ট সাহায্য প্রাপ্ত হইতে পারেন। যদি তাঁহারা সেরূপ নাও করেন, তথাপি প্রত্যেক জেলাবাসী সাহিত্যসেবীর কর্ত্তব্য যে, স্বদেশীয় বিশেষভাব প্রকাশক শব্দ সকল সংগ্রহ করিয়া এবং কার্য্যকালে ঐ সকলের যথাব্যবহার করিয়া ভাষার পুষ্টিসাধন করেন।

শ্রীমনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা।

ইতর প্রাণীর বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়-শক্তি।

মানুষের পক্ষে মানুষকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রাণী মনে করা বোধ হয় স্বাভাবিক। এতটুকু আত্ম-প্রশংসা বোধ হয় সকল প্রাণীরই আছে; উহার অভাব হইলে তাহাদের অন্তঃকরণ সোশ্যালিষ্ট-মতের তীব্রবিষে জর্জ্জরিত হইত। "লোক রহস্য" কার দেখাইয়াছেন যে, হনুবংশীয়েরা মনুবংশীয়দের নির্ব্বুদ্ধিতা দেখিয়া অনেক হাস্য পরিহাস ও দন্ত বিকাশ করিয়া থাকে। যদি ইতর প্রাণীর ভাষা বুঝা যাইত, তবে বোধ হয় শুনিতে পাইতাম যে, বিষ্ঠার ক্রিমিরা

বলাবলি করিতেছে—"আমাদের মত ভাগ্যবান ও সুখী কে? মনুষ্য পশু পক্ষী প্রভৃতি ইতর (!) প্রাণীরা আপনাদের পা লইয়াই সর্ব্বদা বিব্রত—কত আছাড় খায়, কত বা পা ভাঙ্গে; আমাদের কিন্তু সে বালাই নাই। দিব্যি পরম সুখে গড়ায়ে গড়ায়ে অগ্রসর হই। আহারের অভাব নাই—দুর্ভিক্ষ কাহাকে বলে জানি না; ক্যা মজা! মনুষ্যের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা হীন জাতি যে মেথর, আমার সত্য সত্যই মনে হয়,সেই মেথররাও সন্ধ্যার পরে আহারের পূর্ব্বে পুত্র কন্যাদের সমক্ষে আলোচনা করিয়া থাকে, "আমাদের মত ক্ষমতা কার? যত বাবু ভূয়ারা আমাদের অনুগ্রহের ভিখারী, আমরা ইচ্ছা করিলে দুদিনে কলিকাতার সহরকে শ্মশানে পরিণত করিতে পারি। গবর্ণমেন্ট কি সাধে আমাদিগকে বিনা ভাড়ায় বাসা দিয়া থাকে?"

এই আত্মম্ভরিতা বশতঃই বোধ হয় ডেকার্ট ও ফেবার (Descartes and Fabre) এর মত বড় পণ্ডিতও বিশ্বাস করিতেন যে, ইতর প্রাণীদের বিচার শক্তি নাই; কেহ কেহ বা নিশ্চিত রূপে কোন মত প্রকাশ না করিয়া এ বিষয়ে সন্দিগ্ধ-চিত্ত ছিলেন। ফলতঃ যখন দেখিতে পাই যে, একদিন এক দধি-লোচন এক তৈল-পায়িকার লোভে আমার বাগুড়ায় বদ্ধ হইয়া ছট্‌ফট্‌ করিয়াছিল, শেষে আমি তাহার পক্ষপুট অলক্ত-রঞ্জিত করিয়া কৃপা বশতঃ তাহাকে অক্ষত দেহে ছাড়িয়া দিয়াছিলাম; আর দু দিন পরেই সেই বাছা দধিলোচন সেই তৈল-পায়িকার লোভে তেমনি ফাঁদে পড়িয়া থতমত খাইতেছে, অথবা যখন দেখিতে পাই যে, আমার ধবলী গাই প্রতিদিন মিয়াজান্ মিঞার মটরক্ষেতে গিয়া প্রহারে পরিক্লিষ্ট ও বক্রপৃষ্ঠ হইয়া আমার গোশালায় ফিরিয়া পূর্ব্ব দিনের আহার ও প্রহারের রোমন্থন করিতে করিতে ঘুমাইয়া পড়ে,তখন স্বতঃই মনে হয় যে,ইতর প্রাণীর বিচার-বুদ্ধি আদৌ নাই।

কিন্তু সকল দিক্ পর্য্যালোচনা করিলে এই কথা সত্য বলিয়া বোধ হয় না। তাহাদের বিচার শক্তি আমাদের মত প্রবুদ্ধ না হইতে পারে, কিন্তু এই বিষয়ে তাহাদের সহিত আমাদের যাহা কিছু পার্থক্য, তাহা প্রমাণগত,* প্রকার-গত নহে। পক্ষান্তরে তাহাদের কোন কোন ইন্দ্রিয় আমাদের অপেক্ষা সজীব, তাহাতে সন্দেহ নাই। যে আওয়াজ অত্যন্ত মোটা বলিয়া বা অত্যন্ত সূক্ষ্ম বলিয়া আমরা শুনিতে পাই না, অনেক ইতর প্রাণী তাহা শুনিতে পায়।

---

* 'প্রমাণ' শব্দ—এস্থলে পরিমাণ বুঝাইতেছে।

বায়ুর স্পন্দন হইতেই শব্দের উৎপত্তি। এই পুরোবর্ত্তী টেবিলের পৃষ্ঠে একটী অকপট চপেটাঘাত করিবা মাত্র উহার অণুগুলি স্পন্দিত হইবে; পরে সেই স্পন্দন সমীপবর্ত্তী বায়ুতে সংক্রামিত হইয়া, লোষ্ট্রাহত দীর্ঘিকার জলের বৃত্তাকার তরঙ্গমালার ন্যায়, ক্রমশঃ দূরে প্রধাবিত হইবে, এবং পরিশেষে যখন সেই স্পন্দিত বায়ু আমাদের কর্ণ-পটহকে আঘাত করিবে, তখনই আমাদের শব্দজ্ঞান হইবে। আহত বস্তু ও আঘাতের প্রকার অনুসারে এই স্পন্দন দ্রুত ও মৃদু হইয়া থাকে। হরিদাস বৈরাগী যখন মোটা আওয়াজে "ওরে রাসশশী, হরি বনবাসী" বলিয়া গাইতে থাকে, আর সেই সময়ে তাহার গলার শিরাগুলি সারিবদ্ধ হইয়া মনসা পূজার অষ্ট নাগের মত শোভা পাইতে থাকে, তখন তাহার সেই আওয়াজ প্রতি সেকণ্ডে বায়ুর ২৫।৩০ বার স্পন্দন হইতে জন্মিয়া থাকে। বাঘের হাড়ী-পানা মুখ হইতে যে ঘর্ঘর ধ্বনি নির্গত হইয়া শ্রোতার ও বসুমতীর বক্ষঃস্থল কম্পিত করিয়া থাকে, তাহাও উক্ত প্রকার স্পন্দন হইতে জাত। পক্ষান্তরে গমনোন্মুখ বাষ্পীয় শকটের ইঞ্জিন্ হইতে যে কর্ণ-পটহ-বিদারী চিৎকার বহির্গত হয়, বা একটী লৌহ-পাত্রের উপরে সজোরে একটী ব্রেক্ টানিয়া দিলে যে কন্‌কনে আওয়াজ্ নির্গত হয়, তাহা প্রতি সেকণ্ডে বায়ুর ২।৩ সহস্র স্পন্দন হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

বায়ুর স্পন্দন সংখ্যা যদি প্রতি সেকণ্ডে ১৪।১৫ অপেক্ষা কম হয়, অর্থাৎ আওয়াজ যদি অত্যন্ত মোটা হয়, তবে আমরা উহা শুনিতে পাই না। আর যদি স্পন্দন সংখ্যা ৩৫ হাজারের উপরে উঠে, তখনও উহা আমরা শুনিতে পাই না।* মাইক্রোফোন্ নামক যন্ত্র আমাদের প্রথমোক্ত অভাব কিয়ৎ পরিমাণে মোচন করিয়াছে।

---

* অত্যন্ত মোটা ও অত্যন্ত সূক্ষ্ম—উভয় প্রকার আওয়াজই আমরা শুনিতে পাই না। ইহার সঙ্গে উত্তাপ ও শৈত্য সম্বন্ধীয় নিম্নলিখিত বিষয়টী ভাবিয়া দেখিবার যোগ্য। অত্যন্ত শীতল ও অত্যন্ত উষ্ণ—উভয় প্রকারের পদার্থই স্পর্শ করিতে আমাদের কাছে একরূপ বোধ হয়। পঞ্চম বর্ষীয় একটী শিশুর হস্তে এক টুক্‌রা বরফ দিয়াছিলাম, বালক "তত্ত, তত্ত" বলিয়া উহা ফেলিয়া দিয়াছিল।

খুব্ শীতল পদার্থের অণুর স্পন্দন নাই বলিলেই হয়; খুব গরম জিনিষের অণুর স্পন্দন এত দ্রুত যে আমাদের স্পর্শেন্দ্রিয় চর্ম্ম সেই স্পন্দন ধরিতে পারে না। তাই অতি শীতল ও অতি উষ্ণ পদার্থ একই প্রকারই অনুভূত হয়।

কিন্তু এমন অনেক ইতর জন্তু আছে, যাহারা উপরোক্ত উভয় প্রকারের শব্দই বিনা যন্ত্র সাহায্যে শুনিতে পারে; এবং তাহা মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। পরীক্ষা দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, যে সকল বর্ণ আমরা ধরিতে পারি না, অনেক ইতর প্রাণী তাহা পারে।

কোন বস্তুর অণুর স্পন্দন দ্বারা বায়ু স্পন্দিত হইয়া যেমন শব্দের উৎপত্তি করে, সেইরূপ উক্ত স্পন্দন দ্বারা ঈথর নামক সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অপ্রতিহত-গতি পদার্থ স্পন্দিত হইয়া আলো ও বর্ণের উৎপত্তি ঘটায়। প্রতি সেকণ্ডে স্পন্দনের সংখ্যার তারতম্যানুসারে রক্ত পীতাদি বিভিন্ন বর্ণের সৃষ্টি হয়। সর্ব্বাপেক্ষা অল্প সংখ্যক স্পন্দনে লোহিত বর্ণের উৎপত্তি। যতই স্পন্দনের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়, ততই রামধনুর বর্ণপটের লোহিত প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তের দিকে বর্ণগুলি অগ্রসর হইতে থাকে। উহার লোহিত ও বেগুণে * প্রান্তের বাহিরেও অনেকগুলি বর্ণ আছে, তাহা আমাদের চক্ষু গ্রহণ করিতে অক্ষম; (তাপমান যন্ত্র দ্বারা লোহিত প্রান্তের বহিঃস্থ বর্ণের ও ফটোগ্রাফের সাহায্যে বেগুণে প্রান্তের বহিঃস্থ বর্ণের অস্তিত্ব প্রমাণিত হইয়াছে।) কোন কোন নিম্নশ্রেণীস্থ প্রাণী বেগুণে প্রান্তের বহির্দেশস্থ এই বর্ণগুলি ধরিতে সমর্থ, তাহা লর্ড এভবারী (Lord Avebury) নামক বৈজ্ঞানিক সম্প্রতি সপ্রমাণ করিয়াছেন।

মোটামুটী হিসাবেও আমরা দেখিতে পাই যে, মার্জ্জারের দর্শন ও শ্রবণ শক্তি উভয়ই আমাদের চেয়ে বেশী। সে যেরূপ অন্ধকারে দেখিতে পায় ও ইন্দুরের সামান্য পদশব্দে তাহার অনুসরণ করিয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলে, তাহা মনুষ্যের অসাধ্য। কুকুরের ঘ্রাণশক্তি প্রসিদ্ধ। পিপীলিকা তাহার ঘ্রাণশক্তি বলে লেখকের মশারীর উপরিস্থ লুক্কায়িত আমসত্ত্ব খাইয়া ফেলিয়াছিল। কপোত তাহার কোন্ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে স্বীয় বাসস্থান হইতে বহুদূরে নীত হইয়াও পুনরায় স্ব ভবনে প্রত্যাবর্ত্তন করে, তাহা মনুষ্যের বুদ্ধির অতীত। গৃধ্র কত উচ্চ হইতে প্রান্তরস্থিত গো-মহিষাদির মৃতদেহ দেখিতে পায়,—আমরা দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্য ব্যতিরেকে তাহা পারি কি?

শ্রীশ্রীনিবাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

---

* রামধনুর সাতটী বর্ণ শ্রেণীবদ্ধ ভাবে মনে রাখিবার পক্ষে নিম্নলিখিত সূত্রটী খুব সাহায্য করিবে বলিয়া আশা করা যায়;—

বেনী কহ পীম লো।

বে = বেগুণে (ভায়লেট।) নী = নীল। ক = কটা। হ = হরিত। পী = পীত
ম = মহাবর্ণ (কমলা রং।) লো = লোহিত।

মোহাম্মদ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

মোহাম্মদ জন্মভূমি দর্শন করিয়া তিন দিন পর মদিনায় প্রত্যাগমন করিলেন।

মোহাম্মদ সিরিয়ার নিকটবর্ত্তী মুতা নামক স্থানে ধর্ম্মপ্রচার জন্য দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। তত্রত্য খ্রীষ্টান অধিবাসীরা তাহাকে হত্যা করে। মোহাম্মদ এই হত্যার প্রতিশোধ লইবার জন্য মদিনায় ফিরিয়া আসিয়া সৈন্য প্রেরণ করিলেন। মোসলমান সৈন্য মুতার সম্মুখবর্ত্তী হইলে তত্রত্য অধিবাসীরা তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া একান্ত বিব্রত করিয়া তুলিল। ক্রমান্বয়ে তিনজন মোসলমান সেনাপতি জীবন বিসর্জ্জন করিলেন। শেষে বীরশ্রেষ্ঠ খালেদ সেনাপতির পদ গ্রহণ পূর্ব্বক প্রবল পরাক্রমে শত্রু সৈন্য নাশ করিয়া বিজয় পতাকা উড্ডীন করিলেন। (৮ম হিজিরী) মোসলমান সৈন্য মদিনায় প্রত্যাবৃত্ত হইল। (১)

মুতার যুদ্ধের অল্পদিন পরেই কোরেশেরা সন্ধির নিয়ম ভঙ্গ করিয়া বেনীখুজা বংশীয় মোসলমানদিগকে আক্রমণ করিল। তাহারা কোরেশ-

---

(১) The army, on its return, though laden with spoil, entered the city more like a funeral train than triumphant pageant, and was received with mingled shouts and lamentations While the people rejoiced in the success of their arms, they mourned the loss of three of their favourite generals. All bewailed the fate of Jaafar, brought home a ghastly corpse to that city whence they had seen *him* so *recently sally forth in all* the pride of valiant manhood, the admiration of every beholder. He had left behind a beautiful woman and infant son. The heart of Mahomed was touched by her affliction. He took the orphan child in his arms and bathed in his tears But most he was affected, when he beheld the young daughter of his faithful Zeid appoaching him. He fell on her neck and wept in speechless emotion. A bystander expressed surprise that he shall give way to tears for a death which, according to Moslem doctrine, was but a passport to paradise. "Alas!" replied the prophet, these are the tears of friendship for the loss of a friend!" Irving

দিগকে দমন করিবার জন্য মোহাম্মদের সাহায্য প্রার্থনা করিল। তিনি কোরেশদিগকে দমন করিবার জন্য বিপুল আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন, অবিলম্বে দ্বাদশ সহস্র সৈন্য সমভিব্যাহারে মক্কা অভিমুখে যাত্রা করিলেন। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কোরেশ দলপতি আবুসুফিয়ান এবং মোহাম্মদের পিতৃব্য আব্বাস প্রভৃতি অগ্রসর হইয়া এসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। মোহাম্মদ বিপুলবাহিনীসহ আগমন করায় এবং দলপতিগণ এসলাম ধর্ম্ম-গ্রহণ করিয়া তাঁহার পক্ষাবলম্বী হওয়ায় কেহই আর তাঁহার গতিরোধ করিতে অগ্রসর হইল না। তিনি সগৌরবে মক্কায় প্রবেশ করিয়া কাবামন্দিরের তিনশত ষাইটটী মূর্ত্তি ভগ্ন করিলেন। কোরেশেরা বিস্মিত হইয়া এই দৃশ্য দেখিতে লাগিল। অতঃপর মক্কার সমস্ত নরনারী মোহম্মদের শরণাপন্ন হইয়া এসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। মোহাম্মদ কিয়দ্দিবস মক্কায় বাস করিয়া মদিনায় প্রত্যাগমন করিলেন।

পৌত্তলিকতার দুর্গস্বরূপ কাবামন্দিরে একেশ্বরের উপাসনা প্রতিষ্ঠিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই এসলাম ধর্ম্মের জ্যোতিঃ আরবদেশের সর্ব্বত্র বিকীর্ণ হইয়া অজ্ঞান তিমিরাচ্ছন্ন নরনারীর হৃদয় আলোকিত করিল। আরবদেশ হইতে দেব দেবীর উপাসনা বিলুপ্ত হইল।

হওয়াজন ওসকিফ ব্যতীত আরবের অন্য সমস্ত সম্প্রদায় এসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া মোহাম্মদের শরণাপন্ন হইল। তাঁহার ঐশ্বর্য্য, প্রভাব এবং প্রতিপত্তি সমধিক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল। হওয়াজন ওসকিফ বংশীয় অধিনেতৃগণ ত্রিশ সহস্র সৈন্য সংগ্রহ করিয়া মদিনা আক্রমণ করিবার জন্য বহির্গত হইল। মোহাম্মদ এই সংবাদ পাইয়া শত্রু সৈন্যের গতিরোধ করিতে সসৈন্যে যাত্রা করিলেন। হোনয়ন নামক স্থানে উভয় সৈন্য পরস্পরের সম্মুখীন হইলে তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। মোসলমান সৈন্য শত্রুর প্রবল আক্রমণ সহ্য করিতে না পারিয়া পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। মোহাম্মদ ও আবুসুফিয়ান উৎসাহপূর্ণ বাক্যে তাহাদিগকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। সৈন্যগণ তাহাদের উৎসাহ পূর্ণ বাক্যে উদ্দীপ্ত হইয়া শত্রুদিগকে দুর্জ্জয় পরাক্রমে আক্রমণ করিল। ,শত্রুকুল তাহাদের পরাক্রম প্রতিরোধ করিতে না পারিয়া পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিল। বিজয়লক্ষ্মী মোসলমানের অঙ্কশায়িনী হইলেন। শত্রু সৈন্যের ছয় সহস্র অশ্ব, চারি সহস্র উষ্ট্র ও চারি সহস্র রৌপ্য মুদ্রা মোসলমানদের হস্তগত হইল। একদল সাকিফ হওয়াজন সৈন্য রণক্ষেত্র হইতে

পলায়ন করিয়া আরব নগরে আশ্রয় গ্রহণ করিল। মোহাম্মদ আরব নগর অবরোধ করিলেন। কিয়দ্দিবস অতিবাহিত হইলে তত্রত্য অধিবাসীরা তাঁহার হস্তে আত্ম সমর্পণ করিয়া এসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিল।

মোহাম্মদ তায়েফ নগর পরিত্যাগ করিয়া সগৌরবে মদিনায় ফিরিয়া আসিলেন। তিনি মদিনায় প্রত্যাগমন করিয়া অবগত হইলেন যে, রোম-সম্রাট হিরাক্লিয়াস তাঁহার প্রতাপ খর্ব্ব করিবার জন্য আরব সীমান্তে বহু সংখ্যক সৈন্য সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। এজন্য তিনি বিপুল যুদ্ধায়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন। আবুবেকর প্রভৃতি প্রচার-বন্ধুগণ আপনাদের সঞ্চিত সমস্ত অর্থ মোসলমান জাতির রক্ষার জন্য উৎসর্গ করিলেন। মোসলমান রমণিগণ আপনাদের বসন ভূষণ বিক্রয় করিয়া লব্ধ অর্থ মোহাম্মদের হস্তে সমর্পণ করিল। মোহাম্মদ বিপুল বাহিনী সংগ্রহ করিয়া রোম সাম্রাজ্য আক্রমণ করিবার জন্য ধাবিত হইলেন। মোসলমান সৈন্য সিরিয়ার প্রান্তদেশে উপনীত হইল। এই সময় রোম সম্রাট সাম্রাজ্যের আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা দূর করিবার জন্য সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিয়াছিলেন। এজন্য তিনি মোসলমান সৈন্যের সম্মুখীন হইলেন না। মোহাম্মদ বিনা যুদ্ধে ফিরিয়া আসিলেন।

মোহাম্মদ মদিনায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া আরব দেশের সুশাসন ও আরব দেশের বহির্ভাগে ধর্ম্ম প্রচার জন্য মনোনিবেশ করিলেন। পার্শ্ববর্ত্তী রাজা সমূহের রাজন্যবৃন্দ মোহাম্মদের সঙ্গে সখ্য সংস্থাপন জন্য দুত প্রেরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। মোহাম্মদ অবিশ্রান্ত যুদ্ধ হইতে বিশ্রাম লাভ করিয়া পরমেশ্বরের ধ্যান ধারণায় নিরত হইলেন। কিন্তু তিনি দীর্ঘকাল শান্তিতে যাপন করিতে পারিলেন না। তাঁহার একমাত্র পুত্র অকালে কালগ্রাসে পতিত হইল। মোহাম্মদ একমাত্র বংশধরের অকাল মৃত্যুতে শোকে মুহ্যমান হইলেন। এই নিদারুণ শোকের সময়েও ধর্ম্মবিশ্বাস তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল না। তিনি প্রিয়তম পুত্রের সমাধির সময় আকুল কণ্ঠে বলিলেন, "হে পুত্র! আজ সাক্ষ্য প্রদান কর যে, ঈশ্বর তোমার প্রভু, পয়গম্বর তোমার পিতা এবং এসলাম তোমার ধর্ম্ম।" তিনি ঈশ্বরের নাম স্মরণ করিয়া দুঃসহ পুত্র-শোক সহ্য করিলেন। মোহাম্মদ মক্কা গমন করিতে ইচ্ছা করিলেন। তিনি দশম হিজিরীর জেলকদ মাসে মক্কা যাত্রা করিলেন। যথা সময়ে জন্ম ভূমিতে উপনীত হইয়া সমস্ত ক্রিয়া কলাপ সমাপন করিলেন। তারপর সমাগত মোসলমানদিগকে মধুর ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিয়া মদিনায় ফিরিয়া আসিলেন।

মোহাম্মদ মদিনায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া পীড়াক্রান্ত হইয়া পড়িলেন। ক্রমশঃ তাঁহার পীড়া অত্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল। একাদশ হিজিরীর রবি-ওল-আউল মাসের ৯ই তারিখ শুক্রবার আগত হইল। মোহাম্মদ চিরাগত প্রথামত মসজিদে উপাসনার জন্য গমন করিতে উদ্যত হইলেন, কিন্তু দৌর্ব্বল্য বশতঃ দুই এক পদ অগ্রসর হইয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার পরিবর্ত্তে আবুবেকর মসজিদে গমন করিয়া উপাসনা করিতে আরম্ভ করিলেন। ইহাতে সমবেত উপাসকগণ ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল, অনেকে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে আরম্ভ করিল। মোহাম্মদ এই সংবাদ পরিশ্রুত হইয়া আলী ও আব্বাসের স্কন্ধে ভর করিয়া মসজিদে গমন করিলেন। আবুবেকরের উপাসনা শেষ হইলে তিনি সমবেত মোসলমানদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন, "তোমরা আমার মৃত্যুর জনরব শুনিয়া ভীত হইয়াছ। কিন্তু ইতিপূর্ব্বে কি কোন পয়গম্বর চিরজীবী হইয়াছে যে, আমিও মৃত্যুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া তোমাদের সঙ্গে চিরকাল বাস করিব? সকলি ঈশ্বরেচ্ছায় সম্পন্ন হয়; সকলেরি নির্দ্দিষ্ট সময় আছে, তাহার অগ্র পশ্চাৎ করিবার কাহারও সাধ্য নাই। যিনি আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন, আমি তাঁহার নিকট ফিরিয়া যাইতেছি। তোমরা ঐক্য সূত্রে বদ্ধ থাকিও, পরস্পর প্রেম ও সম্মান করিও, বিপদের সময় একে অন্যের সাহায্য করিও, একে অন্যকে ধর্ম্ম বিশ্বাসে অটল থাকিতে ও সৎকার্য্য-সাধন করিতে উৎসাহিত করিও। ধর্ম্মবিশ্বাস এবং সৎকার্য্যই মানুষের মঙ্গল বিধান করিয়া থাকে। অন্য সকল কার্য্যই তাহাদিগকে ধ্বংসের পথে লইয়া যায়।"

মোহাম্মদ ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিয়া গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। ইহার তিন দিন পর (১) তিনি "প্রভো! তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক" বলিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। তাহার পবিত্র আত্মা নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিল। (২)

(১) ৬৩২ খ্রীষ্টাব্দ, ৮ই জুন, সোমবার।

(২) আমরা মোহাম্মদের ক্ষুদ্র আখ্যায়িকা এইখানে সমাপ্ত করিলাম। মোহাম্মদ খাদিজার মৃত্যুর পর বহু বিবাহ করিয়াছিলেন। এজন্য খ্রীষ্টান লেখকগণ তাঁহার যথেষ্ট নিন্দা করিয়াছেন। আমীর আলী প্রভৃতি আধুনিক মোসলমান লেখকগণ নানা কথা বলিয়া তাঁহার কার্য্যের সমর্থন করিয়াছেন। মোহাম্মদের জীবনী লিখিবার সময় তাঁহার বহু বিবাহ সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। কিন্তু আমরা এ সম্বন্ধে নীরব রহিলাম, পাঠকগণ ক্ষমা করিবেন।

মহাপুরুষ আরব জাতির উদ্দাম স্বভাব সংযত (১) এবং একেশ্বরবাদের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা করিয়া আপন জীবনব্রত সাধন পূর্ব্বক ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন।

মোহাম্মদ প্রথমতঃ ত্রয়োদশ বৎসর কাল মক্কায় বাস করিয়া এসলাম ধর্ম্ম প্রচার করেন। এই সময়ে তিনি স্বীয় পাবকশিখা সদৃশ উপদেশে কঠিন-হৃদয় আরবদিগকে বিগলিত করিতে যত্ন করেন। ইহাতে মক্কার অনেকে এসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করেন এবং মক্কার কোন কোন স্থানে (মক্কার বহির্ভাগের স্থান সমূহের মধ্যে মদিনার নামই সর্ব্বাগ্রে উল্লেখ-যোগ্য) এসলাম ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু সমগ্র আরবের লোক সংখ্যার তুলনায় এসলামধর্ম্ম-বিশ্বাসীর সংখ্যা নগণ্য ছিল। মোহাম্মদ ত্রয়োদশ বৎসরের সাধনায়ও সাফল্যলাভ করিতে অসমর্থ হইয়া এবং বিরুদ্ধবাদী কোরেশদের উৎপীড়ন সহ্য করিতে না পারিয়া সশিষ্যে মদিনার আশ্রয় গ্রহণ করেন। মদিনার অনুরক্ত শিষ্যগণের সাহায্যে মোহাম্মদ ধর্ম্মমণ্ডলীর প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহাকে রাজশক্তি সম্পন্ন করিয়া তুলেন। এই ধর্ম্মমণ্ডলীর সহায়তায় তিনি এসলাম ধর্ম্ম প্রচারে ব্রতী হন। তাঁহার অদম্য ধর্ম্মোৎসাহ, সর্ব্বগ্রাহী সাম্যবাদ (২) উদ্দীপনা পূর্ণ বাগ্মীতা,

(১) আরব জাতির উদ্দাম স্বভাব সংযত করিবার কিরূপ অসাধারণ ক্ষমতা মোহাম্মদের ছিল, তাহা প্রদর্শন করিবার জন্য আমরা একটা বিষয়ের উল্লেখ করিতেছি। তৎকালের আরব সমাজে সুরার অতিশয় প্রচলন ছিল। অতি মৃদু প্রকৃতির লোকও সহসা সুরাপান পরিত্যাগ করিতে পারিত না। উগ্র প্রকৃতির আরবীয়দের পক্ষে পান-দোষ পরিত্যাগ করা একরূপ অসম্ভব ছিল। চতুর্থ হিজিরীতে মোহাম্মদ সুরাপানের অবৈধতা বিষয়ে প্রত্যাদেশ লাভ করেন। এই প্রত্যাদেশের বিষয় ঘোষণা দ্বারা প্রচার করা হইয়াছিল। এই ঘোষণা প্রচারকালে যাহারা মদ্যপান করিতেছিল, তাহারা পানপাত্র দূরে ফেলিয়া দিল আর সুরা স্পর্শ করিল না। সুরাপায়ীরা সমস্ত ভাণ্ড ভাঙ্গিয়া ফেলিল। পথে পথে সুরাস্রোত বহিল। এ ঘটনায় কেবল যে মোসলমানদের উপর মোহাম্মদের প্রভাব প্রকাশ পাইতেছে, তাহা নহে, ইহাতে তাহাদের সুগভীর সরল বিশ্বাসেরও প্রমাণ রহিয়াছে।

(২) এসলাম ধর্ম্মের সাম্যবাদ যথার্থই সর্ব্বগ্রাহী। মোসলমান মাত্রেই সমান। অতি নীচ মোসলমানেরও কোরাণ পাঠ ও মসজিদে উপাসনা করিবার অধিকার রহিয়াছে। রাজত্ব ও দাসত্বের মধ্যে কেবল গুণের প্রাধান্যে অনেক ক্রীতদাস বুদ্ধি ও শৌর্য্যবলে রাজসিংহাসন অধিকার করিয়াছেন। দাসত্ব প্রথা ঈদৃশ সাম্যবাদের বিরোধী বলিয়া মোহাম্মদ তাহার পক্ষপাতী ছিলেন না। যে সকল ব্যক্তি যুদ্ধে বন্দী হয়, কেবলমাত্র তাহাদিগকেই দাসত্বে আবদ্ধ করিবার নিয়ম তিনি অনুমোদন করেন। কিন্তু দাসত্ব মোচনই পরমেশ্বরের চক্ষে প্রীতিকর কার্য্য বলিয়া তিনি বর্ণনা করিয়াছেন।

নির্ম্মল চরিত্র, বিপুল সাহস এবং সুদৃঢ় সহনশীলতার কথা ক্রমশঃ আরবদেশে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে এবং তজ্জন্য আরবদেশের নানা স্থান হইতে বহু লোক আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করে। এই ভাবে আরবদেশের সর্ব্বত্র দ্রুতগতিতে এসলাম ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা আরম্ভ হয়। কিন্তু মোহাম্মদের জন্মভূমি মক্কার অধিবাসী কোরেশদের চিত্ত উত্তরোত্তর অধিকতর বিদ্বেষ-বিষে পূর্ণ হইয়া উঠে। মোহাম্মদ পঞ্চ বৎসর মদিনায় অতিবাহিত করিয়া সশিষ্যে মক্কা দর্শন জন্য গমন করেন। এই সময়ে তিনি কোরেশদের সঙ্গে সন্ধি সংস্থাপন করেন। এই সন্ধি ইতিহাসে হোদয়বিয়ার সন্ধি বলিয়া খ্যাত হইয়াছে। মোহাম্মদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রচার-বন্ধু আবুবেকর বলিয়াছেন;—"হোদয়বিয়ার সন্ধি স্থাপন জন্য এসলাম ধর্ম্মের যেরূপ প্রচার হয়, আর কিছুতে সেরূপ হয় নাই।" যে সকল এসলাম-ধর্ম্মবিশ্বাসী কোরেশদের হস্তে লাঞ্ছনার আশঙ্কায় আপনাদের ধর্ম্ম বিশ্বাস গোপন রাখিত, তাহারা হোদয়বিয়ার সন্ধিতে স্বাধীন ও প্রমুক্ত হইয়া প্রকাশ্যে এসলাম ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করে। ইহাতে অসংখ্য নরনারীর কুসংস্কার দূর হয় এবং তাহারা এসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করে। হোদয়বিয়ার সন্ধি স্থাপনের পর মোহাম্মদ মদিনায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্য পারস্যরাজ, রোমক সম্রাট, মিশরের শাসনকর্ত্তা ও আবিসিনিয়ার অধিপতির নিকট দূত প্রেরণ করেন। ইহার ফলে এই সব দেশে এসলাম ধর্ম্মের পক্ষপাতী কতিপয় ব্যক্তির উদ্ভব হয় এবং পারস্য রাজ্যের উপরিভাগস্থ য়মানের শাসনকর্ত্তা প্রজামণ্ডলীসহ এসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করে। হোদয়বিয়ার-সন্ধি স্থাপনের এক বৎসর পর মোহাম্মদ পুনর্ব্বার মক্কা দর্শন জন্য গমন করেন। এই সময়ে বহু লোক এসলাম ধর্ম্মে বিশ্বাস স্থাপন করে। ইহার পর বৎসর মোহাম্মদ মক্কার সমস্ত নরনারীকে এসলামধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। মক্কায় একেশ্বরবাদ পরিগৃহীত হইবার পর অচিরে সমগ্র আরবদেশে এসলাম ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

মোহাম্মদ মক্কায় শান্ত স্বভাব ছিলেন; বাক্যবলই তাঁহার একমাত্র সম্বল ছিল। কিন্তু তিনি মদিনায় তেজস্বিতা প্রকাশ করেন, বাহুবল তাঁহার সহায় হইয়াছিল। মক্কায় বাস কালে এসলাম ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা মন্দগতিতে

বন্দী ব্যতীত আর কাহাকে দাসত্ব নিগড় আবদ্ধ করিতে মোহাম্মদ নিষেধ করিয়াছেন; কিন্তু মোসলমান সমাজে আজ পর্য্যন্তও দাস বিক্রয়ের প্রথা প্রচলিত রহিয়াছে। এ প্রথা যে এসলাম শাস্ত্রবিরুদ্ধ, তাহাতে সন্দেহ নাই।

হইয়াছিল, মদিনা গমনের পর হইতেই দ্রুতগতিতে এসলাম ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা আরম্ভ হয়। এ কারণ অনেকে মনে করেন যে, মোহাম্মদ বাক্যবলে ধর্ম্ম প্রচার করিতে অসমর্থ হইয়া বাহুবলের আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক কৃতকার্য্য হন।

কি প্রণালীতে এসলাম ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা হয়, তাহার রেখাপাত আমরা পূর্ব্বেই করিয়াছি। মোহাম্মদ মদিনায় গমন করিয়া যতবার যুদ্ধযাত্রা বা অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন, আমরা তাহারও সংক্ষিপ্ত অথচ আমূল বৃত্তান্ত প্রদান করিয়াছি। তাঁহার আদেশে মোসলমান সৈন্য তেত্রিশবার যুদ্ধযাত্রা বা অস্ত্রধারণ করিয়াছিল। তন্মধ্যে তেরবার কোরেশদিগের বিরুদ্ধে, ছয়বার ইহুদিদের বিরুদ্ধে, দুইবার খ্রীষ্টানদের বিরুদ্ধে এবং বারবার বারটী বিভিন্নসম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা বা অস্ত্রধারণ করা হইয়াছিল। এসলাম ও মোসলমানের বিরুদ্ধবাদীদের মধ্যে কোরেশদের শত্রুতাচরণই সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান ছিল। কোরেশদের নিম্নেই ইহুদিদের বিদ্বেষভাব প্রবল ছিল। কোরেশ ও ইহুদি ধরাপৃষ্ঠ হইতে এসলাম ও মোসলমানদের চিহ্ন পর্য্যন্ত মুছিয়া ফেলিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছিল। মোহাম্মদ ত্রয়োদশ বৎসর কাল বাক্যবলে শত্রুতাচরণ নির্ব্বৃত্ত করিতে যত্ন করেন। কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া বাহুবলের প্রয়োগ করেন। মোহাম্মদ আত্মরক্ষা বা শত্রুনাশ (১) করিবার উদ্দেশ্যেই অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন। এজন্যই আমরা দেখিতে

---

(১) কোন কোন খ্রীষ্টান-লেখক লিখিয়া গিয়াছেন যে, লুণ্ঠনলোলুপ আরবদের প্রীতির জন্যই মোহাম্মদ অনেক স্থানে অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন। আমাদের ইহা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। মোহাম্মদ নিজে নির্লোভ মহাপুরুষ ছিলেন। আমরা শ্রীযুক্ত গিরিশ বাবুর গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া একটা ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। মোহাম্মদ অন্তিমকালে কতকগুলি স্বর্ণমুদ্রা প্রাপ্ত হন। তিনি নিজ কার্য্যের জন্য ৬।৭টা রাখিয়া অবশিষ্টগুলি বিতরণ করিবার জন্য আয়েসার হস্তে অর্পণ করেন। ইহার কিছু কাল পরেই তিনি ব্যাধির যন্ত্রণায় সংজ্ঞাশূন্য হন। তিনি সংজ্ঞালাভ করিয়া মোহরগুলি বিতরণ করা হইয়াছে কি না, তাহাই প্রথমে জিজ্ঞাসা করেন। আয়েসা না করেন। তিনি মোহরগুলি দরিদ্রদিগকে দান করিতে বলিয়া পুনর্ব্বার সংজ্ঞাশূন্য হন। মোহাম্মদ কিছুকাল পরে সংজ্ঞালাভ করিয়া মুদ্রাগুলি বিতরণ করা হইয়াছে কি না, পুনঃ জিজ্ঞাসা করেন। আয়েসা না করেন। ইহাতে মোহাম্মদ মোহরগুলি আলীর হাতে দেন। আলী বিতরণ করিলে তিনি বলেন, "এক্ষণে আমি শান্তিলাভ করিলাম।" ঈদৃশ মহাপুরুষ যে শিষ্যগণের লুণ্ঠন বাসনা চরিতার্থ করিবার জন্য নররক্তপাত করিবেন, তাহা আমাদের বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না।

পাই যে, যাহার বিদ্বেষভাব যত প্রবল ছিল, তাহার বিরুদ্ধে তত অধিকবার যুদ্ধ যাত্রা বা অস্ত্র ধারণ করা হইয়াছিল। বস্তুতঃ মোহাম্মদ বাহুবলের সাহায্যে ধর্ম্ম প্রচার করেন নাই। তাঁহার অনুষ্ঠিত যুদ্ধের ফলে কদাচিৎ কেহ এসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল। তবে এ কথা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, শত্রুকুল যুদ্ধক্ষেত্রে পরাজয় নিবন্ধন দুর্ব্বল হইয়া পড়াতে গৌণভাবে তরবারি এসলাম ধর্ম্মের পথ পরিষ্কৃত করিয়াছিল। একেশ্বরবাদের শ্রেষ্ঠতা এবং মোহাম্মদের গুণগ্রামই মুখ্যভাবে এসলাম ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠার হেতু ছিল। আমরা একটী দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছি। মোহাম্মদ দ্বাদশ সহস্র সৈন্য সমভিব্যাহারে মক্কায় প্রবেশ করেন। তাঁহার বিপুল বাহিনীর নিকট কোরেশরা মস্তক অবনত করিতে বাধ্য হয় এবং শত্রুতাচরণ পরিত্যাগ করে। তিনি তরবারি দূরে নিক্ষেপ করিয়া প্রেম ও করুণা বিস্তার পূর্ব্বক তাহাদিগকে এসলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। মোহাম্মদ বিজয়ী বীরের ন্যায় মক্কায় প্রবেশ করিলে অধিনেতৃবৃন্দ দণ্ডভয়ে ব্যাকুল চিত্তে তাঁহার নিকট আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। তিনি তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করেন, "তোমরা কি ভাবিতেছ ?" তাহারা উত্তর করে, "ক্ষমাশীল পিতার পুত্র, আপনি আমাদের উপর ক্ষমতা লাভ করিয়াছেন।" মোহাম্মদ প্রত্যুত্তরে বলেন, "পুরাকালে ইউসফ উৎপীড়নকারীদিগকে ক্ষমা করিয়া যাহা বলিয়াছিলেন, অদ্য আমি তাহারই পুনরুক্তি করিতেছি। তোমাদিগকে তিরস্কার করিব না, ঈশ্বর পরম দয়ালু, তিনি তোমাদের সমস্ত অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন। তোমরা স্বাধীন, ইচ্ছা করিলে চলিয়া যাইতে পার।" মোহাম্মদের সৌজন্য ও সদ্ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া সমস্ত মক্কা এসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করে।

মোহাম্মদের জীবন পরমেশ্বরের সেবা ও মানব জাতির কল্যাণের জন্য উৎসর্গীকৃত হইয়াছিল। এ জীবনের আদ্যন্ত মধুময়। মোহাম্মদ আত্মীয় স্বজনে স্নেহশীল ও বন্ধুবান্ধবে প্রীতিমান ছিলেন, তিনি দাস দাসীর সঙ্গে সাতিশয় সদ্ব্যবহার করিতেন। তাঁহার তিরোভাবের পর আনস নামক একজন ভৃত্য বলিয়াছিল, আমি ১০ বৎসর কাল মহাপুরুষের অধীনে কাজ করিয়াছি ; তিনি এক দিনের জন্যও আমাকে কটু কথা বলেন নাই। বালক বালিকা তাঁহার অত্যন্ত প্রিয় ছিল, অনেক সময় তাঁহাকে পথিমধ্যে দাঁড়াইয়া বালক বালিকাদিগকে আদর করিতে দেখা যাইত। তিনি জীবনে কাহাকেও

কখন প্রহার করেন নাই। অভিসম্পাত বা কটুবাক্য এক দিনের জন্যও তাঁহার রসনা কলুষিত করে নাই।

মোহাম্মদ পীড়িতের সেবা করিতেন, শবাধার দেখিলেই বহন করিয়া সমাধি স্থানে লইয়া যাইতেন। ক্রীতদাসের গৃহে সানন্দে ভোজন করিতেন, স্বহস্তে জীর্ণ বস্ত্র সংস্কার করিয়া পরিধান করিতেন, অনেক সময় স্বয়ং গাভী দোহন করিতেন। তিনি সৌজন্যের আধার ছিলেন। কাহারও সঙ্গে সাক্ষাৎকালে হস্ত মর্দ্দন করিবার সময় তিনি কখন প্রথমে হস্ত পরিত্যাগ করিতেন না। কেহই তাঁহার স্থায় মুক্তহস্ত, বীর হৃদয় ও সত্যনিষ্ঠ ছিল না। তিনি আশ্রিতকে আশ্রয় দান করিতে একান্ত তৎপর ছিলেন। তিনি সাতিশয় মিষ্টভাষী ও প্রিয়বাদী ছিলেন। "সত্যং ব্রূয়াৎ, প্রিয়ং ব্রূয়াৎ, নব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ং" এই নীতি তিনি অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করিতেন। তিনি শোকার্ত্তকে সান্ত্বনা ও দরিদ্রকে উৎসাহ প্রদান জন্য অতি দীন হীন ব্যক্তির গৃহেও অকুণ্ঠিত চিত্তে গমন করিতেন। তাহাদের অনেকে তাঁহাকে পথি মধ্যে ধরিয়া আপনাদের দুঃখ কাহিনী নিবেদন করিত। একবার তিনি অনবসর বশতঃ একজন ধর্ম্ম জিজ্ঞাসু অন্ধকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। এ কারণ তিনি আমরণ অনুশোচনা করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিতেন, আমি ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসু অন্ধকে প্রত্যাখ্যান করিয়া ঈশ্বরের অভিপ্রায়-বিরুদ্ধ কার্য্য করিয়াছি। গরিব দুঃখীর জন্য তাঁহার দ্বার সর্ব্বদা উন্মুক্ত থাকিত। অনেক গৃহহীন নিরাশ্রয় ব্যক্তি তাঁহার গৃহে রাত্রি যাপন করিত। তিনি আহারে প্রবৃত্ত হইবার প্রাকালে পরমেশ্বরের আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা ও আহারান্তে তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেন। তাঁহার জীবনে এক দিনের জন্যও এ নিয়মের ব্যত্যয় হয় নাই। তিনি প্রবল শত্রুকেও অকুণ্ঠিত চিত্তে ক্ষমা করিতেন।

মোহাম্মদ কোন প্রকার বিলাসিতার প্রশ্রয় দিতেন না। তাঁহার ভোজ্য ও পরিচ্ছদ অতি সামান্য ছিল। এক এক দিন তাঁহাকে অন্নাভাবে অনাহারে থাকিতে হইত। অনেক সময় কেবল মাত্র খর্জ্জুর ও জল তাঁহার ক্ষুন্নিবৃত্তি করিত। কোন কোন রাত্রিতে তৈলাভাবে তাঁহার গৃহে সন্ধ্যা দীপ জ্বলিত না। মোসলমান ঐতিহাসিকগণ বলেন, পরমেশ্বর তাঁহার নিকট পৃথিবীর ধনভাণ্ডার খুলিয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি তাহা প্রত্যাখ্যান করেন।

ফলতঃ, আত্ম প্রতিষ্ঠা অথবা আত্মসুখ মোহাম্মদের জীবনের উদ্দেশ্য

ছিল না। একমাত্র অদ্বিতীয় পরমেশ্বরের উপাসনার প্রতিষ্ঠা, পাপে আকণ্ঠ-নিমজ্জিত আরব সমাজের উদ্ধার এবং বহুধা বিভক্ত আরব জাতির ঐক্য-বন্ধন মোহাম্মদের প্রতি কার্য্যের মূল মন্ত্র ছিল। তাঁহার সফল জীবন; তিনি স্বীয় মূল মন্ত্রে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার অলৌকিক সাধনায় মূর্খতা ও কুসংস্কার-সমাচ্ছন্ন আরব দেশে সত্য ধর্ম্মের রশ্মি বিকীর্ণ হইয়া পড়ে, সে রশ্মি-সম্পাতে আরব দেশের সর্ব্ব প্রকার কুপ্রথা, কদাচার ও কুসংস্কার দূরীভূত হয় এবং তদ্দেশবাসিগণ ধর্ম্মে ও চরিত্রে সমুজ্জ্বল হইয়া উঠে। আরবগণ এক মহামন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া সমস্ত বিবাদ বিসম্বাদ বিস্মৃত হয় এবং ঐক্যবলে অসাধ্য সাধন করিতে আরম্ভ করে। আমরা মহাত্মা-কার্লাইলের বাক্য উদ্ধৃত করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি।

"To the Arab nation it was as a birth from darkness into light; Arabia first become alive by means of it. A poor shepherd people, roaming unnoticed in its deserts since the creation of the world: a Hero-prophet was sent down to them with a word they could believe: see, the unnoticed becomes world-notable, the small has grown world great; within one century afterwards, Arabia, is at Granada on this hand, at Delhi on that;—glancing in valour and splendour and the light of genius, Arabia shines through long ages over a great section of the world. Belief is great, life giving. The history of a Nation becomes fruitful, soul-elevating, great, so soon as it believes. These Arabs, the man Mahomet, and that one century, is it not as if spark had fallen, one spark, on world of what seemed black unnoticeable sand; but lo the sand proves explosive powder, blazes heaven-high from Delhi to Granada; I said, the great man was always as lightning out of Heaven; the rest of men waited for him like fuel, and then they too would flame."

শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত।

চোখের বালি।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

"লুৎফউন্নিসা কহিলেন, "তুমি কি চাও? পৃথিবীতে কিছু কি প্রার্থনীয় নাই? ধন, সম্পদ, মান, প্রণয়, রঙ্গ, রহস্য পৃথিবীতে যাহাকে যাহাকে সুখ বলে, সকলই দিব; কিছুই প্রতিদান চাহিব না; কেবল তোমার দাসী হইতে চাহি। তোমার যে পত্নী হইব, এ গৌরবও চাহি না, কেবল দাসী!"

—লুৎফ্‌উন্নিসা আবার তাঁহার বস্ত্রাগ্র ধরিয়া কহিলেন,

"ভাল, সে যাউক। বিধাতার যদি সেই ইচ্ছা, তবে চিত্তবৃত্তি সকল অতল জলে ডুবাইব। আর কিছু চাহি না, এক একবার তুমি এই পথে যাইও; দাসী ভাবিয়া এক একবার দেখা দিও, কেবল চক্ষুঃ পরিতৃপ্ত করিব।"

* * * সহসা লুফ্‌উন্নিসা বাতোন্মূলিত পাদপের ন্যায় তাঁহার পদতলে পড়িলেন। বাহুলতায় চরণযুগল বদ্ধ করিয়া কাতর স্বরে কহিলেন, নির্দ্দয়! আমি তোমার জন্য আগ্রার সিংহাসন ত্যাগ করিয়া আসিয়াছি। তুমি আমায় ত্যাগ করিও না!" *

উল্লিখিত নায়িকা দুইটীর মধ্যে কোন্‌টী প্রেমিকা এবং কোন্‌টী বিলাসিনীর চিত্র, পাঠকগণ সে গুরুতর সমস্যার মীমাংসা করিবেন। রমণী যেরূপ প্রেমের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, তেমনি অভিমানের জীবন্ত প্রতিমা। উপেক্ষিত, অনাদৃত অথবা প্রত্যাখ্যাত হইলে রমণী-হৃদয়ে অভিমানের অনল জ্বলিয়া উঠে। অভিমান নারী হৃদয়ের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম! প্রেম-নৈরাশে অভিমান নারী হৃদয়ে বল বিধান করে। সে স্থলে অভিমানে জলাঞ্জলী দিয়া প্রেম যাচ্ঞা করা রমণী-প্রকৃতি-বিরুদ্ধ। উপনায়কের প্রেমে উন্মাদিনী হইয়া বিনোদিনী মান, অভিমান, ঘৃণা, লজ্জায় জলাঞ্জলী দিয়াছেন। বলি ইহাই কি প্রেমিকার চিত্র?

* কপালকুণ্ডলা ৮৭ ও ৮৮ পৃষ্ঠা।

মহেন্দ্রের চরিত্রও কাপুরুষতার চরম নিদর্শন। তিনি আত্মীয়, স্বজন, সমাজ, এমন কি আশালতার ন্যায় জীবনসঙ্গিনী সাধ্বী স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়াও বিনোদিনী লাভের জন্য উন্মত্ত। অপিচ দিবালোকে প্রকাশ্যভাবে কুলবধূকে কুলের বাহির করিয়া নির্লজ্জতা ও কাপুরুষতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন; তিনিই আমাদের সমালোচ্য গ্রন্থের নায়ক। গ্রন্থকার স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়াই মহেন্দ্রের চিত্রে কলুষ পঙ্কিলতায় আবিল করিয়াছেন। এ দিকে মহেন্দ্র এম-এ পাশ শিক্ষিত যুবক। বিশ্ব বিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ডাক্তারী পড়িতেছেন। দীনবন্ধু বাবুর বন্ধু নিমেদত্ত, মাতাল, লম্পট ও কলুষিত চরিত্রের আধার। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষোত্তীর্ণ অথবা কোনরূপ শিক্ষিত নামের যোগ্য নহে। সুতরাং সেরূপ কলঙ্ক পঙ্কিলতা মহেন্দ্রের চিত্রে আরোপ করা সুরুচি-সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। উচ্চ শিক্ষার পরিণাম যদি এরূপ বিষময় হয়, তবে উহা যত শীঘ্র এদেশ হইতে বিলুপ্ত হয়, ততই জনসাধারণের মঙ্গল। অপিচ সমাজের শিক্ষা, সংস্কার অথবা উন্নতির জন্য গ্রন্থকার আদর্শ চিত্র কল্পনা করিতে পারেন; কিন্তু সমাজের অধঃপতনের জন্য নয়।

মহেন্দ্রের মত নির্ব্বোধ ও কাণ্ডজ্ঞানশূন্য বোধ হয় দ্বিতীয় নাই। বিনোদিনী, তাঁহার প্রেমে উৎসাহ দেওয়া দূরে থাকুক, তাঁহাকে তিরস্কৃত, লাঞ্ছিত অথবা পাদলেহী কুক্কুরের মত অপমানিত করিতে কুণ্ঠিত নহে। অপিচ সে যে বিহারীকে প্রাণের সহিত ভালবাসে, ইহা নিজ মুখে মহেন্দ্রের নিকট ব্যক্ত করিতেও কুণ্ঠিত নহে। যাহাকে হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রীদেবীরূপে স্থাপনা করিয়া যাহার জন্য জীবন উৎসর্গ করা যায়, সেই প্রেম-প্রতিমা অন্যের প্রণয়াকাঙ্ক্ষা হইলে হৃদয়ে ভীষণ আলোড়ন উপস্থিত হয়। তখন সে প্রতিমাকে স্থানচ্যুত করিতে যদি হৃদয় শতধা চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যায়, প্রেমিকগণ তাহাতেও কুণ্ঠিত হন না। কিন্তু মহেন্দ্র সে ধাতের লোক নয়। হতাশ প্রেমের তীক্ষ্ণ ছুরিকা তাহার স্থূল চর্ম্ম ভেদ করিয়া স্পৃষ্ট হয় না;—প্রেম-নৈরাশ্যে অভিমানের তীব্র হলাহল তাহার হৃদয়কে জর্জ্জরিত করে না। বস্তুতঃ মহেন্দ্র প্রেমিকও নহে,—কামুকও নহে,—লীলা-মর্কটের অবতার! বিনোদিনীর প্রেমের শিকল গলায় পরিয়া তিনি মর্কটের ন্যায় অভিনয় করিয়াছেন। কিন্তু বিনোদিনীর কাছে ঘেঁসিতে পারেন নাই;—তাহার ছায়া মাড়াইতেও কখনও সমর্থ হয় নাই। এরূপ ভেড়ানন্দ আর দুটী মিলে কি?

মহেন্দ্রের প্রেমের মোহ এখনও অপনীত হয় নাই। কিন্তু বিনোদিনী আবার প্রকাশ্যভাবে তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিলেন।

"মহেন্দ্র কহিল, "তবে তুমি কাহার জন্য সাজিয়াছ? কাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছ?"

বিনোদিনী আপনার বুক চাপিয়া ধরিয়া কহিল, "যাহার জন্য সাজিয়াছি, সে আমার অন্তরের ভিতরে আছে।"

মহেন্দ্র কহিল,—সে কে? সে বিহারী?

বিনোদিনী কহিল—তাহার নাম তুমি মুখে উচ্চারণ করিও না।

মহেন্দ্র। তাহারই জন্য তুমি পশ্চিমে ঘুরিয়া বেড়াইতেছ?

বিনোদিনী। তাহারই জন্য।

মহেন্দ্র। তাহারই জন্য তুমি এখানে অপেক্ষা করিয়া আছ?

বিনোদিনী। তাহারই জন্য।

মহেন্দ্র। তুমি মরিলে কত মঙ্গল হইত ভাবিয়া দেখ!

বিনোদিনী। তাহা জানি, কিন্তু যতদিন বিহারীর আশা আছে, ততদিন আমি মরিতে পারিব না।"

প্রেমের অন্তর্জলী ও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া এইরূপে সম্পন্ন হইয়া গেল!

এতদিন পরে বিনোদিনী সম্বন্ধে বিহারী স্বীয় অভিমত ব্যক্ত করিলেন।

"বিহারী অপমানের মাত্রা চড়িতে দেখিয়া মহেন্দ্রের হাত চাপিয়া ধরিল। কহিল, "মহেন্দ্র, বিনোদিনীকে আমি বিবাহ করিব তোমাকে জানাইলাম' অতএব এখন হইতে সংযতভাবে কথা কও!"

বোধ হয় মহেন্দ্রের এখন চৈতন্য হইয়াছে। তাই তিনি প্রেমের ব্যাপার হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া একেবারে চম্পট দিলেন। পাপের চিত্র অঙ্কিত করিয়া উপসংহারে তাহার বীভৎস পরিণাম প্রদর্শনে সমাজকে শিক্ষা দেওয়া উপন্যাস রচনার উদ্দেশ্য। কিন্তু এ গ্রন্থে তাহার কিছুই নাই। যে অবৈধ প্রেমের ফলে "রোহিণী" মরিল, "গোবিন্দ লাল" আত্মহত্যা করিলেন, সোণার সংসার ছারখার হইয়া গেল; তথাবিধ অবস্থায় মহেন্দ্রের কোনরূপ শাস্তি হওয়া কি উচিত ছিল না? বরং বিনোদিনী কথঞ্চিৎ ক্ষমার যোগ্য; কিন্তু মহেন্দ্রের পাপ কি গুরুতর নহে? রাজলক্ষ্মীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনাই কি এ হেন পাপের সমুচিত প্রায়শ্চিত্ত? যাহার চক্ষু আছে, তিনি বলিবেন,—না।

তার পর বিনোদিনী ও বিহারীর আকাঙ্ক্ষিত মিলন দৃশ্যটী পাঠক দেখিয়া লউন।

"বিনোদিনী তখন বিহারীকে বলিল—"যে কথা তুমি বলিলে, তাহা তোমার মুখ দিয়া কেমন করিয়া বাহির হইল? এ কি ঠাট্টা?"—

বিহারী বলিল—"না, আমি সত্যই বলিয়াছি, তোমাকে আমি বিবাহ করিব।"

বিনোদিনী। এই পাপিষ্ঠাকে উদ্ধার করিবার জন্য?

বিহারী। না। আমি তোমাকে ভালবাসি বলিয়া, শ্রদ্ধা করি বলিয়া!

বিনোদিনী। * * * কিন্তু ছি ছি, বিধবাকে তুমি বিবাহ করিবে! তোমার ঔদার্য্যে সব সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু আমি যদি এ কাজ করি,—তোমাকে সমাজে নষ্ট করি, তবে ইহ জীবনে আর মাথা তুলিতে পারিব না।

বিনোদিনী বিহারীর প্রেমে উন্মাদিনী—আত্মহারা। তিনি মন-প্রাণ, জীবন-যৌবন সমস্তই বিহারীকে উৎসর্গ করিতে পারেন, কিন্তু ধর্ম্মপত্নীরূপে পরিণয় শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইতে তাঁহার ঘোরতর আপত্তি। এ রহস্যের মর্ম্মোদ্ঘাটন কে করিবে? বিনোদিনী কি সমাজ ভয়ে—লোক গঞ্জনা ভয়ে ভীত হইয়াই হৃদয়ের চির-সঞ্চিত আশা বিসর্জ্জন দিলেন? এ ত প্রেমিকার লক্ষণ নয়! অপিচ দেশাচার-মন্ত্রমুগ্ধ অধঃপতিত সমাজে এরূপ দৃশ্য প্রদর্শন অপেক্ষা কুসংস্কারের মূলে কুঠারাঘাত করিয়া—তুচ্ছ সমাজ-ভীতি অতিক্রম পূর্ব্বক—বাল-বিধবার পুনঃ পরিণয় রূপ মহৎ ব্রত উদ্‌যাপনে সমাজকে জীবন্ত শিক্ষা দিলে কি ভাল হইত না? সহৃদয় ও স্বদেশ প্রেমিক শ্রদ্ধাস্পদ গ্রন্থকারের নিকট আমাদের এ আশা অরণ্য-রোদনে পরিণত হইল, ইহা গভীর পরিতাপের বিষয়!

পরিণয় শূন্য প্রণয় যদি নরকের জিনিষ হয়, তবে বিনোদিনীর প্রণয় অবৈধ সন্দেহ নাই। অপিচ বিনোদিনী যদি বিহারীকে মনে মনে আত্ম সমর্পণ করিয়াই পরিতৃপ্ত রহিতেন, তবে আমরা তাঁহাকে দেবী বলিয়া পূজা করিতে সম্মত হইতাম। কিন্তু গ্রন্থকার আমাদিগকে সে সুযোগ দেন নাই। প্রেমিকা লজ্জা, ভয়, কুল, মানে জলাঞ্জলী দিয়া একদিন অভিসারিকা বৃত্তি অবলম্বন করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। "সদা বিকশিত সুগন্ধ পুষ্পমঞ্জরী

তুল্য একখানি চুম্বনোন্মুখ মুখের অসম্পূর্ণ ব্যাকুল চুম্বন বিহারীর ওষ্ঠের নিকট উপস্থিত করিয়াছিলেন।" কিন্তু বিহারী অনায়াসে সে প্রলোভন জয় করিলেন। ইহা স্বর্গের ছবি, না নরকের চিত্র?

প্রেমাবেশ-বিহ্বলা বিনোদিনী বিহারীর সম্মুখে যেরূপ প্রেমের পশরা খুলিয়া দিয়াছিলেন, সে দিন যদি বিহারী এই অযাচিত প্রেমোপহার প্রত্যাখ্যান না করিতেন, তবে বিনোদিনীর দশা কি হইত? দাম্পত্য সম্বন্ধ স্থাপনের বাসনা হৃদয়ে পোষণ না করিয়াও যিনি এরূপ পবিত্র (!) প্রেমলীলার অভিনয় করিতে পারেন, তাঁহাকে প্রেমিকা বলিব কি? বস্তুতঃ বিনোদিনী প্রেমিকাও নহে,—ব্যাপিকাও নহে,—অভিসারিকা।

উপসংহারে বিনোদিনী বিহারীকে প্রেমোপঢৌকন স্বরূপ দুই হাজার টাকার নোট দিয়া চিরদিনের জন্য বিদায় গ্রহণ করিলেন। কিন্তু তিনি কোনরূপ প্রেমোপহার পাইয়াছিলেন কি?—না তৎকৃত আঘাত চিহ্ন! এ উপহার প্রেমিকার উপযুক্ত বটে। তবে প্রেমের বাজারে এ মালের নূতন আমদানী দেখিয়া পাঠক বিস্ময়ে পুলকিত হইবেন। অপিচ বিনোদিনীর চির অভিলষিত "উদ্যত চুম্বনের" প্রতিদান না করিয়া প্রেমাভিনয়ের যবনিকা পতন করাতে বিহারীকে অপ্রেমিক মনে করিয়া বিনোদিনী মনে মনে ক্ষুণ্ণ হইবেন নাত?

আমরা সমালোচ্য গ্রন্থের নায়ক নায়িকার চরিত্র বিশ্লেষণ করিয়া দোষ গুণ প্রদর্শন করিয়াছি। সামান্য লেখকের লেখা হইলে আমরা তাহার দোষোদ্ঘাটনে এত উৎসুক হইতাম না। রবিবাবু সুবক্তা, সুলেখক, সুকবি। তাঁহার মত প্রতিভাশালী চিত্রকরের তুলিকায় আমরা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর চিত্র অঙ্কিত দেখিতে আশা করি। গ্রন্থকার ভবিষ্যতে আমাদের সে আশা সফল করিবেন কি? প্রস্তাব দীর্ঘ হইয়া পড়িল, সুতরাং উপন্যাস সম্বন্ধে অন্যান্য বিষয়ের আলোচনা না করিয়া, নায়ক নায়িকার চরিত্র সমালোচনা করিয়াই আমরা এস্থলে প্রস্তাবের উপসংহার করিলাম।

নরেশের জীবন-উৎসর্গ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

"নরেশ, তুমি বিবাহ করিবে না বলিয়াই প্রতিজ্ঞা করিলে না কি? এতকাল বলিয়াছ, যতদিন না লেখা পড়ার শেষ হইবে, যতদিন না ভাল কাজ কর্ম্মের যোগাড় করিয়া মানুষের মত মানুষ হইবে, ততদিন বিবাহ করিবে না। কিন্তু এখন ত আর কিছুরই আপত্তি করিতে পার না; কারণ এখন যেমন বীণাপাণির স্নেহ-আশীর্ব্বাদে এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছ, তেমনই স্নেহশীলা লক্ষ্মীদেবীও ত তোমাকে এখন মাসে এক শতটী টাকা প্রদান করিতেছেন। সুতরাং তুমি ইচ্ছা করিলে অনায়াসেই একটী বাঙ্গালীর ঘরের মেয়েকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিয়া সুখ স্বচ্ছন্দে রাখিতে পার। ভাই' আর নিষেধ করিও না, বিবাহে সম্মত হও"। প্রিয় বন্ধু ভূপতির এই সকল কথায় নরেশচন্দ্র একটু হাসিল, পরে ধীরে ধীরে বলিল,—ভূপতি, তোমরা আমার বিবাহের জন্য এত ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছ কেন? মানুষ হইতে না হইতে বিবাহ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয় বলিয়াইত বাঙ্গালী জাতির এই অধঃপতন। আমাদের এই শোচনীয় দরিদ্রতা অসাময়িক বিবাহের বিষময় ফল নয় কি? আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যতদিন মানুষ নিজের উপর নির্ভর করিতে সমর্থ না হয়, ততদিন এক ভবিষ্য-পরিবারের গুরুভার-সৃষ্টির সূচনা করা উচিত নহে। আচ্ছা ভাই, বিবাহে এমন কি পুণ্য আছে, যাহার জন্য তোমরা এত উন্মত্ত হইয়া পড়িয়াছ? আমার বিবেচনায় আমি বেশ সুখে আছি, কোন ভাবনা নাই, যাতনা নাই, অভাব অভিযোগের গঞ্জনা বা স্ত্রীপুত্রাদির রোগ শোকের বিড়ম্বনা নাই। আমি বেশ নিজের মনে নিজে অনন্ত আকাশের নীচে মুক্ত বায়ুর ন্যায় সুখ-স্বাধীনতায় বিচরণ করিয়া বেড়াইতেছি। তোমরা আমার এই সাধের স্বাধীনতায় কেন বাধা দিতে প্রস্তুত হইয়াছ? সুখ-শান্তির অমৃতময় ক্রোড় হইতে অনন্ত দুঃখ যাতনার সংসারে আমাকে কেন পাঠাইতে চাও? রমণীর বদনে বা নয়নে এমন কি মাধুরী আছে, যাহার নিমিত্ত মনুষ্যত্বে জলাঞ্জলি দিতে বাধ্য হইব? তুমি হয়ত আমার কথাগুলি শুনিয়া মনে মনে কত হাসিতেছ, আমাকে হয় ত পাগল

বলিয়াও ভাবিতেছ। কিন্তু ভাই, আমি ধীরভাবে স্থিরচিত্তে চিন্তা করিয়া দেখিয়াছি, রমণীর পাণিগ্রহণ উন্নতির বিশেষ পরিপন্থী। যাহারা একবার কামিনীর ভালবাসায় বা মায়ামন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছে, তাহাদের কয়জনের উৎসাহ-উদ্যম লক্ষ্য-সঙ্কল্প চিরতরে 'কর্ম্মনাশার' খরস্রোতে ভাসিয়া যায় নাই? অবলাগণের চঞ্চল অঞ্চল যাহাদের জীবনসম্বল, তাহাদের এই অধোগতি হইবে না কেন? কর্ম্মবীর ইংরাজ জাতির চরিত-ইতিহাস পাঠ করিলে দেখিতে পাইবে, তাহাদের কেহ অধ্যয়নের জন্য, কেহ উপার্জ্জনের জন্য, কেহ ধর্ম্মের জন্য, কেহ কর্ম্মের জন্য দীর্ঘ জীবনে কামনার তাড়নায় কামিনীর কমল-কোমল চরণ-তলে নিজের মূল্যবান প্রাণটা সঁপিয়া দিতে প্রস্তুত হয় না। আমরা বাঙ্গালীর ছেলে ষোলর পরে সতেরর সিঁড়িতে পা দিতে না দিতে বিবাহের ফাঁসীটা যদি গলায় না পরি, তবে তৎক্ষণাৎ আত্মীয় স্বজনেরা মনে করেন, বাছা আমার বিরাগী হইয়া বনে চলিল।

ভূপতি! ভরসা করি, তোমরা ভবিষ্যতে আর কখনও এ বিষয়ে আমাকে বিরক্ত করিবে না। এইটুকু বলিলে সম্ভবতঃ অসঙ্গত হইবে না;—তোমাদের অপেক্ষা আমার নিজের সুখ দুঃখ আমি নিজে একটু বেশী বুঝি। যে দিন আবশ্যক বোধ করিব, সেই দিন—সেই মুহূর্ত্তেই কোন তরল-নয়নার নিকট আমার সাধের জীবনটা বিক্রয় করিব। কিন্তু ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিও, সেই অশুভ মুহূর্ত্ত আসিবার পূর্ব্বেই যেন ভবের বিপণি বন্ধ করিতে পারি। নরেশেরএই কথা শুনিয়া ভূপতি একটী দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিল এবং অলক্ষিতে মর্ম্ম—কাতরতার দুই বিন্দু অশ্রু তাহার গণ্ড বহিয়া পড়িল। কিছুক্ষণ পরে ভূপতি সেই দিনের তরে বিদায় গ্রহণ করিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

নরেশচন্দ্র কে? ভূপতির সহিত তাহার কি সম্পর্ক? নরেশচন্দ্র নরোত্তমপুরের জমিদার রাধেশচন্দ্র বসুর একমাত্র পুত্র। আজ দুই বৎসর অতীত হইতে চলিল, কৃতিত্বের সহিত এম এ পাশ করিয়া কৃষ্ণনগর কলেজে অধ্যাপকের কার্য্য করিতেছে। ভূপতি রঞ্জন সেন ডাক্তার—তাহার প্রাণ-প্রতিম বন্ধু।

নরেশের আচার ব্যবহারে এবং কথা বার্ত্তায় তাহার পিতা মাতা ও বন্ধু বান্ধবেরা নিশ্চিতরূপে বুঝিয়াছিলেন, সে ইহ জীবনে বিবাহ করিবে না,

এই জন্যই সেদিন ভূপতির বুকের পাঁজর ভাঙ্গিয়া নিঃশ্বাস পড়িয়াছিল, এবং চোখের পাতা স্নেহের জলে ভিজিয়া উঠিয়াছিল। যে দিন ভূপতির সহিত নরেশের উল্লিখিত কথাবার্ত্তা হয়, তাহার দুই বৎসর পরে আর একদিন ভূপতি বন্ধুর সহিত বহুক্ষণ আলাপ করে। নরেশের পিতা মাতা অনেক যত্ন ও চেষ্টায় 'সবে ধন নীলমণিকে' সংসারী করিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহারা উভয়ে এখন অনন্তধামে। সংসারে আপনার বলিতে নরেশের আর কেহই নাই। হীরালাল নামক একটী দূর সম্পর্কিত ভ্রাতা ও বন্ধু ভূপতি ব্যতীত আর কেহ এখন তাহাকে বিবাহের জন্য বিরক্ত করে না। এক দিন হীরালাল ও ভূপতি বিবাহের জন্য নরেশকে দৃঢ়তার সহিত বলিল, তোমার বিবাহ করিতে হইবে, আমরা পাত্রীর অন্বেষণ করিতেছি; তোমার নিষেধ আর শুনিব না, এখন তুমি বিবাহের সম্পূর্ণ উপযুক্ত। বেশ দুপয়সা উপার্জ্জন করিতেছ, পৈত্রিক বিষয় সম্পত্তিরও তুমিই একমাত্র উত্তরাধিকারী। এই অবস্থায় বিবাহে অসম্মতি প্রকাশ করা তোমার পক্ষে উচিত নহে। আজ আর সম্ভবতঃ বৈদেশিক বীরপুরুষগণের দৃষ্টান্ত দেখাইতে পারিবে না। আমাদের বিশ্বাস, তোমার ন্যায় ধনী ও বিদ্বান্ ব্যক্তি যে কোন সমাজে হউক না কেন, বিবাহের সম্পূর্ণ অধিকারী। আমাদের অনুরোধে একবার দশজনের মত বিবাহ করিয়া সংসারের সুখ দুঃখ আস্বাদন কর। ইহার উত্তরে সেদিনও নরেশচন্দ্র পূর্ব্বের ন্যায় গম্ভীর স্বরে বলিল,—ভাই, ক্ষমা কর, আমি ভালরূপ ভাবিয়া দেখিতেছি, মানুষ কেবল ইন্দ্রিয় সেবার জন্য সৃষ্ট হয় নাই। ইন্দ্রিয় সেবাতেই মনুষ্য জন্মের সার্থকতা নহে; সুন্দরী রমণীই মনুষ্য জীবনের একমাত্র আরাধনার সামগ্রী বলিয়াও মনে হয় না। ইন্দ্রিয় সেবা হইতে মনুষ্য জীবনের আরও উচ্চতর লক্ষ্য আছে; বিবাহ ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি-সাধনের দ্বারস্বরূপ। প্রণয় বা ভালবাসা যৌবনের ক্ষণিক উন্মত্ততা বই কিছুই নহে। যে প্রেমে বিশ্বজনীন ভাব নাই, যে প্রণয় কামগন্ধশূন্য নহে, সেই প্রণয়কেও কি মানসিক উচ্চবৃত্তি বলিয়া স্বীকার করিব? আমার হৃদয়ে প্রেম বা ভালবাসা নাই, মনে করিও না। কিন্তু আমি প্রণয়ের ছলনায় প্রতারিত হইতে ইচ্ছা করি না, ভালবাসার ছল করিয়া স্বেচ্ছাচারিতা ও ভোগ সুখের পঙ্কিল জলে ডুবিতে পারিনা। সার্ব্বভৌম পবিত্র প্রণয়-দেবকে স্ত্রীরূপ সঙ্কীর্ণ গণ্ডীতে আবদ্ধ রাখা কখনই সঙ্গত নহে। পৃথিবীর সকলেই সকলের প্রীতিস্নেহ-প্রাপ্তির অধিকারী। ভূপতি, যদি আমার বাসনা পূর্ণ হয়, তবে শীঘ্রই দেখিতে পাইবে,

আমার প্রণয়প্রলুব্ধ হৃদয় কোন্ মহৎ প্রেমের আশায় কোন্ মহত্তর উদ্দেশ্যে কোন্ মহত্তর লক্ষ্যে ছুটিয়াছে। সাত দিন আমাকে চিন্তা করিতে সময় দেও, সপ্তাহ পরে আমি বিবাহ বিষয়ক শেষ মন্তব্য প্রকাশ করিব। আজ সহস্র অনুরোধ করিলেও ইহার বেশী কিছু বলিতে পারিব না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

আজ নরেশচন্দ্রের শেষ কথা বলিবার দিন,—কাল সপ্তাহ অতীত হইয়াছে। ভূপাল যথাসময়ে আসিয়া তাহাকে নিজ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে অনুরোধ করিল।

বন্ধুর প্রতি কটাক্ষে চাহিয়া, মৃদু হাসিয়া, স্থিরচিত্ত নরেশচন্দ্র ধীরে উত্তর করিল,—ভাই, স্থির করিয়াছি,—বিবাহ করিব; কিন্তু ব্যক্তিবিশেষকে নহে, সমগ্র জীবজগৎ আমার প্রণয় প্রাপ্তির অধিকারী। আজ সর্ব্বসাধারণের হিত-সাধনে আমার জীবন উৎসর্গ করিলাম। যদি সংসারে একটী দুঃখীরও এক বিন্দু দুঃখের অশ্রু মোচন করিতে সমর্থ হই, তবে নিজকে নিজে কৃতার্থ মনে করিব। তুমি চিকিৎসক, ভরসা করি, আবশ্যক মত তোমার সাহায্য লাভে বঞ্চিত হইব না। আমার পৈত্রিক সম্পত্তি আছে, নিজেও কিঞ্চিৎ সঞ্চয় করিয়াছি;—ইহার দ্বারা একটী দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত করিব। দেশের সমস্ত বিপন্ন অনাথ পরিবার সেই ঔষধালয়ের সম্পূর্ণ সাহায্য প্রাপ্ত হইবে। অবস্থাবিশেষে তাহাদের পথ্যাদিরও ব্যবস্থা আমিই করিয়া দিব। প্রয়োজন হইলে রাত্রি দিন উপস্থিত থাকিয়া রোগীর শুশ্রূষা করিতেও কুণ্ঠিত হইব না। আমি জানি, দেশের বহু দরিদ্র বিনা চিকিৎসায় বিনা শুশ্রূষায় অকালে পরলোক গমন করিয়া থাকে। আমার এই ক্ষুদ্র জীবনের দ্বারা যদি একটীও বিপন্ন জীবন রক্ষিত হয়, তবেই আমার মনুষ্য জন্ম সার্থক হইল,—বিবেচনা করিব। গ্রামে জল-কষ্ট-নিবারণের নিমিত্ত পুষ্করিণী-খনন, সাধারণের সুশিক্ষা-প্রচার-উদ্দেশ্যে অবৈতনিক বিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠা প্রভৃতিতেও আমার ধন-প্রাণ ব্যয় করিব,—বাসনা করিয়াছি। দেখ ভাই, যে পরের জন্য প্রাণ দিতে কুণ্ঠিত, তাহার মনুষ্যত্বে ধিক্, ধন যদি ক্ষুধিত বিপন্নের দুঃখ দারিদ্র্য দূর করিতে ব্যয়িত না হইল, তবে আর তাহাতে প্রয়োজন কি? বস্তুতঃ ভাই, হৃদয়বতী মহিলা-কবি যাহা বলিয়াছেন, তাহা আমার প্রাণে বড় ভাল লাগিয়াছে;—

"পরের কারণে স্বার্থ দিয়া বলি,
এজীবন মন সকলি দাও।
পরের কারণে মরণেও সুখ
আপনার কথা ভুলিয়া যাও।
তার মত সুখ কোথাও কি আছে,
সুখ সুখ বলি কেঁদনা আর।
যতই কাঁদিবে যতই ভাবিবে
ত'তই বাড়িবে হৃদয় ভার।
আপনারে লয়ে বিব্রত রাখিতে
আসে নাই কেহ অবনী'পরে।
সকলের তরে সকলে আমরা।
প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।"

'আজ হইতে আমার মন প্রাণ পরার্থে উৎসৃষ্ট হইল। আশীর্ব্বাদ কর, বাসনা যেন পূর্ণ হয়। এই অনন্ত বিশ্বপ্রেম হইতেও কি নিতান্ত সান্ত বালিকা-প্রেম অধিকতর প্রার্থনীয়?—ইহাই আমার শেষ মন্তব্য।

ভূপতি ইহার প্রতিকূলে অনেক তর্ক করিল, কিন্তু নরেশচন্দ্র স্থাণুর ন্যায় নিশ্চল, একটুক টলিল না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

এক বৎসর যাবৎ নরেশচন্দ্র পরহিতব্রতে জীবন উৎসর্গ করিয়াছে। তাহার বাড়ীতে বহু অর্থব্যয়ে একটী দাতব্য-ঔষধালয় ও একটী উচ্চশ্রেণীর ইংরেজী বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছে। কর্ত্তব্য-পরায়ণ নরেশের অদম্য ও অক্লান্ত পরিশ্রমে দেশের অভাব-অসুবিধাগুলি দিন দিনই দূরীকৃত হইতেছে। পরোপকারী যুবক অবস্থা বুঝিয়া বিপন্নদিগকে ঔষধ-পথ্যাদি প্রদান করিতেছে। প্রয়োজন মত অনাহার অনিদ্রায় থাকিয়া রাত্রি দিন রোগীর সেবা শুশ্রূষা করিতে তাহার কোনরূপ ক্লান্তি বা বিরক্তি বোধ নাই।

যখন এইরূপে বিশ্বপ্রেমিক নরেশচন্দ্র উপকৃত ব্যক্তিগণের আন্তরিক আশীর্ব্বাদ মস্তকে ধারণ করিয়া জীবনের পথে অগ্রসর হইতেছিল, তখন একদিন কায়েৎপাড়া গ্রাম হইতে সংবাদ আসিল, সেই গ্রামের এক জীর্ণ পর্ণকুটীরে একটী অনাথা বালিকা বার দিন যাবৎ রোগ শয্যায়

পারিল। রোগিণী এই দীর্ঘ-দিবসব্যাপী অবিরাম প্রবল জ্বরে অতিশয় কাতর হইয়া পড়িয়াছে। অর্থাভাবে ইহার যথারীতি চিকিৎসা চলিতেছে না, সেবা শুশ্রূষা করিবারও তেমন লোক-জন নাই। এই সংবাদ শ্রবণে পরদুঃখ-কাতর যুবকের শান্তিস্নিগ্ধ বদনমণ্ডলের এক অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ বিকাশিত হইল। কর্ত্তব্য-নিষ্ঠার উদ্দীপন-মন্ত্রে তাহার মন নাচিয়া উঠিল। সে তৎক্ষণাৎ ঔষধ পত্র সহ কায়েৎপাড়া গ্রামাভিমুখে ছুটিল।

*   *   *   *   *

দীর্ঘ আঠার দিন অতীত হইল, বালিকার জ্বর হইয়াছে। নরেশের কৃপায় দেশের প্রসিদ্ধ চিকিৎসকগণ ইহার চিকিৎসায় নিযুক্ত। বিপন্নের বন্ধু দরিদ্রের আশ্রয় নরেশচন্দ্র স্বয়ং আহার নিদ্রা ভুলিয়া রোগীর সেবা শুশ্রূষায় ব্যতিব্যস্ত। চিকিৎসা ও শুশ্রূষার গুণে রোগীর রোগশক্তি ক্রমেই কমিয়া আসিতে লাগিল। সেদিন সন্ধ্যার পর দেশ-বিখ্যাত নীলমণি কবিরাজ আসিয়া বলিলেন,—আজ নাড়ীর অবস্থা দেখিয়া বুঝিতেছি, আর কোন আশঙ্কা নাই।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

আজ পাঁচ দিন হেমলতার জ্বর হয় না। হেমলতা—রুগ্ন বালিকার নাম।

প্রবল জ্বরের আক্রমণে হেমলতা সংজ্ঞাশূন্য অবস্থায় মুদ্রিতনয়নে একুশ দিন অতিবাহিত করিয়াছে। জ্বরের বিরামে ২২ দিন পরে প্রথম সে যখন আঁখি মেলিয়া পরিচিত জগতের পরিচিত দৃশ্য দেখিতে প্রয়াস পাইল, তখন তাঁহার শিরোদেশে এক অপরিচিত মূর্ত্তি দেখিয়া চমকিয়া উঠিল। লজ্জার গুরুভারে হেমলতার রৌদ্র-শুষ্ক ইন্দীবরবৎ ব্যাধিক্লিষ্ট নয়নযুগল নিমীলিত হইয়া আসিল। ক্ষণেক পরে আবার সে চক্ষু মেলিয়া চাহিল, চাহিয়া চাহিয়া আপনি আপনা ভুলিয়া দেখিল,—কি সুন্দর মনোমদ মূর্ত্তি তাহার সম্মুখে!

এমন রূপ ত কখন দেখি নাই! এই রূপরত্নের অধিকারী ইনি কে? ইনি কি আমাদিগের কোন আত্মীয়? আত্মীয় হইলে পূর্ব্বে আর কখনও দেখি নাই কেন? মাকে জিজ্ঞাসা করিব কি?—বড় লজ্জা করে। তবে জানিব কিরূপে? তা বলিয়া লজ্জার মাথায় পা দিয়া মাকে কিছুতেই

জিজ্ঞাসা করিতে পারিব না। এইরূপ নানা ভাবনায় রোগ-ক্লিষ্টার দুর্ব্বল-মস্তিষ্ক আলোড়িত ও নিপীড়িত হইল।

এই স্থলে আরও একটী ঘটনার উল্লেখ করিতে হইতেছে; হেমলতার লজ্জা-নম্র আঁখিদুটি যখন চুরি করিয়া যুবকের সৌন্দর্য্য পান করিতে ব্যতিব্যস্ত, তখন যুবকের পিপাসু আনমেয় দৃষ্টিও বড় একটা অলস ভাবে বসিয়া ছিল না; সুতরাং চারি চোখে দেখা হইল। অমনি বালিকার শীর্ণ দেহ খানি এক অজ্ঞাত-কারণে কাঁপিয়া উঠিল,—লজ্জায় আবার চক্ষু মুদিয়া ফেলিল। বালিকা এইরূপ বিপদে আর কখনও পড়ে নাই, সে যতবার চক্ষু মেলিল, ততবারই দেখিতে পাইল,—অপরিচিত যুবক স্নেহসিক্ত কোমল-দৃষ্টিতে তাহার মুখপানে চাহিয়া রহিয়াছে।

* * * *

হেমলতা যতদিন রোগশয্যায় শায়িতা ছিল, আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত আছি, উদার-চেতা নরেশচন্দ্র এক মুহূর্ত্তের তরেও তাহার পার্শ্বদেশ পরিত্যাগ করে নাই।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

হেমলতা এখন সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়াছে। নরেশচন্দ্রও বাড়ী ফিরিয়াছে। আজ কাল তাহাকে অন্যমনস্ক বলিয়া বোধ হয়। তাহার সেই জ্ঞানদীপ্ত আনন্দোজ্জ্বল প্রশান্ত-গম্ভীর মুখখানি এখন সর্ব্বদাই এক দুর্জ্জেয় বিষাদ-কালিমায় পরিম্লান। চিন্তার কুটিলরেখায় তাহার প্রশস্ত ললাটদেশ কুঞ্চিত; ভাববিহ্বল চল চল নয়ন এখন কোটর-যুগল প্রবিষ্ট। এই আকস্মিক পরিবর্ত্তনের কারণ সে তাহার হৃদয়কে বহুবার জিজ্ঞাসা করিয়াছে, কিন্তু বিশ্বাসঘাতক হৃদয় তাহাকে কোনরূপ যথার্থ উত্তর দেয় নাই, শুধু প্রতারণা করিয়াছে। ধীর প্রকৃতিক নরেশ সহজে ছাড়িবার লোক নহে, সে প্রাণপণ অনুসন্ধান আরম্ভ করিল, পাতি পাতি খুঁজিয়া দেখিতে পাইল, তাহার হৃদয়ের নিভৃত-কোণে একটি অপূর্ব্ব বালিকামূর্ত্তি। এবং যখন এই হৃদয়-বাসিনী মোহিনী-মূর্ত্তি সেই পীড়িতা হেমলতার প্রতিকৃতি বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করিল, তখন বিশ্ব-প্রেমিকের মুখমণ্ডল লজ্জায় পাংশুবর্ণ হইয়া উঠিল। যে 'পরের কারণে' জীবনে বিবাহ করিবে না, প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, জগতের সেবায় যাহার ধন প্রাণ উৎসর্গীকৃত, তাহার এই অনুরাগ-বিড়ম্বনা কেন?

*   *   *   *   *

নরেশ নীরবে নিঃশ্বাস বন্ধ করিয়া বহুক্ষণ ভবিষ্যৎ ভাবিল। ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিল,—সংসার প্রলোভনময়; এই স্থানে তাহার স্থায় ক্ষুদ্র-শক্তি মানব কোনরূপেই অক্ষত শরীরে থাকিতে পারে না, সুতরাং প্রলোভন-শূন্য কোন নির্জ্জন প্রদেশে একাকী থাকাই সঙ্গত। কিন্তু যাওয়ার পূর্ব্বে ভূপতির সহিত দেখা করিয়া যাওয়া উচিত নয় কি?

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

নরেশ, আমাকে এত তাড়াতাড়ী আসিতে লিখিয়াছ কেন? তোমার চিঠির ভাবে বোধ হয় ব্যাপার কিছু গুরুতর। তোমার আকৃতি দেখিয়াও নানারূপ আশঙ্কা মনে হইতেছে; তোমার সেই চিরপ্রফুল্লতা, অমিয়-হাসিরাশি কে যেন চুরি করিয়া নিয়াছে? ঘটনাটা পরিষ্কার করিয়া বল দেখি। ভূপতি এক নিঃশ্বাসে বলিয়া অনিমিষ লোচনে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। উত্তরে নরেশচন্দ্র মেঘাবগুণ্ঠিত রবিকিরণের ন্যায় বিষাদমাখা হাসি হাসিয়া কহিল,—হাঁ তোমাকে একটা কথা বলিব ভাবিয়া আসিতে লিখিয়াছি। এই নিষ্ঠুর সংসারে আমার আর স্থান হইল না। দেখিলাম,—সংকল্পে বহু বাধা বিঘ্ন। দেখিলাম, সংসার বড় ভয়ানক স্থান, এখানে প্রলোভনের সম্পূর্ণ আধিপত্য; এখানে সত্যের ভাগ্যে তিরস্কার, মিথ্যা পায় পুরস্কার; এখানে দেবতার অপমান, দৈত্য দানবের জয়গান। আরও দেখিলাম,—মানবের শক্তি বড় ক্ষুদ্র। ইচ্ছানুরূপকাজ আমরা বহু সময়েই করিতে পারিনা। যদি স্বর্গে যাইতে ইচ্ছা করি, পাতাল পুরে গিয়া পড়ি। তাই ভাবিয়াছি, কোলাহলময় সংসার-সংগ্রাম হইতে দূরে সরিয়া শ্যামল-দ্রুমদল-শোভিনী বিকচ কুসুম হাসিনী নির্জ্জন অরণ্যময়ী প্রকৃতির সুখশান্তিময় ক্রোড়ে মাথা রাখিয়া সময়-সাগর-বক্ষে জীবনতরণী খানি বাহিয়া যাইব। আগামী পরশ্ব আমার সেই শুভ-যাত্রার দিন স্থিরীকৃত হইয়াছে। তোমরা প্রীতি-প্রফুল্ল চিত্তে অনুমতি দেও। ভূপতি কথা গুলি শুনিয়া মনে মনে ভীত হইল, পরে উপহাসের হাসি মিশাইয়া বলিল, এই আবার বুঝি একটা নূতন ধরণের জীবন ব্রত আবিষ্কৃত হইল! কি অদ্ভুত পাগলাম! ভাই আমি তোমাকে ঔষধ দিতেছি, দুই সপ্তাহ পর তুমি সুখ-যাত্রার দিন স্থির কর।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

ভূপতি বহু অনুসন্ধানে নরেশের একজন বিশ্বস্ত ও প্রাচীন কর্ম্মচারীর নিকট গোপনে শুনিতে পাইল, কায়েৎপাড়া নিবাসী নন্দকিশোর গুহের কন্যা হেমলতাকে শুশ্রূষা করার পর হইতে নরেশচন্দ্রের এই ভাবান্তর উপস্থিত হইয়াছে। প্রাচীন কর্ম্মচারী আরও বলিলেন, সেই মেয়েটীর চৌদ্দ বছর বয়স, এখনও বিবাহ হয় নাই, সৌন্দর্য্যও তুলনাবিহিত। ভূপতি কর্ম্মচারীর এইরূপ অঙ্গুলি-সঙ্কেতে ঘটনার অন্তরালে একখানি সুন্দর চিত্র দেখিতে পাইল, সে চোখের পলকে প্রিয়তম বন্ধুর অকাল বৈরাগ্যের কারণটীকে খুঁজিয়া বাহির করিল। পরে বুদ্ধিমান ভূপতি সেই বৃদ্ধ কর্ম্মচারীর সহিত বহুক্ষণ ফিস্ ফিস্ করিয়া চুপি চুপি একটা পরামর্শ আটিয়া ফেলিল।

* * * * *

আজ ২।৩ দিন হইল ভূপতি 'বাড়ী যাই' বলিয়া নরেশের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া কায়েৎপাড়া আসিয়াছে। এখানে আসিয়া হেমলতাকে দেখিয়াছে, দেখিয়া নিশ্চিন্ত মনে বুঝিয়াছে, তাহার প্রয়োজন-সিদ্ধি অবশ্যম্ভাবিনী ও অদূরবর্ত্তিনী। এতক্ষণ একটী কথা বলিতে আমরা অবসর পাই নাই। স্নেহময়ী জননী ও ৭ সাত বৎসরের ভ্রাতা বিজয় চন্দ্রই সংসারে হেমলতার একমাত্র অবলম্বন। হেমলতার পিতা নন্দকিশোর গুহ বিজয় চন্দ্রের তিন-বৎসর বয়ঃক্রমকালে স্ত্রী-পুত্র-কন্যার সহিত পার্থিব সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিয়া অমর রাজ্যে প্রস্থান করিয়াছেন। তদবধি এই অনাথ পরিবার দুঃখ-দারিদ্র্যের প্রবল প্রবাহে ভাসিতে ভাসিতে মরণের দিকে অগ্রসর হইতেছে।

দারিদ্র্যের নিষ্ঠুর নিষ্পেষণেই হিন্দুসমাজ সম্ভূতা হেমলতা রূপবতী হইয়াও আট বছরে গৌরী সাজিয়া পতিকুল উজ্জ্বল করিতে সমর্থ হয় নাই--এবং আজ চৌদ্দ বৎসরের মুকুলিত যৌবনেও সে কুমারী!

* * * * *

ভূপতি হেমলতার জননীর সহিত হেমলতার বিবাহ বিষয়ে বহু কথা বলিয়া স্মিতমুখে কায়েতপাড়া পরিত্যাগ করিল।

ইহার ৬ দিন পরে ভূপতি নরেশের নিকট উপস্থিত হইল, পরে নির্জ্জনে তাঁহাদের এইরূপ কথাবার্ত্তা হয়।

ভূপতি। (গম্ভীর ভাবে) নরেশ, তুমি কি কায়েৎপাড়ার নন্দকিশোর গুহের কন্যা হেমলতাকে দেখিয়াছ?

নরেশ। (চমকিয়া) দেখিয়াছি।

ভূপতি। মেয়েটী কেমন?

নরেশ। খুব সুন্দরী।

ভূপতি। বয়স কত হইবে?

নরেশ। বছর তের চৌদ্দ।

ভূপতি। স্বভাব কেমন?

নরেশ। সম্ভবতঃ খুব ভাল।

ভূপতি। তাহাদের অবস্থা কেমন?

নরেশ। অতিশয় মন্দ।

ভূপতি। তুমি তাহার সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছ?

নরেশ। সর্ব্বান্তঃকরণে।

ভূপতি। কোন সৎ পাত্রের সহিত তাহার বিবাহ হইলে তুমি সুখী হইবে?

নরেশ। নিশ্চয়।

ভূপতি। তুমি কত সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছ?

নরেশ। তাহার বিবাহে যত লাগিবে, আমি তাহা সমস্তই দিতে প্রস্তুত আছি।

ভূপতি। তখন যেন হাতে আকাশ পাইল। প্রীতিভয়ে বন্ধুকে আলিঙ্গন করিয়া বলিল, ভাই, ঘটনা চক্রে আমি সে মেয়েটীকে দেখিয়াছি, এমন লক্ষ্মীর মত মেয়েটীর, অর্থাভাবে, বিবাহ হইতেছে না। আমি তোমার বলে সাহস করিয়া তাহার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিয়াছি, আমতা গ্রামের দীনবন্ধু মিত্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রবোধচন্দ্রকে তুমি অবশ্য জান, তাহার সহিত আমার যথেষ্ট বন্ধুতা। প্রবোধের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীমান সুবোধচন্দ্র প্রেসিডেন্সি কলেজে এফ, এ পড়ে। প্রবোধকে বলিয়া কহিয়া সুবোধের সহিত হেমলতার সম্বন্ধ স্থির করিয়াছি। বরপক্ষকে নগদ ১২০০ শত টাকা দিতে হইবে। অলঙ্কার পত্রও কিছু না দিলে চলিবে না। তুমি পরার্থে জীবন উৎসর্গ করিয়াছ, তোমার সাহায্যেই আমি এই বিপদ হইতে উদ্ধার পাইব, ভরসা করিতেছি। তুমি এখনই ৩০০ শত টাকা আনিয়া দেও, বর পক্ষের লোক আমার সঙ্গে আসিয়াছে। নরেশচন্দ্র ভূপতিকে ধন্যবাদ দিয়া তৎক্ষণাৎ প্রার্থিত ৩০০ শত টাকা আনিয়া ভূপতির হস্তে দিল। ভূপতিও সেই টাকা তখনই বরপক্ষীয় কালীচরণ দত্তের হস্তে প্রদান করিল।

নবম পরিচ্ছেদ।

আজ হেমলতার বিবাহ। হৃদয়বান্ ভূপতির প্রাণপণ যত্ন ও সহায়তায় নন্দকিশোর গুহের পরিত্যক্ত জীর্ণ কুটীর এক অভিনব অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করিয়াছে, আজ বহুদিন পরে এই অনাথ পরিবারের সুপ্ত কুটীর-ভবন সমাগত আত্মীয় স্বজনের আনন্দ কোলাহলে আবার যেন জাগিয়া উঠিয়াছে, আজ এই দরিদ্র গৃহ-প্রাঙ্গণ নিমন্ত্রিত বালক বালিকাদিগের হাসি কান্নার মধুর কাকলিতে মুখরিত এবং পুর মহিলাগণের বৈবাহিক মঙ্গল গানে ঝঙ্কারিত হইয়া উঠিতেছে।

বিবাহ দর্শনোৎসুক উৎসব-মত্ত বালক বৃদ্ধ আজ এক একটী মুহূর্ত্তকে এক একটী অফুরন্ত যুগ বলিয়া মনে করিতেছে, তাহারা আকুল প্রাণে সন্ধ্যা-সুন্দরীর শুভাগমন প্রার্থনা করিতে লাগিল। তাহাদের সদর আহ্বানেই হউক অথবা প্রকৃতিদেবীর অনুরোধেই হউক, দেখিতে দেখিতে দিবসের কনক-আলোক সাঁঝের আঁধারে ডুবিয়া গেল। নিশারূপসীও তারার মেলখা পড়িয়া কৌমুদী পট্টবস্ত্রে শরীর আবৃত করিয়া বিবাহ বাড়ীতে ধীরে ধীরে উপস্থিত হইল। সকলেই যখন শুভলগ্ন উপস্থিত দেখিয়া উৎকণ্ঠিতচিত্তে বরের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল; তখন সেই আনন্দ উৎসবের মধ্যে বিষাদের একটা করাল ছায়া সহসা নিপতিত হইল। কর্ত্তৃপক্ষের ব্যাকুল ব্যবহারে সকলেই ভবিষ্যৎ অমঙ্গলের একটা বিরাট মূর্ত্তি আঁকিয়া লইল; পৌর্ণমাসী মধুযামিনীতে অসাময়িক বর্ষার এই ঘনঘটা কেন?—সংবাদ আসিয়াছে, বরকর্ত্তা দীনবন্ধু মিত্র আরও ২০০০৲ টাকার অলঙ্কার না পাইলে এই ঘরে পুত্রের বিবাহ দিবে না। বিশেষতঃ সে সাহঙ্কারে কন্যাপক্ষের নিকট কুল মর্য্যাদা-প্রাপ্তির অসঙ্গত দাবী করিতেছে। মিত্র মহাশয় বলেন, কায়েৎপাড়ার বসুবংশ হইতে আমতার মিত্র পরিবার কুল মর্য্যাদায় অনেক বড়, সুতরাং কন্যাপক্ষীয়েরা তাহার প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন না করিলে কিছুতেই 'ক্রিয়া' করিতে পারেন না। এই সংবাদে সকলের মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল, কারণ এখন এই শেষ মুহূর্ত্তে এত টাকার যোগাড় কিরূপে হইবে?

ভূপতি ও হেমলতার জননী অগাধ জলে পড়িলেন। ভূপতি উদ্ভ্রান্তের ন্যায় রুদ্ধশ্বাসে ছুটিয়া গিয়া নরেশকে বলিল, ভাই, এখন উপায়? আমার

প্ররোচনায় একটা পরিবারের যে জাতিকুল নষ্ট হইতে চলিল। আমার কর্তৃত্বেই সুবোধের সহিত এই সম্বন্ধ স্থিরীকৃত হয়, এখন তাহাদের পৈশাচিক ব্যবহারে মহা বিপদে পড়িয়াছি, তুমি উদ্ধার না করিলে এই বিপদ-সাগর হইতে কিছুতেই ত্রাণ পাইব না। শুনিয়া নরেশচন্দ্র উত্তেজিত স্বরে বলিল, ভূপতি, চিন্তা কি? আমি এই মুহূর্ত্তেই আরও দুই হাজার টাকা দিতেছি। তুমি বরপক্ষকে সংবাদ দেও। ভূপতি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া ছল ছল চোখে বন্ধুকে জানাইল, না ভাই তা হবে না, শুধু টাকা হইলে কথা ছিল না, সামাজিক আপত্তিটা কোনরূপেই মিটিবে না, হেমলতার পিতৃজ্ঞাতি ও কুটুম্বেরা কিছুতেই এই অসঙ্গত প্রস্তাবে সম্মত হইবেন না। এখন আর তর্ক বিতর্কেরও সময় নাই, লগ্ন উপস্থিত প্রায়। আমি বলিতেছি, তুমি ত পরার্থে প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছ। একবার তুমি অক্লান্ত যত্ন ও অজস্র অর্থ ব্যয় করিয়া হেমলতার শরীর রক্ষা করিয়াছ, আজ আমার অনুরোধে তাহাকে তুমিই বিবাহ করিয়া পুনরায় সেই বিপন্ন অনাথ বালিকার জাতি কুল রক্ষা কর না কেন? ভূপতির এই অসম্ভব প্রস্তাবে নরেশ প্রথমে শিহারিয়া উঠিল, পরে দৃঢ় প্রতিজ্ঞার সহিত কহিল, আমি যেরূপেই হউক, হেমলতাকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়া তোমার সম্মান রক্ষা করিব।

* * * * *

কয়েক বৎসর পরে একদিন বিনোদ নিবাসে বসিয়া হাসিতে হাসিতে নরেশচন্দ্র প্রিয় বন্ধু ভূপতিকে বলিল, ভাই তুমি যে এই রূপ দিনে দুপুরে ডাকাতি করিবে, তাহা আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই, বড়ই চতুরতা করিয়া আমার গলায় ঐ ফাঁসিটী পরাইয়া দিয়াছ।

প্রবোধচন্দ্র তোমার একজন অকৃত্রিম বন্ধু, তুমি প্রবোধ ও শ্বশ্রূমাতার সহিত পরামর্শ করিয়াই এই আগাগোড়া জুয়াচুরিটা করিয়াছ। আমি তখন ঘুনাক্ষরেও ইহা বুঝিতে পারি নাই। আমার বিশ্বাস জন্মিয়াছিল, বাস্তবিকই হেমলতার সম্বন্ধ স্থির হইয়াছে, এবং প্রবোধদের অভদ্র ব্যবহারে তোমরা বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছ। আমি এই বিশ্বাসেই পরোপকার কামনায় হেমলতার সৌন্দর্য্য-সরসীতে চিরসঞ্চিত আভলাষটী বিসর্জ্জন দিয়াছি।

ভূপতি এখন সুযোগ পাইয়াছে, সে ভ্রুকুটি করিয়া উত্তর করিল, যদি আমার প্রতারণায় অসন্তুষ্ট হইয়া থাক, তবে কাল না হয় হেমলতাকে কায়েৎপাড়া পুনরায় রাখিয়া আসি।

দেখ ভাই, এতদিনে ঠিক পথ চিনিয়াছ, এতদিন লক্ষ্যহীন হইয়া অকূল প্রণয়-সাগরে ভাসিয়াছ। এখন সান্ত বালিকাকে কেন্দ্র করিয়া 'অনন্ত বিশ্বপ্রেমের উপাসক হও, তুমি কামিনীকে ঘৃণা করিয়া কামনাকে বলপূর্ব্বক দলি দিতে চাহিয়াছিলে, কাজেই তুমি লাঞ্ছনা ভোগ করিতে বাধ্য হইয়াছ। এখন প্রিয়তমা রমণীর চরণ-কমলে জীবনটী ষোল আনা উৎসর্গ করিয়া পূর্ব্বকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর।

গ্রন্থ সমালোচনা।

ছাত্র জীবন। শ্রীব্রজনাথ বিশ্বাস প্রণীত; কলিকাতা ভারত-মিহির যন্ত্রে মুদ্রিত।

ছাত্রজীবন—মানব জীবন রূপ মহান মহীরুহের ক্ষুদ্র অঙ্কুর। যেমন বিন্দুর পরিণাম সিন্ধু ও বালুকা-কণার পরিণাম মরুভূমি, ছাত্র জীবনের বাঞ্ছণীয় পরিণামও তেমনি পূর্ণ-বিকশিত মানব-জীবন। বস্তুতঃ বৈষয়িক জীবনের গুরুতর কর্ত্তব্য সম্বন্ধে এই গ্রন্থে যে সমস্ত অমূল্য উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা সর্ব্বথা প্রতিপালনীয়।

প্রকৃতি-অধ্যয়ন প্রবন্ধটী গ্রন্থগৌরব বাহুল্যের সুচারু নিদর্শন। উহা মনস্বী গ্রন্থকারের স্বীয়জীবনে প্রকৃতি-অধ্যয়ন ও সংসার-পর্য্যবেক্ষণের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম। অধ্যয়নের প্রকৃত উদ্দেশ্য জ্ঞান লাভ, সুতরাং মানসিক উন্নতি। শিক্ষা প্রভাবে জ্ঞানের উৎকর্ষ সাধন ব্যতিরেক প্রকৃতির গূঢ় রহস্য মলিন নয়নে প্রতিভাত হয় না। অপিচ প্রকৃতি-অধ্যয়ন পরীক্ষা ও পর্য্যবেক্ষণ সাপেক্ষ। ক্ষুদ্র কারণ হইতেই মহৎ কার্য্যের উৎপত্তি হয়। প্রকৃতি পর্য্যবেক্ষণ করিয়াই মনস্বীবর্গ অভিনব তত্ত্ব আবিষ্কারে সমর্থ হন। প্রস্তাবিত প্রবন্ধে এই সমস্ত গভীর রহস্য অতি বিশদরূপে বিবৃত হইয়াছে। বস্তুতঃ প্রকৃতি-অধ্যয়ন প্রবন্ধটী গভীর চিন্তাশীলতা, ভূয়োদর্শন ও তত্ত্বানুসন্ধানের ফল।

গ্রন্থকার, সমাজ-সংস্কারক অথবা ধর্ম্মোপদেষ্টাগণ কেহই জীবিতাবস্থায় যশস্বী হইতে পারেন না; কারণ তাঁহারা অসাময়িক লোক। তাঁহাদের দৃষ্টি দেশ, কাল, পাত্রের দুর্ভেদ্য আবরণ ভেদ করিয়া শতাব্দী ব্যবধানের উন্নতির আলোক দেখিতে পায়; সুতরাং সম সাময়িক লোকের সহিত তাঁহাদের গুরু-

তর মতভেদ। অপিচ জীবিতাবস্থায় নাট্যশালার পটান্তরালে লুক্কায়িত দৃশ্যের ন্যায় চরিত্রের দুর্ব্বল অংশ লক্ষ্য করিয়াও তাঁহাদের পক্ষে সমুচিত সম্মানের লাঘব ঘটে। কিন্তু তাঁহারা কালে দেবতার ন্যায় লোকের ভক্তি ও প্রীতির পুষ্পাঞ্জলী প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এই সমস্ত মূল্যবান উপদেশ যাহা সমালোচ্য গ্রন্থে উদাহৃত হইয়াছে, তাহা অক্ষরে অক্ষরে সত্য, সন্দেহ নাই।

ছাত্রজীবনের সময় যে কতদুর মূল্যবান সামগ্রী, এবং তাহার সদ্ব্যবহারে যে কিরূপ সুফল উৎপন্ন হয়, এ বিষয়ে বাঙ্গালার অধীত বিদ্যা বাক্‌ যন্ত্রের ক্রিয়াতেই পর্য্যবসিত হয়, কার্য্যক্ষেত্রে ফলোপদায়িনী হয় না। এ সম্বন্ধে ইংরেজ জাতির পদানুসরণ ভিন্ন আমাদের উন্নতির আশা সুদূরপরাহত। সুতরাং পাশ্চাত্য ভাষা হইতে জলন্ত দৃষ্টান্ত সংগ্রহ পূর্ব্বক তাহা প্রদর্শন করিলে বিদ্যার্থিগণের অধিকতর মঙ্গল সাধিত হইত। বস্তুতঃ সময়ের সদ্ব্যবহার সম্বন্ধে একটী পৃথক প্রবন্ধ লিখিত না হওয়াতে, গ্রন্থগত গুরুত্বের কথঞ্চিৎ লাঘব হইয়াছে বলিতে হইবে।

গ্রন্থশিক্ষা, চরিত্র, সামাজিক শিক্ষা ও জীবনের উদ্দেশ্য প্রভৃতি প্রবন্ধগুলি সারগর্ভ এবং মূল্যবান। বস্তুতঃ সমালোচ্য গ্রন্থে এমন একটী প্রবন্ধও বিনিবেশিত হয় নাই, যাহা মানব-জীবনের সুমহান্‌ কর্ত্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ না দেয়। গভীর জ্ঞান, বৈজ্ঞানিক তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও ঐতিহাসিক গবেষণায় গ্রন্থখানি মণিমুক্তা-খচিত আভরণের ন্যায় মূল্যবান; এবং আভরণ অপেক্ষাও সমধিক আদরের সামগ্রী। প্রস্তাবিত গ্রন্থে যে সমস্ত অমূল্য উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা কার্য্যে পরিণত হইলে ভারতবাসীর সামাজিক, নৈতিক ও জাতীয় জীবন-স্রোত নূতন পথে প্রবাহিত হইবে, আশা করা যায়।

এই শ্রেণীর গ্রন্থ বঙ্গভাষায় আর আছে কি না, জানি না; অপিচ ইহা সর্ব্বাংশে বিদ্যালয়ের পাঠোপযোগী হইয়াছে। কিন্তু শিক্ষা বিভাগে ভাগ্যবিধাতাগণের শুভদৃষ্টি সর্ব্বত্র সমভাবে নিপতিত হয় না;—উহা বৈশাখের মেঘের ন্যায় কোথাও অনাবৃষ্টি, কোথাও বা অতিবৃষ্টি রূপে বর্ষিত হয়! সুতরাং গ্রন্থকারের ভাগ্য কবে সুপ্রসন্ন হইবে?—অথবা কখনও হইবে কিনা, তাহা কে বলিবে?

রাজর্ষি-কুমার।—শ্রীপ্রসন্ন কুমার মজুমদার প্রণীত।

এই গ্রন্থের নাম নির্ব্বাচনে বোধ হয় গ্রন্থকার একটুকু ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। কারণ রাজর্ষি-কুমার পদটী ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস নিষ্পন্ন। অতুল ধনশালী, বিপুল বিভব-সম্পন্ন বীরশ্রেষ্ঠ উত্তানপাদ রাজা হইলেও—রাজর্ষি নামের যোগ্য নহেন। রাজন্যবর্গের মধ্যে এক মাত্র জনক রাজাই রাজর্ষি পদ বাচ্য। সুতরাং উল্লিখিত বাক্যটী বিশুদ্ধ প্রয়োগ বলিয়া বোধ হয় না।

সমালোচ্য গ্রন্থের কবিতাগুলি অর্দ্ধ প্রস্ফুটিত কুসুমের ন্যায় ফুট ফুট হইয়াও অনেক স্থলে সম্যক ফুটিতে পায় নাই;—সুতরাং ইহা যে পরিমাণে শ্রুতিসুখকর, তেমন মনঃপ্রাণ বিমুগ্ধকারিণী নহে। গ্রন্থকার একজন সুনিপুণ শব্দশিল্পী সন্দেহ নাই। অপিচ শব্দ সম্পদে তিনি যেমন সৌভাগ্যশালী,

ভাবৈশ্বর্য্যে তেমন কৃতীমান হইলে কালে সুকবির সম্মানিত উচ্চ আসনলাভে সমর্থ হইবেন, আশা করা যায়।

ভক্তপ্রধান ধ্রুবের জীবন-গত ভক্তির উচ্ছ্বাসে পাঠকের হৃদয়ে সমবেদনার উৎস ছুটাইয়া দিয়া, ভক্তি-মাহাত্ম্য বর্ণন এ গ্রন্থের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় কিনা, বলা যায় না। কিন্তু ইহাতে ভক্তিভাব তেমন ফুটে নাই। অপিচ সুনীতির বিষাদময় অঙ্কের ইতিহাসও হইতে পরিস্ফুটতর বর্ণে চিত্রিত হয় নাই;—ইহা অবশ্য অভাব ও অপূর্ণতার পরিচায়ক।

প্রস্তাবিত গ্রন্থে ফুল, অলি, বিজলী ও শ্যামালতা, মলয় মারুত প্রভৃতি বাহ্য প্রকৃতির বর্ণচিত্রে এবং রমণীয় রূপলাবণ্য ও প্রেম, বিরহ প্রভৃতি যুব-জন হৃদয়োন্মাদক কল্পনায় গ্রন্থকার অতি নিপুণতার পরিচয় দিয়াছেন। বসন্তে সদ্যঃপ্রস্ফুটিত কানন-কুসুম মৃদুমন্দ সমীরে আন্দোলিত হইয়া যেমন চারিদিকে সুগন্ধ বিকীর্ণ করে,—আমরা ইহার সৌরভে তেমনি পুলকিত হইয়াছি। তবে কর্ত্তব্যের অনুরোধে ইহাও অবশ্য স্বীকার্য্য যে,—সমালোচ্য গ্রন্থে মূল উপপত্তি সাধন সম্বন্ধে গ্রন্থকার কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন, সে বিষয়ে আমাদের গভীর সন্দেহ।

শ্রীমহেশচন্দ্র সেন।

মালঞ্চ।

উৎকণ্ঠিতা।

এত এ আগ্রহ নিত্য নবীন,
সবই কি মিশাবে নিরাশে ?
পূর্ণ এ পরাণ হে পরাণ প্রিয়,
ব্যথিত নিশ্বাস প্রশ্বাসে !
পথ চেয়ে আর কত রব হায়,
কেমন এ দুরাশা গিয়েও না যায়,
বুঝি বা শর্ব্বরী পোহায় পোহায়,
নাহিক বারতা বাতাসে !
মুগ্ধা, গোপিনী কালো বরণে,
উন্মাদ নদীয়া সুবর্ণ কিরণে,
উচাটিলে চিত কিরূপে কে জানে,
রহিয়া গোপন কোথা যে !

শত ভকত হৃদয় কোন চন্দ্রাবলী,
রেখেছে গো বহু বল্লভে আগুলি,
গেল গেল নিশি আকুল কাকলী,
ওগো মনোকুঞ্জ বনে জেগেছে।

শ্রীগিরীন্দ্রমোহিনী দাসী।

লাজময়ী ।

ওগো দ্বারে এসে কেন যায় সে ফিরিয়া
　　শিথিল আঁচলে আবরি' কায়,
পাছে নূপুর বাজে গো রুণু ঝুণু অই
　　ধীরে পদ ফেলে ধরার গায় !
যবে ফুলবনে সখি ফুলরেণু মাখি'
　　সুধামাখা সুরে গাহে সে গান,
কেন হেরিলে আমারে দূর বনপথে
　　সহসা তাহার মিশায় তান !
তা'র সুধামাখা সেই অধরের ছায়
　　হাসিরাশি কত বিকশি' উঠে,
কেন হেরিলে আমারে সে মধুর-হাসি
　　নিমেষে লুকায় অধরপুটে !
যদি নির্জ্জনে হয় আমাদের দেখা
　　কাননের পথে নিভৃত সাঁঝে,
ওগো তখনি তাহার কপোল দু'খানি
　　রাঙা হয় কেন নিমেষ মাঝে !

শ্রীপ্রিয়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রণত ।

অস্থির-উন্মত্ত-চিত্তে বহুদিন পরে,
আসিয়াছি হেরিবারে সেই শূন্য গেহ,
আঁধার বিজন যাহা শুধু ধু ধু করে,
বিলীন হয়েছে যেথা ভালবাসা-স্নেহ ;
হৃদিচূর্ণ, আশাহত, হয়েছে যেথায়
যাইতে সেথায় আর চলে না চরণ,

হিয়া কাঁপে দুরু দুরু তীব্র যাতনায়,
কাহারে করিব সেথা প্রিয় সম্ভাষণ!
এমন সময়ে হেরি প্রশস্ত প্রাঙ্গণে
বিবর্ণ মলিন কান্তি শীর্ণ দুর্ব্বল
আঁধার প্রতিমা এক বিনম্র বদনে,
প্রণত চরণে মোর, চক্ষে অশ্রুজল;
তোর ত গিয়াছে সব, হয়েছে নিয়তি;
কি করিব আশীর্ব্বাদ—'ধর্ম্মে রেখ' মতি।

শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

প্রেম।

সখি,

যা' দিয়েছি খুঁজে দেখ আপন হিয়ায়,
এ নহে কামনা-বহ্নি মত্ত রূপ-তৃষা;
বিলাসের পাপ-আশা নাহি বিন্দু তায়
পবিত্র উচ্ছ্বাস এ যে শুদ্ধ ভালবাসা।
এ যে গো নিষ্কাম-প্রেম—মন্দাকিনী ধার,
বাসনা পঙ্কিল স্পর্শ করে নাই তায়,
নহে মায়া মরীচিকা মৃগতৃষ্ণিকার
এ পূত সলিলে তপ্ত পরাণ জুড়ায়।

এ প্রেমে সংশয় নাই তৃপ্তি অনুক্ষণ,
ব্যাকুল বাসনা কভু জাগে না পরাণে,
মরমে থাকে না গাঁথা স্মৃতির দংশন,
বিচ্ছেদ হয় না কভু জীবনে মরণে।
আমি যে দিয়েছি প্রেম অমূল্য অক্ষয়
এ নহে গো কাম তৃষা পূতিগন্ধময়।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ মজুমদার বি-এ।
